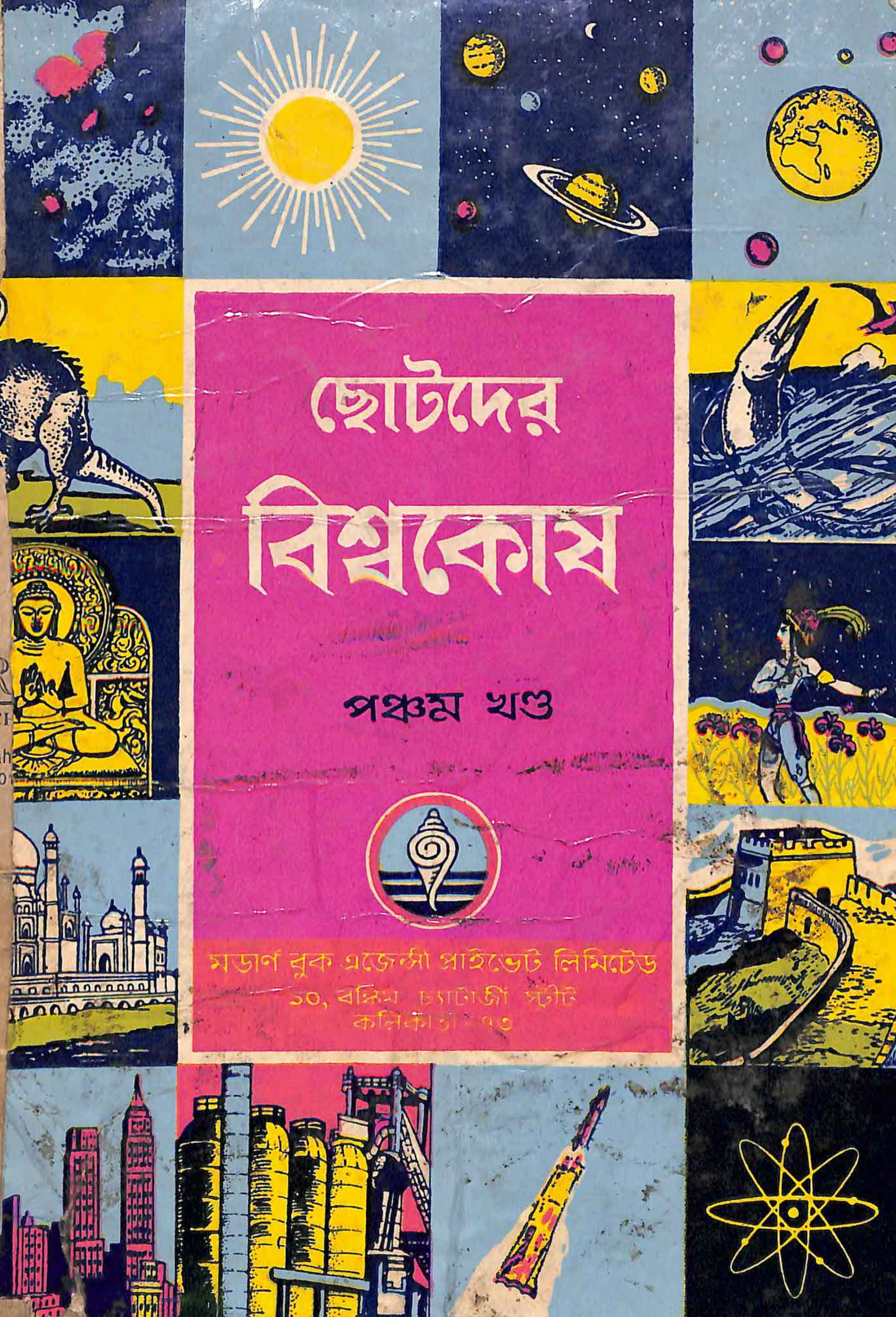


ছোটদের বিশ্বকোষ

পঞ্চম খণ্ড

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

ছোটদের

বিশ্বকোষ

পঞ্চম খণ্ড

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

পঞ্চম খণ্ডের লেখক-পরিচিতি

চিত্রশিল্পের কথা

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ভারত সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্র-পুস্তকের রচয়িতা ও শিল্পী হিসেবে পুরস্কারপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ফটিক-স্মৃতি পদক ও ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।

জীবজন্তুর কথা
ভাষা ও লিপির কথা (আংশিক)
পৃথিবীর কথা
গাছপালার কথা
দেশবিদেশের কথা
বিশ্বসাহিত্যের কথা (আংশিক)
মহাশূন্যের পথে

অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, এম. এস-সি

প্রখ্যাত কিশোর-মাসিক রামধনু পত্রিকার সম্পাদক ও শিশু-সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। কলকাতা আশুতোষ কলেজ ও যোগমায়া দেবী কলেজের প্রাক্তন রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। বি. ই. এস্ কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। ছোটদের বহু গ্রন্থপ্রণেতা। সরল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ও বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প-উপন্যাস রচনায় খ্যাতিমান্। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি। বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের কৃষ্ণনগর ও জলপাইগুড়ি অধিবেশনের শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতি ও নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বারাণসী ও বর্ধমান অধিবেশনের শিশুসাহিত্য শাখার উদ্বোধক। শিশুসাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য রণজিৎ-স্মৃতি পুরস্কার, ভুবনেশ্বরী পদক ও ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত।

যানবাহনের কথা
অঙ্কশাস্ত্রের কথা
সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল, বি. এস-সি., এ. আই. সি.

শিশুসাহিত্যের ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক ও গ্রন্থ-রচয়িতা। কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের ভূতপূর্ব রাসায়নিক গবেষক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প-সংগ্রহশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ। শ্রেষ্ঠ শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-লেখক হিসেবে ফটিক-স্মৃতি পদকপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক।

লোক-সংস্কৃতির কথা

অধ্যাপক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ., পি. এইচ্.-ডি

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান ও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইনস্টিটিউট্ অফ্ ফোক্লোর"-এর অনারারি ডিরেক্টর। লোকসাহিত্যের গবেষণায় সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ঐ বিষয়ে পি. এইচ-ডি।

দেশবিদেশের রূপকথা	**অধ্যাপিকা ডঃ সুচেতা মিত্র, এম. এ., পি. এইচ. ডি.** বাংলা সাহিত্যে কবি ও লেখিকা হিসেবে সুপরিচিতা। প্রখ্যাত শিশুমাসিক "রামধনু" পত্রিকার সহযোগী-সম্পাদিকা। শিশুসাহিত্যের খ্যাতনামা কবি ও লেখিকা। "জীবনানন্দ" ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকার অন্যতম সম্পাদিকা (অধ্যাপক ডঃ পলাশ মিত্রের সহযোগে)। কলকাতা যোগমায়া দেবী কলেজের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা। লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট।
চিকিৎসাশাস্ত্রের কথা আমাদের শরীরের কথা	**ডাঃ ননীগোপাল মজুমদার,** **এম্. বি (কলকাতা), ডি. সি. এইচ (লণ্ডন), সি. এ. পি।** খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিশুচিকিৎসক। কলকাতা ন্যাশানাল মেডিক্যাল কলেজের শিশুচিকিৎসা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক। শিশুকল্যাণ পত্রিকা ও বয়স্কাউট-মুখপত্র যাত্রীর প্রাক্তন সম্পাদক। বার্ষিক শিশুবিচিত্রা পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। বহু শিশুগ্রন্থ-রচয়িতা। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ভুবনেশ্বরী পদকপ্রাপ্ত। শিশুসাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ।
ধর্মের কথা	**শ্রীঅর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য, বি. এ, এল্. এল্-বি, আই-আর-এ-এস।** বড়দের ও ছোটদের সাহিত্যে সুপরিচিত কবি ও লেখক। কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত।
এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা	**শ্রীঅমিতাভ ঘোষাল—বি. ই., এম. ই. আই. ই (ইণ্ডিয়া), এম. আই. ষ্ট্রাক্‌ট. ই. (লণ্ডন) এম. আই. সি. ই. (লণ্ডন)** ব্রেথওয়েট, বার্ন ও জেসপ কনষ্ট্রাক্‌শন প্রতিষ্ঠানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ এঞ্জিনীয়ার। বহু এঞ্জিনীয়ারিং প্রবন্ধের লেখক। ১৯৫৭ সাল থেকে বিভিন্ন ধরনের এঞ্জিনীয়ারিং প্রকল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত।
যে গল্প চিরকালের	**শ্রীরত্নাবলী চক্রবর্তী, এম. এ.** শিশুসাহিত্যের লেখিকা হিসেবে সুপরিচিতা। যোগমায়া দেবী কলেজের ইতিহাসের প্রাক্তন অধ্যাপিকা।
ইতিহাসের কথা	**শ্রীআশিসকুমার রাহা, এম. এ** ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-লেখক হিসেবে সুপরিচিত। ভারত সরকারের উচ্চপদে নিযুক্ত।

প্রকাশক
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

পঞ্চম খণ্ড

দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য পঁচিশ টাকা

মুদ্রক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বাগ
নিউ নিরালা প্রেস
৪, কৈলাস মুখার্জী লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

বিষয় :— পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

মানুষের কথা	**শ্রীউৎপল হোম রায়, এম. এস-সি** নিখিল ভারত শিশুসাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক। প্রাক্তন কেন্দ্রমণি, মণিমেলা। শিশুসাহিত্যের লেখক ও গ্রন্থকার হিসেবে সুপরিচিত। মনোবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত।
ভাষা ও লিপির কথা (আংশিক)	**শ্রীপ্রদীপকুমার ভৌমিক, এম. আই. ই.** কিউরেটার (মেকানিক্যাল), বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেক্‌নোলজিক্যাল মিউজিয়ম্‌।
সংস্কৃত সাহিত্যের কথা	**শ্রীনীলিমা চক্রবর্ত্তী, বি. এ.** শিশুসাহিত্যের সুপরিচিত লেখিকা। সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ও ঐ বিষয়ে একদা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী।
বিজ্ঞানের জয়যাত্রা	**শ্রীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, বি. ই.** শিশুসাময়িক পত্রে খেলাধূলা ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের লেখক। গেস্ট কিন্‌ উইলিয়ামস্‌ লিঃ প্রতিষ্ঠানে এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত।
বিশ্বসাহিত্যের কথা (আংশিক)	**শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ.** শিশুসাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। ভারত সরকার কর্তৃক শিশু-সাহিত্যের ও সদ্যসাক্ষরদের গ্রন্থকার রূপে পুরস্কৃত। শিশুসাহিত্যে অবদানের জন্য ফটিক-স্মৃতিপদক, ভুবনেশ্বরী পদক ও মৌচাক পুরস্কার প্রাপ্ত। শতাধিক শিশুসাহিত্য-গ্রন্থের রচয়িতা। প্রাক্তন সম্পাদক, বার্ষিক আনন্দ। শিশুসাহিত্য পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি।
সংগ্রহশালার কথা	**অধ্যাপক সন্তোষ বসু, এম. এ** কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা-বিজ্ঞানের (মিউজিয়লজি) প্রধান অধ্যাপক। ভারতীয় চারুশিল্প, লোকশিল্প ও সংগ্রহশালা বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর খ্যাতনামা লেখক ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা।



গঙ্গোত্রী



চিত্রশিল্পের কথা

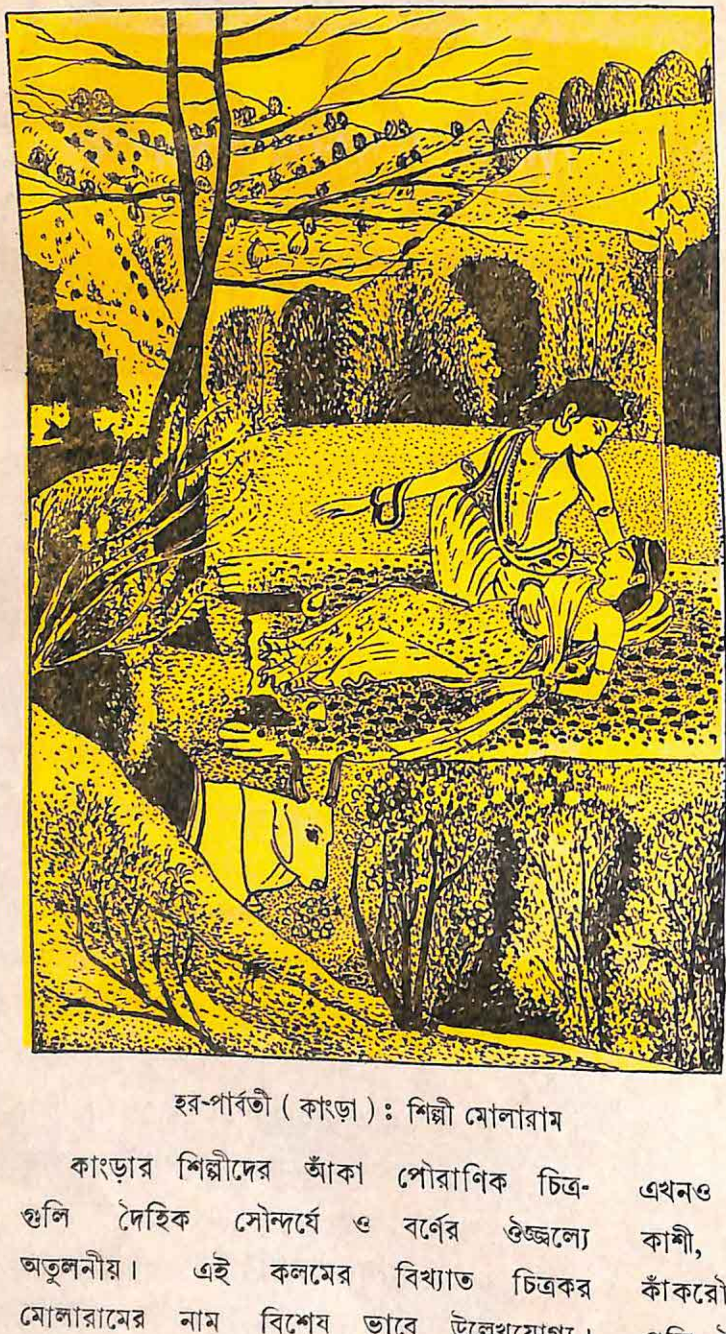
মধ্যযুগের শেষে

—এর আগে আমরা পৃথিবীর চিত্রশিল্প সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আভাস দিয়েছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩০৫-৩১৭, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২০২-১২১২)। আবার পৃথিবীর চিত্র-শিল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে ভারতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগ সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত আলো-চনা করা হয়েছে। এবারে বলব মধ্যযুগের শেষ থেকে একেবারে আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার কথা।

সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল রাজত্ব ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে—তবে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতেও তা বেশ কিছু দিন টিকে ছিল। এই রাজত্বের শেষের দিকে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সময় (১৭৩৯ খৃঃ) পারস্যের নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করেন। দিল্লীতে নাদির যে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন তাতে তখন দিল্লী নগরী প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। যারা বেঁচে ছিল প্রাণের ভয়ে তারা পাঞ্জাবের পাহাড়-ঘেরা হিন্দু রাজ্যগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সব লোকদের মধ্যে ছিলেন বহু গুণী, জ্ঞানী, গায়ক, বাদক, নর্তক, ওস্তাদ চিত্রশিল্পী, কারুশিল্পী, স্থপতি প্রভৃতি। ঐ সব রাজ্যগুলিতে তাঁরা সাদরে গৃহীত হলেন। মোগল রাজত্বের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে এই সময় কি হিন্দু, কি মুসলমান নবাব-রাজা-মহারাজা সকলেই স্বাধীন হয়ে ওঠেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মোগলের বিলাসব্যসনে, আদব-কায়দায় অভ্যস্ত। ফলে সারা ভারতময় ক্ষুদে ক্ষুদে মোগল বাদশাহ্ গজিয়ে উঠতে থাকে।

চারটি বিখ্যাত শিল্প-কলম

এইভাবে দিল্লীর দরবারের বিশিষ্ট শিল্পীদের পরিচালনায় ও স্থানীয় পটুয়াদের সহযোগিতায় চারটি বিখ্যাত "শিল্প-কলম" বা "স্কুলের" উদ্ভব হয়। তাদের নাম দেওয়া হয় বাঁশোলী, চম্বা, গুলের ও কাংড়া কলম। বাঁশোলীর রাজা কৃপাল পাল সিংএর পৃষ্ঠপোষকতায় বাঁশোলী কলম, চম্বার রাজা রাজ-সিংএর উৎসাহে চম্বা কলম, গুলের রাজা প্রকাশচাঁদের উৎসাহে গুলের কলম আর কাংড়ার রাজা সংসার-চাঁদের চিত্র-প্রীতিতে হয় কাংড়া কলমের উদ্ভব।



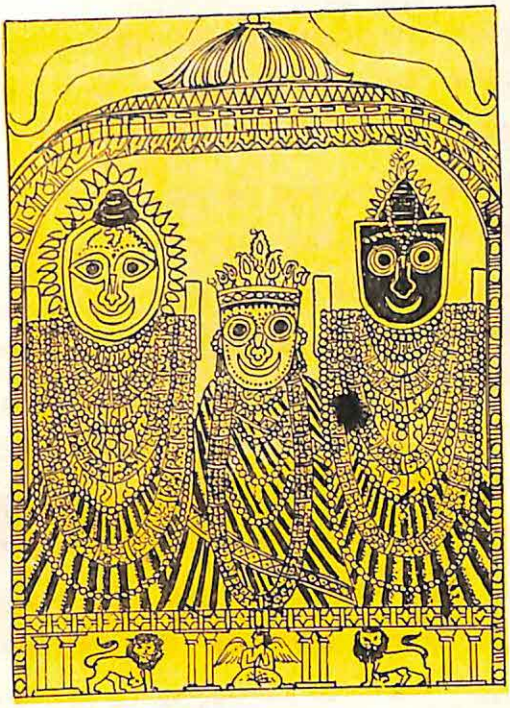
হর-পার্বতী (কাংড়া) : শিল্পী মোলারাম

যে সমস্ত চিত্র-কলমের উল্লেখ করা হ'ল তা সবই কিন্তু মোগল চিত্রকলা থেকেই উদ্ভূত এবং সবই রাজা-মহারাজা, নবাব, আমীর-ওমরাহ্‌দের উপভোগের জন্যই আঁকা। এ সব চিত্রে জনসাধারণের কোনই যোগাযোগ ছিল না।

পটুয়া

জনসাধারণের যোগাযোগ ছিল পটুয়াদের সঙ্গে। পটুয়া হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই হ'ত। পটুয়ারা দেব-দেবী ও দেবলীলার পট এঁকে হাটে, বাজারে, মেলায় পটের বেসাতি সাজিয়ে বসতেন ও নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রি করে তাতেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। বিশেষতঃ দেবমন্দির ও তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র ক'রে বহু পটুয়া তাঁদের পটের ব্যবসা চালিয়ে যেতেন এবং এখনও যাচ্ছেন। তারকেশ্বর, পুরী, ভুবনেশ্বর, কাশী, কালীঘাট, এলাহাবাদ, নাথদ্বার, কাঁকরৌলী, দ্বারকা প্রভৃতি জায়গার পটচিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা ভারতে সুপরিচিত। একদল মুসলমান ফকির লম্বা কাপড়ের ফালির ওপর আঁকা পট দেখিয়ে ও পটের বিষয়ে গান গেয়ে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষা করত। এরা গাজীর পট, মনসার পট, লক্ষ্মীর পট, যমপট বা

কাংড়ার শিল্পীদের আঁকা পৌরাণিক চিত্রগুলি দৈহিক সৌন্দর্যে ও বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে অতুলনীয়। এই কলমের বিখ্যাত চিত্রকর মোলারামের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কলমগুলির নামই হ'ল পাহাড়ী চিত্রকলা। পরবর্তী কালে অবশ্য ভারতের অন্যান্য স্থানেও নানা কলমের উদ্ভব হয়েছে; যেমন, লখ্‌নৌ কলম, বেনারস কলম, পাটনা কলম ইত্যাদি।



জগন্নাথের পট

স্থানীয় কোন ঘটনা বা ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে গান বেঁধে পট দেখিয়ে বেড়াত। শোনা যায় পূর্বে নাকি "মুস্কিল আসানের" হাতেও পটের ছবি থাকত।

ধর্মীয় পুস্তকের ছবি আঁকা সর্বদেশেই প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশের নবম ও দশম শতকে পাল যুগের পুঁথিচিত্র এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে গুজরাতী পুঁথিচিত্র চিত্রশিল্পের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পরবর্তী কালে ভারতের সব প্রদেশেই বিশিষ্ট পটুয়ারা পুঁথিচিত্র এঁকে সুনাম অর্জন করে গেছেন। পণ্ডিতদের মতে ভারতের পুঁথিচিত্রগুলির মধ্যে উড়িষ্যার পুঁথিচিত্র-গুলি সর্বশ্রেষ্ঠ। তালপাতা অথবা তুলট কাগজের উপর টেম্পারা রং দিয়ে এই চিত্রগুলি আঁকা হ'ত। এগুলো তো বটেই, পুঁথির কাঠের পাটার (মলাট) ওপরে যে ছবিগুলি আঁকা হ'ত তাও শত শত বছর পরে আজও অম্লান ও অবিকৃত রয়েছে।



কালীঘাটের পট



পুঁথিচিত্র

ভারতে বিদেশী চিত্রকর : জল-রঙ আর তেল-রঙের ছবি

অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে বহু ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে ইয়োরোপীয় চিত্রকর আমাদের দেশে আসতে শুরু করেন। এখানে এসেই তাঁরা জানতে পারেন যে জল-রঙ বা তেল-রঙ দিয়ে কোন ছবিই এখানে আঁকা হয় না। ছবি আঁকা হয় টেম্পারা রঙে। চিত্র বলতে এখানে শুধু পটকেই বোঝায়, তাও সবই আবার ঠাকুর-দেবতার চিত্র। লোকের ছবি,—যাকে বলা হয় 'পোর্ট্রেট' বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি,—যাকে বলা হয় 'ল্যাণ্ডস্কেপ',—সেই জাতীয় পেন্টিং এখানে কেউই জানে না। বিদেশী চিত্রকরেরা এ সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে ধনী গৃহস্থদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে "লাইফ" থেকে "সিটিং" নিয়ে পোর্ট্রেট্ পেন্টিং করে (অর্থাৎ যার ছবি আঁকা হবে তাকে সামনে বসিয়ে দেখে দেখে তার হুবহু ছবি এঁকে দিয়ে) বেশ দু' পয়সা উপার্জন করতে আরম্ভ করেন। তখন ফটোগ্রাফের রেওয়াজ ছিল না, কাজেই পোর্ট্রেট আঁকতে গেলে আঁকতে হ'ত "লাইফ" থেকেই।

তখনকার দিনে 'অয়েল পেন্টিং' করার হাঙ্গামাও ছিল প্রচুর। নিজের হাতে ক্যান্‌ভাস্ তৈরি করতে হ'ত। শিলনোড়ায় রঙ বেটে, তাতে তিসির তেল মিশিয়ে ছোট ছোট চামড়ার থলিতে ভর্তি করে রাখতে হ'ত। চামড়ার থলিগুলির মাথায় থাকত একটি করে ছিদ্র, যাতে থলিটি টিপলেই রঙ এসে পড়ে পেলেটের ওপর। এমন কি তূলিগুলিও তাঁদেরকেই তৈরি করে নিতে হ'ত।

আজকাল চিত্রকরদের রঙ-তূলি, ক্যান্‌ভাস ইত্যাদির বহু বহু ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে; সেকালে কিন্তু চিত্রকরকেই সব করে নিতে হ'ত। সেজন্যে তাঁদের দরকার হ'ত সহকারী বা সাগরেদের। ভারতে আগত বিদেশী চিত্রকরেরা তাই পটুয়াপাড়ায় ঘুরে ঘুরে পটুয়াদের মেধাবী ছাত্রদের বেছে নিয়ে এ কাজে বহাল করতেন। পটুয়ারাও ভাবতেন, সাহেবদের কাছ থেকে যদি পোর্ট্রেট পেন্টিংটা শিখে নিতে পারে ছেলেরা, তবে আখেরে কাজ দেবে। এইভাবে বিদেশী চিত্রকরদের সংস্পর্শে এসে তাঁরা অয়েল পেন্টিং-এর মূল সূত্রগুলি শিখতে লাগলেন বটে, কিন্তু ঠিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষা না পাওয়াতে তাঁদের আঁকা ছবিগুলিতে ড্রইং, মাপজোঁক ও দর্শনানুপাত,—যাকে বলা হয় পার্স্‌পেক্‌টিভ,—প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি উপেক্ষিত হওয়ায় সেগুলি না হ'ল পট, না হ'ল পেন্টিং।

পটুয়াদের আঁকা অয়েল পেন্টিংগুলিতে হাত-পায়ের মাপজোঁকের গণ্ডগোল ছাড়াও চোখ আঁকতে গিয়ে প্রায় সকলেই গোলমাল করে বসতেন। ওঁদের আঁকা চোখগুলি হ'ত অস্বাভাবিক বড়। চোখের তারাগুলিও হ'ত ড্যাবডেবে। এটা যে কোন লোকের চোখেই পড়ে আর ঐ ছবির চোখ দেখেই ধরা যায় যে এটা পটুয়া চিত্রকরদের আঁকা। পটের ছবিতে যে চোখ তাঁরা পুরুষানুক্রমে এঁকেছেন তাকে তাঁরা ভুলতে পারেন নি—বদলানোও দরকার মনে করেন নি।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। ১৯২৪ সালে কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের

ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন স্বনামখ্যাত চিত্রকর যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী মশাই। একদিন কি কাজে তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি একখানি বিশাল অয়েল পেন্টিং-এর ওপর 'টারপেনটাইন' ঘষছেন। ছবিখানি চন্দননগরের কোন এক ধনীর গৃহ থেকে এসেছে রং বার্নিশ হওয়ার জন্যে। ছবিখানি পায়রা-পুরীষোৎসর্গে বিবর্ণ, ছবির মুখখানিতে এবং মুখের আশপাশের ব্যাক্ গ্রাউণ্ডে শত শত ছোট ছোট ছিদ্র। ছবিখানির এ অবস্থা হ'ল কি করে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের এয়ার গান চালিয়ে ছবিটির এ অবস্থা করেছে। তাদের টারগেট ছিল পূর্বপুরুষের ড্যাবডেবে চোখ তু'টি।

এতে কেউ যেন মনে না করে যে পটুয়াদের আঁকা অয়েল পেন্টিং সবই অতি নীচু স্তরের। এর মধ্যে উৎকৃষ্ট ছবিও অনেক আছে। "ফুল ফিগার" বা পুরো ছবি আঁকবার সময় যে দোষক্রটীর কথা আগে উল্লেখ করেছি, বুক পর্যন্ত পোর্ট্রেটে সে সব দোষগুলি অনেক কম। বিশেষতঃ ভারতীয়দের গায়ের রং আঁকতে এঁরা ছিলেন সিদ্ধ-হস্ত। এখানে ইয়োরোপীয় চিত্রকরেরা প্রায়ই অকৃতকার্য হয়েছেন। ভারতীয়দের গায়ের রং পালিশ করা সেগুন কাঠের রং। কেউ বা এক পোঁচ সাদা, কেউ বা এক পোঁচ ঘোর। বিদেশী চিত্রকরদের আঁকা পোর্ট্রেটগুলি কখনও বা তাদের দেশীয় লোকজনদের মত সাদা ধবধবে, কখনও বা একেবারে ঘোর কালো হয়ে যেত। ভারতে যে সব চিত্রশালা আছে তাতে দেশীয় চিত্রকরদের অয়েল পেন্টিং-এর বহু নিদর্শন দেখা যায়। এর মধ্যে হায়দ্রাবাদের সালারজং মিউজিয়াম, বোম্বাই, পুনা এবং আমাদের মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের চিত্রশালা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কয়েকজন নামকরা বিদেশী চিত্রকর

যে সব ইয়োরোপীয় চিত্রকরের কথা আগে বলেছি তাঁরা কেউই খুব নামকরা চিত্রকর ছিলেন না। নামকরা চিত্রকরদের মধ্যে সর্ব-প্রথম ভারতে আসেন বোধ হয় টিলি কিট্‌ল। তিনি মাদ্রাজে আসেন ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে, তার পাঁচ বছর পরে আসেন কলকাতায়। ইনি অসংখ্য পোর্ট্রেট, কম্পোজিশন ও ভারতবাসীদের সেকালের জীবনযাত্রার স্কেচ এঁকে গেছেন। সতীদাহের কয়েকখানি মূল্যবান্ চিত্রও ইনি এঁকেছেন।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে আসেন উইলিয়াম হজেস্।

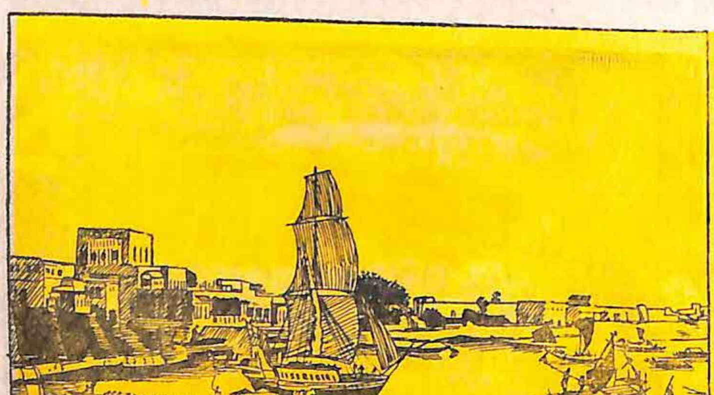


জন জোফানীর আঁকা একখানি ছবি

ইনি ছিলেন ক্যাপ্টেন কুকের সার্ভেয়ার বা আমিন। কুকের সঙ্গেই ইনি অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারে যান, তারপর ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে আবার চলে আসেন ভারতে। এখানে এসে, অনেক দিন থেকে, ইনি বহু দৃশ্যচিত্র এঁকে গেছেন। ইনিই ভারতে ইয়োরোপীয় চিত্রকর-দের মধ্যে সর্বপ্রথম 'ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টার'। এর পরে (১৭৮৩ খৃঃ) আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর এখানে আসেন। তাঁর নাম জন্ জোফানী। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্ ও হাইকোর্টে এঁর কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট ছবি আছে। কলকাতায় কিছু দিন থেকে, ইনি লখ্নৌর নবাব-দরবারে ছবি আঁকার জন্য আহূত হন এবং বারো বছর লখ্নৌতে থাকার পর দেশে ফিরে যান। ইংল্যাণ্ডের রয়াল অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম চিত্রশিল্পী ছিলেন জন্ জোফানী।

ডেনিয়েল (১৭৮৬) খুড়ো-ভাইপো দু'জন চিত্রকরের নাম বোধ হয় অনেকেরই শোনা আছে। এঁরা প্রায় কুড়ি বছর এখানে থেকে বহু বড় বড় ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে অমর হয়ে আছেন। এঁরা কলকাতা থেকে নৌকোয়, গরুর গাড়ীতে, উটের পিঠে, ঘোড়ায়, হাতীতে চড়ে মাদ্রাজ পর্যন্ত যান। যেতে যেতে রাস্তার দু'ধারে গ্রাম, শহর, পাহাড়, পর্বত, জনপদ প্রভৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র কখনো জল-রঙে, কখনো তেল-রঙে এঁকে গেছেন এবং তাঁদের এই ভ্রমণের একটি সুখপাঠ্য বিবরণও রেখে গেছেন। তখনকার দিনে ডেনিয়েলদের এক-রঙা স্কেচ ও বহুবর্ণ চিত্রের লিথো-প্রতিলিপি ইংল্যাণ্ডে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আর একজন বিখ্যাত চিত্রকর এসেছিলেন চিনারী (১৮০৭)। এই অদ্ভুতকর্মা পাগলাটে চিত্রকর সারা ভারত ঘুরে হাজার হাজার স্কেচ, ল্যাণ্ডস্কেপ ও কম্পোজিশন করে গেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে ছবি 'ফিনিশ্' করার ধৈর্য এঁর ছিল না। ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়াল হলে এঁর একখানি স্কেচ-বুক আছে। বিলেতের রয়াল অ্যাকাডেমীতে ও ইণ্ডিয়া হাউসেও এঁর বহু স্কেচ-বুক সযত্নে রাখা আছে।



গঙ্গার দৃশ্য : শিল্পী ডেনিয়েল

আর একজন চিত্রকর ছিলেন এডওয়ার্ড লিয়ার (১৮৭৩)। এঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, কিন্তু এমন মনের জোর ছিল যে ঐ স্বাস্থ্য নিয়েই ইনি সারা ভারত ঘুরে হাজারের ওপর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে গেছেন জল-রঙে অর্থাৎ ওয়াটার কালারে। ওজিয়াস হাম্ফ্রে ও

দু'জন বিখ্যাত মহিলা চিত্রকর,—ইসাক (ইহুদী) ও ডায়না হিল্‌—এঁরা ছিলেন 'মিনিয়েচার পেণ্টার'। এঁদেরও শত শত মিনিয়েচার নানা যাদুঘরে দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে আমরা মাত্র কয়েকজনের নাম করলাম। এ ছাড়াও বহু বিখ্যাত চিত্রকর তখন এদেশে এসে আমাদের দেশের দৃশ্যপ্রকৃতি, নানা ধরনের মানুষের বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, দেবমন্দির, মসজিদ, তীর্থক্ষেত্র, মেলা, নানা পূজা-পার্বণ ও উৎসবের ছবি এঁকে গেছেন সমস্ত ভারত ঘুরে ঘুরে। তখনকার দিনের সে সব অমূল্য ছবি ও তাঁদের ভ্রমণকাহিনী, যা তাঁরা রেখে গেছেন, তার তুলনা নেই। আশ্চর্য হয়ে ভাবি আজ এতদিন পরেও কি আমাদের দেশের কোন চিত্রশিল্পী সমস্ত ভারত ঘুরে ছবি আঁকার কথা মনেও ভেবেছেন? সমস্ত ভারত দূরের কথা, তাঁর নিজের প্রদেশের—নিজের গ্রামখানির ছবি আঁকার কথাও কি কেউ একবার চিন্তা করেছেন?

বিদেশী শিল্পীরা করেন নি শুধু একটি কাজ —এঁরা কোন শিষ্য বা ছাত্র রেখে যান নি। তারও একটা কারণ আছে। তখন দেশে এমন কোন চিত্রকর হয়তো ছিলেন না যাঁরা এঁদের কাছ থেকে তাঁদের বিদ্যা গ্রহণ করে উঠতে পারেন। জন্‌ জোফানী, টেলি কিট্‌ল, ডেনিয়েল —এঁদের যদি কোন সুযোগ্য ছাত্র থাকত তবে হয়তো সেই ধারা অনুসরণ করে আজ একটা 'ইনষ্টিটিউশন' গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তা হয় নি। কেউ এঁদের বিদ্যা গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসে নি। হয়তো এর কারণ, তখন ছবি আঁকাটা সমাজে ছিল অপাংক্তেয়, ভদ্রসন্তানেরা এ বিদ্যা শিখতেন না। পটুয়া সমাজে তেমন প্রতিভাধর কেউই ছিলেন না যিনি ঐ সব বিখ্যাত চিত্রকরদের ধারক ও বাহক হবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

রবি বর্মার যুগ

ত্রিবাংকুরের বিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবি বর্মা (১৮৪৮ খৃঃ) এ ক্ষেত্রে একটা মস্ত ব্যতিক্রম। বাল্যকালে তিনি মাদুরার রামস্বামী



রাবণ কর্তৃক জটায়ুর পক্ষচ্ছেদ

শিল্পী: রাজা রবি বর্মা

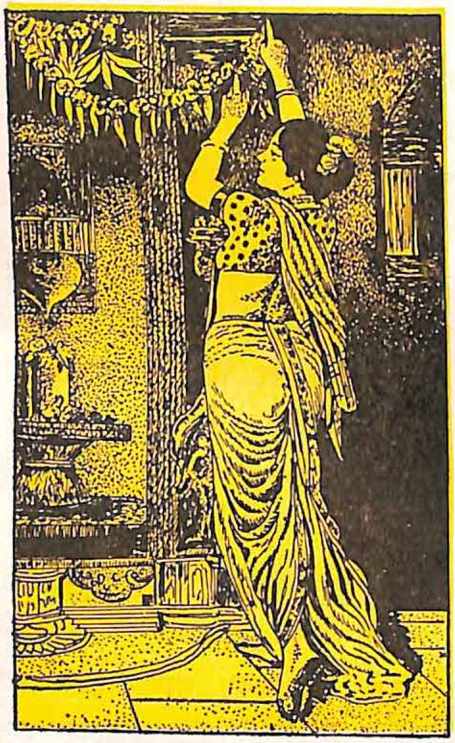
নায়েকের কাছে ছবি আঁকায় প্রথম পাঠ নেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে থিওডোর জ্যানসেন নামে এক-জন ভেনিস চিত্রকর এসেছিলেন ত্রিবাংকুরের রাজপরিবারের ছবি আঁকার জন্য। এঁর কাছেই রবি বর্মা অয়েল পেন্টিং শিখেছিলেন। উঁচু মানের অয়েল পেন্টিং-এর প্রবর্তক বলে রবি বর্মার নাম চিরদিনই সমুজ্জ্বল থাকবে আমাদের দেশে। পাশ্চাত্য শিল্পের ভগীরথ হিসাবে তিনি চিরকালই পূজিত হবেন। তাঁর অসংখ্য ছবির মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের ছবিগুলি সারা ভারতেই অতি জনপ্রিয়।

তাঁর বিশালকায় ছবিগুলির বড় এবং ছোট ওলিওগ্রাফ প্রিণ্ট ধনী ও দরিদ্রের গৃহে সমান ভাবেই আদর পেয়ে আসছে আজ একশ' বছর যাবৎ। এঁর অধিকাংশ ছবিগুলিই মহীশূরের বা বরোদার চিত্রশালায় রাখা আছে। কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলেও রবি বর্মার আঁকা ত্থানি পোর্ট্রেট আছে। সেগুলি রঙের ঔজ্জ্বল্যে ও ড্রইং-এর মুন্সীয়ানায় দীপ্যমান্।

বোম্বাই আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধরের নামও ছবির জগতে সুপরিচিত। তিনি ওয়াটার ও অয়েল ত্ব-রকমেই ছবি এঁকে সুখ্যাতি অর্জন করে গেছেন।

শিল্পী বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় রবি বর্মাকে অনুসরণ করে বহু সুন্দর সুন্দর অয়েল পেন্টিং রচনা করে গেছেন। তাঁর 'শকুন্তলার প্রতি ত্বর্বাসার অভিশাপ' ছবিখানি বিখ্যাত।

অন্নদা বাগচী ছিলেন কলকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের হেড্মাষ্টার। তাঁর 'কুবেরের লক্ষ্মী-পূজা' ছবিখানি অতি সুন্দর। ইনিও রবি



পূজারিণী : শিল্পী মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর

বর্মাকেই অনুসরণ করে গেছেন। এ ছাড়া পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী বাগচী প্রভৃতি বাঙ্গালী ও তখনকার যুগের সারা ভারতের চিত্র-শিল্পীরা রবি বর্মাকেই আদর্শ শিল্পী বলে মেনে নিয়ে অল্পবিস্তর তাঁকে অনুসরণ করেই তাঁদের চিত্র রচনার কাজ করে গেছেন। এ সময়টিকে তাই রবি বর্মার যুগ বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে।

শিল্পী শশীকুমার হেশ ছিলেন পোর্ট্রেট পেণ্টার। কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে পাঠ শেষ করে তিনি ইটালীতে যান পোর্ট্রেট পেন্টিং শিখতে এবং এখানে এসে আমাদের দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির ছবি এঁকে সুনাম অর্জন করেন। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের চিত্র-শালায় শশী হেশের আঁকা সাতখানি পোর্ট্রেট

আছে। সেগুলি সত্যিই অনবদ্য। দীর্ঘকাল পরেও তাদের রংঙের ঔজ্জ্বল্য এতটুকুও ম্লান হয়ে যায় নি।

সরকারী আর্ট স্কুল খোলা হ'ল

প্রায় একই সময়ে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুল স্থাপিত হয়। কলকাতার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হলেন লক্ (১৮৬৪)। তার পর এলেন জবিন্স। সে সময়ে ইটালিয়ান চিত্রকর গিলার্ডি ছিলেন ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। জবিন্সের পর প্রিন্সিপ্যাল হয়ে আসেন ই. বি. হ্যাভেল (১৮৯৬)। হ্যাভেল আসার পর থেকেই ভারতের চিত্রশিল্পে এক নতুন যুগের সূচনা হয় এবং রবি বর্মার প্রদর্শিত পথে চিত্র রচনায় পড়ে পূর্ণচ্ছেদ। হ্যাভেল এদেশে এসে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের ও ভারতীয় শিল্পচর্চার ইতিহাস পাঠে আত্মনিয়োগ করেন এবং বহু মূল্যবান্ ও তথ্যপূর্ণ শিল্পবিষয়ক পুস্তক রচনা করে ভারতশিল্পের একজন বিশিষ্ট দিশারী বলে সুপরিচিত হন। এর কিছুকাল পূর্বে জেম্স্ ফার্গুসনও হিষ্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ন্ আর্কিটেক্চার নামে অতি মূল্যবান্ একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন (১৮৭৬)।

প্রিন্সিপ্যাল হ্যাভেল ও ইণ্ডিয়ান আর্ট

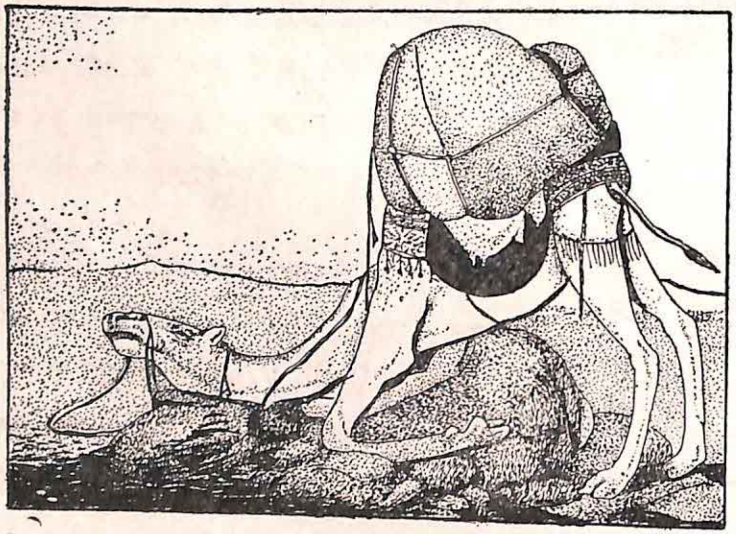
উপরে যে তিনটি আর্ট স্কুলের কথা বলা হয়েছে সেগুলি স্থাপিত হয়েছিল ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য। কিন্তু হ্যাভেল আর্ট স্কুলে এসেই পূর্বের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ভারতীয় ভাবে আর্ট স্কুলকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্কুল থেকে চেয়ার-টেবিল দূর হ'ল—এল মাদুর, জলচৌকি। প্রথম প্রিন্সিপ্যাল লক্ আর্ট স্কুলে ইয়োরোপীয় বিখ্যাত চিত্র ও মূর্তি-শিল্পের 'কপি' (কারও কারও মতে 'ওরিজিন্যাল' অর্থাৎ আসল) করিয়ে এনে একটি চিত্রশালা গড়ে তোলেন। হ্যাভেল সেই চিত্রশালাটিকে নীলামে বিক্রি করে দেন সকলের আগে। প্লাষ্টার অব্ প্যারিসের বড় বড় গ্রীক মূর্তিগুলি, যা বিক্রি হয় নি, সেগুলিকে ফেলে দেন আর্ট স্কুলের পুকুরে।

এই থেকে ছাত্রদের মনে এই ধারণা হয় যে হ্যাভেল তাদেরকে ইয়োরোপীয় আর্ট শিখতে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তখন রণদা গুপ্তের নেতৃত্বে আর্ট স্কুলে ধর্মঘট হয়। (এই ধর্মঘটই বোধ হয় ভারতের সর্বপ্রথম ধর্মঘট।) রণদা বাবু আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকজন ছাত্র সংগ্রহ করে 'জুবিলি আর্ট স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত চিত্রকর অতুল বসু, প্রহ্লাদ কর্মকার, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির সর্বপ্রথম গুরু এই রণদা গুপ্ত।

এলেন অবনীন্দ্রনাথ

এখন, স্কুলে 'ইণ্ডিয়ান আর্ট' শিক্ষা দিতে পারে এমন শিল্পী খুঁজে বার করাই হ'ল হ্যাভেলের সর্বপ্রথম কাজ। তিনি ছুটলেন কালীঘাটের পটুয়াদের কাছে। তাঁরা কেউই আর্ট স্কুলের মাষ্টার হতে সাহসী হলেন না। এই খোঁজাখুঁজির পর ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মাকে পাওয়া গেল। এঁরা নাকি পুরুষানুক্রমে চিত্র-শিল্পী। এই সময়ে হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় ঘটে (১৮৯৭-৯৮)। হ্যাভেল এতদিন যা খুঁজছিলেন অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে সে সমস্ত গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত জেনে মহাখুশি

হয়ে উঠলেন। অপর পক্ষে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে হ্যাভেলের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পেয়ে অবনীন্দ্রনাথও হয়ে উঠলেন তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও শিষ্য। হ্যাভেলের অনুরোধে তিনি আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যালের পদ গ্রহণ করেন এবং ভারতীয় শিল্পচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে জাপানী পণ্ডিত ও শিল্পী শ্রীযুত ওকাকুরার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটে এবং এঁরই কাছে তিনি জাপানী পদ্ধতিতে ছবি আঁকা আয়ত্ত করেন। এই ভাবে মোগল চিত্রকলা, রাজস্থানী চিত্র, পটশিল্প ও জাপানী চিত্রের সংমিশ্রণে যে চিত্রকলার উদ্ভব হয় তারই নাম হ'ল ভারতীয় শিল্প বা 'ওরিয়েন্টাল আর্ট'।



শেষ বোঝা ঃ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

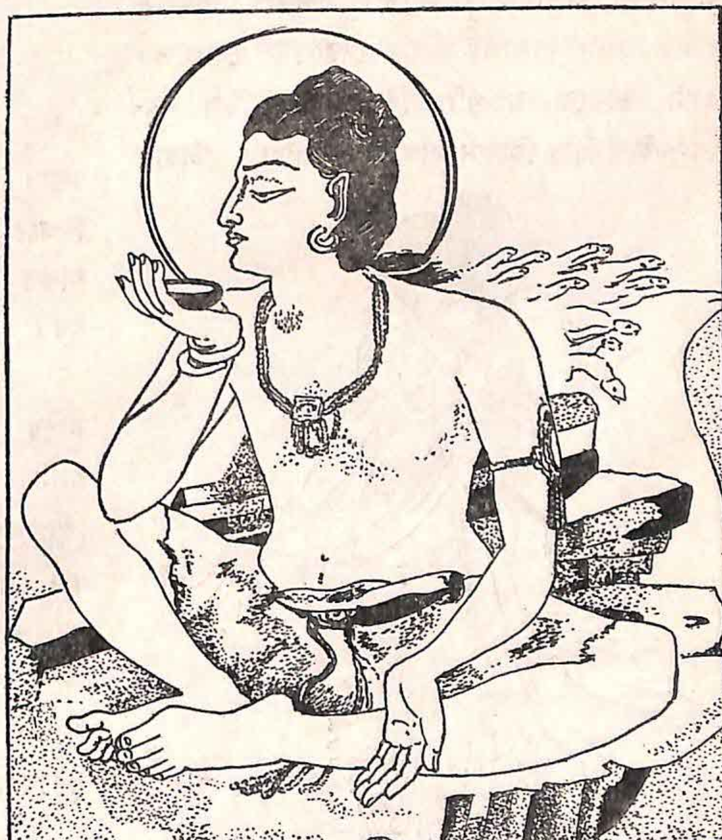
সরকারী আওতায় এই সময় স্থাপিত হয় একটি সোসাইটি, তার নাম হ'ল 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট' (১৯০৭-১৯২৯)। এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তখনকার বিচারপতি উড্রফ, ভগিনী নিবেদিতা আর পরবর্তী কালে বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডশে। প্রতি বছরই সোসাইটির একটি করে চিত্র-প্রদর্শনী হ'ত। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, সে সব ছবির ক্রেতা প্রায় সবই ছিলেন ইয়োরোপীয় ধনীমহল। আমাদের দেশের মানুষের মনে সোসাইটির চিত্রকলা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় নি। ১৯০৫ সাল থেকে আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের শুরু। এ সময়ে ওরিয়েন্টাল সোসাইটির সদস্যদের দেশী ভাবে ছবি আঁকাটা শিক্ষিত সমাজে দেশভক্তির পরিচায়ক বলে বিবেচিত হয়ে ওরিয়েন্টাল আর্টকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে বেশ কিছুটা সাহায্য করেছিল সন্দেহ নেই। সোসাইটির প্রাণকেন্দ্র অবনীন্দ্রনাথ। তিনিই শিল্পাচার্য ও গুরু। অবনীন্দ্রনাথ বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিল্পশিক্ষার প্রথম পাঠ তিনি গিলার্ডি (ইটালিয়ান চিত্রকর, যিনি প্রিন্সিপ্যাল জবিন্সের সময়ে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ও নোনাতলায় একটি ষ্টুডিও স্থাপন করে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতেন) ও তারপর ইংরেজ চিত্রকর পামারের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। কিন্তু কোথাও তাঁর মন বসে নি। পরে তিনি রাজপুত চিত্রকলার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেইভাবেই চিত্র রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

বাংলার তথা ভারতের সমকালীন দুই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়।

দু'জনেই প্রথমে গিলার্ডির ও পরে পামারের ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথ ইয়োরোপীয় পন্থা বর্জন করে ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, আর যামিনীপ্রকাশ পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ (অয়েলে) পেন্টিং শিক্ষার গুরুপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন আজীবন।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের কথা দু'-চার লাইনে বলা সম্ভব নয়। তাঁর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। ইয়োরোপীয়, জাপানী, ভারতীয়, মোগল প্রভৃতি চিত্রকলায় তাঁর বিশেষ দখল থাকায় তাঁর সব ছবিতেই ঐ সব চিত্রশৈলীর স্পর্শ পাওয়া যায়। সব ছবিই তাঁর জল রঙে রচিত। রবীন্দ্রনাথের একখানি পোর্ট্রেটই শুধুমাত্র অয়েল কালারে দেখেছি।

পরবর্তী কালে তিনি পেস্টেলে ও ক্রেয়নে অনেক চিত্র রচনা করে গেছেন। তবে তিনি ভালবাসতেন মুসলমানি চিত্র আঁকতে। তাঁর ওমর খৈয়মের ছবি, আরব্য উপ-ন্যাসের ছবিগুলি খুবই বিখ্যাত। "শাজাহানের শেষ শয্যা" ছবিখানির প্রিন্ট মডার্ন্ রিভিউ পত্রিকায় দেখে মহীশূর থেকে রাজা রবি বর্মা ঠাকুরমহাশয়কে অভিনন্দিত করে পত্র দেন। খুব ছোট ছোট এবং খুব বড় (আলমগীর) ছবি তিনি একই রকম নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সঙ্গে রচনা করে গেছেন, কোথাও এতটুকু অপূর্ণতা রাখেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হ'ল এই যে স্বদেশে-বিদেশে তাঁর ছবির বহু সমালোচনা হয়েছে, অথচ কেউই তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং-এর কথা বিশেষ ভাবে বলেন নি। আমার মনে হয় অবনীন্দ্র-সৃষ্টির মধ্যে তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপগুলি অনবদ্য। ল্যাণ্ডস্কেপ পেন্টিং করতে গেলে চাই আলো ও ছায়ার প্রতিফলন প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু ঠাকুরমহাশয়ের ল্যাণ্ডস্কেপগুলিতে আছে শুধুমাত্র আলো,—ছায়া তাঁর ছবিতে নেই বললেও চলে। অথচ ছবিগুলি প্রত্যেকখানিই নয়নাভিরাম।



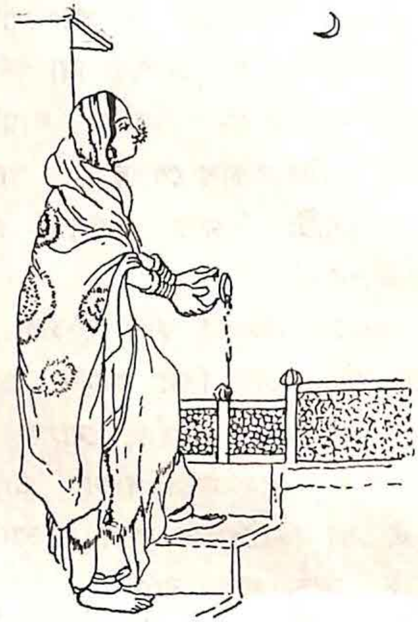
শিবের বিষপান : শিল্পী নন্দলাল বসু

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যসম্প্রদায়

এ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা প্রায় সকলেই অবনীন্দ্র-শিষ্য। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, মুকুল দে, অসিত হালদার, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, সুরেন কর, আবদর রহমান চাঘতাই, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, সমর গুপ্ত, সারদা উকিল, বীরেশ্বর সেন, শৈলেন দে, মণীন্দ্র গুপ্ত, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এস. নটেশন বেঙ্কট আপ্পা, বিপিন দে প্রভৃতি। সে মেয়ে ভারতের প্রতিটি প্রদেশে এই নতুন শিল্পধারাকে স্বাগত জানিয়েছেন সেখানকার গুণীজ্ঞানীরা অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে। বস্তুতঃ চিত্রকর বলতে তখন বাঙ্গালী চিত্রকরদেরকেই বোঝাত। তখন ভারতে যতগুলি শিল্পবিদ্যালয় ছিল সবগুলিরই কর্ণধার ছিলেন বাঙ্গালী শিল্পীরা। তাঁরাই



অপ্সরা : শিল্পী অসিতকুমার হালদার



পূজারিণী : শিল্পী সারদাচরণ উকিল

এই নব-আবিষ্কৃত শিল্পধারার পথপ্রদর্শক ও গুরু। ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশগুলি অবাক্ বিস্ময়ে বাঙ্গালী শিল্পীদের চিত্ররচনার দিকে তাকিয়ে থাকত। বাংলার পক্ষে সে ছিল এক গৌরবময় যুগ।

ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি থেকে সে সময়ে "রূপম্" নামে যে শিল্পবিষয়ক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয় তা পৃথিবীর তৎকালীন শিল্পজগতে বিশিষ্ট মর্যাদার আসন পেয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী) আর ভারতশিল্প-সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত ডঃ আনন্দ কুমারস্বামী ছিলেন এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক।

ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্য শিল্পীরা ও নন্দলাল

অবনীন্দ্রনাথের অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাঁর শিল্পশৈলীতে ভারতশিল্পধারার



যমুনা : শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

অনুসরণ আরম্ভ করে তাঁর চৈতন্যলীলার ছবিগুলি এঁকেছেন। পরবর্তী কালে তিনি খাঁটি জল রঙে বহু ল্যাণ্ডস্কেপ ও কার্টুন ছবি এঁকে ভারতশিল্পের গণ্ডী থেকে বাইরে চলে এসেছেন এবং শেষ বয়সে জার্মানীতে সেকালে সম্ভ-অনুসৃত "কিউবিজ্‌মের" অনুসরণে তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলি রূপায়িত করে গেছেন। বস্তুতঃ তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় চিত্রশিল্পী যিনি বিদেশী শিল্পের আধুনিকতা আমাদের দেশে প্রবর্তন করে চিরদিনের মত নমস্য হয়ে আছেন।

রবীন্দ্রনাথের "জ্যোতিদা"—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর "পেন্‌সিল" দিয়ে পোর্ট্রেট অঙ্কনে বিশেষ পারদশী ছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য নন্দলালের নাম সমস্ত ভারতে সুবিদিত। প্রকৃত পক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম চিত্রশিল্পী যিনি আমাদের দেশের পৌরাণিক ছবিগুলির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করে যশস্বী হয়ে আছেন। ইতিপূর্বে রাজা রবি বর্মার পৌরাণিক ছবির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু রবি বর্মা রামায়ণ-মহাভারতের ছবিগুলিতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করতে সমর্থ হন নি। ঐ কাজ করেছেন নন্দলাল। তিনি দেশের প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্য থেকে পৌরাণিক চরিত্রগুলির যে রূপ আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন তাতে সেগুলি হয়ে উঠেছে অনবদ্য সুন্দর এবং অসাধারণ



দেবস্থান : শিল্পী যামিনী রায়



মা ও ছেলে : শিল্পী যামিনী রায়

মহিমান্বিত। অসংখ্য পৌরাণিক চিত্র এঁকেছেন তিনি। বিশেষতঃ শিব-পার্বতীর ছবিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এদেশের আরও কয়েকজন খ্যাতিমান্ শিল্পী

এখানে আরও কয়েকজন খ্যাতিমান্ শিল্পীর নাম উল্লেখ করতে হয়। অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত শিল্পশৈলীর সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত থেকেও দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী পরবর্তী জীবনে একজন প্রখ্যাত ভাস্কর রূপে সুপরিচিত হয়ে আছেন।



শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর গড়া তাঁর পিতার মূর্তি

দেশে-বিদেশে এখন তিনিই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর বলে সম্মানিত। ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির শিক্ষক ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার লীলায়িত ড্রইং ও মনোরম বর্ণ সংস্থাপনের জন্য প্রসিদ্ধ। অবনীন্দ্র-শিষ্য হয়েও চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চিরজীবন "পেন্ অ্যাণ্ড ইংকে" কার্টুন চিত্র এঁকে গেছেন। শিল্পী চারু রায় সর্বপ্রথম বাংলার হরফগুলির "ডেকোরেটিভ" রূপ দান করে গেছেন। বিখ্যাত চিত্রকর যতীন সেন বিজ্ঞাপনের "লাইন" এবং "হাফ্‌টোন" ড্রইংগুলি আমাদের প্রাচীন চিত্র ও ভাস্কর্যের অনুসরণে অঙ্কিত করে সেকালে সুধীসমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন।

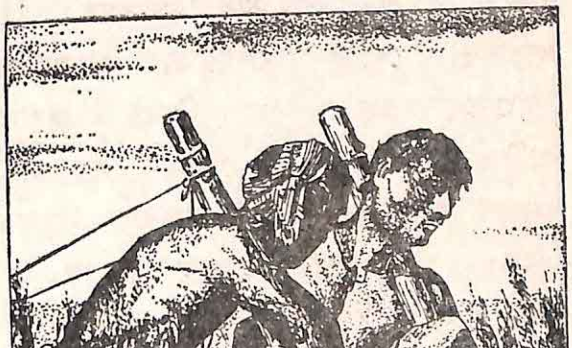


মুসাফির : শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

পোর্ট্রেট ও কাম্পোজিশন করে গেছেন।

যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তখনকার আর্ট স্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল। এঁরই ছাত্র যামিনী রায়, অতুল বসু, সতীশ সিংহ, বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায়, ল্যাণ্ডস্কেপ পেণ্টার পরেশ মজুমদার, যোগেশ শীল, উপেন্দ্র কর্মকার, প্রহ্লাদ কর্মকার প্রভৃতি শিল্পীগণ। হেমেন্দ্র মজুমদার যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র না হলেও ছাত্রস্থানীয় ছিলেন। ভাস্কর প্রমথ মল্লিক ভাস্কর ভি. পি. কারমারকারের ছাত্র। এই শিল্পীদল ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের শিল্পধারার ঘোর বিরোধী। কিছুদিন পরে এঁদের মধ্যে যামিনী রায়

এইভাবে অবনীন্দ্রনাথের ভারতশিল্পের বন্যায় যখন সমস্ত ভারত প্লাবিত, তখন খাঁটি ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকার একটা প্রবল স্রোত বাংলা দেশেই এবং বেশ জোরের সঙ্গেই প্রবাহিত হচ্ছিল। দু'টি বিভিন্ন ধরনের শিল্প-ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হয়ে বাংলা দেশের চিত্রকলাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র দাস, পরেশ সেন, পুলিনকৃষ্ণ কুণ্ডু, ভবানীচরণ লাহা, হরেকৃষ্ণ সাহা, হরেন গুপ্ত, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণ অধিকাংশই



বন্ধু : শিল্পী অতুল বসু



সাপুড়ে : শিল্পী ভবানীচরণ লাহা

অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেও, অবনীন্দ্র-পদ্ধতি অনুসরণ না করে সম্পূর্ণ নিজস্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করে (সাবলীল রেখা ও সামান্য রঙের আভাস দিয়ে) ছবি আঁকতে থাকেন।

কলকাতা আর্ট স্কুল থেকে যে সব প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী বেরিয়েছেন তাঁদের মধ্যে যামিনী রায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায় নিঃসন্দেহে। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই পোর্ট্রেট, কম্পোজিশন, ল্যাণ্ডস্কেপ প্রভৃতি সব দিকেই অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। সব চাইতে আশ্চর্য ছিল তাঁর ড্রইং-এর অসামান্য নিপুণতা। এমন নিখুঁত সাবলীল রেখাসম্পাত বড় একটা দেখা যায় না। তাঁর জীবনের মাঝামাঝি সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলা দেশের পট-শিল্পের ধরনে চিত্র রচনা করে জগৎবিখ্যাত হয়ে আছেন। অতুল বসুকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ পোর্ট্রেট পেণ্টার বলা যায়। তাঁর আঁকা প্রতিকৃতিগুলি স্বদেশে-বিদেশে সমভাবে আদৃত হয়েছে। হেমেন্দ্র মজুমদার সুষমামণ্ডিত নারীমূর্তি আঁকায় সুদক্ষ ছিলেন। তাঁর আঁকা ভিজে কাপড় (অয়েল ও ওয়াটারে) সবই শিল্পীর অপূর্ব সৃষ্টি। বসন্ত গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শিক্ষক ও বিখ্যাত পোর্ট্রেট পেণ্টার। শিল্পী সতীশ সিংহ ড্রইং ও কম্পোজিশনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রাজদরবারের নতুন চাহিদা মত ছবি : পোর্ট্রেটের আদর

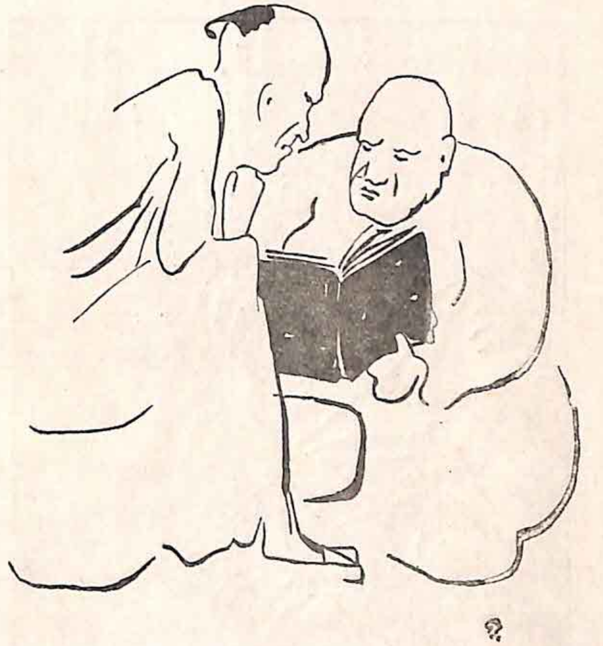
আরও একটি কথা বোধ হয় এখানে বলা আবশ্যক। যে সময়ে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত ভারত-শিল্পের জয়জয়কারে সারা ভারত মুখরিত, তখন থেকেই ভারতের দেশীয় রাজারা মোগল আদব-



সদ্যস্নাতা : শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদার

কায়দা সম্পূর্ণ বর্জন করে ইয়োরোপীয় ধরনের জীবনযাত্রায় অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে থাকেন। তাঁরা গালিচা, গদী, তাকিয়া, মণি-মাণিক্য-খচিত পাগড়ী, জাব্বাজোব্বা, পায়জামা ছেড়ে, বাবরী, জুলপী ছেঁটে ফেলে একেবারে বিলিতী লর্ডদের অনুকরণে জীবনযাত্রা শুরু করে দেন। অবশ্য এই কৃতিত্বে তখনকার বৃটিশ রাজপুরুষদেরও যে অনেকখানি হাত ছিল তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অন্যান্য ইয়োরোপীয় আনুষঙ্গিক বিলাসব্যসনের দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে পূর্বপুরুষের পোর্ট্রেট, শিকারের ছবি, ল্যাণ্ডস্কেপ, লাস্যময়ী সুন্দরীদের ছবি "অত্যাবশ্যক" হয়ে পড়ে।

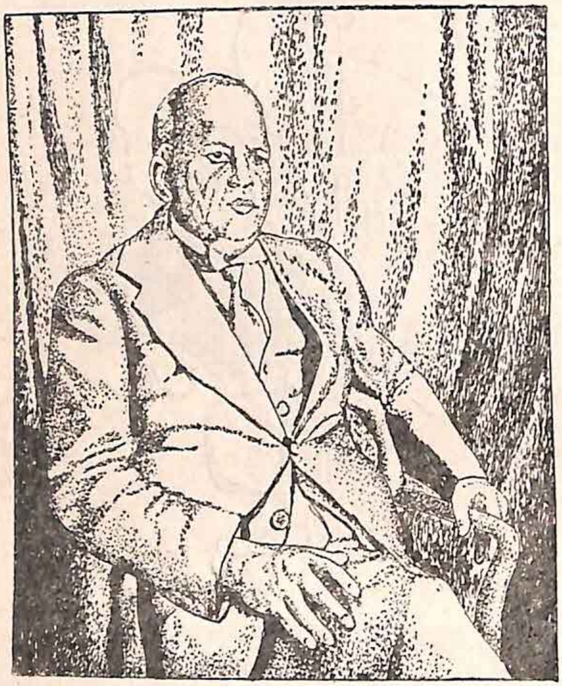
সময়টা তখন উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের আরম্ভ। ভারতীয় শিল্পীরা তখন ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত। এ সময় শত শত সুবিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর দেশীয় রাজা-মহারাজাদের দরবারে এসে চাহিদা মত ছবি এঁকে লক্ষ লক্ষ টাকা সগৌরবে স্বদেশে চালান দিয়ে গেছেন। হায়দ্রাবাদ, বরোদা, মহীশূর, পাতিয়ালা, বুন্দি, কোটা, নবনগর প্রভৃতি স্থানে এ সব চিত্র-শিল্পীদের বহুমূল্য ও অতিবৃহৎ শত শত চিত্র আছে। পাতিয়ালার মহারাজা চিত্রশিল্পের সমঝদার ছিলেন। তাঁর চিত্রসংগ্রহের মূল্য সেকালেই ছিল দেড় কোটি টাকার ওপর। বিখ্যাত অভিজাত ইংরেজ চিত্রশিল্পী উইলিয়ম কোপ্ শুধুমাত্র ইংল্যাণ্ডের রাজ-পরিবারের পোর্ট্রেট ছাড়া বিশেষ কিছুই আঁকেন নি। তিনিও বহু অর্থের বিনিময়ে বরোদার রাজ-পরিবারের প্রায় সকলেরই পোর্ট্রেট এঁকে



সমালোচক : শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গেছেন। নবনগরের জাম সাহেব বিখ্যাত চিত্রকর টিউককে দিয়ে রাজ-পরিবারের ছবি আঁকিয়েছেন।

এখানে অতি "সূত্রাকারে" এ কাহিনীর একটুখানি মাত্র বলা হ'ল। এ ছাড়া সারা ভারতে কত কত ধনী জমিদার, কত ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁদের পোর্ট্রেট ইয়োরোপীয় চিত্রকরদের দিয়ে আঁকিয়েছেন তার সীমা-সংখ্যা নেই। কিন্তু তখন আমাদের দেশের চিত্রকরেরা এই বিরাট চিত্রভোজের কাছ থেকে বহুদূরে পড়ে ছিলেন। কেবল এই সব বাঘা বাঘা চিত্রকরদের মুখ থেকে কিছুটা অংশ ছিনিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁর আঁকা বহু পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ রাজা-মহারাজাদের দরবার-গৃহ অলঙ্কৃত করেছিল। আর একজন মহারাষ্ট্রীয় চিত্রশিল্পী গোপাল দেউস্কর একাধারে পোর্ট্রেট, কম্পোজিশন ও



ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী : শিল্পী গোপাল দেউস্কর

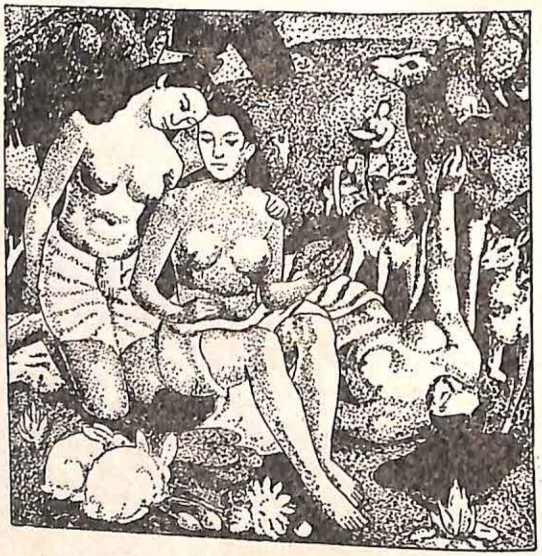
ওরিয়েণ্টাল আর্টে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর আঁকা আকবর হায়দরী ও বরোদার দেওয়ান ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর পোর্ট্রেট দু'খানি অনবদ্য। একমাত্র এঁরই একখানি তেল-রঙে আঁকা (শকুন্তলার) ছবি রয়াল অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শিত হয়েছিল (১৯৩৬)। আর কোন ভারতীয় চিত্রকরের ভাগ্যে এ সম্মানলাভ ঘটেছে বলে মনে পড়ছে না।

শিল্পী লাল কাকার নামও পোর্ট্রেট পেণ্টার হিসেবে দেশে-বিদেশে সুবিদিত।

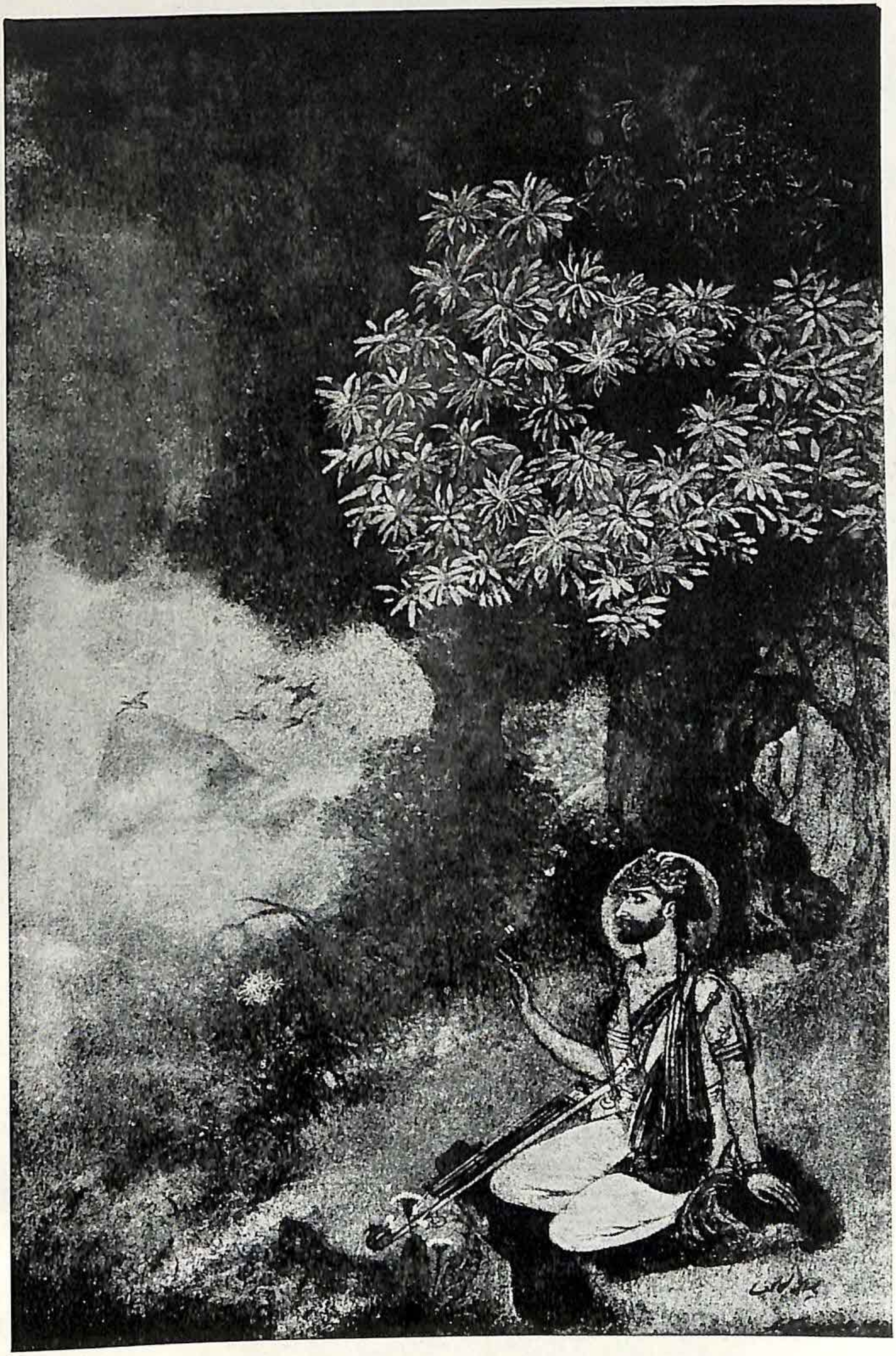
ভি. এ. মালী, ভি. এস. সুরজেয়, জি. ডি. পালরাজ, এস. পি. পানিকর, ডি. ডি. চিঞ্চলকর প্রভৃতি চিত্রকরের ছবি কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চিত্র-প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। এঁরা সকলেই ভারতের বিখ্যাত চিত্রকর।

রবীন্দ্রনাথের ছবি ও মডার্ন্ আর্ট

এবার আমরা মডার্ন্ আর্টের কথায় এসে গেলাম। ইয়োরোপে মডার্ন্ আর্টের আরম্ভ ও তার মোটামুটি বিকাশের কথা ছোটদের বিশ্ব-কোষ চতুর্থ খণ্ডে (পৃঃ ১২১২) আছে। সুতরাং তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। ইতিপূর্বে গগনেন্দ্রনাথের কথায় তাঁর সেই সময়ে "কিউবিজ্‌মের" রীতি অনুসারে ছবি আঁকার কথা বলা হয়েছে। এখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশ-বিদেশের শত শত শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষীরা রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়ে নানা দিক্ থেকে সমালোচনা করেছেন। এ কথা বোধ হয় সকলেই জানে যে তাঁর লেখা-গুলিকে কাটাকুটি করতে গিয়েই সেগুলি এক একটা বিচিত্র রূপ ধরে কবির সামনে আসতে থাকে। এই থেকে তাঁর মনে হয় যে তিনি চিত্রের মাধ্যমেও তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করতে



শকুন্তলা : শিল্পী গোপাল দেউস্কর



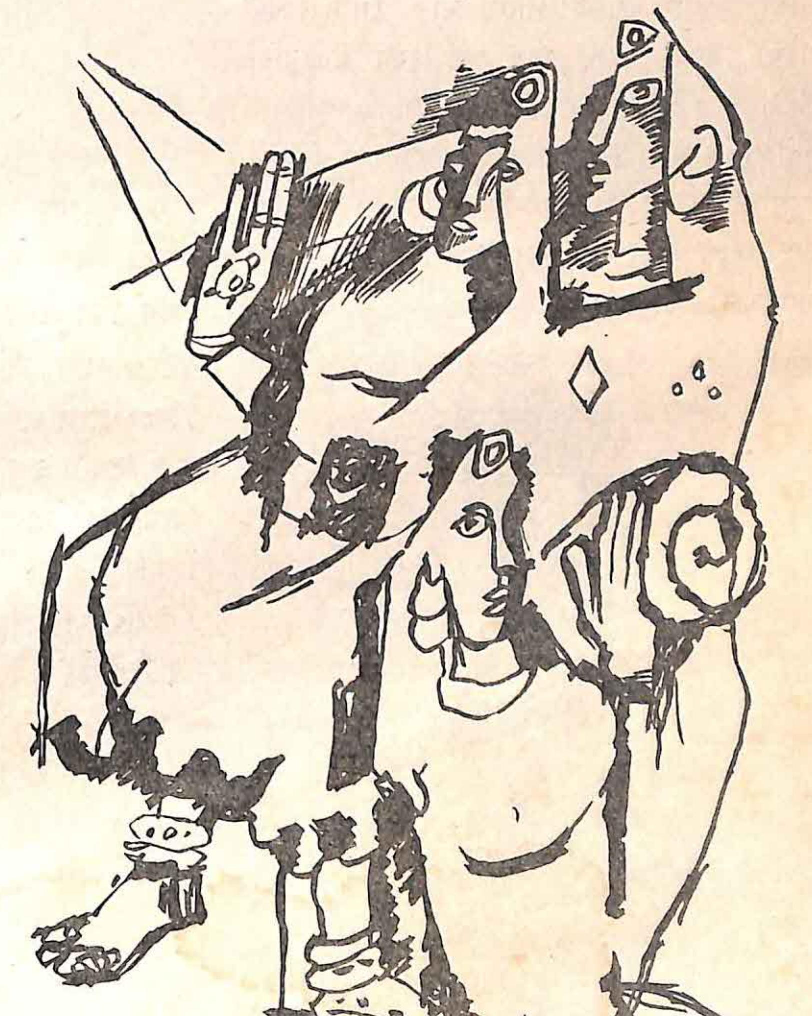
মেঘদূত

শিল্পী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারেন। নিজ ক্ষমতার কথা উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই রঙে রেখায় অজস্র ছবি তিনি এঁকে গেছেন বিরামহীন ভাবে। পৃথিবীর সব চিত্রশিল্পীই ছবি আঁকার গোড়াতে মনে মনে একটা ছবি এঁকে নিয়ে কাজে হাত দেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক তার বিপরীত। ছবি আঁকার সময় মন শূন্য করে দিতেন তিনি,—ছবি আঁকতে আঁকতে যা হয়ে দাঁড়াত তাই ছবি। সব চাইতে এইটুকুই তাঁর চিত্রের অভিনবত্ব।

আমাদের দেশে মডার্ন আর্টের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একজন শক্তিময়ী মহিলা শিল্পীর সাক্ষাৎ পাই। তাঁর নাম অমৃত সরগীল। তাঁর পরমায়ু ছিল খুবই কম। দিল্লী সংগ্রহ-শালায় তাঁর যে অনবদ্য ছবিগুলি সংরক্ষিত আছে তা দেশ-বিদেশের শিল্প-রসিকদের প্রশংসা পেয়েছে অপর্যাপ্ত ভাবে।

আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার অল্প দিন পরেই কলকাতায় "ক্যালকাটা গ্রুপ" স্থাপিত হয়। এতে ছিলেন শুভ ঠাকুর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, রথীন মৈত্র, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, প্রাণ-কৃষ্ণ পাল ও পরিতোষ সেন। এঁরাই এখানে ভাস্কর্যে, চিত্রে নানা ভাবের আধুনিক নতুন নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তার পর, যেমন হয়, ক্রমে নানা দল ও নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়ে যাঁরা নতুন একটা কিছু আরম্ভ করেন তাঁরা যান তলিয়ে, কারণ তখন তাঁদের মধ্যেও আবার খানিকটা রক্ষণশীলতার আভাস পাওয়া যেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে আরও উদার, আরও সর্বব্যাপী মতবাদের কথা উঠতে থাকে।



শিল্পী হোসেনের আঁকা একখানি ছবি

ইয়োরোপে এই মডার্ন আর্টের বয়স একশ' বছরের কিছু ওপরেই বলা যায়। অন্যান্য দেশে এর আগমন ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের বেশি হবে না। কিন্তু আজ সমস্ত পৃথিবীর চিত্রকরেরা যেন একীভূত হয়ে গেছেন। আগে ছবি দেখলে কোন্ ছবি কোন্ দেশের বোঝা যেত, আজ আর তা বুঝবার উপায় নেই। আজ নানা সমস্যাজর্জর পৃথিবীর কোথাও কোন আনন্দ বা শান্তির আশ্বাস কেউই পাচ্ছে না। সে কারণেই ছবির বিষয়বস্তুগুলি, মনে হয়, যেন ধরা-বাঁধা একটা ছকে ফেলে আঁকা হচ্ছে। সমস্ত পৃথিবীর শিল্পীরা এই আর্ট নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নতুন নতুন সৃষ্টির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। সুতরাং দেশে দেশে মডার্ন আর্ট নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পুরোদমে।



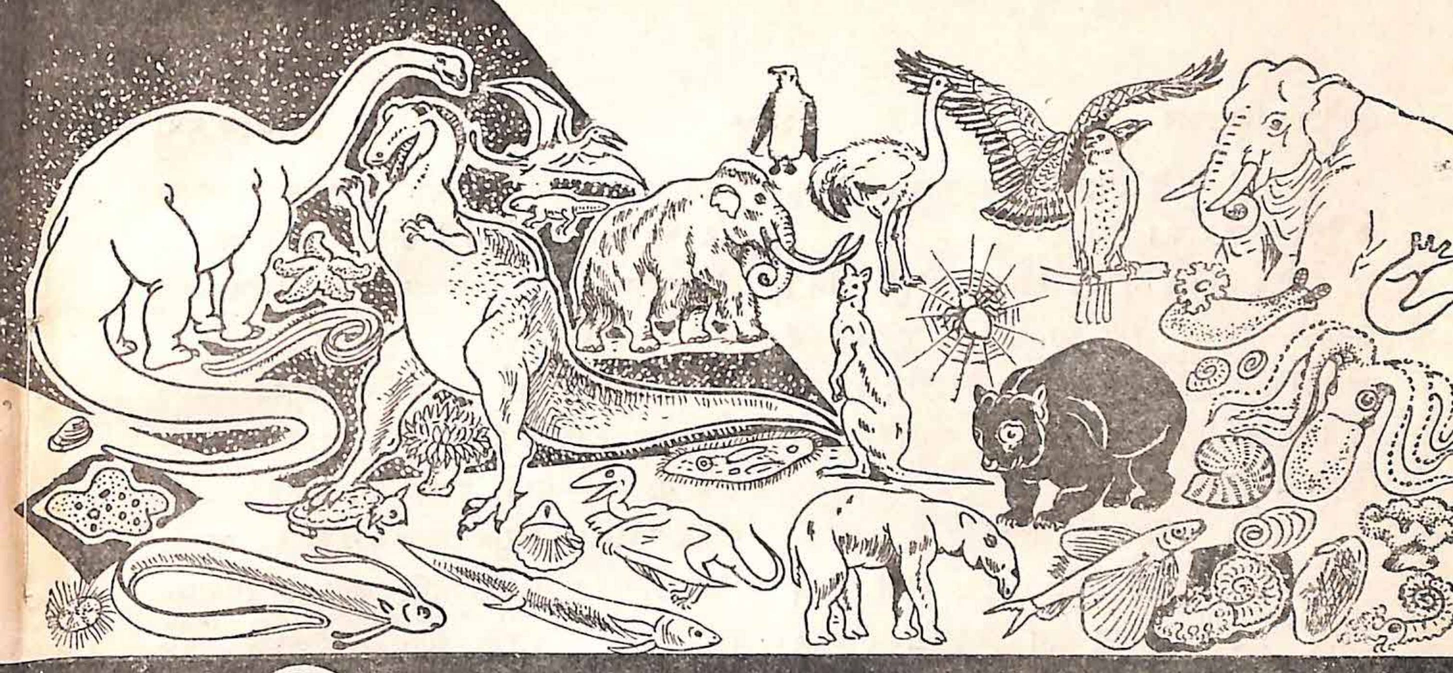
ভাস্কর্য : শিল্পী রামকিংকর



ঘোড়া : শিল্পী সুনীল দাস

দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে চিন্তাজগতের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করাই এই আর্টের মূল লক্ষ্য। যে সব "অ্যাবস্ট্রাক্‌ট্" বিষয়ের ছবি কোন দিন কেউ আশা করে নি তেমন তেমন বস্তুরও ছবি আঁকার প্রচেষ্টা হচ্ছে। মানুষের মনের ভালোমন্দের নানা অলিগলির সন্ধান করে সেগুলিকে রূপায়ণের প্রচেষ্টা চলছে নানা বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে। আমরা আশা করব শিল্পীরা তাঁদের এই "অবাংমানসগোচর" বস্তুকে (অর্থাৎ যা বাক্য বা মনের গোচর নয় তাকে) "গোচরীভূত" করে তাঁদের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবেন।

মডার্ন আর্টে আমাদের দেশে হোসেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী বলা যায়। তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে। সতীশ গুজরাল, রামকিংকর, কে. কে. হেব্বার, নীরদ মজুমদার, কুলকার্নি, সুনীল দাস প্রভৃতি আরও অনেকের নামও উল্লেখযোগ্য।



জীবজন্তুর কথা

সমুদ্রের ক্ষুদে বাসিন্দার দল

এর আগের বারে সমুদ্রের প্রাণীদের গল্প বলতে গিয়ে আমরা বিশেষ করে বড় বড় প্রাণীদের কথাই বলেছিলাম, খুব ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীদের সম্বন্ধে অল্পস্বল্প বললেও ভালো করে বলা হয় নি। কিন্তু তাদের কথা না বললে সমুদ্রের আসল বাসিন্দাদের কথাই অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। এবারে তাই তাদের কথা শোনাই।

খুব ছোট প্রাণীর কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে ইন্‌ফিউসোরিয়ার কথা। সমুদ্রে তো বটেই, খালে-বিলে-পুকুরেও এই অতি-ক্ষুদ্র প্রাণীটি অসংখ্য ছড়িয়ে আছে। কোন কোন জায়গায় এদের সংখ্যা এত বেশি যে এক গেলাস, ধর সিকি লিটার জলে ২।৩ 'শ' কোটি থাকাও বিচিত্র নয়। অর্থাৎ গোটা পৃথিবীতে যত লোক আছে তার সমান না হলেও প্রায় কাছাকাছি হবে। সংখ্যা এত বেশি হবার কারণ এদের বংশবৃদ্ধির ধরন। একটা ভেঙ্গে মুহূর্তে দু'টো হয়ে যাচ্ছে, দু'টো হয়ে যাচ্ছে চারটে, চারটে হচ্ছে আটটা। এই ভাবে চক্রবৃদ্ধি হারে চললে এক সপ্তাহে কত হবে বল তো? কিন্তু সত্যি তা হয় না। ওদের প্রচুর শত্রু। জন্মাবামাত্র টপাটপ্ হাজারে হাজারে ইন্‌ফিউসোরিয়া গিলে ফেলার মত জীব জলে—বিশেষ করে সমুদ্রে সর্বদাই রয়েছে। না থাকলে একমাত্র ওরাই সারা সমুদ্র, এমন কি খাল-বিল-পুকুরও ছেয়ে ফেলত।

এ রকম ছোট ছোট আরও নানা জাতের জীব আছে সমুদ্রে। তারাই সময় বিশেষে বিশাল বিশাল দ্বীপ তৈরি করে, বিরাট বিরাট খড়িমাটির পাহাড় তৈরি করে। প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক বড় বড় দ্বীপের জন্ম এই রকম মরা সামুদ্রিক প্রাণীর কঙ্কাল থেকে; ইংল্যাণ্ডের উপকূলে বিখ্যাত খড়ির পাহাড়ও নাকি তৈরি হয়েছে এইভাবে অতি ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীর শরীর থেকে।

খুব ছোট্ট প্রাণী থেকে এবার আর একটু বড় প্রাণীতে আসা যাক।

পরিফেরা (স্পঞ্জ) আর সিলেনটেরাটা (প্রবাল) জাতের প্রাণীদের কথা আমরা আগে একবার আলোচনা করেছিলাম (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৪৫-৪৫০)। সিলেনটেরাটদের কথায়ই আবার ফিরে আসা যাক।

ফাঁপা-অন্ত্র প্রাণী

সিলেনটেরাটা কথাটার মানে ফাঁপা অন্ত্র। অন্ত্রকে ডাক্তারী ভাষায় বলে ইন্‌টেস্টাইন—যার ভিতর দিয়ে খাদ্য গিয়ে জমা হয়, হজম হয়। এই সব প্রাণীর শরীরের মাঝখানেও থাকে একটা ফাঁপা নল, যার ভিতর দিয়ে খাবার চলাচল করে, আবার হজমও হয় সেখানেই। খাবার অবশ্য ঢোকে মুখ দিয়ে, তারপর গ্রন্থি-কোষ (গ্ল্যাণ্ড সেল) থেকে বেরিয়ে-আসা এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে গেলে ঐ নলই তা শুষে নেয়। মুখের কাছটায় সাধারণতঃ থাকে কতকগুলো ঝালরের মত জিনিস—যার নাম বহুবচনে টেন্‌টাক্‌ল্‌স্।

সিলেনটেরাটদের শরীরের বাইরের দিক্‌টা শক্ত কোষ দিয়ে তৈরি, কিন্তু তার ভিতর দিকে এমন কতকগুলি কোষ আছে যার মধ্যে খুব চাপ দিয়ে ভরা আছে খানিকটা করে বিষাক্ত রস, আর আছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর কতকগুলো কুণ্ডলী-পাকানো সরু সুতোর মত ফাঁপা নল। শিকার ধরবার সময় শিকারের স্পর্শ পাওয়া মাত্র ঐ সুতো-নলগুলো খাড়া হয়ে ছড়িয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে শিকারের গায়ে তার বিষাক্ত রস ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে অসাড় করে ফেলে। শুধু তাই নয়, শিকারের গায়ে সেগুলো এমন ভাবে জড়িয়ে যায় যে শিকারের আর পালাবার পথ থাকে না। তখন ঐ ঝালর,—যাকে বলা হয় টেন্‌টাক্‌ল্‌স্,—সেই শিকারকে টেনে নিয়ে এসে মুখের মধ্যে ফেলে দেয়।

সিলেনটেরাটদের মধ্যে পলিপ্‌দের গড়নই বোধ হয় সবচেয়ে সাদাসিধে। আসলে ওটাকে জন্তু না বলে একটা জ্যান্ত নল বললেই চলে। নলের মাথার দিকে থাকে ঝালর। অন্যান্য সিলেনটেরাটগুলো এই পলিপ্‌গুলোরই রকমফের বলা যায়। এদের মধ্যে হাইড্রয়েড, সী-অ্যানিমোন বা সমুদ্রের ফুল, জেলিফিশ এবং প্রবাল ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

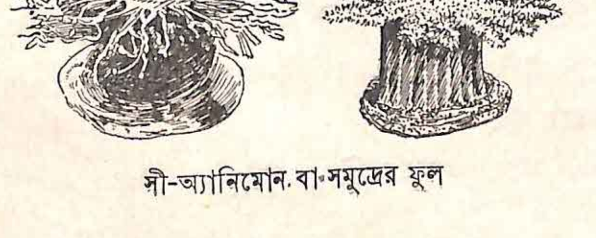
প্রবালের কথা তো আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৫০)। হাইড্রয়েডগুলোও, প্রবালের মতই একসঙ্গে একটার গায়ে আর একটা যুড়ে, সব মিলে একটা উপনিবেশ গড়ে থাকে। শুধু যে একটার গায়ে আর একটা যুড়েই থাকে তাই নয়, অনেক সময় একাধিক হাইড্রয়েডের থাকে একই এজমালি নল। ঠিক যেমন বড় গাছের মূল কাণ্ডের সঙ্গে যোড়া থাকে ডালপালা—তেমনি আর কি!

এদের বংশবৃদ্ধির নিয়মটাও বেশ মজার। নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে ঐ নিয়ম অনেক ক্ষেত্রে চালু আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে "অল্‌টারনেশন্ অব জেনারেশন্‌স্"—যার বাংলা করা হয়েছে "জনুঃক্রম"। একটা পলিপের গা থেকেই কুঁড়ির মত আর একটা পলিপ্ গজিয়ে ওঠে। ইংরেজিতে ওর নাম "বাডিং"। বাড্ বা কুঁড়ি বেরোবার পর সেটার আলাদা মুখ হয়, মুখের চারদিকে আলাদা

ঝালর গজায়। কিন্তু কতকগুলো বাড়ের আবার মুখ বা ঝালর কিছুই থাকে না —থাকে ভিতরে কতকগুলো ক্ষুদে ক্ষুদে চাকতি বা 'সসার'। এই চাকতিগুলো থেকেই বেরোয় ওদের বাচ্চা। কি করে? পরিণত অবস্থায় এগুলো আল্‌গা হয়ে বেরিয়ে আসে আর জলের মধ্যে সাঁতরাতে থাকে। তখন এগুলোকে বলা হয় মেডুসা। মেডুসার সঙ্গে ক্ষুদে জেলিফিশের কিছুটা মিল আছে। সে কথায় পরে আসব। ক্রমে মেডুসার চারদিকেও ঝালর গজাতে থাকে আর তলা দিয়ে 'ডিম' বেরিয়ে এসে জলের মধ্যে পড়ে। 'ডিম' কথাটাই ব্যবহার করছি, যদিও ওগুলো সাধারণ ডিম নয়। ঐ ডিম থেকেই ক্রমে বেরিয়ে আসে শূককীট আর সেই শূককীটও জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে এক সময়ে কোনও একটা পছন্দসই জায়গায় নিজেকে সেঁটে নেয়। তার পর সেই শূককীট পরিবর্তিত হয় নতুন পলিপে আর সেই পলিপ্‌ থেকেই হয় নতুন পলিপ্‌ উপনিবেশ।

সমুদ্রের ফুল

সামুদ্রিক জীবদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে আশ্চর্য চেহারা হচ্ছে সী-অ্যানিমোনদের— চলতি কথায় যাদেরকে বলা হয় সমুদ্রের ফুল। অ্যানিমোন হচ্ছে একরকম ফুলের নাম,— সেই থেকেই ওর নাম 'সী' অর্থাৎ কিনা সমুদ্রের অ্যানিমোন। সত্যি, অবিকল ফুলের মত



সী-অ্যানিমোন বা সমুদ্রের ফুল

চেহারা! শীতের দিনে রঙ-বেরঙের পাপড়ি-ছড়ানো মরশুমি ফুলে যখন বাগান ছেয়ে থাকে তখন দেখতে যেমন সুন্দর লাগে, এই সী-অ্যানিমোনগুলোও যখন সমুদ্রের জলে ঝাঁক বেঁধে, পাপড়ি ছড়িয়ে ভিড় করে থাকে তখন তেমনি সুন্দর দেখায়। মনে হয় রূপ যেন ফেটে পড়ছে। কলকাতার যাদুঘরে সামুদ্রিক জীবের গ্যালারীতে গেলে এদের অনেক নমুনা দেখতে পাবে। যারা বোম্বাইএ গেছ, তারা সেখানকার অ্যাকোয়েরিয়ামে (জলজীবের চিড়িয়াখানা) কাচের ঘরের ভিতর জ্যান্ত সী-অ্যানিমোন হয়তো অনেকেই দেখেছ। দেখে কে বলবে ওগুলো ফুল নয়, জ্যান্ত প্রাণী?

কিন্তু দেখতে অমন মন-ভোলানো হলে কি হবে, এ এক রাক্ষুসে প্রাণী। মাথার ঐ রঙিন পাপড়িগুলো আর কিছুই নয়—ওগুলি সেই টেন্‌টাক্‌ল্‌স্‌, যা দিয়ে ওরা শিকার ধরে। এদের কারো কারো চোখ থাকলেও থাকতে পারে (একেবারেই আছে কিনা তাও সন্দেহ), তবে অনেকেরই নেই। কিন্তু কিছু আসে যায় না তাতে। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ত্বক্‌ ইন্দ্রিয়টি এদের সবচেয়ে প্রখর। অদ্ভুত এদের স্পর্শশক্তি। কোন ছোটখাট সামুদ্রিক প্রাণী, রূপে আকৃষ্ট হয়েই হোক কিংবা আর যে ভাবেই হোক, একবার ওর কাছে গেলে আর রক্ষা নেই। মুহূর্তের মধ্যে, বিদ্যুৎবেগেই বলতে পার, ঐ পাপড়ি,—আসলে যেগুলো ওর টেন্‌টাক্‌ল্‌স্‌,—গিয়ে পড়বে তার ওপর, বেরিয়ে আসবে তার ভিতরকার বিষাক্ত রস—যা নাকি অসাড় করে দেবে শিকারকে। তার পর ঐ ছড়ানো পাপড়ি কুঁকড়ে, গুটিয়ে

সী-আর্চিনেরও নানা রকমফের আছে। আর, খাদ্য হিসেবে ওরা নিজেরাও নাকি বেশ সুস্বাদু। জাহাজের নাবিকেরা সী-আর্চিন ধরতে পারলে খুব খুশি। ওরা সেগুলো সিদ্ধ করে খেতে ভালোবাসে। সিদ্ধ সী-আর্চিন্ নাকি হাঁস-মুরগীর ডিমের মতই খেতে, তাই ওরা ওর নাম দিয়েছে 'সী-এগ্' অর্থাৎ সামুদ্রিক ডিম।

সী-আর্চিনেরই আর এক জাতভাই হচ্ছে সী-কিউকাম্বার বা সমুদ্রের শশা। দেখতে ঠিক শশার মত লম্বাটে, কিন্তু সী-আর্চিন্‌দের মত শক্ত নয়, শশার মতই নরম। তবে নরম চামড়ার নীচে পাৎলা খোলাও আছে। এদের মুখ এক দিকে, টেন্‌টাক্‌ল্‌স্ দিয়ে ঘেরা। ঐ টেন্‌টাক্‌ল্‌গুলো দিয়ে ওরা ছোট ছোট জলজ প্রাণী টেনে এনে মুখে পুরে দেয়। তবে এরাও কাদায় আটকানো জলজ শ্যাওলাই বেশি পছন্দ করে খাদ্য হিসেবে। সী-কিউকাম্বারেরও নলাকৃতি পা আছে। পাঁচজোড়া পা সারা শরীরের নীচে, যা দিয়ে ওরা চলাফেরা করে। তবে মাংসপেশীর সংকোচন করেও ওরা নড়াচড়া করতে পারে।

"শশা" নাম শুনলেই মনে হবে ওরা একটি শাঁসাল এবং সুস্বাদু খাবার। অন্য দেশের লোকেরা যাই বলুক, আমাদের চীনে ভাইরা কিন্তু সত্যি ওদের ধরে খায়। ওদের খাবার টেবিলে এই সামুদ্রিক শশা পরিবেশন করলে তা খুব সুখাদ্য বলেই বিবেচিত হবে। কোন কোন জাতের সী-কিউকাম্বার এজন্য ওদেশে বেশ চড়া দরেই বিক্রি হয়।

সমুদ্রের ঘোড়া

সমুদ্রের ফুল, কাঁটাচুয়া, শশা ইত্যাদির কথা বলতে গিয়ে সমুদ্রের ঘোড়ার কথাও মনে আসছে—যাদেরকে বলা হয় সী-হর্স্। এরা অবশ্য আরও অনেক উঁচু জাতের প্রাণী—প্রায় মাছের দলেই ফেলা যায় ওদেরকে। "ঘোড়া" নাম শুনে কিন্তু মনে ক'র না এদের এক-একটা আকারে আরবী বা অষ্ট্রেলিয়ার ওয়েলার ঘোড়ার মত বড়। এমন কি দার্জিলিংএ-দেখা বাচ্চা চেহারার টাট্টুর সঙ্গেও কোন মিল নেই ওদের। আসলে প্রাণীটি কয়েক ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। বোম্বাই অ্যাকোয়েরিয়ামে গেলে এদেরকে দেখতে পাবে। মুখটা অনেকটা ঘোড়ার মত বলে এই নাম। ঘোড়ার মত এদের চারটে পাও নেই, আছে কুণ্ডলী-পাকানো একটা করে লেজ যা দিয়ে ওরা জলজ গাছের ডালপালা দিব্যি আঁকড়ে ধরে বেয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু যে জন্য এই আশ্চর্য প্রাণীটির কথা বিশেষ করে বলা দরকার তা হচ্ছে ওদের পেটের থলি। ঠিক যেমন ডাঙ্গার প্রাণী ক্যাঙারুরা বাচ্চাদের পেটের থলির মধ্যে পুরে রাখে বড় না হওয়া পর্যন্ত, সমুদ্রের ঘোড়ারাও তেমনি বাচ্চা-দের ভরে রাখে তাদের পেটের থলি বা পাউচের



সী-হর্স্ বা সমুদ্রের ঘোড়া
নীচে একটি ঈল মাছও রয়েছে।

মধ্যে—যতদিন না তারা 'সাবালক' হচ্ছে। আর মজা হচ্ছে এই, এ কাজে মা-ক্যাঙারুরা যে ভূমিকা নেয়, সমুদ্রের ঘোড়ার বেলায় সে ভূমিকা নেয় বাবারা। পুরুষ-সী-হর্সের পেটের নীচে থাকে থলি, মা-সী-হর্সেরা সেইখানে তাদের ডিম পেড়ে রাখে। বাবার সেই পেটের থলির মধ্যেই বাচ্চারা জন্মায় এবং ক্যাঙ্গারুর বাচ্চার মতই সেই থলিতে তারা 'মানুষ' হয়—যতদিন না এক একটি পুরোপুরি সী-হর্সে পরিণত হচ্ছে।

কাঁকড়ার কাহিনী

সমুদ্রের প্রাণীর কথা বলতে বসেছি, তাই সমুদ্রের কাঁকড়ার কথাই আগে বলি। কাঁকড়া অবশ্য নদী, খাল, বিল, পুকুর—অর্থাৎ মিষ্টি জলেও থাকে। ডাঙ্গাতেও অনেক সময় বাস করে—তবে জল থেকে বেশি দূরে নয়। বিজ্ঞানীরা এদের ক্রাস্টেশিয়ান প্রাণীদের মধ্যে ফেলেছেন।

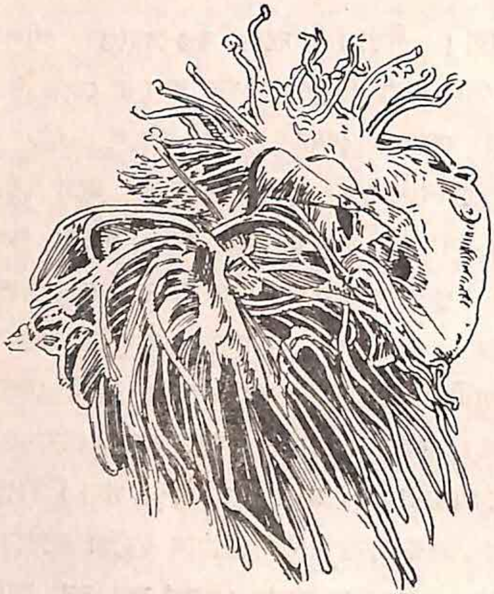
অদ্ভুত চেহারার এই প্রাণীটিকে অনেকেই চেন, কেন না সর্বভুক্ মানুষের কাছে কাঁকড়াও একটি সুখাদ্য জীব। অবশ্য সব জাতের কাঁকড়াই খাওয়া যায় না—অখাদ্য এবং বিষাক্ত কাঁকড়াও আছে। মাছের বাজারের এক কোণে এই কিম্ভূতকিমাকার জীবটিকে দেখলে খেতে যে খুব প্রবৃত্তি হয় তাও নয়, কিন্তু রান্না করে পাতে পরিবেশন করলে তখন তার আর এক চেহারা। আমি এমন ছেলেমেয়ে অনেক দেখেছি যারা জ্যান্ত কাঁকড়া দেখলে 'অ্যা রাম!' বলে নাক সিঁটকোয়, কিন্তু খেতে দিলে দিব্যি হাপুস হুপুস করে বারে বারে চেয়ে নিয়ে খায়।

বাস্তবিক কাঁকড়ার চেহারাটা অদ্ভুতই বটে! মাথা খুঁজে পাবে না, যেন পেটটিই সার, আর ঐ পেটের দু'দিক্ থেকে পাঁচ জোড়া কাঁটাওয়ালা ঠ্যাং বেরিয়ে এসেছে। সামনের ঠ্যাং দু'টি হচ্ছে 'ক্ল' অর্থাৎ নখর, আমরা যাকে বলি কাঁকড়ার দাড়া। ভীষণ শক্ত আর মোটা, গায়ে কতকগুলি দাঁতের মত বসানো,—দেখলেই মনে হয় এ দু'টি ওর যুদ্ধের অস্ত্র। সত্যিই তাই। ঐ দাড়া দু'টি দিয়েই ওরা শিকার আঁকড়ে ধরে, চাপ দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করতে পারে। শুধু চেহারা অদ্ভুত নয়, হাঁটার ধরনটাও ওদের অদ্ভুত। অন্যান্য প্রাণীর মত ওরা সোজাসুজি সামনের দিকে হাঁটে না—হাঁটে পাশের দিকে। অর্থাৎ বাঁ-দিকে বা ডান দিকে।

কাঁকড়ার সমস্ত শরীরটাই শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা। যাকে পেট বলছি সেটাও। আর মাথা, চোখ, গলা সবই ঐ তথাকথিত পেটের সঙ্গে যোড়া, তাই সবটা মিলে হঠাৎ দেখলে রামায়ণের সেই কবন্ধের কথা মনে পড়ে।

আগেই বলেছি কাঁকড়া নানা জাতের হয়। ছোট, বড়, অতিকায়—সব রকম। এক ইঞ্চি দু'ইঞ্চি থেকে শুরু করে দশ-বারো ফুট বেড়ের কাঁকড়াও দেখা গেছে সমুদ্রে। সেকালে নাকি আরও বড় কাঁকড়া দেখা যেত—বিজ্ঞানীরা ঐ সব লুপ্ত কাঁকড়ার ফসিল দেখে সে খবর যোগাড় করেছেন। কলকাতার যাদুঘরেও একটা অতিকায় সামুদ্রিক কাঁকড়া রাখা আছে, দেখলে অক্টোপাসের কথা মনে পড়ে।

সচরাচর যে সব কাঁকড়া আমরা দেখি তা মেটে মেটে রঙের, কিন্তু রংবেরং-এর কাঁকড়াও আছে। নীল, লাল, সবুজ—সব রকম। কোন কোনটার গায়ে আবার নানা রঙের



সী-অ্যানিমোন টেন্‌টাক্‌ল্‌গুলো দিয়ে
শিকারকে জড়িয়ে ধরেছে।

গিয়ে চিমটের মত টেনে নেবে ঐ শিকারকে মুখগহ্বরের ভিতর।

শরীরের তুলনায় খিদেও এদের প্রচণ্ড এবং খাবার গ্রহণ করবার থলি অর্থাৎ নলটিও শরীরের আন্দাজে বেশ বড়সড়। কাজেই অপেক্ষাকৃত বড়সড় জীব,—যেমন সামুদ্রিক মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ইত্যাদি প্রাণীও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। সময় সময় এমনও দেখা গেছে যে সী-অ্যানিমোন তার নিজের চাইতেও অনেক বড় প্রাণী ধরে খেতে গিয়ে সামলাতে পারছে না। তখন সে তার শরীরকে দু'ভাগ করে চিরে নিয়েছে কিন্তু তবু শিকার ছাড়ে নি। একবার এক প্রাণিবিজ্ঞানী সমুদ্রের ধারে একটা সী-অ্যানিমোন দেখতে পেয়ে পরীক্ষার জন্য তাঁর আঙুলটা ওর মুখের কাছে নিয়ে ধরেছিলেন। ভালো করে কিছু বুঝবার আগেই ওর ছড়ানো পাপড়ি অর্থাৎ টেন্‌টাক্‌ল্‌গুলো বিদ্যুৎগতিতে তাঁর আঙুলটাকে আঁকড়ে ধরল। বিজ্ঞানী টের পেলেন টেন্‌টাক্‌ল্‌গুলোর গায়ের ভিতর ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁটা বসানো,—এত খস্‌খসে যে তাঁর আঙুলটা নিস্‌পিস্‌ করতে লাগল। টেন্‌টাক্‌ল্‌গুলো কিন্তু সমানে চেষ্টা করছে আঙুলটাকে মুখের ভিতর টেনে নিতে। বেশ কয়েক মিনিট ধরে তারা আঙুলটাকে সজোরে চেপে রইল, যাতে শিকার ফস্‌কে না যায়। প্রায় পনেরো মিনিট পরে, চেষ্টা বৃথা বুঝে, টেন্‌টাক্‌ল্‌গুলো বাঁধন আল্‌গা করে আবার ফুলের পাপড়ির মত ছড়িয়ে পড়ল নতুন শিকারের অপেক্ষায়। আঙুলের জ্বালা কিন্তু তার পরেও বহুক্ষণ ছিল।

সী-অ্যানিমোন উপনিবেশ গড়ে না

সী-অ্যানিমোন কিন্তু হাইড্রয়েডদের মত উপনিবেশ গড়ে থাকে না, একা একাই থাকে। কখনও একসঙ্গে অনেকগুলো যদি দল বেঁধে জড়ও হয় তবুও একটার সঙ্গে আর একটার কোন সম্বন্ধ থাকে না। ওদের বংশবৃদ্ধির ধরনটাও বেশ মজার। আগেই বলেছি, বড় শিকার ধরতে গিয়ে ওরা নিজের শরীর চিরে ফেলতেও দ্বিধা করে না। অবশ্য চিরে ফেললেও ওরা মরে না, ওই দু'টো টুকরোতেই ক্রমে ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজিয়ে শেষে দু'টি আলাদা সী-অ্যানিমোনের সৃষ্টি হয়। লম্বালম্বি ভাবে শরীরকে দু'ভাগ করে চিরে নিয়ে বংশবৃদ্ধি করা ওদের বিধিদত্ত ক্ষমতা। আবার, অনেক সময়ে, কোন কারণে ওদের শরীর ছিঁড়ে গিয়ে কোন অংশ যদি পড়ে থাকে তা হলে সেই টুকরোটাও আবার নতুন সী-অ্যানিমোনে পরিবর্তিত হতে পারে।

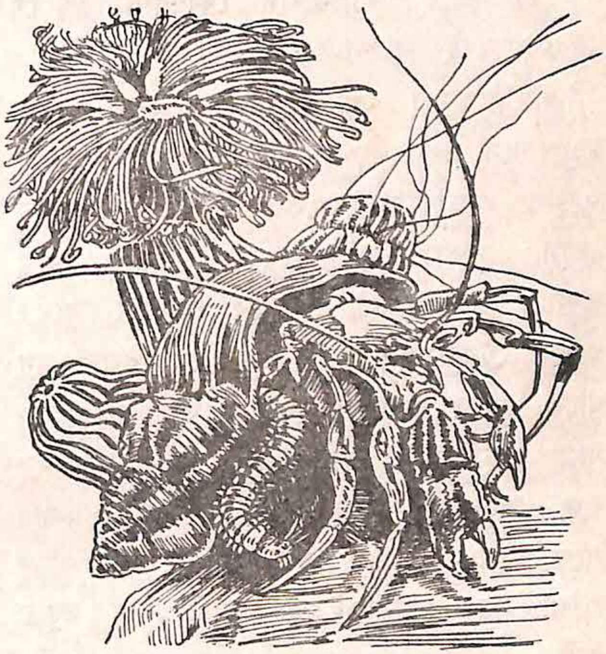
তবে এরাও ডিম পাড়ে। 'ডিম' কথাটি

আগের মতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। ডিম ওদের ঐ ফাঁপা নলের মধ্যেই তৈরি হয়, আর তা বেরিয়ে আসে মুখের গর্ত দিয়ে। ঐ ডিম থেকে হয় শূককীট এবং সেই শূককীট থেকে আস্ত একটা সী-অ্যানিমোন। কোন মেডুসার বালাই নেই ওদের।

সী-অ্যানিমোনের প্রাণের সঙ্গী

সী-অ্যানিমোন যে প্রাণিজগতে বেশ নীচু ধাপের প্রাণী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এক দিক্ দিয়ে ওরা যে বাহাদুরী দেখিয়ে থাকে তা শুনলে অবাক্ হতে হয়। সে হচ্ছে ওদের সঙ্গী নির্বাচন। সে সঙ্গী ওদের স্বজাতের কেউ নয়, নিতান্তই ভিন্ন-গোত্রীয় প্রাণী, যাদের সঙ্গে আকারে, চেহারায়, চালচলনে বা স্বভাবে কোনই মিল নেই ওদের। কে এই সাথী? আর কেউ নয়, সন্ন্যাসী কাঁকড়া,—ইংরেজি করে বললে 'হারমিট ক্র্যাব্'।

নামে সন্ন্যাসী হলেও এই কাঁকড়ারা কিন্তু কেউই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম পালন করে না। বরঞ্চ উল্টো। একা একা তো থাকেই না, তা ছাড়া ভীষণ লড়ুয়ে স্বভাব ওদের। সুযোগ পেলেই অপর প্রাণীদের সঙ্গে লড়াই করতে এদের জুড়ি নেই। এখন, এই সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের দেহে একটা মস্ত খুঁত আছে। বিধাতা ওদের সমস্ত শরীরটাই শক্ত করে গড়েছেন কিন্তু, কি কারণে জানি না, বাদ রেখেছেন লেজটুকু। ভারি নরম ঐ লেজ আর ওরই সুযোগ নেয় ওর যত শত্রুরা। তারা বাগে পেলেই ওর লেজের ওপর আক্রমণ করে বসে। ফলে লেজটিকে কি করে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা যায় এই ওদের একমাত্র ভাবনা। লেজটি যাতে কেউ দেখতে না পায় সেই চেষ্টায় ওরা নানা রকম ফন্দীফিকির খুঁজে বেড়ায় আর এ ব্যাপারে ওদের একটি প্রধান সহায় হচ্ছে সী-অ্যানিমোন। ওরা দিব্যি সী-অ্যানিমোনের সঙ্গে ভাব পাতিয়ে তাকে লেজের ওপর বসিয়ে নেয়। ফলে, বাইরে থেকে নরম লেজটুকু আর কারও চোখে পড়ে না। আর, সী-অ্যানিমোনদেরও



সী-অ্যানিমোনের সঙ্গী সন্ন্যাসীকাঁকড়া। কাঁকড়াটি একটি শামুকের খোলে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু সী-অ্যানিমোনকেও ছাড়ে নি।

সুবিধে হয় এতে। তাদের চলবার-ফিরবার ক্ষমতা বড় কম,—নেই বললেই চলে। অথচ সর্ব-ক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলে খাবারের সন্ধান পাওয়া বেশ মুশ্‌কিল। ঐ সন্ন্যাসী কাঁকড়ার লেজের ওপর চড়ে বসতে পারলে ওরা যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারে। এজন্য ওরা পরস্পর পরস্পরকে সঙ্গী বেছে নেয় আর সে বন্ধুত্ব প্রায়

আজীবন টিকে থাকে। এক সাহেব তাই ঠাট্টা করে ওদের নাম দিয়েছিলেন 'মেসার্স ক্র্যাব্ অ্যানিমোন অ্যাণ্ড কোম্পানী'। ক্র্যাব্ মানে হারমিট ক্র্যাব্ অর্থাৎ সন্ন্যাসী কাঁকড়া আর অ্যানিমোন হচ্ছে সী-অ্যানিমোন। ছ'জনে মিলে ব্যবসা করবার সময় ঐ রকম নামই সাধারণতঃ দেওয়া হয় কিনা!

তা ক্র্যাব্ অ্যানিমোন কোম্পানী শুধু যে ঐ একভাবেই পরস্পরকে সাহায্য করে তা নয়। সী-অ্যানিমোনরা যখন সন্ন্যাসী কাঁকড়ার লেজে চেপে বসে তখন ওদের টেন্টাক্‌ল্‌গুলো কাঁকড়ার দাড়ার কাছাকাছি থাকে। ঐ কাঁকড়া যখন কোন শিকার দেখে তাকে ধরতে যায় তখন অ্যানিমোনরাও তাকে সাহায্য করে। ওদের টেন্টাক্‌ল্‌গুলোর ভিতর যে বিষাক্ত রস থাকে সুবিধা পেলেই তারা তা শিকারের গায়ে ঢুকিয়ে দেয়। ফলে খানিকক্ষণের জন্য সেটা হয়ে পড়ে অসাড়। তখন কাঁকড়ার পক্ষে তাকে ঘায়েল করা এমন কিছুই কঠিন ব্যাপার নয়। এমনিতেই তো, বলেছি, সে খুব লড়ুয়ে প্রাণী।

তারপর শিকার মারা পড়লে শুরু হয় ভোজনপর্ব। কাঁকড়া বেশিটা খেলেও সী-অ্যানি-মোনকেও একেবারে বঞ্চিত করে না। খাবারের খানিকটা ভাগ সেও পায়। এইভাবে সন্ন্যাসী কাঁকড়া তার লেজ বাঁচিয়ে এবং নিজেকেও যথাসম্ভব আড়ালে রেখে সহজেই শত্রুজয় করতে পারে, সী-অ্যানিমোনও বেশ ভালো একটি বাহনে চড়ে যত্রতত্র ঘুরবার সুযোগ পায় এবং নিয়মিত কাঁকড়ার আক্রান্ত শিকারের খানিকটা ভাগও পায়। ছ'জনেই যখন সুবিধে পাচ্ছে তখন এই যোড় বা 'পার্টনারশিপ' ভাঙ্গবার কোনও কারণ নেই, ভাঙ্গেও না বড় একটা।

যে জন্তুর শরীরের বেশির ভাগই জল

সন্ন্যাসী কাঁকড়ার কথায় আবার পরে আসছি, আপাততঃ সিলেনটেরাটদের আর ছ'-একজনের সঙ্গে আলাপ করা যাক।

যারা পুরীতে সমুদ্রের ধার দিয়ে লম্বা টহল দিয়েছ তারা অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় এক ধরনের বিচিত্র জীব দেখে থাকবে—যা নাকি সমুদ্রের ঢেউএর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে পাড়ে এসে আছড়ে পড়েছে। বেশির ভাগই সাদা, মাথাটা ঈষৎ গোলাপী। ওপরের দিক্‌টা অনেকটা টুপি বা খোলা ছাতার মত, আর সেই ছাতার চারদিক্ দিয়ে কতকগুলি ঝালর ঝুলছে। মাঝখানটায়, যে অংশটা নীচে নেমে এসেছে,



জেলিফিশ্

তাইতেই রয়েছে ওর মুখ আর ফাঁপা নল অর্থাৎ আসল শরীর। সমস্ত জন্তুটাকে কিন্তু দেখতে অনেকটা থলথলে জেলির মত—কাদা কাদা। সেইজন্যই এই জন্তুটির নাম দেওয়া হয়েছে জেলিফিশ্ অর্থাৎ জেলি-মাছ।

আসলে কিন্তু মাছের সঙ্গে ওর কোনই সম্পর্ক নেই, ও নিতান্তই সেই নীচু ধাপের জীব যাদের আমরা 'ফাঁপা-অন্ত্র' নাম দিয়েছি। শরীরটা থলথলে হবার কারণ আর কিছু না, এই প্রাণীটি যখন জলে ঘুরে বেড়ায় তখন প্রচুর জল শুষে নিতে থাকে—যার ফলে ওর সারা শরীরটাই জলে ভর্তি হয়ে যায় আর ঐ রকম থলথলে জেলির মত দেখায়। ডাঙ্গায় এনে রোদে রাখলেই কিন্তু এই অদ্ভুত জানোয়ারটি অল্পক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে চিমসে হয়ে যাবে, তখন আর তাকে আগের জীব বলে চেনাই যাবে না। একটা আধমণ বা প্রায় ২০ কে. জি. ওজনের জেলিফিশ্‌কে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শুকিয়ে এক-আধসের বা এক-আধ কে. জি. হয়ে যেতে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ রকম আমি স্বচক্ষে অনেকবার দেখেছি ওই পুরীর সমুদ্র-তীরেই। তবে সব জেলিফিশ্‌ই অত বড় হয় না। তিন-চার ইঞ্চি (৮-১০ সেন্টিমিটার), বা ওর চেয়ে সামান্য একটু বড় জেলিফিশ্‌ই বেশি চোখে পড়ে। তবে সমুদ্রের ভিতর এমন অতিকায় জেলিফিশ্‌ও ঘুরে বেড়ায় যারা ওজনে ১৫০-২০০ কে. জি. পর্যন্ত হতে পারে।

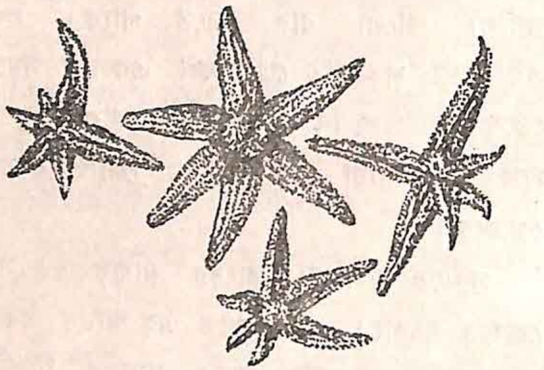
জেলিফিশ্ বেশির ভাগই দেখা যায় গরম দেশের সমুদ্রে, তবে ঠাণ্ডা দেশের সমুদ্রেও যে একেবারে থাকে না তা নয়। গরম দেশের জেলিফিশ্‌দের অনেকেই রাত্রে এক রকম স্নিগ্ধ রূপালী আলো বার করতে পারে। যখন এই রকম শত শত জেলিফিশ্ একসঙ্গে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় তখন সে হয় এক আশ্চর্য দৃশ্য। মনে হয়, সারা সমুদ্রে যেন জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে।

পুরীতে নুলিয়ারা তাদের ভাষায় এর নাম রেখেছে সৎরাং। ইংরেজিতে এর আরও একটা নাম আছে—সী-নেট্‌ল অর্থাৎ সমুদ্রের বিছুটি। বিছুটি পাতা যেমন হাতে নিলে হাত কুটকুট করে চুলকোয়, এই জেলিফিশ্‌দেরও কোন কোনটাকে ধরলে তেমনি জ্বালা করে। শুধু জ্বালা করা নয়, অনেক সময় আঙুল ফুলেও ওঠে এবং শেষে গা-হাত-পা টন্‌টন্ করতে থাকে—বুকের ভিতর নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। এর কারণ আর কিছুই না, ওদের ঐ ঝালরগুলোও,—যা আসলে টেনটাক্‌ল্‌স্,—এক রকম বিষাক্ত রসে ভরা থাকে। ছুঁলেই সেই রস শরীরে ঢুকে গিয়ে ঐ রকমটা হয়। বলা বাহুল্য জেলিফিশেরও এটি একটি শিকার ধরার ফন্দী। সী-অ্যানিমোনদের মতই অমনি করে ওরা শিকারকে অসাড় করে, তারপর মুখে পুরে দেয়। শিকার হজম হয় ওর ঐ লম্বা ফাঁপা নলের মধ্যে।

বংশবৃদ্ধির জন্য ওদেরও নলের মধ্যে তথাকথিত 'ডিম' হয়। সেই ডিম জলে পড়ে অপর জেলিফিশের নলের মধ্যে ঢুকে ক্রমে ক্রমে শূককীট সৃষ্টি করে, তারপর নানা অবস্থার পর তা পুরোপুরি একটি জেলিফিশে পরিণত হয়।

তারা মাছ

এইবার আর একটি মজার প্রাণীর কথা বলি। আমরা এদের বলি তার মাছ, ইংরেজি নাম স্টার



তারা মাছ

ফিশ্ বা সী-স্টার। দেখতে ঠিক আকাশের তারার মত, তাই ঐ নাম। কিন্তু আসলে এরাও মাছ নয়, আবার সিলেনটেরাটার মধ্যেও পড়ে না এরা। এই জাতের প্রাণীদেরকে বলা হয় 'একিনোডার্ম'। এরা একিনোডার্মাটা পর্বের জীব। কথাটার মানে হচ্ছে যে সব প্রাণীর পিঠে কাঁটা বসানো। কাঁটাচুয়া, যাকে সাহেবরা বলেন হেজ্‌হগ, দেখেছ কখনও? অনেকটা সেই রকম আর কি!

তারা মাছের পিঠও কাঁটায় ভর্তি, কিন্তু কাঁটাগুলো অত লম্বা নয়, আর অত ধারালও নয়। তবে হাত দিলে টের পাওয়া যায় কেমন খস্‌খসে। চেহারাটা, আগেই বলেছি, ঠিক তারার মত। একটা গোল চাকতি, তা থেকে কয়েকটা আঙুলের মত বেরিয়ে জীবটিকে তারার আকৃতি দিয়েছে। শরীরের আসল অংশটি কিন্তু ঠিক মাঝখানে। সেখানেই ওদের মুখ, তার নীচে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। ঐ যে অংশগুলো আঙুলের মত বেরিয়ে আছে সেগুলোকে ওদের হাত এবং পা দুই-ই বলা যায়। ওরই নীচে ফাঁপা নলের মত সরু সরু সত্যিকার পা বসানো আছে। তার সাহায্যে ওরা জলের নীচে শক্ত বালির স্তরের ওপর দিয়ে তর্ তর্ করে হেঁটে যেতে পারে। জলে শরীর এবং পা ফুলিয়ে নিয়ে এদিক্ ওদিক্ সাঁতরাতেও পারে। তবে এরা বেশি নড়াচড়া পছন্দ করে না। এই জাতের সব প্রাণীরই এই রকম বসে কাটানো স্বভাব। কোন একটা ডুবো পাথর বা জলজ গাছ পেলে তার গায়ে সেঁটে রইল তো রইলই!

তারা মাছেরও আবার রকমফের আছে। কোন কোনটা ভারি সুন্দর, রঙচঙে দেখতে।—সবুজ, বাদামী আরও কত কি রং! তার মধ্যে বুটি বসানো। আবার কোন কোনটা কালচে—ফ্যাকাসে রঙের; পুরোনো চামড়ার মত সে রঙ। আঙুলের ধারে ধারে ছোট ছোট সুতোর মত অনেক টেন্‌টাক্‌ল্‌ও আছে ওদের।

তারা মাছকেও কিন্তু নেহাৎ নিরীহ জীব মনে ক'র না। ওরাও এক একটি দুরন্ত রাক্ষস এবং ওদেরও খিদে দুর্দান্ত। ঐ যে আঙুলের মত দেখতে বললাম, ওগুলোই হচ্ছে ওদের শিকার ধরবার অস্ত্র। শিকার কাছে এলেই আঙুলগুলো তার দিক তেড়ে যায় আর সবলে আঁকড়ে ধরে মুখের কাছে টেনে আনে। টেন্‌টাক্‌লের নিঃসৃত রস তাদেরকে সাহায্য করে। প্রচণ্ড শক্তি ঐ আঙুলের। ওরই সাহায্যে ওরা চাপ দিয়ে শক্ত ঝিনুক বা শামুকের খোলা ফাটিয়ে ফেলে, তার পর খোলার ভিতরের শাঁসাল নরম জীবটিকে টেনে বার করে তা দিয়ে জলযোগ করে। কাঁকড়া, ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য।

তারা মাছও অনুরূপ অন্যান্য জলজীবদের মত তথাকথিত 'ডিম' পেড়ে শূককীটের জন্ম দিতে পারে, যা নাকি পরে নতুন তারা মাছে পরি-

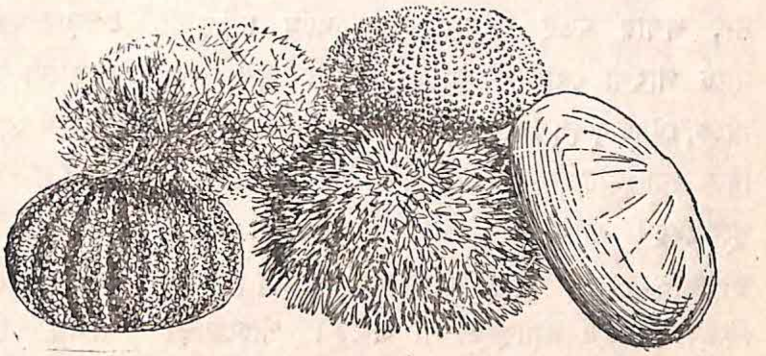
বর্তিত হয়। কিন্তু এদের বংশবৃদ্ধির আরও ধরন আছে। জেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে জালে তারা মাছ উঠলে খুব খুশি হয় না। অনেকে রেগেমেগে, ওদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আবার জলে ফেলে দেয়। ব্যাপারটা নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক হলেও জেলেদের বোকামিরও পরিচায়ক। কারণ ওভাবে ওদের মারা যায় না। ঐ ছেঁড়া টুকরো-গুলোয় অল্প কিছুদিন পরেই গজাতে থাকে নতুন আঙুল—নতুন অঙ্গ। শেষে প্রত্যেকটি টুকরো এক একটি আলাদা তারা মাছ হয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক যেন একে অপরের বন্ধু।

তারা মাছের আর একটি অদ্ভুত স্বভাবের কথা শুনতে পাওয়া যায়। সে হচ্ছে ওদের ইচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণ—যাকে আমরা বলি আত্মহত্যা। জলের ভিতর তারা মাছ শত অত্যাচার করলেও সহ্য করতে পারে কিন্তু ডাঙ্গায় তুললেই তার মেজাজ যায় বিগড়ে। সে তখন নিজে থেকেই, যেন ইচ্ছে করেই, নিজের হাত-পা অর্থাৎ ঐ আঙুলগুলো খসিয়ে ফেলে দেয়—বাঁচবার সব সাধ-আশা বিসর্জন দিয়ে।

তারা মাছের জাতভাইরা

একিনোডার্মদের মধ্যে তারা মাছই প্রধান হলেও ওদের আরও নানা জাতভাই আছে। সী-আর্চিন্ বা সী-হেজ্‌হগ্ অর্থাৎ সমুদ্রের কাঁটাচুয়া, সী-কিউকাম্বার অর্থাৎ সমুদ্রের শশা প্রভৃতি প্রাণীরাও তারা মাছেরই জাতভাই। পর্ব অর্থাৎ ফাইলাম একই, তবে শ্রেণী বা ক্লাস আলাদা।

কাঁটাচুয়ার সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য থেকে সী-হেজ্‌হগ্ বা সী-আর্চিন্ নামটি দেওয়া হয়েছে। আকৃতিতে এদের বেশির ভাগই বলের মত গোল, আর সেই বলের সারা গা যুড়ে লম্বা লম্বা ছুঁচলো কাঁটা খাড়া হয়ে আছে। ডিমের মত চ্যাপ্টা বা চাকতির মত চ্যাটাল সী-আর্চিন্‌ও যে নেই তা নয়। কাঁটার নীচে শক্ত খোলার বর্ম, তারই মাঝখানে ওদের মুখ, আর নীচে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। কাঁটা খাড়া হয়ে থাকলেও, জ্যান্ত অবস্থায় ঐ কাঁটাগুলো ওরা ইচ্ছেমত নাড়াতে-চাড়াতে



সী-আর্চিন বা সী-হেজ্‌হগ্ (সমুদ্রের কাঁটাচুয়া)
নাবিকেরা নাম দিয়েছে সী-এগ্ (সামুদ্রিক ডিম)

পারে। মরে গেলে কাঁটাগুলো খুলে ঝরে যায়, তখন জীবটিকে দেখায় অনেকটা কমলা লেবুর আকৃতির অ্যাশ্-ট্রে বা পিন্-কুশানের মত। আলোয় ধরলে ওদের মস্ত মুখ আর চোয়ালের শক্ত হাড় স্পষ্ট বোঝা যায়, আর দেখা যায় অসংখ্য ছিদ্র, যার মধ্যে নাকি কাঁটাগুলো আটকানো ছিল। তারা মাছদের মত সী-আর্চিনদেরও ফাঁপা নলের মত পা আছে চলেফিরে বেড়াবার জন্য, তবে এরাও বিশেষ নড়তেচড়তে চায় না। এদের প্রধান খাদ্য সমুদ্রের শ্যাওলা, যাদের আমরা বলি অ্যাল্‌গী। তবে অনেকেরই সামুদ্রিক পোকামাকড় খেতেও কোন আপত্তি নেই।

বাহার। রঙের বাহার দেখে এদের নাম দেওয়া হয়েছে লেডী-ক্র্যাব্—অর্থাৎ কিনা মহিলা-কাঁকড়া। মেয়েরাই রঙচঙে পোশাকে সাজতে বেশি ভালোবাসে কিনা! সমুদ্রের ধারে বা নদীর পাড়ে বালির মধ্যে এক জাতের ছোট ছোট লালচে কাঁকড়া অনেকেই হয়তো দেখেছ। আমি একবার ক্যানিংএ মাতলা নদীর ও-পাড়ে এই রকম একটা লাল কাঁকড়ার ঝাঁক দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। শত শত—হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ কাঁকড়া। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছিল বুঝি গোটা নদীর পাড়টাই কেউ একটা বিরাট লাল রঙের গালচে দিয়ে ঢেকে দিয়েছে! কিন্তু ও মা, নৌকো থেকে নামতে না নামতে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় সমস্ত লাল রং অদৃশ্য হয়ে গেল, একটি কাঁকড়াও চোখে পড়ল না। কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝা গেল। নদীর পাড়ে বালির মধ্যে অসংখ্য গর্ত। মানুষের সাড়া পাওয়া মাত্র কাঁকড়াগুলো এক একটা গর্তের নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে ঢুকেছে। আর এত বিদ্যুৎগতিতে এ কাজ সমাধা করেছে যে কল্পনা করাও কঠিন। ঘণ্টাখানেক পরে, ঐ পথ দিয়েই যখন আবার ফিরছিলাম, দূর থেকে দেখলাম সমস্ত তটভূমি কাঁকড়ার রঙে রঙে লাল হয়ে আছে। বালি বা মাটি চোখেই পড়ে না। বিপদ্ কেটে গেছে অনুমান করে সবাই আবার বেরিয়ে এসেছে যে যার গর্তের ভিতর থেকে।

কাঁকড়ার ছানা

ছোট বড় সব কাঁকড়াই মোটামুটি দেখতে এক রকম বলেছি, তাই বলে ছানা-কাঁকড়ার সঙ্গে কিন্তু ধাড়ি কাঁকড়ার চেহারার একেবারেই মিল নেই। জন্মাবার পর ওদের না থাকে ঠ্যাং, না থাকে দাড়া। চেহারা দেখে কে বলবে এরাই একদিন আসল কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হবে? কাঁকড়ার এই পরিবর্তন



জন্মাবার সময় কাঁকড়ার চেহারা

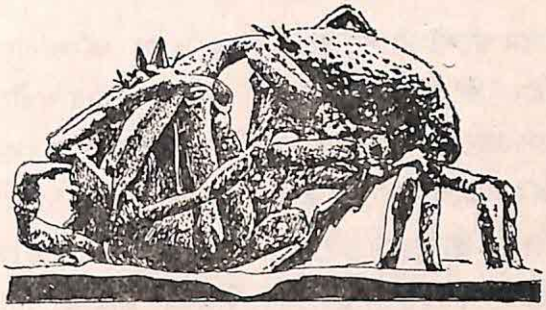
হয় ক্রমাগত খোলস বদলাতে বদলাতে। বিজ্ঞানের ভাষায় ওকে বলে 'মোল্টিং', যার বাংলা হচ্ছে "নির্মোচন"। পাখীদের মধ্যেও এই ব্যাপারটা দেখা যায়—পুরোনো পালক ফেলে নতুন পালক বেরিয়ে ছানা-পাখীর চেহারা ধীরে ধীরে আসল পাখীর রূপ নেয়।

কাঁকড়ার এই খোলস বদলানোর পালা ঘটে অনেকবার। প্রতিবারেই ভিতরের দাড়া, ঠ্যাং ইত্যাদি বাইরের শক্ত খোলা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসে। ইতিমধ্যে তার তলায় একটা নরম খোলা গজাতে শুরু করে। কাঁকড়ার এই খোলস বদলানো ব্যাপারটি মোটেই আরামদায়ক মনে ক'র না, বরঞ্চ বেশ কষ্টকর। এমন কি অনেক কাঁকড়া ওর ফলে মারাও পড়ে। সত্যিই তো, ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যদি বাইরের খোলার তুলনায় বেড়ে গিয়ে বড় হতে থাকে তা হলে তো খোলার ওপর চাপ পড়বেই।

অবশ্য কাঁকড়ার আসল দেহ খুব নরম—আমরা যাকে বলি সরস। খোলস বদলাবার

সময় সে সমস্ত শরীরটাকে সংকুচিত করে আরো ছোট করে ফেলে, তারপর যোড়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে দাড়া, ঠ্যাং ইত্যাদি বার করে এনে ওপরের খোলসটা ভেঙ্গে ফেলে। এই সময় কাঁকড়ার গোটা শরীরটাই হয়ে যায় ভীষণ নরম—যাকে বলা যায় শাঁসাল। ওপরে শক্ত খোলা না থাকলে তা তো হবেই! এ রকম নরম শাঁসাল শরীর যে-কোন সামুদ্রিক প্রাণীর কাছেই অতি উপাদেয় ভোজ্য। এমন কি ওদের স্বজাতিদের কাছেও। কাজেই খোলস ছেড়েই ও চেষ্টা করে কোন একটা পাথুরে ফাটল বা ঐ জাতীয় কিছু খুঁজে বার করতে, যার মধ্যে কিছুদিন অন্ততঃ লুকিয়ে থাকা যায়। অবশ্য বেশি দিন ও-ভাবে থাকতে হয় না। অল্প কয়েকদিন পরেই ওর ওপরকার নতুন চামড়া আবার শক্ত হয়ে ওঠে—পরিবর্তিত হয় নতুন খোলসে। তখন ও নির্ভয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। কোন কোন কাঁকড়ার বেলায় এই খোলস শক্ত হওয়া ব্যাপারটা নাকি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোটামুটি হয়ে যায়।

প্রতিবারেই খোলস বদলাবার পর ছানা-কাঁকড়ার চেহারা ধাড়ি কাঁকড়ার মত হতে থাকে এবং নির্মোচন কার্য কয়েকবার হয়ে গেলেই সে একটি পুরোপুরি সাবালক কাঁকড়ায় পরিণত হয়। তখন তার চেহারা ঠিক কাঁকড়ারই মত। ঐ রকম শক্ত দাড়া—যা দিয়ে ও শুধু খাবারই আঁকড়ে ধরতে পারে না, দস্তুর মত অন্য কাঁকড়াদের সঙ্গে লড়াই করতেও পিছপা হয় না। লড়াইবাজ জানোয়ার বলে কাঁকড়ার প্রাণিরাজ্যে বেশ নাম আছে। কারণে



কাঁকড়ার লড়াই

অকারণে ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে। এমন কি যখন বালির মধ্যে গর্তে আশ্রয় নেয় তখন যদি ভুল করে কোন কাঁকড়া অপর কাঁকড়ার গর্তে ঢুকে পড়ে তা হ'লে আর তার সহজে রেহাই নেই। যুদ্ধ তখন অবশ্যম্ভাবী—যদি না আগেভাগেই পালিয়ে আসতে পারে।

কাঁকড়ার লড়াই একটা দেখবার জিনিস। সে লড়াই দেখার কারো যদি সৌভাগ্য হয় তবে দেখা যাবে ছ'জনেই প্রতিপক্ষের দাড়া ছ'টো ছিঁড়ে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাতে যদি নিজের দাড়া ছ'টির একটি বা ছ'টিই খোয়া যায় তা হলেও ডোণ্ট্ কেয়ার। কারণ, ও জানে, ওর দাড়া আবার নতুন করে গজাবে—টিকটিকির লেজের মত। তবে এজন্য এক বা একাধিক নির্মোচনের দরকার হতে পারে। শুধু দাড়া নয়, ছেঁড়া ঠ্যাংও ঐ ভাবে আবার গজাতে পারে। এমন কি চোখটাও নষ্ট হয়ে গেলে নতুন চোখও গজাবে। কোন কোন কাঁকড়ার চোখ ছ'টো আবার ছ'টো ডাঁটির ওপর বসানো থাকে।

কাঁকড়ার অভিযান

কাঁকড়া জলে বা ডাঙ্গায় ছ' জায়গায়ই দেখা যায় বলেছি। কোন কোন জাতের কাঁকড়া সারা

জীবন জলেই বাস করে, কিন্তু ডাঙ্গা ভালোবাসে এমন কাঁকড়ারও অভাব নেই। এদের শরীরে শ্বাস-গ্রহণের ব্যবস্থাও সেই রকম ভাবেই থাকে। যখন জলে থাকে তখন কানকো দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়। কানকো থাকে শরীরের ছু'পাশে ছু'টো গর্তের ভিতর। যে সব কাঁকড়া ডাঙ্গায় থাকে তাদের ঐ গর্ত আরও বড় হয় আর সেটাই ফুসফুসের কাজ চালায়।

এ সম্পর্কে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের একজাতের কাঁকড়ার কথা বিশেষ করে বলা দরকার। এরা সাধারণতঃ সমুদ্র থেকে ২।৩ মাইল দূরে আড্ডা গাড়ে কিন্তু ডিম পাড়বার সময় মেয়ে-কাঁকড়ারা সমুদ্রের ধারে না গিয়ে পারে না। সাধারণতঃ অন্যান্য জাতের মেয়ে-কাঁকড়াদের ডিম তাদের শরীরের সঙ্গেই আটকে থাকে কিন্তু এদের বেলায় আলাদা ব্যবস্থা। ফলে ডিম পাড়বার সময়ে দেখা যায় এক আশ্চর্য দৃশ্য। হাজার হাজার—লাখে লাখে কাঁকড়া দল বেঁধে রওনা হয়েছে। এক এক দলে এত কাঁকড়া যে মাইলখানেক জায়গা যুড়ে শুধু কাঁকড়ার দঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে দঙ্গলও কম করে ৪০।৫০ গজ চওড়া। মাটি দেখা যায় না, সর্বত্র থিক্ থিক্ করছে কাঁকড়া। এতটুকু ফাঁক নেই মাঝে। আগে আগে পুরুষ-কাঁকড়ারা চলেছে প্রহরীর মত, মেয়েদের আগলে নিয়ে; পেছনে সার বেঁধে চলেছে মেয়ে-কাঁকড়ারা। সমুদ্র পর্যন্ত কয়েক মাইল পথ তাদের পার হতেই হবে—তা পথে যে বাধাই আসুক না কেন। পাহাড়, ঢিবি, লোকের বাড়ী, দেয়াল সব টপকে চলেছে তারা। এর ফল যে ক্ষেত্র-বিশেষে মারাত্মক হচ্ছে না তাও নয়, অনেকে পথের মধ্যেই প্রাণ হারাচ্ছে। তবু তারা চলেছে সমুদ্রের দিকে। সেখানে সমুদ্রের কিনারায় বালিতে গর্ত করে মেয়েদের ডিম পাড়া হয়ে গেলে তবে তাদের ছুটী। একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ গর্তে লক্ষ লক্ষ ডিম! আবার মজা, ডিম পাড়া হয়ে গেলেই দেখা যাবে সমস্ত কাঁকড়ারাই আবার আগের মত দল বেঁধে ফিরে চলেছে তাদের পুরোনো আস্তানায়, ফেরার পথেও অনেককে বিসর্জন দিয়ে। কাঁকড়ার এই বার্ষিক অভিযান প্রকৃতির রাজ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার।

সন্ন্যাসী কাঁকড়া

কাঁকড়ার গল্প বলতে গিয়ে সন্ন্যাসী কাঁকড়ার গল্প ভালো করে না বললে তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অবশ্য এদের কথা সী-অ্যানিমোনদের কাহিনী বলবার সময়ও একবার বলেছি। ইংরেজি নাম "হারমিট ক্র্যাব্", তাই বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে সন্ন্যাসী বা যোগী কাঁকড়া। যোগীরা যেমন অনেকে লোকালয়ে না গিয়ে গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে বাস করে, এরাও তেমনি অন্য প্রাণীর—বিশেষ করে শামুকের খোলের ভিতর আশ্রয় নিয়ে বাস করে। কারণটা তো আগেই বলেছি। এদের শরীরের সমস্ত অংশ শক্ত খোলা দিয়ে ঢাকা থাকলেও লেজটি একদম অরক্ষিত, আর তেমনি নরম এবং শাঁসাল। ফলে যত রাজ্যের শত্রুর নজর ঐ লেজটির দিকে। এই লেজটিকে বাঁচিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাই হচ্ছে তাই এদের প্রধান সমস্যা। আর এই জন্যই এরা কখনও লেজের উপর সী-অ্যানিমোনকে বসিয়ে কিংবা কোন স্পঞ্জের তলায় ঢুকে বা কোন

শামুকের খোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে লেজটিকে আড়াল করে রাখে। শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকলে অবশ্য সব সময়ে খোলটিকে ঘাড়ে নিয়ে ঘুরতে হয়। তাতেও এদের বিশেষ আপত্তি নেই। নিরাপত্তার জন্য সেটুকু করতেই হয়। তবে অনেক সময় একই খোলের কয়েকজন ভাগীদার এসে জোটে এবং তখনই বাধে মুশ্ কিল। সে ক্ষেত্রে, যদিও প্রথম দখলদারের দাবীই অগ্রগণ্য, কিন্তু অপরে তা মানতে না চাইলে লড়াই করেই সমস্যার মীমাংসা করতে হয়। আর শামুকের ভিতর যদি জ্যান্ত শামুক প্রাণীটি উপস্থিত থাকে তবে তো কথাই নেই। আশ্রয় নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক আহারের সমস্যাটাও তা হলে মিটে যায়।

তবে একই শামুকের খোলে চিরকাল থাকা চলে না। কারণ কাঁকড়ারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মোটাও হতে থাকে। ফলে কিছুদিন পরেই খোলটি তার পক্ষে অপরিসর হবার সম্ভাবনা। কাজেই তখন ছুটতে হয় আবার নতুন খোলের সন্ধানে। স্পঞ্জের সঙ্গে মিতালি পাতালে কিন্তু এ দুর্ভাবনা থাকে না। কারণ স্পঞ্জের সারা গায়ে অসংখ্য ছেঁদা, তা দিয়ে ওরা জল টেনে নিয়ে ইচ্ছেমত ফেঁপে উঠতে পারে। কাঁকড়া তখন মোটা হলেও তার মধ্যে দিব্যি গা-ঢাকা (বা লেজ-ঢাকা) দিয়ে থাকতে পারে।

শুধু শামুক, সী-অ্যানিমোন আর স্পঞ্জই নয়, সন্ন্যাসী কাঁকড়ারা দরকার হলে অন্য সামুদ্রিক প্রাণীর সাহায্য নিতেও কসুর করে না। সমুদ্রে একরকম রঙচঙে পোকা আছে যেগুলোর চেহারা অনেকটা ময়লা-সাফ-করা বুরুশের মত। এরাও সন্ন্যাসী কাঁকড়াদের পিঠের ওপর আস্তানা গাড়ে। এতেও দু'পক্ষের সুবিধা। কাঁকড়ার লেজ সবটুকু ঢাকা পড়ুক আর না পড়ুক, সেটাকে গোপন করতে নিশ্চয়ই ওরা খানিকটা সাহায্য করে আর তার চাইতে বেশি—কাঁকড়ার শরীরের আর খোলার ভিতরকার যত ময়লা সব ওরা ঐ বুরুশের মত শরীর দিয়ে ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে দেয়। আর ওদের নিজেদের সুবিধে এই—কাঁকড়ার পিঠে চড়ে এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বেড়াতে পারে এবং খাবারেরও খানিকটা ভাগ অবশ্যই পায়।

সন্ন্যাসী কাঁকড়ার আর একটি জাতভাইএর কথাও এখানে বলে নিই। এরা থাকে সমুদ্রের একদম তলায় এবং সেখানে মাটির ওপর দিয়েই চলাফেরা করে। এদেরও যত গোলমাল কিন্তু ঐ নরম লেজ নিয়ে। এজন্য কোথাও আস্তানা গাড়তে হলে এরা আগে সেখানে একটা গর্ত করে তার মধ্যে লেজটা ঢুকিয়ে নিয়ে তবে বসে। ফলে, বংশপরম্পরায় এমনি ধারা করতে করতে, এদের শরীরের পেছন দিক্‌টা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক বঁড়শির মত—যা দিয়ে ওরা যে কোন জিনিস আঁকড়ে ধরে লেজটা ঢেকে রাখতে পারে।

অতিকায় কাঁকড়া

সবচেয়ে বড় জাতের কাঁকড়া দেখা যায় জাপান দেশে। এদেরকে বলা হয় অতিকায় মাকড়সা-কাঁকড়া। লম্বা লম্বা ঠ্যাংগুলো দেখতে অনেকটা মাকড়সার মত কিনা! এদের এক দাড়া থেকে অন্য দাড়া পর্যন্ত মাপলে কম করে দশ ফুট বা তারও কিছু বেশি হবে। আকারে বড় হলেও স্বভাবে কিন্তু এরা ততটা ভয়ঙ্কর নয়। অবশ্য এরাও সামুদ্রিক প্রাণী ধরেই খায়। এই

জাতের কাঁকড়ারা অনেক সময় জলের তলায় লতাপাতার আড়ালে বা স্পঞ্জের মধ্যে লুকিয়ে থেকে শিকারের জন্য ওৎ পেতে থাকে। তবে এদের নিজেদের মাংসও নাকি খুব সুস্বাদু। জাপানীরা তো প্রচুর খায়ই, আবার টিনের কৌটোয় প্যাক্ করে দেশ-বিদেশে চালানও দেয়। মাকড়সা-কাঁকড়া অবশ্য পৃথিবীর অন্যত্রও দেখা যায়, তবে সেগুলি অত বড় নয়—বড় জোর এক ফুট কি ঐ রকম হবে।

আরও নানা জাতের কাঁকড়া আছে, কিন্তু সবগুলির কথা বলবার এখানে জায়গা কই? তাই শুধু আর একটি বড় জাতের কাঁকড়ার কথা বলে আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে আসব। এই কাঁকড়াগুলো সাধারণতঃ পাওয়া যায় ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের ভিতরকার নানা দ্বীপে। এরা নারকেল গাছের নীচে গর্ত করে সেখানে বাস করে। গাছ থেকে যে নারকেল খসে পড়ে তাই হচ্ছে এদের খাদ্য। এদের দাড়া এত ধারাল যে তাই দিয়ে ওরা নারকেলের ছোবড়া ছুলে ফেলে নারকেলের "চোখের" মধ্যে ঘা মেরে মেরে তাকে ফুটো করে ফেলে, তার পর ঐ দাড়ার সাহায্যেই নারকেলের শাঁস খুবলে বার করে নিয়ে খায়। এই কাঁকড়াগুলোও ঐ সব দ্বীপের লোকদের কাছে বেশ সুখাদ্য বলে পরিচিত। তারা শুধু ওদের মাংসই খায় না, ওদের উনুনে ফুটিয়ে গালিয়ে ফেলে প্রচুর পরিমাণে নারকেল তেলও উদ্ধার করে। বলা বাহুল্য যে সব নারকেল এই সব কাঁকড়ারা খায় তেলটা তাই থেকেই আসে।

চিংড়ি কিন্তু মাছ নয়

কাঁকড়ারই কতকটা জাতভাই হচ্ছে চিংড়ি। চিংড়িও যে নানা রকমের হয় তা তো আমরা সবাই জানি। বড় জাতেরগুলোকে আমরা বলি গল্‌দা চিংড়ি। ইংরেজিতে বলে লব্‌স্টার। দেখতে নীলচে, কিন্তু যখন ভাজা হয়ে খাবার থালায় পড়ে তখন প্রায় টুকটুকে লাল। এরাও ক্রাস্টে-শিয়ান দলের প্রাণী। কাঁকড়ার সঙ্গে এদেরও নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। কাঁকড়ার মত এরাও নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে ওস্তাদ্ এবং সে লড়াইএ যদি শরীরের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,—বিশেষ করে দাড়া,—খোয়া যায় তা হলেও ওরা পরোয়া করে না। কারণ কাঁকড়ার মতই সে দাড়া আবার নতুন করে গজায়। কাঁকড়ার মত এদেরকেও নির্মোচন বা 'মোল্টিং' করে বার বার খোলস বদলে তবেই সাবালক হতে হয়।

এক একটি মা-গল্‌দা চিংড়ি প্রতি বছর হাজার হাজার ডিম পাড়ে। ঐ ডিম তাদের পেটের নীচে লেগে থাকে; তারপর ডিম ফুটে যখন শূক-কীট বেরোয় তখন সেগুলি মাকে ছেড়ে এসে জলের ওপর ভাসতে থাকে। এইভাবে প্রায় ৩।৪ সপ্তাহ কেটে যায়। এ সময় শূক-কীটগুলি ভারি অসহায়, কারণ তাদের ঐ নরম শরীর মাছেদের অতি প্রিয় খাদ্য। তাই হাজার হাজার যেমন জন্মায়, হাজার হাজার তেমনি মরেও। যেগুলি টিকে যায় সেগুলো জলের নীচে নেমে অল্পদিনেই পুরোপুরি গল্‌দা চিংড়িতে পরিণত হয়।

মা-গল্‌দা চিংড়িগুলি কিন্তু খুবই স্নেহপ্রবণ হয়। জলের তলায় ডুবো পাথরের ফাঁকে মা তার দাড়া ছড়িয়ে শুয়ে আছে আর তার বাচ্চারা সেই দাড়ার ফাঁকে সাঁতরে সাঁতরে খেলা করছে এ দৃশ্য প্রাণিবিজ্ঞানীদের খুব

অপরিচিত নয়। বিপদের আশঙ্কা দেখলেই মা তার দাড়া ঘষে শব্দ করে, আর বাচ্চারা পিল্ পিল্ করে গিয়ে মায়ের পেটের নীচে আশ্রয় নেয়,—ওদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়।

চিংড়িদের মধ্যে এই গল্‌দা চিংড়িই সবচেয়ে বড়। কোনও কোনও সামুদ্রিক গল্‌দা চিংড়ির ওজন তিরিশ পাউণ্ড পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। লম্বায় কোন কোনটা ছ'ফুট। দাড়া দু'টোই হয়তো ১৫ ইঞ্চি করে লম্বা।

বাগ্‌দা চিংড়িগুলো গল্‌দার চাইতে ছোট। ইংরেজিতে এদেরকে ক্রে-ফিশ্, শ্রিম্প্ বা প্রন্ ইত্যাদি নানা রকম নাম দেওয়া হয়েছে। ওরা সবাই কিন্তু ভিন্ন প্রজাতির জীব। তবে বাংলায় সবগুলিকেই আমরা, সাধারণ লোকেরা, বাগ্‌দা চিংড়িই বলি। শ্রিম্প্‌কে কেউ কেউ কুচো চিংড়িও বলে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে বড় আকারের শ্রিম্প্‌ই হচ্ছে প্রন্। প্রন্‌গুলো কিন্তু শ্রিম্পের চাইতে দেখতে অনেক সুন্দর। কোন কোনটা বেশ রঙচঙে। ক্রে-ফিশ্ স্বাদু জলের চিংড়ি। সবগুলিই কিন্তু মানুষের খাদ্য। চিংড়িকে আমরা চলতি কথায় বলি চিংড়ি মাছ। পূর্ববঙ্গে বলে ইচা মাছ। আসলে কিন্তু ওরা মোটেই মাছ নয়, মাছের জাতই নয়। যেমন তিমি মাছও মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জন্তু।

অন্যান্য বেশির ভাগ ক্রাস্টেশিয়ান দলের প্রাণীর মত চিংড়িকেও অনেকবার খোলস পালটাতে হয়। ক্রে-ফিশকে এ কাজটা করতে হয় অন্ততঃ বার পনেরো। প্রথম বছরে আটবার, দ্বিতীয় বছরে পাঁচবার এবং তৃতীয় বছরে দু'বার। তার পরে সে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়।

শামুক আর ঝিনুক

বর্মধারী জীবের কথা বলতে গেলে আর এক জাতের প্রাণীর কথা বলতে হয় যাদের আমরা এক কথায় বলি শামুক-ঝিনুক। শামুক আর ঝিনুক কিন্তু ক্রাস্টেশিয়ানের দলে পড়ে না, ওরা দু'টোই 'মোলাস্ক' পর্বের জীব। দু'টোরই হাজার হাজার প্রজাতি আছে এবং তাদের মধ্যে বৈচিত্র্যও বড় কম নয়। এক সময়, কোটি কোটি বছর আগে, যখন পৃথিবীতে উন্নত ধরনের কোনও প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে নি তখন এই শামুক-ঝিনুকরাই পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করত বলা চলে। অন্যান্য প্রাণীরা নাকি ওদের থেকেই, ক্রমবিকাশের ফলে, পরে বিভিন্ন চেহারায় রূপান্তরিত হয়েছে। সে দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে ওরা আমাদেরও পূর্বপুরুষ।

শামুক হচ্ছে গ্যাস্ট্রোপোড্ শ্রেণীর মোলাস্ক। আমরা সাধারণতঃ যেটাকে দেখে শামুক বলি সেটা কিন্তু ওদের কঙ্কাল। অবশ্য কঙ্কাল বলতে আমরা শরীরের ভিতরকার শক্ত কাঠামোটাই বুঝি, কিন্তু ওদের বেলা উল্টো। ওদের কঙ্কাল থাকে শরীরের বাইরে। আসলে ওটা হচ্ছে ওদের আত্ম-রক্ষার দুর্গ। জীবটি বাস করে ঐ দুর্গের ভিতরে। ভারি নরম শরীর কিনা ওদের, তাই এই রকম একটা শক্ত খোলার দুর্গ না থাকলে বেঁচে থাকাই দায় হ'ত। সমুদ্রে ওদের শত্রুসংখ্যা অসংখ্য। সেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ওরা ঐ নিরাপদ কঙ্কালের মধ্যে বাস করে।

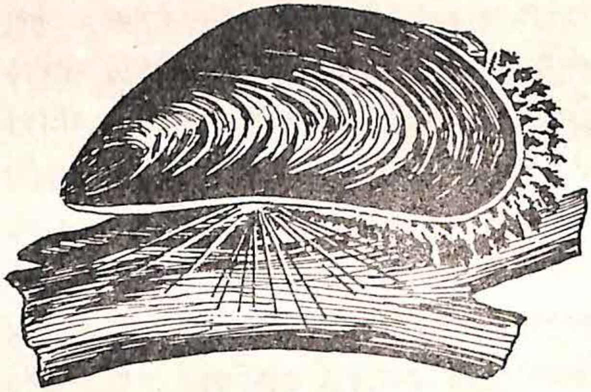
গ্যাস্ট্রোপোড্ বা 'উদরপদ' (গ্যাস্টার=পেট, পোডোস্=পা) শ্রেণীর প্রাণীদের কিন্তু পা আছে, মাথা ইত্যাদিও আছে। বিভিন্ন গ্যাস্ট্রোপোড্‌দের মধ্যে শঙ্খ বা শাঁখ আমাদের বিশেষ পরিচিত।

আমরা মঙ্গল-উৎসবে যে শঙ্খ বাজাই তা এই প্রাণীটিরই তথাকথিত খোলস বা কঙ্কাল। ফুঁ দিলে ভিতরে বাতাস ঢুকে ঐ রকম গুরুগম্ভীর আওয়াজ বেরোয়। ভিতরের প্রাণীটির খোঁজ আমরা বড় একটা নিই না, কিন্তু পৃথিবীর অনেক জায়গায় এটিও মানুষের একটি মুখরোচক খাদ্য। কোন কোন জাতের শাঁখ লম্বায় এক ফুটও হতে দেখা গেছে। ওজনে সেগুলির এক একটা পাঁচ পাউণ্ড। হিন্দু মেয়েরা যে হাতে শাঁখা পরে তা এই শঙ্খকে করাত দিয়ে কেটেই তৈরি করা হয়। শাঁখা ছাড়া আরও নানারকম কারুশিল্পে শঙ্খ ব্যবহার করা হয়।

লিম্পেট নামে এক রকম শামুক আছে যেগুলো দেখলে ঠিক খেলার আগ্নেয়গিরি বলে মনে হবে। এমন কি আগ্নেয়গিরির গহ্বর বা ক্রেটারটাও যেন রয়েছে ওর গায়ে। আর এক রকম শামুক আছে, ইংরেজিতে যাদের বলা হয় অ্যাবালোল, দেখতে ঠিক মানুষের কানের মত। বলা বাহুল্য এগুলি সবই শামুকের খোল, আসল প্রাণীটি সব সময়েই থাকে খোলের ভিতরে। ঐ জীবের বিশেষত্ব হচ্ছে ওদের ধারাল দাঁত—যা নাকি বসানো থাকে ওদের জিভের গায়ে। একটা নয়, হু'টো নয়, কম করে পাঁচশ' থেকে হাজার দেড়েক দাঁত। ঠিক উকো বা 'ফাইলের' মত কাটা কাটা। ঐ দাঁত দিয়েই ওরা খাবার থেঁতলে নরম কাদার মত করে নিয়ে তারপর খায়। কোন কোন শামুকের জিভের ডগায় পর্যন্ত এই রকম দাঁত থাকে—যা দিয়ে ওরা ঝিনুকের খোলা পর্যন্ত ফুটো করে ভিতরের প্রাণীটিকে চুষে খেতে পারে।

ঝিনুক জাতে আলাদা

ঝিনুকও মোলাস্ক, তবে শামুকের মত গ্যাস্ট্রোপোড্ নয়। এদের আর একটা নাম হচ্ছে বাই-ভাল্‌ভ্‌স্। তার মানে এদের শরীর অনেকটা বাক্সের ডালার মত হু'টো ঢাকনা দিয়ে তৈরি। ঢাকনার যোড়ের মুখে আছে শক্ত মাংসপেশী, যার সাহায্যে ঢাকনা ইচ্ছেমত খোলা যায়, আবার বন্ধ করে দেওয়া যায়। ঐ হুই ঢাকনার মাঝখানে নরম প্রাণীটি বাস করে। ঢাকনার ভিতর দিক্‌টা সাধারণতঃ সাদা এবং খুব চকচকে। ইংরেজিতে ওকে বলে 'মাদার অব্ পার্ল্'। ঝিনুকের তৈরি নানা সৌখীন জিনিসে আমরা



ঝিনুক সুতোর মত জাল বুনে নিজেকে আটকে রেখেছে।

এই জিনিসটি দেখতে পাই। ঢাকনার বাইরের দিক্‌টা কখনও সাদাসিধে, কখনও ঢেউ খেলানো, খাঁজকাটা কিংবা রঙিন। শুধু রঙিনই নয়, অনেক সময় রকমারি কারিকুরিতে ভরা বা চিত্র-বিচিত্র করা। চিত্র-বিচিত্র হবার কারণ নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ? উদ্দেশ্য সেই আত্মরক্ষা।—সমুদ্রের তলাকার লতাপাতা জঙ্গলের মধ্যে মিশে তাদেরই চেহারার অনুকরণ করে শত্রুর চোখকে ফাঁকি দেওয়া।

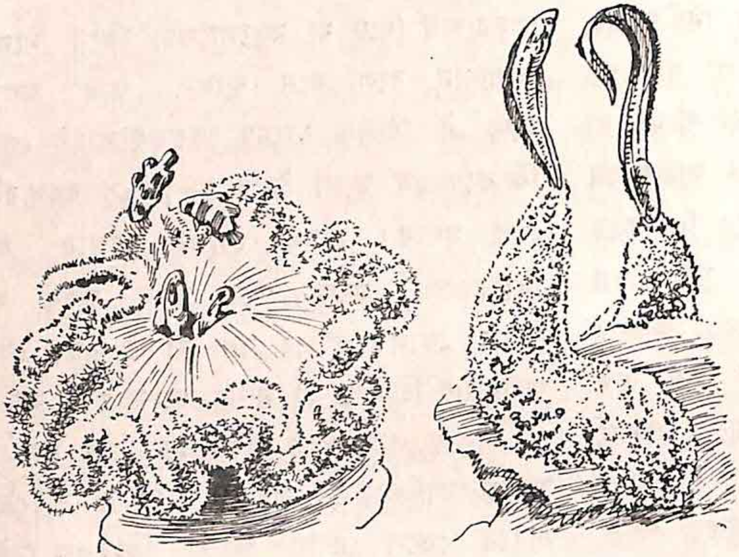
ঝিনুক খুব নিরীহ প্রাণী। শুধু নিরীহ নয়, অলসও। কোন কোন ঝিনুকের পা থাকলেও ওরা সমুদ্রের তলায় কোন শ্যাওলা-ধরা পাথর বা ঐ জাতীয় কিছুর গায়ে আটকে থেকে সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারে। পিছল পাথরে কি করে আটকায় ভাবছ? গোড়াতে ওদের ফাঁপা পা শোষকের মত পাথরটাকে আঁকড়ে ধরে। তারপর ওদের শরীর থেকে রেশমের সুতোর মত এক রকম সরু কিন্তু অত্যন্ত শক্ত আঠালো পদার্থ বেরিয়ে এসে পাথরের গায়ে জালের মত বোনা হয়ে যায়। ঐ বুনট এত শক্ত যে সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউও তা আলগা করে ঝিনুককে উল্টে ফেলে দিতে পারে না। অনেক সময় ওরা দল বেঁধে এই ভাবে পাথরের গায়ে আটকে থাকে। প্রত্যেকের সুতোর বুনুনি আলাদা, কিন্তু সবগুলি আবার এক জায়গায় একত্র হয়ে যুড়ে রয়েছে। ফলে তা আলগা করা শিবেরও অসাধ্য।

ঝিনুক এত কুঁড়ে যে খাবার সংগ্রহের জন্যও এদিক্ ওদিক্ নড়াচড়া করতে চায় না। তা হ'লে খাবার পায় কি করে? সে এক মজার ব্যাপার। খাবার সময় হলে ওরা জলের নীচে ঢাকনা দু'টো খুলে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। সমুদ্রের স্রোতের সঙ্গে নানারকম ক্ষুদে ক্ষুদে জলজীব—পোকামাকড় ভেসে আসছে। যেই সেগুলো ঢাকনার মাঝখানে এসে ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে ঝিনুক ডালা বন্ধ করে তাকে খেয়ে ফেলে।

মুক্তা-চরিত

ঝিনুকদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল সেইগুলো যাদেরকে আমরা বলি মুক্তা-শুক্তি, যাদের মধ্যে পাওয়া যায় মুক্তো। হ্যাঁ, যে মুক্তোর নাম করলে মন আনচান করে ওঠে, প্রচুর অর্থ দিয়ে যা বড়লোকেরা কিনে নিজেদের ভাগ্যবান্ বলে মনে করেন, তার জন্মস্থান হচ্ছে ঐ বিশেষ ধরনের ঝিনুকগুলোরই পেটে। কি করে ওই মুক্তো তৈরি হয়? সে ব্যাপারটাও বেশ মজার। ঢাকনা খোলা অবস্থায় যখন ঝিনুকগুলো জলে পড়ে থাকে তখন যদি দৈবাৎ কোনও বালির কণা বা ঐ রকম কোন অবাঞ্ছনীয় জিনিস, যা নাকি ওদের খাদ্য নয়,—ঐ ডালায় এসে পড়ে তখন হয় বিষম ল্যাঠা। অত্যন্ত অস্বস্তিকর সে অবস্থা, কারণ তাকে ঠেলে সরিয়ে ফেলে দেবার ক্ষমতা ঝিনুকের নেই। সে তখন তার ঢাকনার গা থেকেই এক রকম অতি তরল রস (যাকে মাদার অব্ পার্লের রস বলা চলে) বার করে আস্তে আস্তে সেই বিরক্তি-কর পদার্থটিকে প্রলেপ দিয়ে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করে এবং ক্রমাগত প্রলেপ পড়তে পড়তে সেই বিরক্তিকর পদার্থটিই এক সময়ে পরিণত হয়ে যায় মুক্তোয়। ডুবুরিরা সমুদ্রের তলায় নেমে এই সব ঝিনুক কুড়িয়ে এনে তা থেকে মুক্তো খুঁজে বার করে। পৃথিবীর কতকগুলি অঞ্চলে এ রকম মুক্তো একটু বেশি করে পাওয়া যায়। তার মধ্যে সিংহল—এখন যার নাম হয়েছে শ্রীলঙ্কা—একটি। ভারতেও দক্ষিণে তুঁতকড়ি অঞ্চলে মুক্তো সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে।

জাপানীরা এ বিষয়ে আরও চালাক। তারা ঝিনুককে দিয়ে মুক্তো তৈরি করিয়ে নেয়। এজন্য তারা সমুদ্রের খানিকটা জায়গা ঘেরাও করে সেখানে ঝিনুকের চাষ করে, আর ঝিনুকগুলো একটু বড় হ'লেই সেই ঝিনুকের ঢাকনা খুলে তার ভিতর খানিকটা বালির কণা বা ঐ রকম কোন ক্ষুদে জিনিস পুরে ঢাকনা বন্ধ করে দিয়ে আসে।



বাঁ-দিকে : সী-অ্যানিমোনের খপ্পরে পড়ে মাছের দফা সারা ;
ডান দিকে : সমুদ্রের শশারাও মাছ শিকারে কম যায় না।

তারপর ? তারপর আর কি! ঝিনুক তখন উপায়ান্তর না দেখে সেই বালির কণার ওপর তার রসের প্রলেপ দিয়ে দিয়ে তাকে মুক্তোয় পরিণত করতে বাধ্য হয়। এই রকম কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মুক্তোকে বলা হয় কালচার্ড্ পার্ল। পার্ল মানে মুক্তো। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বলে ওর দাম একটু কম হ'লেও আসলে ওগুলো কিন্তু কৃত্রিম নয়, আসল মুক্তোই। এবং, ঠিক প্রকৃতিতে যে ভাবে মুক্তো তৈরি হয়, এ মুক্তোও সেই একই প্রক্রিয়ায় তৈরি। তফাৎ এই যে এ মুক্তো মানুষের ফরমাস মত ঐ ঝিনুককে দিয়ে তৈরি করানো হয়। এই কালচার-করা মুক্তো প্রস্তুত করা জাপানের একটা বড় ব্যবসা।

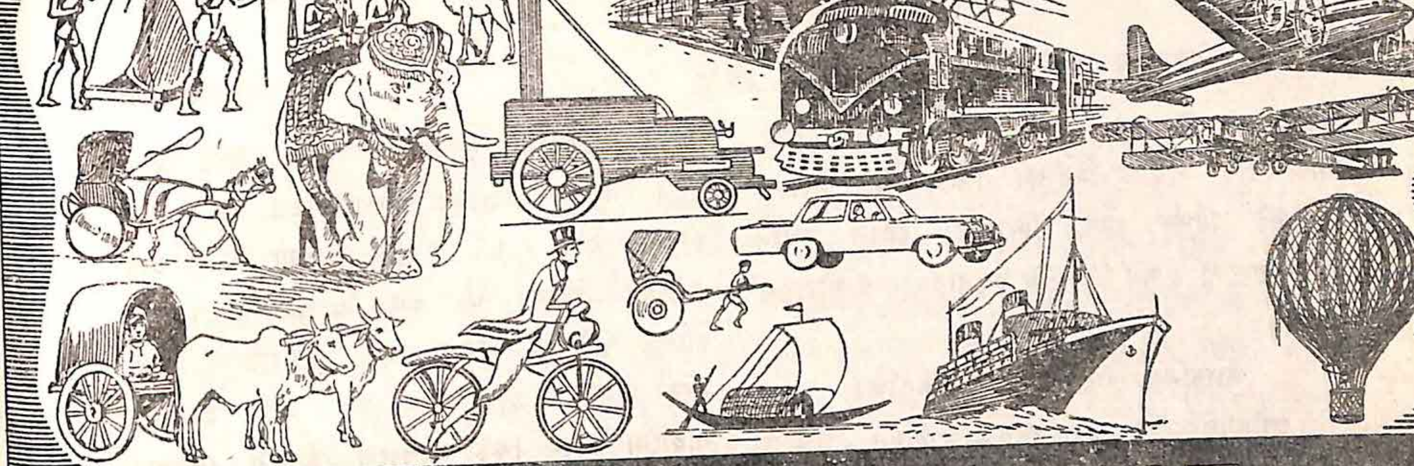
বিচিত্র জীবন

সমুদ্রের অদ্ভুত অদ্ভুত ছোট প্রাণীর কিছু কিছু গল্প এখানে বললাম। সবগুলোর কথা বলতে গেলে সে এক পুরোপুরি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়ে দাঁড়াবে। এই প্রসঙ্গে এখানে সমুদ্র-জীবনের আরও কয়েকটা ছবি দেওয়া হ'ল। সী-অ্যানিমোনের কথা তো আগেই বলেছি। ওরা কি করে শিকার ধরে তার আর একটা জলজ্যান্ত ছবি দেখ। দু'টি মাছ ওদের রঙে আকৃষ্ট হয়ে কাছে গিয়েছিল, সী-অ্যানিমোন তাদেরকে পাপড়ি দিয়ে মুখের কাছে টেনে নিয়েছে। এইবার হজম করল বলে! তার পাশের ছবিটায়ও দু'টো মাছ আছে। ওরাও পড়েছে দু'টি সমুদ্রের শশার (সী-কিউকাম্বার) খপ্পরে। একটা লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু আর একটার আর সে উপায় নেই। শত্রুর মুখে তাকে, মনে হচ্ছে, ঢুকতে হবেই।



গেছো মাছ

জলের মাছ ডাঙ্গায়,—শুধু ডাঙ্গায় কেন দস্তুরমত গাছে উঠে বসে থাকে এ রকম অদ্ভুত ব্যাপারও সম্ভব। এই রকম গেছো মাছও কোন কোন সমুদ্রে দেখতে পাওয়া যায়।



যানবাহনের কথা

যে গাড়ী আকাশে ওড়ে

জল ও স্থলের উপযোগী যানবাহনের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড), এবারে বলব শূন্যপথের নানা ধরনের যানবাহনের কথা। প্রকৃতপক্ষে সব রকম যানবাহনের মধ্যে আকাশভ্রমণের উপযোগী যানবাহন আবিষ্কার-কাহিনীই সবচেয়ে অশ্চার্যজনক, সবচেয়ে বিস্ময়কর, সব-চেয়ে রোমাঞ্চকর। কারণ অন্যান্য যানবাহনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, তত্ত্ব ও তথ্যের মধ্যে আদান-প্রদান চলেছে পাশাপাশি, কিন্তু আকাশযান আবিষ্কারের বেলা সে রকমটি হয় নি। প্রকৃত আকাশযান তৈরির আগে এ সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা চলেছে কম করেও শ'খানেক বছর। অবশ্য এর কারণ ছিল অনেকগুলো। একটি হ'ল উঁচু পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় উৎকর্ষের অভাব, যার জন্য আকাশযান তৈরির কাজটা ছিল এক রকম অসম্ভব।

সেকালের মানুষের আকাশভ্রমণের ইচ্ছে

মানবসভ্যতার আদিম যুগে সেই গুহাবাসী মানুষের মনেও যে আকাশভ্রমণের ইচ্ছে জেগে-ছিল তার প্রমাণ পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

পরবর্তী কালে বিভিন্ন দেশের নানা পৌরাণিক কাহিনীতে আকাশভ্রমণের নানা ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীসের একটি কাহিনীতে দেখা যায় যে পারসিউসের ছিল পাখা-লাগানো পা, যার ফলে তার শূন্যপথে দ্রুত চলা-ফেরায় কোন অসুবিধেই হ'ত না। ইকারাসের ঘাড়ের সঙ্গে মোম দিয়ে লাগানো থাকত পাখনা। একবার খুব উঁচুতে উঠতে গিয়ে সূর্যের তাপে মোম গলে তার পাখা যায় খুলে। ফলে তার বিপদ্ ঘটে। গ্রীক্ দেবতা মার্কারি তো আকাশপথেই ভ্রমণ করতেন। বাগ্দাদের এক রাজকন্যা মন্ত্রপূত কার্পেটে বসে কি ভাবে আকাশভ্রমণ করতেন সে গল্পও তো অনেকেই পড়েছ।

আকাশযান সম্বন্ধে আমাদের দেশেও নানা পৌরাণিক কাহিনীর চলন আছে। সে যুগের হাঁসে-টানা পুষ্পকরথ নাকি আকাশপথে ভ্রমণ করত। নারদ মুনিও তো তাঁর ঢেঁকিতে চড়েই স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ভ্রমণ করতেন। রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ বা মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতেন।

এ সব হয়তো নিতান্তই গল্পকাহিনী, কিন্তু এ থেকে বোঝা যায় যে পাখীর মত

আকাশে উড়বার বাসনা মানুষের বহুদিনের, এবং তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিপদ্ দেখা দিয়েছে। কোন কোন দেশে হয়তো এ সব নিতান্তই কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

আধুনিক কালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পৌরাণিক যুগের পরে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে সত্যিকারের বিজ্ঞান বলতে যা বোঝায় তার শুরু হয়েছে। কাজেই বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু বিষয়ের মত আকাশযান তৈরির ব্যাপারেও নানা দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এই সব পরীক্ষার ফলে যে-সব আকাশযান তৈরি হ'ল তাদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা চলে: বায়ুর চেয়ে হাল্কা আকাশযান এবং বায়ুর চেয়ে ভারী আকাশযান।

বায়ুর চেয়ে হাল্কা আকাশযান

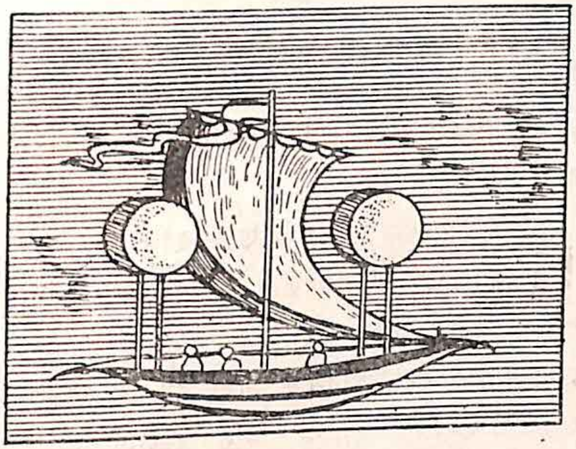
জল আর তেল মেশালে তেলটা জলের ওপর ভেসে ওঠে। কারণ কি? না, তেল জলের চেয়ে হাল্কা। হাইড্রোজেন গ্যাস-ভর্তি খেলনা বেলুন ছেড়ে দিলে তা কেমন সুন্দর ওপর দিকে উড়ে যায়! কারণ হাইড্রোজেন গ্যাস হ'ল অতি হাল্কা একটি গ্যাস। (পৃথিবীতে যত পদার্থ আছে হাইড্রোজেনই হ'ল তাদের মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা পদার্থ)। বেলুনে সে গ্যাস ভরার জন্যে গ্যাস সমেত বেলুনটিও হয়ে যায় হাওয়ার চেয়ে অনেক হাল্কা। তার ফলে সেটি ওপরে উঠে যায়।

তোমরা ফানুস ওড়ানো হয়তো দেখেছ। রঙিন কাগজের একটা বড় আকারের বেলুনের মত তৈরি করে তার নীচের দিকে কেরোসিন তেলে ভেজানো ন্যাকড়ায় আগুন ধরিয়ে দিতে হয়। ফলে আগুনের তাপে হাওয়া গরম হয়ে হাল্কা হয়ে যায়। হাল্কা হাওয়া উঠতে চায় ওপরের দিকে। এ ভাবে ওপরের দিকে যে চাপের সৃষ্টি হয় তারই ধাক্কায় ফানুসটি আকাশে উঠে যায়। যতদূর মনে হয়, গরম হাওয়ার সাহায্যে কোন কিছু আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার এ তত্ত্বটি বহু যুগ আগে চীন দেশেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারা অবশ্য ফানুস ওড়াত না, ওড়াত কাগজের ড্রাগন। সেই সঙ্গে পাঠাত ছোট ছোট খেলনা পুতুল। চীন দেশে অবশ্য এ ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে তেমন কোন কাজ হয় নি। ওরা ড্রাগন উড়িয়েই খুশি ছিল। কিন্তু ওরা হয়তো ভাবতে পারে নি যে ওদের এই আবিষ্কারই একদিন মানুষের আকাশ-জয়ের পথকে সুগম করে দেবে।

রোজার বেকন ছিলেন একজন রসায়নবিদ্। তিনি লিখলেন, বায়ু-সমুদ্রে মেঘেরা কেমন সুন্দর ভেসে বেড়ায়। মানুষ যদি কোনক্রমে একবার এই বায়ু-সমুদ্র জয় করতে পারে তবে আকাশভ্রমণে তাদের আর কোন অসুবিধে থাকবে না। পাতলা তামার পাত দিয়ে একটা গোলক বা গ্লোব তৈরি করে, তাতে গরম হাওয়া ভর্তি করে তা উড়িয়ে দেওয়া হয়তো সম্ভব।

সম্ভবতঃ বেলুনের ধারণাটাই এই সময় থেকেই।

এর বহু বছর পরে একজন পাদ্রীও, নাম ডি. লানা, অনেকটা এমনি ধরনের কথা বলেন। তিনি যে আকাশযানের কথা বলেন তাতে থাকবে চারটে বায়ুশূন্য গ্লোব, চলবে দাঁড় এবং



ডি. লানার পরিকল্পিত আকাশযান

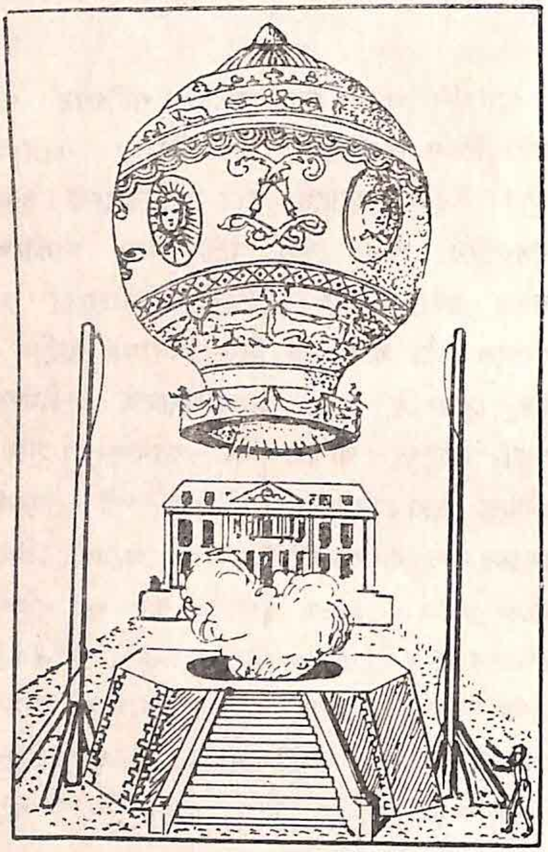
পালের সাহায্যে। ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে ডেমিয়ান নামে একজন পাদ্রী তো পালক দিয়ে তৈরি পাখার সাহায্যে আকাশে উড়তে গিয়ে ঠ্যাংই ভেঙ্গে ফেললেন! আরও কয়েকজন পাদ্রী এ বিষয় নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা করলেন। ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে অনেকটা এমনি ধরনের পরীক্ষা চালালেন ফাউস্তে ভেরানজিও, ফরাসী দেশে পরীক্ষা চালালেন এক ইংরেজ পাদ্রী, নাম এল্‌মেরাস্। বিশপ্ উইল্‌কিনস্ লিখলেনঃ আকাশে উড়বার যন্ত্র তৈরি হতে আর বেশি দেরী নেই।

ইটালির বোরেলি নামে এক বিজ্ঞানী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিষয়টা সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য চালান। পাখীদের ডানার মাংসপেশীর শক্তি পরীক্ষা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন যে মানুষ তার হাত-পায়ের জোরে পাখীদের মত আকাশে উড়তে পারবে কিনা। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এক তালা-চাবির কারিগর, নাম বেসনিয়ার, কৃত্রিম পাখার সাহায্যে মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বেলুন

বোরেলি এবং বেসনিয়ারের পরীক্ষার পর একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। এতদিন যে-সব পরীক্ষা হয়েছে তার অধিকাংশই হ'ল হাতে-পায়ে পাখা বেঁধে পাখীর মত আকাশে উড়বার চেষ্টা। গ্লোব বা বেলুনের সাহায্যে যে আকাশে ওঠা যায় সেটা ছিল নিতান্তই তাত্ত্বিক। কিন্তু বোরেলি এবং বেসনিয়ারের পরীক্ষায় বোঝা গেল, পাখীর মত ডানার সাহায্যে আকাশে ওড়া সম্ভব নয়। এর পর থেকেই বেলুনের সাহায্যে আকাশে ভ্রমণের পরীক্ষার কাজ চলতে থাকে। ১৭৬৯ খৃস্টাব্দে স্যর জর্জ কেলী তিমির হাড়, কর্ক এবং পাখীর পালক দিয়ে একটি প্রপেলার তৈরি করতে সমর্থ হন। এর কয়েক বছর পরে যোসেফ মাইকেল এবং জ্যাক্‌স্ ইটিয়েন মন্টগলফিয়ের কাগজ দিয়ে বেলুন তৈরি করে তার ভিতর ভরে দেন গরম হাওয়া। এ বেলুন হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা বলে আকাশে উড়ল। এই ধরনের একটি বেলুনে যুড়ে দেওয়া হ'ল একটি খাঁচা; খাঁচায় রাখা হ'ল একটি করে হাঁস, মুরগী ও ভেড়া। মাটির অধিবাসীদের মধ্যে এরাই হ'ল প্রথম আকাশযাত্রী। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর দুই ফরাসী যুবক পিলত্রে দ্য রোজিয়ার এবং মারকুইস্ দ্য অরলান্দেস্ এমনি একটি বেলুনে চড়ে মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ক্যাভেণ্ডিশ এবং ব্ল্যাক পরীক্ষা করে দেখালেন যে হাইড্রোজেন গ্যাসটি হাওয়ার চেয়ে অনেক হাল্‌কা। কাজেই এর পর থেকে গরম হাওয়ার বদলে হাইড্রোজেন দিয়ে বেলুন ভর্তির কাজ চলতে লাগল। বেলুন চালনা করা, দিক্

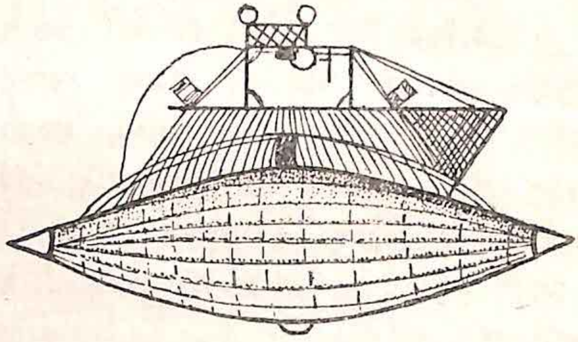


রোজিয়ার ও অরলান্দেস্-এর বেলুন

পরিবর্তন করা, প্রয়োজনমত মাটিতে নামিয়ে আনা প্রভৃতি কাজগুলির জন্য নানা ব্যবস্থা যুক্ত হ'ল বেলুনে। বেলুনের চেহারায়ও হ'ল নানা পরিবর্তন। ফরাসী দেশের রবার্ট ভ্রাতৃদ্বয় তৈরি করলেন মাছের আকৃতিবিশিষ্ট বেলুন, লেনক্স বানালেন চোঙের আকারের বেলুন, জিফার্ডের বেলুনের আকৃতি ছিল বার্মা চুরুটের মত। কোন কোন বেলুন চালাবার জন্যে বেলুনের সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল বাষ্পচালিত যন্ত্র। বেলুন তৈরির কাজে এ সময়ে ব্যবহৃত হ'ত রেশমের কাপড়। হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করতে গেলে বেলুন তৈরির খরচ বেশি পড়ে, তাই অনেকে বেলুন ভর্তির জন্যে কোল গ্যাস ব্যবহার করতে লাগল, এটাও বাতাসের চেয়ে হাল্‌কা। এমনি ভাবে তৈরি নানা ধরনের বেলুনে অনেকেই আকাশে উড়ল, ছোটখাটো অনেক অভিযানও চলল। এই জাতীয় আকাশযানের নাম দেওয়া হ'ল উড়োজাহাজ বা এয়ারশিপ্।

যুদ্ধের কাজে উড়োজাহাজ

শীগ্‌গিরই এই জাতীয় আকাশযানের দিকে দৃষ্টি পড়ল সৈন্যবাহিনীর। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশ এবং অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ফরাসী বাহিনী বহু বেলুন ব্যবহার করেছিল লড়াইএর কাজে। এ সব বেলুনে চড়ে খুব উঁচু থেকে শত্রুসৈন্যের অবস্থিতি জানা খুবই সহজ হয়েছিল। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করেছিলেন তখন মস্কো রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যবাহিনী একটি বেলুন তৈরি করেছিল যুদ্ধের



জিফার্ডের বেলুন

কাজে লাগাবার জন্যে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়েও বেলুনবাহিনী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধেও এই বেলুন নানা উপকারে লেগেছে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বেলুনে করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব হ'ল। এর পরে বেলুনে চড়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ইয়োরোপের নানা দেশে যাতায়াত একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে

দাঁড়াল। গ্রীন নামে এক ভদ্রলোক ১৮ ঘণ্টায় ৫০০ মাইল অতিক্রম করে বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেন। এর পরে একজন আমেরিকাবাসী, নাম ওয়াইজ, বেলুনের সাহায্যে ১৯ ঘণ্টায় অতিক্রম করলেন ৯০০ মাইল।

কত উঁচুতে ওঠে বেলুন ?

ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধের ঠিক আগে দুই ইংরেজ, নাম গ্লেইজার এবং কক্সওয়েল, বেলুনে ৩৬ হাজার ফুট (প্রায় সাত মাইল) ওপরে উঠেছিলেন। এত উঁচুতে বায়ু ভীষণ পাতলা। ফলে গ্লেইজারের চোখ এবং কান থেকে রক্ত পড়তে শুরু করে, সমস্ত শরীরে তিনি অসহ্য ব্যথা অনুভব করতে থাকেন এবং হাত-পা তাঁর অবশ হয়ে যায়। বেলুনটি তখনও ওপরে উঠছিল। কক্সওয়েল তখনও খানিকটা সুস্থ ছিলেন। তিনি অতি কষ্টে ভাল্‌ভ্‌ খুলে দিয়ে বেলুন থেকে কিছু গ্যাস বের করে দিতে সমর্থ হন। ফলে বেলুনটি নীচে নেমে আসে এবং গ্লেইজার ও কক্সওয়েল প্রাণে বেঁচে যান। এর কয়েক বছর পরে ২৯ হাজার ফুট উঁচুতে উঠতে গিয়ে তিন ফরাসী আকাশচারীর মধ্যে দু'জন প্রাণ হারান। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধারণতঃ ১৬ হাজার ফুট ওপরে উঠলেই প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাবে স্বাভাবিক শ্বাসকার্য ব্যাহত হয়।

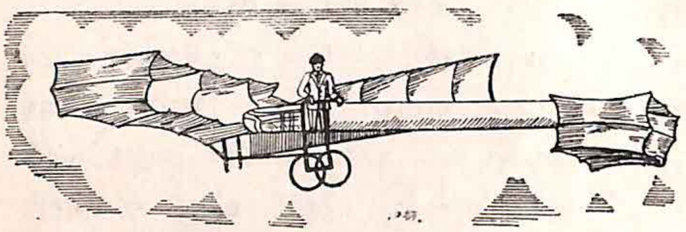
ক্রমে পৃথিবীর সব দেশেই এই ধরনের আকাশযান বা উড়োজাহাজের প্রচলন হতে থাকে। চীন এবং ভারতবর্ষে বেলুন-যান বা উড়োজাহাজের প্রচলন করেন স্পেন্সার ভাইএরা।

একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। সুইডেনের এক এঞ্জিনীয়ার সলোমন আগস্ট অ্যানড্রি মনস্থ করলেন যে তিনি বেলুনে চড়ে উত্তর মেরুতে একটি অভিযান চালাবেন। তৈরি হ'ল এক বিরাট বেলুন। যথাসময়ে আরও দু'জন সঙ্গী এবং প্রয়োজনীয় খাবারদাবার নিয়ে তিনি তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানে রওনা হয়ে পড়লেন। কিন্তু রওনা হয়ে যাওয়ার পর আর তাঁদের কোন খবরই পাওয়া গেল না। এর তেত্রিশ বছর পরে যন্ত্রপাতি-সমেত এই তিন অভিযাত্রীর মৃতদেহ পাওয়া গেল হোয়াইট আয়ার্ল্যাণ্ডে।

বেলুন চালানোর যন্ত্রপাতি

হেনরি জিফার্ড বাষ্পচালিত যন্ত্র (স্টিম্ এঞ্জিন) লাগানো একটি বড় বেলুনে চড়ে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে অভিযান চালান। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে যন্ত্রটি ঘণ্টায় ছ' মাইল বেগে চালিয়ে নেয় বেলুনটিকে। পরীক্ষাটি সফল হ'ল ঠিকই, কিন্তু বেলুনের গতিবেগ আশানুরূপ হ'ল না। তা ছাড়া বাষ্পচালিত যন্ত্রটি ছিল রীতিমত ভারী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে একটি বিদ্যুৎচালিত যন্ত্র যুক্ত করা হ'ল বেলুনের সঙ্গে। আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। বেলুনের গতিবেগ হল ঘণ্টায় তেরো মাইল। এর পরে বেলুনের সঙ্গে যুক্ত হ'ল গ্যাসোলিন-চালিত যন্ত্র। এতে বেলুনের গতিবেগ বেশ বেড়ে গেল। তা ছাড়া ক্রমে বেলুনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের কাজ অনেক নিখুঁত হ'ল। অ্যালবাতো স্যান্‌তোস দুমোঁ একে একে গ্যাসোলিন-চালিত এঞ্জিনযুক্ত বেলুন তৈরি করলেন চৌদ্দটি। এরই একটি বেলুনের সাহায্যে আধ ঘণ্টায় প্যারিসের



স্যান্তোস দুমোঁর আকাশযান

ঈফেল টাওয়ারের ওপর চক্রাকারে ঘুরে কুড়ি হাজার ডলার পুরস্কার লাভ করেন দুমোঁ।

জেপেলিন

জার্মানীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন কাউণ্ট ফার্ডিনাণ্ড ফন্ জেপেলিন। এতদিন বেলুন তৈরি করা হ'ত রেশমী কাপড় দিয়ে। জেপেলিন বেলুন তৈরি করলেন অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে আর বেলুনের ভিতরটা ভাগ করলেন কতগুলি প্রকোষ্ঠে বা কামরায়। এগুলিতে পুরে দেওয়া হ'ল গ্যাসভর্তি থলে। বেলুনের সঙ্গে যুক্ত করা হ'ল দু'টি আলাদা কামরা—একটি যন্ত্রপাতির জন্যে, অন্যটি যাত্রীদের জন্যে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক আগে এই জাতীয় আকাশযান হাজার হাজার যাত্রী বহন করে কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কাউণ্ট জেপেলিনের নাম অনুসারে এই জাতীয় উড়োজাহাজের নাম দেওয়া হয়েছিল জেপেলিন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জেপেলিন এবং অন্যান্য উড়োজাহাজ যুদ্ধের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। শত্রুসৈন্যের উপর বোমাবর্ষণ, অবরুদ্ধ অঞ্চল থেকে সৈন্য অপসারণ, খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ প্রভৃতি কাজগুলি সুন্দর ভাবে করা হয়েছে এই সব উড়োজাহাজের সাহায্যে।

যুদ্ধের পরে অবশ্য অন্য ধরনের আকাশযান এসে বেলুন জাতীয় আকাশযানকে ক্রমে ক্রমে হটিয়ে দিয়েছে আকাশ থেকে। তবে জেপেলিন জাতীয় আকাশযান যুদ্ধের পরেও বেশ কিছুদিন ধরে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে একটি বৃটিশ আকাশযান (আর-৩৪) আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা পৌঁছতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে সমর্থ হয়। গ্র্যাফ জেপেলিন নামে আর একটি আকাশযান একুশ দিনে পৃথিবীর চারদিকে এক পাক ঘুরে আসে। তারপরে এটি জার্মানী এবং দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে যাত্রীবহন কার্যে নিযুক্ত হয়।

হাইড্রোজেনের বদলে হিলিয়াম

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আরও একটা বিষয়ে বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা আকাশযানের উন্নতি ঘটে।



এই জেপেলিনটি সর্বপ্রথম আটলাণ্টিক পাড়ি দেয়।

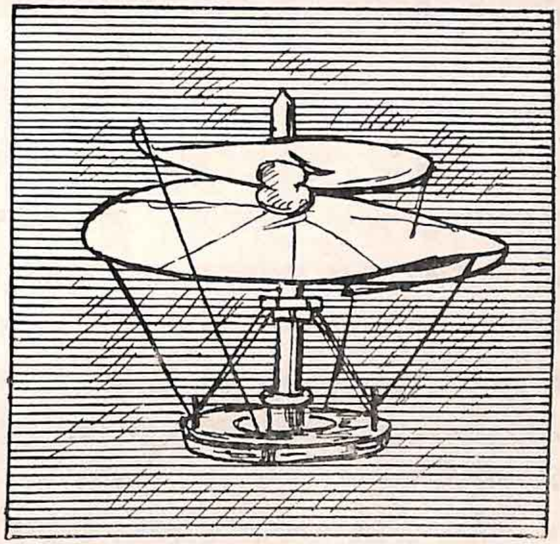
এতদিন ধরে বেলুন ভর্তির কাজে ব্যবহৃত হ'ত হাইড্রোজেন গ্যাস। কিন্তু হাইড্রোজেনে সহজেই আগুন ধরে যায়। প্রকৃতপক্ষে এই গ্যাসে আগুন ধরে বহু উড়োজাহাজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, বহু জীবনহানি ঘটেছে। ইতিমধ্যে হিলিয়াম নামে আর একটি খুব হাল্‌কা গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটিতে আগুন ধরে না। ফলে হাইড্রোজেনের বদলে বেলুন ভর্তির কাজ চলতে লাগল হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে।

নানা রকম উন্নতি সত্ত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কিন্তু বেলুন জাতীয় আকাশযান এক রকম ব্যবহার করা হয়ই নি, যদিও যুদ্ধের আগে পর্যন্ত কিছু কিছু ব্যবহার করা হ'ত। এ সময় আকাশে বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা এবং বায়ুর চেয়ে ভারী হু'টো আকাশযানেরই আধিপত্য ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বেলুন জাতীয় অর্থাৎ হাল্‌কা আকাশযান যাত্রীবহনের কাজে আকাশের বুক থেকে বিদায় নিল চিরদিনের জন্য। তবে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনুরূপ কোন কোন কাজে বেলুনের ব্যবহার এখনও অল্পস্বল্প রয়ে গেছে।

বায়ুর চেয়ে ভারী আকাশযান

গরম হাওয়া, হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম ভর্তি করে আকাশযানকে হাল্‌কা করা হয়। এর ফলে আকাশযানটি আপনা-আপনি আকাশে উঠে যেতে পারে। কিন্তু আকাশযানটি যদি বায়ুর চেয়ে ভারী হয়, তবে তা আকাশে ওঠাতে হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কি সে ব্যবস্থা? সে ব্যবস্থার কথা বলবার আগে এ জাতীয় আকাশযান আধুনিক অবস্থায় আসবার আগে কত লোকের কত অধ্যবসায়, কত পরিশ্রম যে দরকার হয়েছে তা শুনলে অবাক্ হতে হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে আজকাল আকাশপথে যে নানা আকার-আকৃতির আকাশযান দেখা যায় তা সবই হ'ল বায়ুর চেয়ে ভারী আকাশযান।

ইংরেজ বিজ্ঞানী রোজার বেকনের কথা আগেই বলা হয়েছে। বেকনের অনেক বছর পরে ইটালির লিওনার্দো দা ভিঞ্চি একটি আকাশযানের চিত্র এঁকে দেখিয়েছিলেন ভবিষ্যতের আকাশযান কি রকমটি হবে। জর্জ কেলী, মেরি লে ব্রিস্ প্রভৃতিও এ সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্য করেছেন। তবে এ সম্বন্ধে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করেছেন জার্মান দেশের অটো লিলিয়েনথাল। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে তিনি যে বায়ুর চেয়ে ভারী আকাশযানটি তৈরি করেন তাতে যুক্ত ছিল বাদুড়ের মত হু'টি পাখনা, আর মাঝামাঝি



আকাশজয়ের ইতিহাসে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির দান বড় কম নয়। তিনি যে আকাশযানের পরিকল্পনা করেছিলেন তা তৈরি হলে দেখতে হ'ত এ-রকমটি।

জায়গা থেকে ঝোলানো ছিল একটি ছোট খাঁচা। সেখানে বসে চালক পায়ের সাহায্যে যন্ত্রটি চালাতে পারেন—যেমন করে সাইকেল চালায় কোন সাইকেল-আরোহী। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে এ রকম একটি আকাশযান চালাতে গিয়ে লিলিয়েনথাল মৃত্যুবরণ করেন।

গ্লাইডার ও এরোপ্লেন

লিলিয়েনথালের প্রদর্শিত পথে আকাশযান

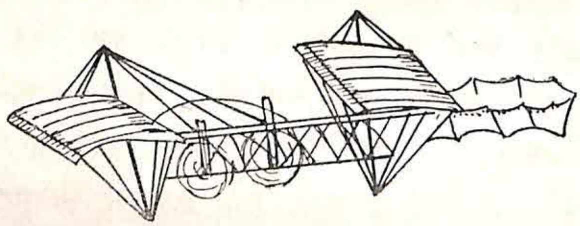
তৈরি করে তার অনেক উন্নতি করেন ইংল্যাণ্ডের পার্সি. এস. পিলচার এবং আমেরিকার অক্‌টেভ ক্যানিউট। ক্যানিউট একটি খাড়া লেজ যুক্ত করেন তাঁর আকাশযানে। এতে আকাশযানের সোজা পথে চলার সুবিধা হ'ল। পাখনাযুক্ত এই সব আকাশযানকে বলা হয় গ্লাইডার। এ সম্বন্ধে বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেটের দুই ভাই—অরভিল ও অলিভার রাইট। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যে গ্লাইডার তৈরি করলেন তা তাঁদের পূর্ববর্তী গ্লাইডার থেকে আলাদা। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের আকাশযান নিয়ে অনেকবার আকাশভ্রমণ করে আসেন। তবে আজকের দিনে আকাশভ্রমণ বলতে যা বোঝায় তাঁদের ভ্রমণ যে সে রকম ছিল না তা বলাই বাহুল্য। এঁদের আকাশ-ভ্রমণের সময়টা কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র বারো সেকেণ্ড, দূরত্ব ১২০ ফুট মাত্র।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয় দেখলেন যে সেকালের গ্যাসোলিন-চালিত এঞ্জিন খুবই ভারী—তাঁদের আকাশযানে যুক্ত করবার উপযুক্ত নয়। কাজেই তাঁরা নিজেরাই হাল্‌কা গ্যাসোলিন-এঞ্জিন তৈরি করে নিলেন তাঁদের আকাশযানের জন্যে। সব ব্যবস্থা পাকা করে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা তাঁদের আকাশযান নিয়ে আকাশভ্রমণের অনেক পরীক্ষা করলেন। যন্ত্রচালিত তাঁদের এই আকাশযানের নাম দেওয়া হ'ল এরোপ্লেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এঁরা যে আকাশভ্রমণ করেন তার স্থায়িত্ব ছিল আধ ঘণ্টা, দূরত্ব ছিল ২৫ মাইল।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ্ অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. ল্যাংলে এবং তাঁর সহকারী ম্যানলে গ্যাসোলিন-চালিত যন্ত্রযুক্ত আকাশযান নিয়ে আকাশভ্রমণের পরীক্ষা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ল্যাংলের এ পরীক্ষা সফল হয় নি। অবশ্য কয়েক বছর পরে গ্লেন কার্টিজ ল্যাংলের আকাশযানের কিছু উন্নতিসাধন করে পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেন।

এরই কাছাকাছি সময়ে (১৯০৯ খৃষ্টাব্দে) ফরাসী দেশের লুই ব্লেরিয়ো ৩৭ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন তাঁর এরোপ্লেনে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এরোপ্লেন ব্যবহার করে যুদ্ধরত জাতিগুলি বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। সকলেই



ল্যাংলের আকাশযান

বুঝতে পারে যে দ্রুতগামী যানবাহন হিসেবে এরোপ্লেন ভবিষ্যতে অনেক অসাধ্যসাধন করতে সমর্থ হবে। যুদ্ধের কয় বছরে এরোপ্লেনের অনেক উন্নতিসাধনও সম্ভব হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে

যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের আগে যে সব এরোপ্লেন তৈরি হয়েছিল তাদের কোন কোনটিতে থাকত একজোড়া পাখা, নাম মোনোপ্লেন। কোন কোনটিতে থাকত দু'জোড়া পাখা, এদের নাম বাই-প্লেন। আবার অনেক উড়োজাহাজে থাকত তিনজোড়া পাখা, এগুলির নাম

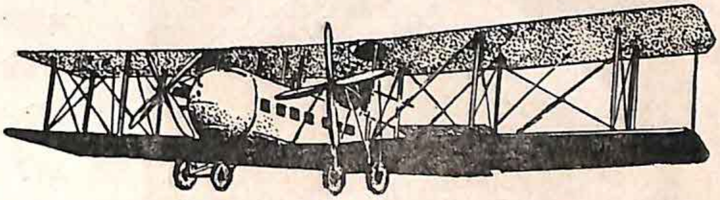
ট্রাইপ্লেন। এই সব এরোপ্লেনের চেহারাও ছিল কিম্ভূতকিমাকার। যুদ্ধের সময় থেকে শুরু করে এরোপ্লেনের আকার-আকৃতি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতিতে বহু রকম পরিবর্তনের পর আজকের দিনের এরোপ্লেনে এসে পৌঁছেছে।

চেহারা যেমন বদলেছে তেমনি গতিবেগও বেড়েছে, যাত্রীদের নানা সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হয়েছে, আকাশভ্রমণ হয়েছে আরও বিপন্মুক্ত। কিন্তু এ কাজ যে এক-দিনে হয় নি তা বলাই বাহুল্য।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার একখানা এরোপ্লেন এন. সি. ৪ নিউইয়র্ক থেকে ইংল্যাণ্ডের প্লাইমাউথ শহরে আসতে সমর্থ হয়েছিল। এক মাস পরে ইংল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন অ্যালকক্ এবং লেফটেন্যাণ্ট ব্রাউন কোথাও একবারও না থেমে এরোপ্লেনে আটলাণ্টিক পাড়ি দিয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর বাড়তি এরোপ্লেন-গুলো বিক্রি করে দেওয়া হ'ল। এ সব কিনে নিলেন যুদ্ধকালীন বিমান-চালকেরা। নানা দেশে বহু বিমান কোম্পানীর পত্তন হ'ল। রীতিমত ডাক ও যাত্রীবহনের কাজ শুরু হয়ে গেল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে চার্লস লিণ্ডবার্গ নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসে এসে হাজির হলেন ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে তাঁর উড়োজাহাজ চালিয়ে। এতে তাঁর সময় লেগেছিল ৩৩ ঘণ্টা। আকাশযানের আরও নানা রকম উন্নতি হতে লাগল। মালপত্র আনা-নেওয়া, ডাক-চলাচল, যাত্রীবহন—সব রকম কাজই চলতে লাগল এরোপ্লেনের সাহায্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

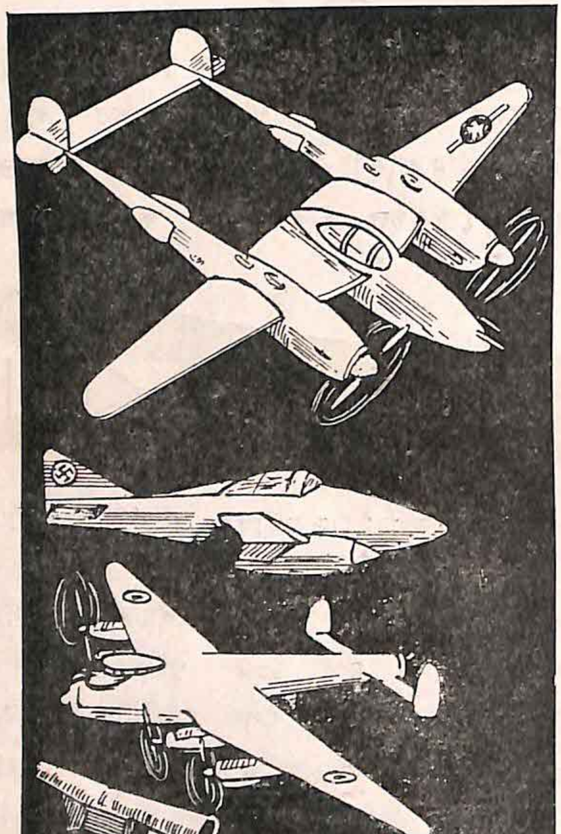
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নানাভাবে উড়ো-জাহাজের উন্নতি হতে থাকে। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান বাহিনী যে সব ক'টি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পেরেছিল তার প্রধান কারণই হ'ল



প্রথম যুগের যাত্রীবাহী একখানা উড়োজাহাজ। এটি পঁচিশজন যাত্রী বহন করতে পারত।

তাদের উন্নত ধরনের আকাশযান। ফরাসী বাহিনীর পতন ঘটে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। এরপর ইংল্যাণ্ডের শহরগুলির ওপর জার্মানীর বিমান-আক্রমণ এত তীব্র হয়ে ওঠে যে ইংল্যাণ্ডবাসীরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে বাধ্য হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। আমেরিকার বিমানশিল্প উল্লেখ করবার মত। সেখানে তৈরি হতে লাগল নানা ধরনের বিমান—বম্বার, ফাইটার, যাত্রীবাহী বিমান, মালবাহী বিমান প্রভৃতি। যুদ্ধের শেষভাগে আবিষ্কৃত হ'ল জেট-চালিত বিমান। সাধারণ বিমান চলে প্রপেলার ঘুরিয়ে, ঘোরানোর কাজ করা হয় শক্তিশালী পেট্রোল-এঞ্জিনের সাহায্যে। কিন্তু জেট-চালিত বিমানে কাজটা করা হয় সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। এ সম্বন্ধে আমরা পরে বলছি।

জার্মানীর ভি-১, ভি-২ প্রভৃতি আরোহীশূন্য জেট বিমান তো ইংল্যাণ্ডকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। তীব্র বিস্ফোরক-ভর্তি এই ছোট ছোট বিমানগুলি ছাড়া হ'ত ইংলিশ



বিভিন্ন কাজের জন্য নানা আকার ও আকৃতির বিমান

চ্যানেলের ওপার থেকে ইংল্যাণ্ডের কোন নির্দিষ্ট শহরকে তাগ করে। নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করে তীব্র বিস্ফোরণ ঘটাত এই সব অস্ত্র। 'প্রতিশোধের অস্ত্র' কথাটির জার্মান প্রতিশব্দের প্রথম অক্ষরটি হ'ল 'ভি'। জার্মানরা তাই এই অস্ত্রের নাম রেখেছিল ভি-১, ভি-২ ইত্যাদি।

আরো—আরো—আরো উন্নতি

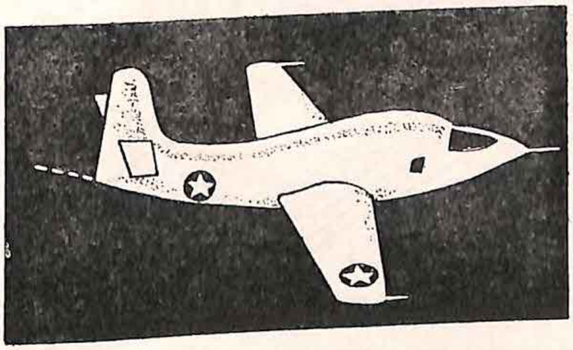
যুদ্ধ থেমে গেলে জেট-চালিত বিমানের বহু রকম উন্নতি সাধিত হয়। তাদের আকার, আকৃতির নানা পরিবর্তন ঘটে, গতিবেগ অসম্ভব রকম বেড়ে যায়। আজকাল যে বিরাট বিরাট বিমানগুলো শতাধিক যাত্রী নিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেগুলোর সবই হ'ল জেট বিমান। তা ছাড়া জেট বিমানের তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে যে বিশেষ ধরনের মহাকাশযান তৈরি করা সম্ভব হয়েছে তারই সাহায্য নিয়ে মানুষ আজ হাজির হয়েছে চাঁদের বুকে, পাড়ি দিচ্ছে মহাকাশের বিভিন্ন এলাকায়। কি করে তা সম্ভব হ'ল তা এই বই-এর অন্যত্র বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৫)।

আজকাল কত রকমের বিমানই না আকাশ-পথে উড়ে বেড়ায় নানা কাজের জন্য! এক এক কাজের জন্য এক এক রকমের বিমান। নামেরও রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। যুদ্ধে যে সমস্ত বিমান ব্যবহৃত হয় সেগুলো সাধারণতঃ হাল্‌কা ধরনের এবং তীব্র গতিসম্পন্ন হয়। অবশ্য বম্বার প্লেনের (যে বিমান থেকে বোমা ফেলা হয়) চেহারা নিতান্ত ছোটখাটো নয়।

যত রকমের বিমান দেখা যায় তার মধ্যে সম্ভবতঃ আমেরিকার সুপার জেট বিমানই আকারে সবচেয়ে বড়। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার জন্যে এর ভিতরে সব রকম ব্যবস্থাই থাকে। এ ধরনের একখানা বিমান হচ্ছে বোয়িং ৭৪৭। ওজনে ৭,১০,০০০ পাউণ্ড, লম্বায় ২৩১ ফুট।

মাটিতে দাঁড়ালে এর লেজের উচ্চতা। একটা পাঁচতলা বাড়ীর উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে যায়। এই বিমানটিতে ৪৯০ জন যাত্রী আরাম করে বসে, শুয়ে যাতায়াত করতে পারে। এ রকম একখানা বিমান তৈরি করতে কত খরচ পড়ে? প্রায় ছু' কোটি ডলার। টাকার হিসেবে বলতে গেলে প্রায় ১৬ কোটি টাকা আর কি!

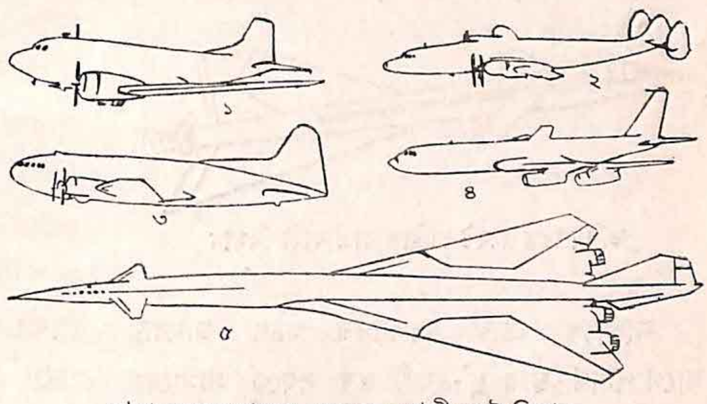
বর্তমান কালে যে-সব দেশ বিমান তৈরির ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা দেশটি হ'ল আমেরিকা। তা ছাড়া রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফরাসী, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও এ বিষয়ে বেশ সুনাম আছে। আমাদের দেশেও বিমান তৈরির কারখানা বসেছে এবং সেখানে বিমানের বিভিন্ন অংশ, এমন কি গোটা বিমানও তৈরি হচ্ছে। শেষ বারের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে ভারতে তৈরি ন্যাট্ বিমান যে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন করেছিল সে খবর হয়তো সকলেরই জানা।



রকেট-চালিত এই বিমানখানাই সর্বপ্রথম শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়তে পেরেছিল।

বিমানের গতিবেগ

প্রথম যে উড়োজাহাজ আকাশে উড়েছিল তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ছ'মাইল মাত্র। আর আজ একখানা বোয়িং জেট বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় ১,৭০০ মাইল। ভাবতে অবাক্ লাগে বই কি! শব্দের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ১,১২০ ফুট, ঘণ্টায় প্রায় ৭৫০ মাইল। এবারে



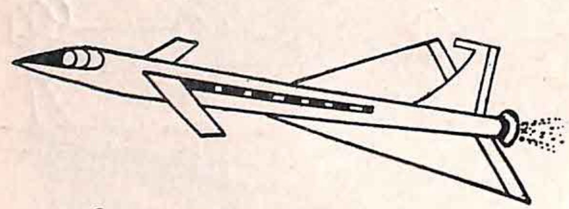
নানা ধরনের শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী জেট বিমান

ভেবে দেখ, আধুনিক একখানা বিমানের গতিবেগের কথা! শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী এই বিমানকে বলা হয় সুপারসোনিক বিমান।

বিমানের অদ্ভুত গতিবেগের জন্য আজ পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে! খুব সকালে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বম্বেতে প্রাতরাশ সেরে, ছুপুরের খাবার খাওয়া চলবে মিশরের কায়রোতে। তারপর সন্ধ্যার মধ্যে লণ্ডন পৌঁছে যাওয়া আজ আর কল্পনার ব্যাপার নয়, এ আজ বাস্তব সত্য। তারপর শেষ রাতে আমেরিকার নিউইয়র্কে পৌঁছে গরম এক কাপ্ কফি পান করে শরীরটা চাঙ্গা করে নেওয়া চলতে পারে। অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা থেকে একেবারে নিউইয়র্ক।

বিমান আকাশে ওড়ে কি ভাবে ?

আধুনিক একখানা বিমানে থাকে নানা রকমের যন্ত্রপাতি। তবে এর মধ্যে দু'ধরনের যন্ত্রই হ'ল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র—যে-সব যন্ত্রের সাহায্যে বিমান আকাশে ওড়ে, আর যে-সব যন্ত্রের সাহায্যে বিমান সামনে এগিয়ে চলে।

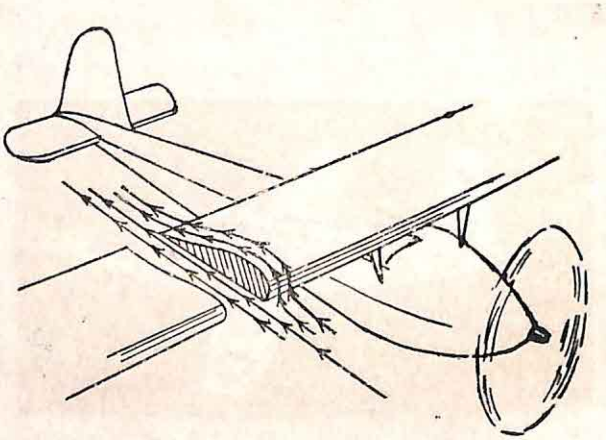


ভবিষ্যতের রকেট-চালিত যাত্রীবাহী বিমান

আকাশে ওঠার যন্ত্রপাতির গঠন জানবার আগে পদার্থবিদ্যার দু'-একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হতে হবে। পদার্থবিদ্যায় বারনৌলির তত্ত্ব নামে একটি তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্ব অনুসারে আমরা জানি যে কোন তরল বা বায়বীয় পদার্থের গতিবেগ বাড়লে সেখানে চাপ কমে যায়, আর গতিবেগ কম হলে চাপ যায় বেড়ে। মনে করা যাক একটি নলের ভিতর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। নলের একটা জায়গা একটু সরু। পরীক্ষায় দেখা যায়, যেখানটা সরু সেখানে জলের গতিবেগ বেশি। তার মানে সেখানে জলের চাপ বেশ কম। আবার নলের যেখানটা মোটা সেখানে জলের গতিবেগ কম, ফলে চাপ বেশি। বারনৌলির এই তত্ত্বের ওপর নির্ভর করে বহু যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এবং সে-সব নানা কাজে লাগছে। সাধারণ একটি যন্ত্রের কথা উল্লেখ করছি। আরশোলা, মশা, মাছি প্রভৃতি মারার ওষুধ ছড়ানো হয় যে স্প্রেয়ারের সাহায্যে তার মধ্যেও রয়েছে বারনৌলির তত্ত্বেরই প্রয়োগ।

বিমান যে আকাশে উঠে যায় তারও মূল কথা এখানেই। বিমানের ওপরে ওঠাকে বিমানবিদ্যার ভাষায় বলে 'লিফ্‌ট্'। কাজটি করে বিমানের পাখা। পাখার উপরিতল থাকে বাঁকানো, ইংরেজিতে বলে ক্যামবার্ড, নীচের তল থাকে সাধারণতঃ সোজা। তা ছাড়া পাখার সামনের দিক্‌টা থাকে মোটা, পিছনের দিক্‌টা সরু। মাটির ওপর দিয়ে যখন বিমান ছুটতে থাকে তখন পাখার ওপর-নীচে বায়ুর ঝাপ্‌টা লাগে। উপরিতল বাঁকানো বলে সেখানে ঝাপ্‌টার গতিবেগ নীচের তলের বায়ুর চেয়ে বেশি। ফলে পাখার ওপরে বায়ুর চাপ হয় কম। পাখার নীচের দিকে বায়ুর চাপের কিন্তু তেমন তারতম্য হয় না। ফলে ওপরের চাপ কম এবং নীচের চাপ বেশি বলে বিমান আকাশে উঠে যায়।

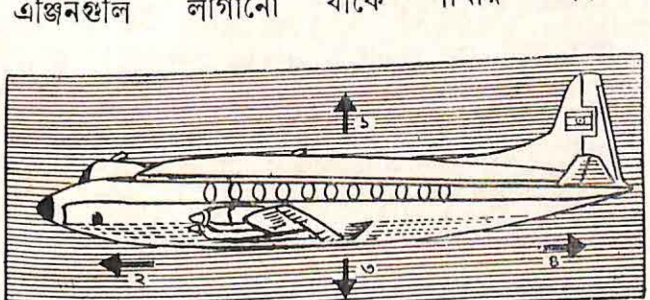
আকাশে উঠে বিমান যখন সামনের দিকে



পাখার নীচে বায়ুর চাপ বেশি, তাই বিমানটি মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে পারে, ভেসে থাকতে পারে সেখানে।

এগোতে যায় তখন বায়ু তাকে বাধা দেয়। তা ছাড়া রয়েছে পৃথিবীর অভিকর্ষ। এই তু'টি বাধার জন্যই বিমানখানা নীচে নেমে আসতে চাইবে। বিমানবিদ্যার ভাষায় এই বাধাদানকে বলা হয় 'ড্র্যাগ্'। এই বাধা অনেকটা কমিয়ে আনা যায় বিমানকে মাছের মত আকৃতি দান করে। আর এক রকমের বাধা আছে যাকে বলা হয় 'স্কিন ফ্রিকশন', অর্থাৎ বিমানের দেহের ওপর বায়ুর বাধা। দেহটি যথাসাধ্য মসৃণ করলে এই ধরনের বাধা অনেক কম হয়।

দ্বিতীয় অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রসমষ্টি হ'ল মোটর। সাধারণ মোটরগাড়ীতে যে ধরনের পেট্রোল-এঞ্জিন ব্যবহার করা হয় বিমানেও ব্যবহার করা হয় সেই ধরনেরই এঞ্জিন, তবে খুবই উন্নত ধরনের। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০৫-৮০৭)। তা ছাড়া বিমানে ব্যবহৃত পেট্রোল-এঞ্জিন খুবই হাল্কা হয়ে থাকে। একখানা বিমানে এ ধরনের পেট্রোল-এঞ্জিন ব্যবহার করা হয় এক থেকে আটটি পর্যন্ত। হাল্কা বিমানে এঞ্জিন লাগানো হয় বিমানের সামনের দিকে, ভারী এবং বড় বিমানের এঞ্জিনগুলি যুক্ত করা হয় পাখার সঙ্গে। জলে এবং শূন্যপথে চলতে পারে যে-সব বিমান তার এঞ্জিনগুলি লাগানো থাকে পাখার ওপর দিকে। বলা বাহুল্য, বিমানে ব্যবহৃত এঞ্জিনগুলি উচ্চশক্তিসম্পন্ন। সাধারণ বিমানে এই এঞ্জিন চালায় প্রপেলার নামে একটি পাখাকে। এটি ঘুরলেই বিমান এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

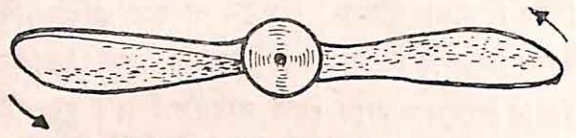


১। লিফ্ট ২। ঘাত ৩। অভিকর্ষ ৪। বায়ুর বাধা

বিমানের বিভিন্ন অংশ

যে কোন একখানা বিমানে সাধারণতঃ পাঁচটি অংশ থাকে। সেগুলি হ'ল: (১) পাখা, (২) প্রধান দেহ বা ফিউজিলেজ, (৩) প্রপেলার বা এয়ার স্ক্রু, (৪) লেজের অংশ বা টেলপ্লেন, এবং (৫) পরিচালনার অংশ বা কণ্ট্রোল সারফেস্। বিমানের দেহের ফিউজিলেজের ওপরই সব রকম ভার পড়ে। প্রপেলার যন্ত্রই বিমানকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। টেলপ্লেনের অনুভূমিক অংশকেই সাধারণতঃ টেলপ্লেন বলা হয়, লেজের অন্য অংশগুলি দরকার মত এদিক্-ওদিক্ নাড়ানো যায়। এদের নাম এলিভেটর। লেজের যে অংশটি খাড়া ভাবে থাকে তাকেই বলে রাডার। পাখার পেছনের অংশও যান্ত্রিক উপায়ে নাড়াচাড়া করা যায়। এদের নাম অ্যালেরনস্। পাখার এই সব অংশ, হাল এবং এলিভেটর প্রভৃতির সাহায্যে প্রয়োজনমত বিমানকে ওপরে ওঠানো যায়, নামানো যায় নীচের দিকে; ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরানোও যায়। প্রপেলার প্রতি মিনিটে প্রায় তু' হাজার বার ঘুরে বিমানকে চালিয়ে নিয়ে যায়। সাধারণ একটি স্ক্রু যেমন ঘুরে ঘুরে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করে, প্রপেলারের কাজও অনেকটা সেই রকমই।

বিমান-চালক বা পাইলট বসেন বিমানের একেবারে সামনের দিকে



সাধারণ একটি স্ক্রু যেমন ঘুরে ঘুরে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করে, প্রপেলারের কাজও অনেকটা সেই রকমই।

একটি ঘরে। ঘরটির নাম ককৃপিট্। সহ-কারী বিমানচালকও তাঁর পাশে বসেন। এঁদের সামনে থাকে যন্ত্রপাতি চালানোর ব্যবস্থাদি। চালানোর কাজ সবই করা হয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। মোটামুটি বড় আকারের যাত্রীবাহী একখানা বিমানে প্রায় দু'শ, রকম বা তারও বেশি কলকজা থাকে। এর সবগুলিই পরিচালনা করেন বিমান-চালক বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে। পাইলটের সামনে থাকে বহু রকমের ছোট ছোট চাকতি। এর কোনটা বিমানের গতিবেগ মাপবার জন্যে, কোনটা বিমানের উচ্চতা নির্দেশ করবার জন্যে, কোনটা বায়ুর চাপ মাপবার জন্যে, কোনটা দিক্ নির্ণয়ের জন্যে, কোনটা তেলের চাপ মাপবার জন্যে ইত্যাদি।

জেট বিমান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে জেট নামে এক নতুন ধরনের বিমানের আবিষ্কার হ'ল। সাধারণ বিমান এগিয়ে চলে প্রপেলারের সাহায্যে, কিন্তু এই নতুন ধরনের বিমানে কোন প্রপেলার নেই।

মহাবিজ্ঞানী নিউটনের তিনটি গতিসূত্রের একটি হ'ল যে প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি প্রতি-ক্রিয়া আছে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হবে সমান সমান এবং বিপরীতমুখী। যাদের বন্দুক ছোঁড়ার অভ্যাস আছে তাদের জানা আছে যে বন্দুক থেকে গুলি যখন বেরিয়ে যায় তখন পেছন দিকে একটা ধাক্কা লাগে। এর কারণ হ'ল ওই গুলি ছোঁড়ার প্রতিক্রিয়া। একটি খেলনা বেলুনে হাওয়া পুরে যদি মুখ-খোলা অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে সেটি জোরে লাফিয়ে উঠে ছুটে চলেছে। বেলুনের মুখ দিয়ে যখন হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে তখন যেদিকে হাওয়া বেরোবে তার উল্টো দিকে একটা ধাক্কা লাগবে। এর ফলেই বেলুনটি, যতক্ষণ না সব হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ, উল্টো দিকে ছুটবে। এও সেই নিউটনের আবিষ্কৃত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই ফল।

জেট প্লেনের ক্ষেত্রেও অনেকটা এই রকম ব্যাপারই ঘটে। একটি লম্বা নলের মধ্যে খুব বেশি চাপে হাওয়া ভর্তি করে তা সরু পথে বের করে দেওয়া হয়। হাওয়া তীব্র বেগে বেরিয়ে যায় প্লেনের পেছন দিক্ থেকে। হাওয়ার এই পশ্চাৎগতির জন্যে বিমান সামনের দিকে গতি পায়। এই কৌশলকে বলা হয় জেট প্রপাল্‌শন্।

জেট প্লেনের এঞ্জিনে থাকে তিনটি প্রধান অংশ। কম্প্রেসার যন্ত্রটি লাগানো থাকে বিমানের সামনের দিকে। এটি হাওয়া টেনে নেয় দহন-প্রকোষ্ঠ বা কম্‌বাস্‌শন্ চেম্বারের মধ্যে। এখানে বায়ুর চাপ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কমবাস্‌শন চেম্বারের উচ্চ চাপের হাওয়ার সঙ্গে জ্বালানী গ্যাসের মিশ্রণ ঘটিয়ে সেখানে দহন ঘটানো হয়। ফলে এখানকার গ্যাসের আয়তন যায় অনেক বেড়ে, চাপও বাড়ে অসম্ভব রকম। বিমানের পেছনের দিকে থাকে টারবাইন নামে একটি অংশ। এটি তীব্র গতিতে ঘুরতে থাকে। উত্তপ্ত এবং উচ্চ চাপবিশিষ্ট গ্যাস টারবাইনের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়,

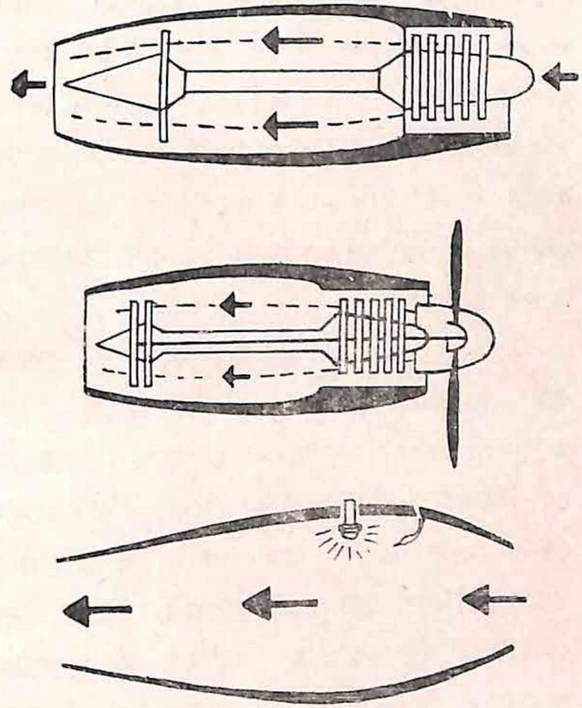
তারপর তা একটি সরু নল দিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে যায়। গ্যাসের এই পশ্চাৎগতিই বিমানকে দেয় অগ্রগতি।

নানা রকমের জেট বিমান

জেট বিমান প্রধানতঃ তিন রকম: টারবো জেট, প্রপ্ জেট এবং র‍্যাম্ জেট। ওপরে যে ধরনের এঞ্জিনের কথা বলা হয়েছে তার নাম হ'ল টারবো জেট এঞ্জিন। প্রপ্ জেট এঞ্জিনের গঠন টারবো জেটের মতই, তবে প্রপ্ জেট বিমানে বাড়তি থাকে প্রপেলার। কম্প্রেসার এবং প্রপেলার ছ'টোই ঘোরে টারবাইনের সাহায্যে। টারবো জেট বিমানের গতিবেগ প্রপ্ জেটের চেয়ে বেশি, তবে প্রপ্ জেটের কর্মক্ষমতা আবার টারবোর চেয়ে অনেক বেশি।

র‍্যাম্ জেট এঞ্জিন অনেকটা সরল। এর ভেতরে টারবাইন নেই। এটি হ'ল আসলে ছ'মুখ-খোলা একটি নল বিশেষ। বিমান যখন ছুটতে থাকে তখন এঞ্জিনের মুখ দিয়ে তীব্রবেগে হাওয়া ঢুকে পড়ে এই নলের মধ্যে। এই হাওয়ার সঙ্গে জ্বালানী মিশিয়ে দহন ক্রিয়া ঘটাতে হয়। উচ্চ চাপের এই গরম হাওয়া নলের খোলা মুখে বিমানের পেছন দিক্ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ফলে বিমান সামনের দিকে এগিয়ে চলে। তবে র‍্যাম্ জেট এঞ্জিন চালু করার আগে অন্য কোন এঞ্জিনের সাহায্যে বিমানকে গতিসম্পন্ন করতে হয়। র‍্যাম্ জেট বিমান ঘণ্টায় প্রায় ছ' হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারে। প্রপেলার-চালিত বিমানের গতিবেগ ঘণ্টায় বড় জোর ৩৭৫ মাইল মাত্র।

রকেট বা হাউই যে তীব্রবেগে চলতে পারে তারও বৈজ্ঞানিক কৌশল এই জেট বিমানেরই



ওপরে টারবো জেট, মধ্যে প্রপ্ জেট ও নীচে র‍্যাম্ জেট

মত। তবে রকেটের ভিতরে নিজস্ব অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হয়, আর জেট বিমান তার অক্সিজেন সংগ্রহ করে বাইরের বায়ু থেকে। রকেটের সাহায্যে এই জন্যেই অতি ঊর্ধ্বাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব।

হেলিকপ্টার

হেলিকপ্টার হ'ল বিশেষ ধরনের বিমান যা সরাসরি অর্থাৎ সোজা মাটি থেকে আকাশে উঠতে পারে। সাধারণ বিমান, তা সে প্রপেলার-চালিত বিমানই হোক বা জেট বিমানই হোক, যখন আকাশে ওঠে তখন তা প্রথমে মাটিতে বেশ খানিকটা ছুটে নেয়, তারপর আকাশে ওঠে। হেলিকপ্টারের বেলা সে-সবের কোন দরকার নেই। ছোট বাড়ীর·

ছাদ থেকেই তা আকাশে ওঠানামা করতে পারে। দরকার পড়লে তা শূন্যে নিশ্চল হয়েও থাকতে পারে। এ জাতীয় বিমানে প্রপেলার নেই। তার বদলে বিমানের ওপরের দিকে লাগানো থাকে একটা পাখা, যার নাম হ'ল রোটার। এই পাখা ঘুরিয়েই হেলিকপ্টার চলাফেরা, ওঠানামা সব রকম কাজই করে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ার সিকোরস্কি প্রথমে এই জাতীয় বিমানের একটি মডেল তৈরি করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সিয়েরভা যে বিমানটি তৈরি করে আকাশে উড়িয়েছিলেন সেটির সঙ্গে একই সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রপেলার এবং হেলিকপ্টারের মত ওপরে পাখা বা রোটার। এই জাতীয় বিমানের নাম অটো-গাইরো বা অটোজাইরো। অটোজাইরো বিমানই ক্রমে রূপ নিল হেলিকপ্টারে ; প্রপেলার বাদ দেওয়া হ'ল পুরোপুরি। রাশিয়ার সিকোরস্কি ছাড়া জার্মানীর হাইনরিখ ফোকে এবং ফ্রান্সের লুই চার্ল্‌স্ ব্রেগুয়েও এ ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান।

হেলিকপ্টার বিমান আবিষ্কৃত হওয়ায় নানা দিক্ দিয়ে নানা রকম সুবিধা হয়েছে। বড় বিমানের জন্যে যেমন 'রান্‌ওয়ে' দরকার, এরোড্রোম বা বিমান স্টেশন দরকার, হেলিকপ্টারের জন্যে সে-সবের কোন প্রয়োজন নেই। ডাক তোলা, বিপদ্‌গ্রস্ত লোকদের উদ্ধার করা, খাদ্য নামিয়ে দেওয়া, চাষের জমিতে ওষুধ ছিটানো, যে-সব জায়গায় সাধারণ বিমানে যাবার সুযোগ নেই সে-সব জায়গায় যাতায়াত প্রভৃতি বহু কাজই করা হয় এর সাহায্যে ; কারণ এগুলি যত্রতত্র ওঠানামা করতে পারে।

এরোড্রোম বা বিমান স্টেশন

রেলগাড়ীর জন্যে যেমন রয়েছে রেলওয়ে স্টেশন, বিমান চলাফেরার জন্যে তেমনি রয়েছে বিমান-স্টেশন বা এয়ারপোর্ট বা এরোড্রোম। বিরাট এলাকা যুড়ে থাকে এক একটি এয়ারপোর্ট। সবুজ ঘাসে ঢাকা ময়দান, দীর্ঘ কংক্রিটের বাঁধানো রাস্তা,—যার নাম রান্‌ওয়ে, তেল জমা করে রাখবার বিরাট বিরাট ট্যাঙ্ক, বিমান মেরামতের জন্য বিরাট বড় কারখানা-বাড়ী বা হ্যাঙ্গার, বেতারের যন্ত্রপাতি সমেত পুরো একটি আবহাওয়া অফিস, যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার, মালপত্র জমা রাখার গুদাম, আরও কত রকমের ব্যবস্থা !

সর্বোপরি রয়েছে কণ্ট্রোল টাওয়ার। এখান থেকেই যে-সব বিমান উড়ে চলে যাচ্ছে এবং যে-সব বিমান এয়ারপোর্টে নামছে তাদের সব রকম নির্দেশ দেওয়া হয়।

মনে করা যাক তুমি একখানা বিরাট বিমানে চড়ে দূরদেশে পাড়ি দিচ্ছ। এয়ার পোর্টে যথাসময়ে হাজির হয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায়টিদায় নিয়ে তুমি উঠে বসেছ তোমার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। টিকেট কেনা তো আগেই হয়ে গিয়েছিল ; তোমার ডাক্তারী পরীক্ষা, তোমার সঙ্গে বে-আইনী কোন জিনিসপত্তর আছে কিনা সে-সব পরীক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ভালো ভাবেই মিটেছে। তোমার কাজ শেষ, এবারে যা কাজ তা বিমান-চালক, বিমানের অন্যান্য কর্মচারী এবং কণ্ট্রোল টাওয়ারের লোকজনদের।

যাত্রা শুরু

এয়ারপোর্টের যন্ত্রবিদ্‌রা বিমানখানার কলকব্জা ইতিমধ্যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে

নিয়েছেন। যান্ত্রিক ত্রুটি কিছু ধরা পড়লে তা সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করে দিয়েছেন। যন্ত্রপাতি চালাবার জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল নেওয়াও হয়ে গেছে। যে আকাশপথে বিমানটি চলবে সে পথের আবহাওয়া সম্বন্ধে সব রকম খবরা-খবর পাইলটকে দেওয়া হয়েছে। তিনি কত উচ্চতায়, কত বেগে বিমান চালাবেন তা এয়ারপোর্টের কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি উঠে এলেন তাঁর বিমানে, যন্ত্রপাতি একটু নাড়াচাড়া করে দেখলেন। রেডিও-অফিসার, কো-পাইলট, বিমান-সেবিকা প্রভৃতিরাও যথাস্থানে হাজির হয়েছেন। রেডিও মারফৎ কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হ'ল। সেখান থেকে জানানো হ'ল বিমান ছাড়ার ঠিক ঠিক সময়, বায়ুর গতিবেগ, রান্‌ওয়ের কোন্ দিক্ দিয়ে আকাশে উঠতে হবে ইত্যাদি খবর। শেষ নির্দেশ এল কন্ট্রোল থেকে, পাইলট চালিয়ে দিলেন তাঁর বিমান এবং একটু পরেই সেটি আকাশে উঠল। নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট উচ্চতায় ট্র্যাফিকের আইন মেনে চলতে লাগল বিমান। রেডিও মারফৎ যে পথের নির্দেশ দেওয়া হয় তার নাম রেডিও রেঞ্জেস্।

বিমান-সেবিকাদের বলা হয় এয়ার হোস্টেস্। যাত্রীদের নানান্ সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ রাখাই হচ্ছে তাঁদের কাজ। সাধারণতঃ সুন্দরী তরুণীরা এ কাজের ভার নেন। যাত্রীদের উড়ন্ত অবস্থাতেই চা, খাবার-দাবার পরিবেশন করা ইত্যাদিও এই কাজের মধ্যে পড়ে।

যাত্রা শেষ : অবতরণ

যাই হোক, ধরা যাক এমনি ভাবে বিমান চালিয়ে বিমান এসে হাজির হয়েছে অবতরণ-ক্ষেত্রে। এটিও একটি এয়ারপোর্ট। দিনের বেলা হলে পাইলট ওপর থেকে সব কিছু দেখতে পান। রাত্রিতে হলে ঘূর্ণায়মান একটি আলোকরশ্মি দেখে পাইলট বুঝতে পারেন যে তিনি এয়ারপোর্টের ওপরে এসেছেন। এই আলোর নাম বেকন। এবারে তিনি কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, বিমানের পূর্ণ বিবরণ দিয়ে অবতরণের নির্দেশ চান। এয়ারপোর্টে নামবার জন্যে যদি আরও অনেক বিমান থাকে তবে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয় এয়ারপোর্টের ওপর ঘুরে বেড়াতে। যে বিমানটি সবচেয়ে শেষে এসেছে সেটি ঘুরবে সবচেয়ে ওপরে। তার হাজার ফুট নীচে নীচে অন্যান্য বিমানগুলি ঘুরবে এবং নির্দেশ পেলে একে একে নেমে আসবে। রাত্রিকালে আলোর নিশানা দেখে পাইলটরা সঠিক পথ চিনতে ভুল করেন না।

অনেক সময় এমনও হয় যে মেঘবৃষ্টি, কুয়াশার জন্যে কোন কিছুই দেখা যায় না। সে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে বিমানটিকে মাটিতে নামিয়ে আনা হয় তার নাম ব্লাইণ্ড ল্যাণ্ডিং সিস্টেম বা গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল অ্যাপ্রোচ। কাজটি করা হয় দু'খানা র‍্যাডার পর্দার সাহায্যে। এ ক্ষেত্রে পাইলটের বেশি কিছু করণীয় নেই। কন্ট্রোল থেকে যে রকম নির্দেশ দেওয়া হয় পাইলট ঠিক ঠিক মত তা অনুসরণ করেন মাত্র। তবে মাটি থেকে কয়েক ফুট ওপরে থাকতেই পাইলট নির্দেশক আলোর সারি দেখতে পান। প্রয়োজন বোধ করলে সেই অনুসারে তিনি বিমানখানাকে মাটির বুকে নামিয়ে আনেন।

লোকসংস্কৃতির কথা

আমরা সবাই জানি

'খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো,
বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেবো কিসে ?'

কিংবা

'ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি
আমাদের বাড়ি এসো,
খাট নেই, পালঙ নেই,
চোখ পেতে বোসো ।'

আমরা সবাই জানি এই ঘুমপাড়ানি ছড়া। সবাই জানি সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পার, রাক্ষসখোক্কস, ফুলপরী আর রাজপুত্তুর-কোটালপুত্তুরের গল্প। সবাই জানি রঙ-বেরঙের পুতুল আর আল্পনার ছবির কথা, গাজনের সং আর মুখোস-পরা নাচের কথা, বাউল-ভাটিয়ালী গান, পুতুল-নাচ, বিয়ের আসরে জামাই-ঠকানো ধাঁধা, পৌষ-পরবের পিঠেপায়েস, মেলার ভিড়ে তালপাতার বাঁশি, এক্কাদোক্কা বা ইকড়িমিকড়ি খেলা, আরো—আরো কত কিছু! আমাদের সবার জানা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে একসাথে করে বলা হয় লোকসংস্কৃতি।

সংস্কৃতি কাকে বলে

লোকসংস্কৃতি আসলে সংস্কৃতিরই একটা বিশেষ অংশ। সংস্কৃতি বলতে এমন একটি সুমার্জিত: বিষয় বোঝায় যার মধ্যে মানুষের বাস্তব সৃষ্টি, মানস সৃষ্টি, বৈষয়িক সৃষ্টি, শিল্পকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য-অভিনয়, আচার-বিশ্বাস ইত্যাদি সব কিছুই জড়িত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের 'হয়ে ওঠার' ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হয়ে ওঠার ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ও জটিল। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় মানবসভ্যতার শুরু থেকে মানুষকে নানান্ উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে এগুতে হয়েছে। এই পথপরিক্রমায় মানুষকে তিনটি বিভিন্ন রকমের সামাজিক স্তর পেরিয়ে চলতে হয়েছে ও হচ্ছে—যাদেরকে বলা যায় আদিম, লোকায়ত আর উচ্চ। তাই এই সামাজিক স্তর ভেদ অনুসারে সংস্কৃতিরও স্তর-বিন্যাস করা যায়—আদিমসংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও উচ্চসংস্কৃতি নামে। সাধারণ ভাবে আদিম সমাজের সংস্কৃতিকে আদিমসংস্কৃতি এবং অগ্রবর্তী উন্নত সমাজের সংস্কৃতিকে উচ্চসংস্কৃতি বলা হয়। আর অনগ্রসর আদিম ও অগ্রবর্তী সমাজের মাঝামাঝি সমাজের সংস্কৃতিকেই বলা যায় লোকসংস্কৃতি।

ফোক্-লোর বনাম লোকসংস্কৃতি

ইংরেজীতে একটা কথা আছে "ফোক্-লোর"। বাংলা "লোকসংস্কৃতি" কথাটিও, মনে হয়, এই শব্দেরই একটা প্রতিরূপ। ফোক্-লোর কথাটিও আগে ওদেশে চলিত ছিল না, ওকে বলা হ'ত "পপুলার অ্যান্টিকুইটিস" অর্থাৎ জন-প্রিয় পুরাতনী। ফোক্-লোর শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে। অ্যামব্রোস মেরটন এই ছদ্মনামে ঐ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন লণ্ডনের এথিনিয়াম পত্রিকায় উইলিয়াম জন্ থমস্। এ

শব্দটিও একটি জার্মান শব্দ "ভলকম কুন্দে" শব্দের অনুবাদ—যেটি সেখানে প্রচলিত হয়েছিল সম্ভবতঃ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। যাই হোক, এখন ফোক্-লোর শব্দটিই কিছু অদলবদল করে মোটামুটি সমস্ত পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য আমাদের ভাষায় এই ইংরেজী শব্দটির সত্যিকার প্রতিশব্দ কি হবে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা এখন পর্যন্ত একমত হন নি। যেমন, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ওর নাম দিয়েছেন লোকযান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দিয়েছেন লোকবিজ্ঞান, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ওকে বলেছেন লোকশ্রুতি। এ ছাড়া আরও আছে। যেমন, লোকবিদ্যা (রামপ্রসাদ চন্দ), লোকবার্তা (ডঃ বাসুদেব সরণ আগরওয়ালা), লোকচর্যা (ডঃ সুকুমার সেন), লোকসংস্কৃতি (ডঃ কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়), লোক-লোর (ডঃ মযাহারুল ইসলাম), লোকবৃত্ত (শঙ্কর সেনগুপ্ত), লোকায়ন (অরুণকুমার রায়), লোকঐতিহ্য (আনোয়ারুল করিম), লোকতত্ত্ব (ডঃ আশরফ সিদ্দিকী), লোককৃতি (ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়) ইত্যাদি। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটিরই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি আছে। ও নিয়ে তর্কাতর্কি না করে বহুল-প্রচলিত "লোকসংস্কৃতি" শব্দটিকেই আমেরা ফোক্-লোরের বদলে গ্রহণ করে কাজ চালাতে পারি।

লোকসংস্কৃতি বলতে ঠিক কি বোঝায়

এবারে আসা যাক সত্যি করে লোকসংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় সেই প্রসঙ্গে। এ নিয়েও অবশ্য বিতর্কের অভাব নেই। তবে সাধারণ ভাবে লোকসংস্কৃতি বলতে সমাজের লৌকিক স্তরের শিল্প-সাহিত্য-নৃত্য-গীত-উৎসব-অভিনয়-ধর্ম, আবার সংস্কার-ক্রীড়া-কৌতুক-ওষুধপথ্য-ক্রিয়াকলাপ এই সব কিছুই বোঝায়। কোন দেশের লোকসংস্কৃতি প্রধানত নির্ভর করে সে দেশের ঐতিহ্যের ওপর। এর মধ্যে ব্যক্তির চাইতে সমষ্টির মূল্যই বেশি। অর্থাৎ কোনও ব্যক্তিবিশেষ নয়,—সকলে মিলে যা গড়ে তোলে তাই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। ব্যক্তির পরিচয় এখানে সম্পূর্ণ চপা পড়ে যায়, সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাই এতে ফুটে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। অবশ্য যুগের সঙ্গে সঙ্গে এরও পরিবর্তন ঘটে।

অনগ্রসর কৃষিসমাজ বা পল্লীজীবনই হচ্ছে লোকসংস্কৃতি বিকাশের আসল ক্ষেত্র। তাই বলে শিল্পী-সমাজে বা নগর-জীবনে লোকসংস্কৃতি বাঁচে না এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। তবে আধুনিক সমাজে জিনিসটি যেমন নিজে থেকে গড়ে ওঠে, তেমনি নানা কারণে এর বিকৃতি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। এসব ক্ষেত্রে কোন্‌টা অকৃত্রিম লোকসংস্কৃতি আর কোন্‌টা কৃত্রিম লোকবিকৃতি তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তবেই বুঝে নিতে হবে।

লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তু

লোকসংস্কৃতির বিষয় সম্পর্কেও একটু মতভেদ আছে। এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা মনে করেন, ও হচ্ছে শুধু অলিখিত লোকসাহিত্য। এঁদের মতে লোকসাহিত্য মানে সহজ ঘরোয়া ভাষার সাহিত্য—অর্থাৎ ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, রূপকথা, গ্রাম্য কবির মুখে মুখে তৈরি বিশেষ ধরনের গান (যাকে বলা হয় লোকসঙ্গীত) এবং এগুলিই লোকসংস্কৃতি। আবার আর একদল মনে করেন লোকসংস্কৃতি শুধু লোকসাহিত্যের

মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,—ঐ সঙ্গে লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত, লোকাচার, সংস্কার, বিশ্বাস, ধর্ম-অনুষ্ঠান—এ সব বিষয়ও ওর অন্তর্ভুক্ত।

লোকসংস্কৃতি চর্চা

লোকসংস্কৃতির উদ্ভব-ইতিহাস অনেক দিনের হলেও ওর চর্চার ইতিহাস কিন্তু নিতান্ত আধুনিক কালের। অবশ্য ও সম্পর্কে উৎসাহ ষোড়শ শতক বা তার আগেও দেখা গিয়েছিল কিন্তু ও নিয়ে যথাযথ ভাবে চর্চার সূত্রপাত হয়েছে উনিশ শতকের প্রথম দিকে। ঐ চর্চার প্রধানত তিনটি দিক্ আমরা দেখতে পাই। এক,—জ্ঞানের দিক্,। দুই,—অনুশীলনের দিক্ আর তিন,—প্রয়োগের দিক্। লোকসংস্কৃতির তত্ত্বগত আলোচনা হচ্ছে জ্ঞানের দিক্। ওর উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ, বিচার, গবেষণা প্রভৃতিকে বলা যায় অনুশীলনের দিক্। আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ওর প্রয়োগকেই বলা হয় প্রয়োগের দিক্। ভালো করে চর্চা করতে হলে এই তিনটির কোনটিরই গুরুত্ব কম নয়।

বাংলার লোকসংস্কৃতি

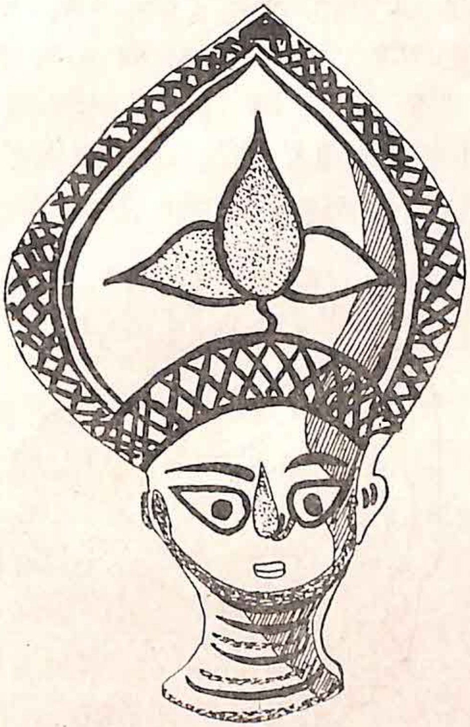
এবার দেখা যাক আমাদের বাংলায় লোকসংস্কৃতি বলতে কি আছে।

আমাদের নিতান্ত আনন্দ ও গর্বের কথা—এদিক্ দিয়ে বাংলা কিন্তু সত্যিই খুব সমৃদ্ধ, বাংলার লোকসংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ—এখন যার নাম 'বাংলাদেশ'—এই দুই জায়গারই উত্তরাধিকারে পুষ্ট। দু'টি দেশই কৃষিভিত্তিক দেশ এবং দু'টিই গ্রাম-প্রধান—অর্থাৎ বিশেষ করে গ্রামকে ঘিরেই এর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই বাংলার গ্রামগুলিকে লোকসংস্কৃতির এক একটি জীবন্ত ভাণ্ডার বলা যেতে পারে। আর সে ভাণ্ডার ভরে আছে লোকসংস্কৃতির সমস্ত বিভাগের মূল্যবান্ উপকরণ ও তথ্যসামগ্রীতে। এর মধ্যে আছে লোকসাহিত্য, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, লোকধর্ম ও লোক-উৎসব, লোক-নৃত্য, লোকক্রীড়া, লোকশিল্প আর রয়েছে লৌকিক দেবদেবী।

বাংলার লোকসাহিত্যের মধ্যে আমরা পাই নানারকমের ছড়া, রূপকথা, ইতিকথা, পুরাণ-কথা, উপকথা, ব্রতকথা, প্রবাদ, ধাঁধা, গীতিকা ইত্যাদি। তেমনি বাংলার লোকসঙ্গীতের মধ্যে আছে ঝুমুর, বাউল, ভাটিয়ালী, জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, চটকা, বারমাস্যা, ভাদু, তুসু, বিয়ের গান, ধান ভানার গান ইত্যাদি। লোকনাট্য বা লোকাভিনয়ের মধ্যে পুতুল-নাচ, গম্ভীরা,



দক্ষিণ রায়—বারা



দক্ষিণ রায়—বারা

আলকাপ, লেটো, চোরচুরনি, পালাটিয়া, সং প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। বাংলার লোকধর্ম ও লোক-উৎসবের মধ্যে গাজন, গম্ভীরা, মনসাপূজা, ঝাপান, বৃক্ষপূজা, পৌষপার্বণ, কার্তিকলড়াই, ভাদু, ভাজো, টুসু, গাজী-পীরের উরস প্রভৃতি প্রধান। লোকক্রীড়ার মধ্যে হাডুডু, এক্কাদোক্কা, চোর-পুলিশ বাঘবন্দী, ইকিড়মিকিড় প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে দক্ষিণ রায় (বারা মুণ্ডমূর্তি ও পূর্ণমূর্তি), ভাদু, টুসু, ধর্ম ঠাকুর, ঘেঁটু, পঞ্চানন্দ, শীতলা, পেঁচে-সেঁচো, ভীম, খেদাই ঠাকুর, ওলাবিবি, বনবিবি, মাণিকপীর, মাকাল ঠাকুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তেমনি লোকনৃত্য বলতে রায়বেঁশে, ঢালি, কাঠিনাচ, কালীনাচ, নৃসিংহ, ঘাটু, নাচনী, মশাল-নাচ, রণপা-নাচ, বৌ-নাচ, বরণ-নৃত্য, ব্রতনৃত্য, ছৌ-নাচ ইত্যাদি বাংলার নিজস্ব।

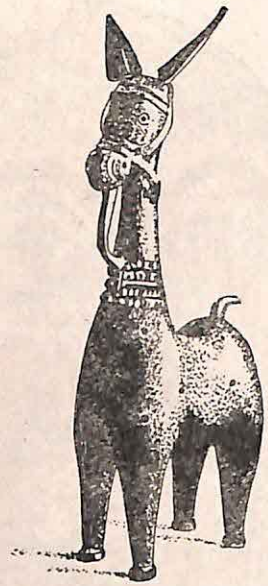


ভীম

নাচের দিক্ দিয়ে রায়বেঁশে নাচ বীরভূম অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত, তেমনি ছৌ-নাচ দেখা



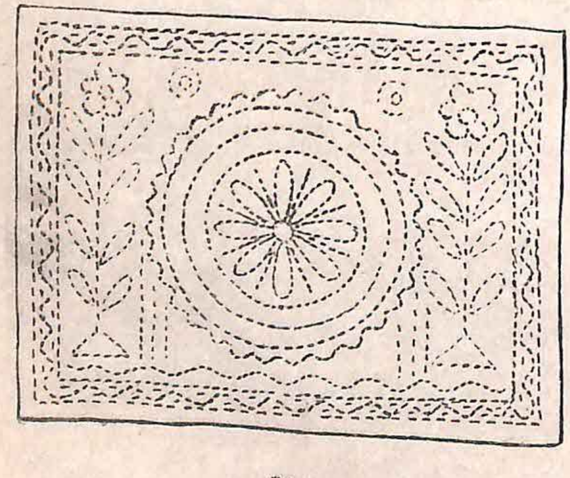
ছৌ-নাচ



বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া

যায় বিশেষ করে পুরুলিয়া জেলায়। অবশ্য এ সবেরই একটা না একটা কারণ আছে, যা নিয়ে এখন গবেষণা চলছে।

লোকশিল্পেও বাংলা নেহাৎ কম যায় না। এখানকার মৃৎশিল্প (যেমন কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল) ও পোড়ামাটির কাজ (যেমন বাঁকুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া) অনবদ্য। তা ছাড়াও



কাঁথা

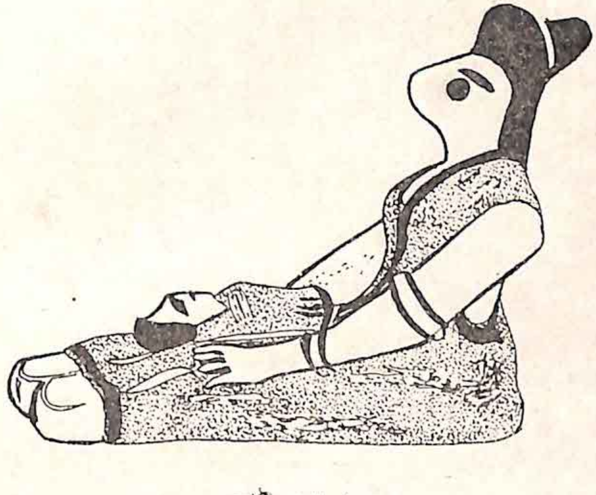
বাংলার শোলার কাজ (যার মধ্যে ডাকের সাজও পড়ে), বাঁশ ও বেতের কাজ, কাঁথা, তাঁতের কাপড়, চিত্রিত সরা (লক্ষ্মীর সরা), কুলো (বরণডালা), পিঁড়ি (বিয়ের পিঁড়ি), মাদুর কাটির কাজ, বড়ি-শিল্প, শিকে, আমসত্ত-



কাঠের পেঁচা

সন্দেশের ছাঁচ, শাঁখের কাজ (ঢাকার শঙ্খ-শিল্প), হাতীর দাঁতের কাজ (মুর্শিদাবাদ), গালার কাজ, পট, আলপনা, ঢোকরা-শিল্প, মুখোস, কাঁসা-শিল্প (খাগড়া, বিষ্ণুপুর) কারিগরির দিক্ দিয়ে নিখুঁত বলা চলে। রথের মেলায় বা চড়কের মেলায় এই লোকশিল্পের নমুনা দেখে অনেক বিদেশী পর্যটক তাজ্জব বনে গেছেন।

এ ছাড়া আছে খাদ্য-রসিকদের জন্য রকমারি খাবার—যাকে 'লোকমিষ্টান্ন' নাম দিলে বোধ হয় ভুল হবে না, যদিও

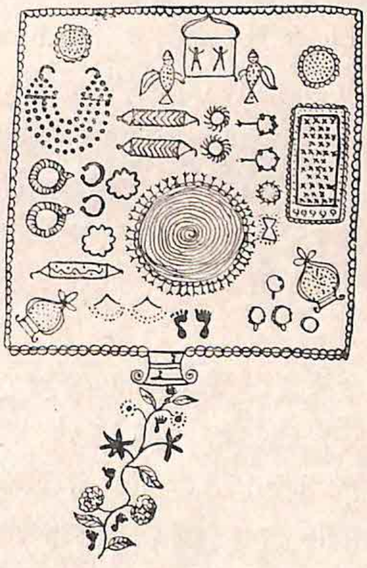


মাটির মা-পুতুল

নামটার এখনও চলন হয় নি। এর মধ্যে আছে বীরভূমের মোরব্বা, বাঁকুড়ার কালাকন্দ, বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া-সরভাজা, বহরমপুরের ছানাবড়া, নাটোরের কাঁচাগোল্লা, ঢাকার আমৃত্তি ও পরোটা, বরিশালের বাখরখানি, বাগবাজারের (কলকাতা) রসগোল্লা—কত নাম করব? মোট কথা, মাত্র কয়েকটি শাখার উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় বাংলার লোকসংস্কৃতি কত বৈচিত্র্যপূর্ণ। আর, শুধু বিষয়বৈচিত্র্যেই নয়, শিল্পগত এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের দিক্ থেকেও বাংলার লোকসংস্কৃতি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন দরকার

পৃথিবীর সমস্ত দেশের পণ্ডিতসমাজই লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন—যেহেতু এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্নার ইতিহাস পরোক্ষভাবে লুকিয়ে থাকে। তাই জনজীবনের ইতিহাস উদ্ধারের জন্যই লোকসংস্কৃতি চর্চা সবিশেষ প্রয়োজন—এ কথা অনেকেই বলেছেন। এই লোকসংস্কৃতি চর্চার মধ্যে দিয়েই দেশের অতীত ইতিহাস, আচার, আচরণ, বিশ্বাস, সংস্কার, ভাষা, সমাজজীবন প্রভৃতির বহু মূল্যবান্ তথ্য জানতে পারা যায়। সমাজবিজ্ঞানী, নৃবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, ভাষা-বিজ্ঞানী—সকলেই তাই আজ এই লোকসংস্কৃতির দিকে ঝুঁকেছেন। তা ছাড়া আধুনিক লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞানীরা এর ব্যবহারিক মূল্যের ওপরেও প্রচুর গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং প্রয়োজনমত লোকসংস্কৃতিকে প্রয়োগমূল্যে কাজে লাগাচ্ছেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য অবৈজ্ঞানিক মনোভাব যে নানারকম



ব্রতকথার লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীপেঁচা, বসনভূষণ ইত্যাদি

বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করে তা তো বলাই বাহুল্য। তবু বলব, দেশের অতীতকে জানবার জন্য এবং ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবার জন্য বহুবিচিত্র উপকরণে সমৃদ্ধ বাংলা তথা ভারতের লোকসংস্কৃতির সবিশেষ চর্চা হওয়া দরকার।



দেশবিদেশের রূপকথা

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু
(ভিয়েৎনামের রূপকথা)

এক দেশে দুই ভাই ছিল। তাদের দু'টিতে ভারি ভাব। তারা একসঙ্গে খেলাধুলো করে হেসে-খেলে দিন কাটায়। দেখতে দেখতে দু'ভাই বড় হ'ল। তখন আর তাদের আগের মত সেই মন ছিল না। বিশেষ করে বড় ভাই ভারি হিংসুক, লোভী আর স্বার্থপর। সে বলল, 'এস ভাই, এবার আমাদের যা সম্পত্তি আছে তা দু'জনে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিই।'

ছোট ভাই খুব সরল। তার একটুও লোভ ছিল না, খুব অল্পেই সে ছিল খুশি। সে বড় ভাইকে বললে, 'খুব ভালো। তোমার যা ইচ্ছে তুমি সব নাও। আমায় কেবল এই ছোট্ট কুঁড়েঘরটুকু দিও। আর কিছু চাই নে।'

বড় ভাই মহানন্দে তাই করল। সব টাকা-পয়সা, ঘরবাড়ি সে-ই নিল, ছোট ভাই পেল শুধু একটা কুঁড়েঘর। কিন্তু তাতে তার মনে কোনও দুঃখ নেই। সেও যেমন মানুষ, তার বউও ঠিক তেমনি মানুষ। বাড়ির সামনে এক চিলতে জমিতে যে ফলের গাছটি আছে সেই ফল খেয়েই তাদের দিন কাটে। তারা আর কিছু চায় না। মনে মনে তারা খুব সুখী।

একদিন সেই গাছে এল এক মস্ত পাখি। সেই পাখি তাদের একমাত্র খাবার সেই ফলগুলি খেয়ে শেষ করে দিল। অভাবের কথা ভেবেও তারা সেই পাখিকে কিছু বলল না, তাড়িয়ে দিল না, মারলও না। এই ভাবে পর পর ক'দিনই পাখি তাদের ফল খেতে এল।

শেষে একদিন পাখি হঠাৎ মানুষের গলায় তাদের বলল, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের ক্ষতি করব না। তোমরা আমাকে কিছু না বলে যেমন ফল খেতে দিয়েছ, আমিও তেমনি তোমাদের উপকার করব। কাল আমি এই সময়ে আসব। তোমরা একটা থলে নিয়ে আমরা সঙ্গে যেও। আমি তোমাদের অনেক সোনা দেব।'

পাখির মুখে মানুষের মত কথা শুনে ছোট ভাই আর তার বউ তো অবাক্। যাই হোক, দেখাই যাক না কি হয়—এই ভেবে পরদিন ছোট ভাই একা একটি ছোট থলি নিয়ে



একদিন সেই গাছে এল এক মস্ত পাখি।

আগের মতই আছে। সেই গাছের ফল খেয়েই তাদের দিন কাটে। এতটুকু বিলাসিতা বা আড়ম্বর নেই তাদের।

একদিন ছোট ভাই আর তার বউ ঠিক করল তারা বড় ভাই আর তার বউকে নেমন্তন্ন করবে। ছোট বউ এই ঠিক করে বড় বউকে একদিন বলতে গেল। তাদের ঐশ্বর্যের খবর এর মধ্যেই বড় ভাইয়ের বাড়িতে পেঁাছে গেছে। হিংসেয় জ্বলে মরছিল স্বামীস্ত্রী। এর ওপর ছোট বউ নেমন্তন্ন করতে এলে বড় বউএর ভারি রাগ হ'ল। সে ছোট বউকে বলল, 'তোমার বাড়ি যাব যদি তোমার বাড়ির সামনেটা সোনার জলে রঙ

পাখির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিক সময়ে পাখি এল। ছোট ভাইকে তার পিঠে নিয়ে সে পাড়ি দিল এক অজানা পথে—এক দ্বীপে। সেই দ্বীপের চারদিকে পাহাড় —সব সোনার। গাছে গাছে হীরে-মুক্তো-মণির ফল। পাখি বলল, 'তোমার থলি ভর্তি করে যা ইচ্ছে তুলে নাও।' ছোট ভাই সোনাদানা, মণিমুক্তো যা পারল থলেটিতে ভরে নিল। তার পর পাখি তাকে আবার পিঠে করে তার কুঁড়েতে পেঁাছে দিয়ে গেল।

তখন সেই সব সোনাদানা দেখে স্বামীস্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু এত সব পেয়েও তাদের কোন অহংকার হ'ল না। তারা ঠিক

করে দাও।' সে ভেবেছিল এবার ছোট বউকে খুব জব্দ করা গেল। নিশ্চয়ই সে এত খরচ করতে পারবে না। ছোট বউ কিন্তু বলল, বেশ, 'তাই হবে দিদি!' শুনে বড় বউ ভাবল, কি বোকা!

শেষকালে, বড় ভাই আর তার বউএর যেদিন নেমন্তন্ন, সেদিন দেখা গেল সত্যিই ছোট ভাই-এর কুঁড়েঘর সোনার জলে রঙিন। বাড়ি ঢোকার রাস্তায় লাল কার্পেট পাতা, ঘরে মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। আর বড় ভাই আর তার বউকে তারা যে কী আদরযত্ন করল তা আর কি বলব! বড় ভাই এই সব দেখে ছোট ভাইকে জিজ্ঞেস করল কি করে সে এই

সব সম্পত্তি করল। তখন ছোট ভাই সেই পাখির কথা আর সোনাদানার কথা সব খুলে বলল।

বাড়ি ফিরে বড় ভাই আর তার বউ যুক্তি করতে লাগল। শেষে বড় ভাই ছোট ভাইকে বললে, 'ভাই, তোমার তো এখন অনেক সম্পত্তি! তুমি আমাকে তোমার ঐ কুঁড়েটুকু দিয়ে দাও না!'

ছোট ভাই বললে, 'এ আর বেশি কথা কি, তুমি এখনই নিতে পার।'

ছোট ভাই তার কুঁড়েঘরটা বড় ভাইকে ছেড়ে দিলে। বড় ভাই আর তার বউ রোজ সেই পাখির জন্যে বসে থাকে। উঃ, এত দেরি করছে পাখিটা আসতে! অবশেষে একদিন পাখি এল। তাকে দেখেই স্বামীস্ত্রী বললে, 'আমাদেরও ঐ রকম সোনাদানা এনে দাও।' পাখি বললে, 'বেশ, কাল থলি নিয়ে তৈরি থেকো।'

ঠিক হ'ল বড় ভাই আর তার বউ দু'জনে মিলে যাবে। তা হ'লে অনেক বেশি সোনা আনতে পারবে। আর তারা যে থলি তৈরি করল সে দু'টোও মস্ত মস্ত দু'টো বস্তার মাপে। তারপর ঠিক সময় পাখির সঙ্গে দু'জনে গেল সেই দ্বীপে। অত সোনা আর হীরেমুক্তো দেখে স্বামীস্ত্রী যেন পাগল হয়ে গেল। তারা বস্তা দু'টো ভর্তি তো করলই, তাদের জামার ফাঁকে ফাঁকেও তুলে নিল এন্তার সোনা। তার পর মোটঘাট নিয়ে তারা উঠল পাখির পিঠে।

কিন্তু একে দু'জনের ভার, তার ওপর দু'বস্তা সোনাদানা আর সোনা-ভর্তি জামাকাপড়ের ভার—সব মিলিয়ে পাখির পিঠে বিরাট বোঝা। সে আর পাখা মেলতে পারছিল না। তার সহ্যের সীমা চলে যেতে লাগল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য সমুদ্রের ঠিক ওপরে এসেই পাখি তাদের সবশুদ্ধু পিঠঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল, তার পর হাল্কা হয়ে একা একা সহজেই উড়ে চলে গেল। বড় ভাই আর তার বউ সেই বিরাট বোঝা নিয়ে পড়ল সমুদ্রের অতল তলে। কোনও চিহ্নই রইল না তাদের।

ডাইনীর পাল্লায়

(কোরিয়া দেশের রূপকথা)

একজন পথিক রাস্তা দিয়ে চলেছে। চলতে চলতে সন্ধ্যে হয়ে এল। এদিকে অন্ধকারে সে এসে পড়েছে এক বনের মধ্যে। লোকটি ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে পথ হারিয়ে ফেলল। তারপর অনেক রাত্রে হঠাৎ দেখল বনের ধারে একটা মস্ত বাড়ি। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সে সেই বাড়ির বন্ধ দরজায় কেবল ধাক্কা দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, 'কে আছ, আমায় একটু আশ্রয় দাও।'

একটু বাদে ভিতর থেকে একটি মেয়ের গলা ভেসে এল। তারপর সে এসে দরজা খুলে লোকটিকে ভিতরে নিয়ে গেল। লোকটি দেখল মস্ত বড় বাড়ি। অনেকগুলি বড় বড় ঘর। কিন্তু লোকজন কেউ নেই। মেয়েটি তখন পথিককে বলল, 'এ আমার বাড়ি। আমার কেউ নেই। কিন্তু খাবার-দাবার, জিনিসপত্র এখানে কিছুরই অভাব নেই। তোমায় কেউ কিছু বলবে না। তুমি যতদিন খুশি থাক।' এই বলে সে লোকটিকে প্রচুর খাইয়ে দিল, তারপর একটি

ঘরে নিয়ে গিয়ে সেখানে নরম পালক-ঢাকা বিছানা দেখিয়ে বলল, 'এবার তুমি ঘুমোও। কালকে আবার আসব।'

সারাদিনের খাটুনি আর ধকলে পথিক বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই যেমনি শোয়া অমনি সে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝ-রাত্তিরে একটা ঘস্ ঘস্ শব্দ শুনে লোকটি হঠাৎ ধড়মড় করে লাফিয়ে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে সে কিছু দেখতে পেলে না। তখন সে জানালার বাইরে মুখ বাড়িয়ে যা দেখল তাতে তার প্রাণ গেল শুকিয়ে। পথিক বুঝল সে ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে। সেই মেয়েটি বসে বসে একটা মস্ত তলোয়ারে শান দিচ্ছিল। লোকটিকে দেখতে পেয়েই সে তলোয়ারটা তুলল, আর যেই তলোয়ারটা তুলেছে অমনি তার শরীরের অর্ধেকটা শেয়াল হয়ে গেল, বাকি আধখানা কিন্তু মানুষই রইল। সেই মানুষ-শেয়াল এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটির ওপর। লোকটিও দৌড়তে লাগল প্রাণপণে। পেছন পেছন ডাইনীও ছুটল।

ছুটতে ছুটতে লোকটি হঠাৎ দেখল তার সামনে সেই আগের মতনই মস্ত একটা বাড়ি। এ বাড়ির দরজা কিন্তু খোলাই ছিল। পথিক দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে সেখানে ঢুকে পড়েই দরজা বন্ধ করে দিল। আর ঠিক তখনই সেই বাড়ির মালিক এক মস্ত চেহারার মানুষ এসে দাঁড়াল তার সামনে। তাকে



একটা মস্ত তলোয়ারে শান দিচ্ছিল।

ধমকে বলল, 'ও, তুই বুঝি আমার মাকে রাগিয়ে চলে এসেছিস? দাঁড়া, তোকে মজা দেখাচ্ছি।'

পথিক কিছু বুঝবার আগেই সেই লোকটা কোত্থেকে ঠিক সেই রকমই একটা চকচকে তলোয়ার নিয়ে এল।

পথিক বুঝতে পারল এ হচ্ছে সেই ডাইনীরই ছেলে। তার মানে সে আবার এসে পড়েছে ঐ ডাইনীরই খপ্পরে। তখন সে মিনতি করে বললে, 'আমাকে মেরে ফেলবার আগে এক বালতি জল খেতে দিন।'

ডাইনীর ছেলে ভাবলে, এ লোকটাও না জানি কোন্ এক রাক্ষসটাক্ষস হবে। নইলে এক বালতি জল কেউ খেতে চায়? তবু তার

কিছু দয়া ছিল। সে চাকরদের জল আনতে হুকুম করলে। চাকর লোকটিকে এক বালতি জল খেতে দিয়ে গেল।

পথিককে জল দিতে বলে লোকটা পাশের ঘরে গেছে, আর পথিকও সঙ্গে সঙ্গে সেই এক বালতি জল দেয়ালে ঢেলে সেটা বেশ করে ভিজিয়ে দিল। দেয়ালটা দেখতে অমন হ'লে কি হবে, সেটা যে মাটির তা সে বুঝতে পেরেছিল।

জল পেয়ে সেই ভিজে দেয়াল আস্তে আস্তে নরম হয়ে গেল, আর একটু ধাক্কা দিতেই তার মধ্যে একটা গর্ত হয়ে গেল। তখন সেই ভাঙা গর্ত দিয়ে লোকটি এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বাড়িটা ছিল পাহাড়ের শেষ প্রান্তে। তাই লোকটি লাফ দিয়ে এসে পড়ল এক জানোয়ারের পিঠে। জানোয়ারটা আসলে একটা বাঘ। বাঘ ভাবলে কী ভালোই দিনটা আজ! এই মানুষের মাংস আমি খাব আর বাচ্চাটাকে খাওয়াব এর রক্ত। এই ভাবতে ভাবতে বাঘ লোকটিকে পিঠে নিয়ে তার গুহায় এসে ঢুকল। তারপর তার বাচ্চাকে ডেকে বললে, 'আয়, কেমন খাবার এনেছি দেখ্।' বলে লোকটার গায়ে খামচে খানিক রক্ত বার করে বাচ্চাকে বললে, 'নে, এবার চুষে খা।'

এই বলে বাঘ লোকটাকে শুইয়ে ফেলে অন্য কাজে চলে গেল ফিরে এসে ভালো করে ফলার করবে বলে। লোকটিও সেই ফাঁকে একটা পাথর তুলে নিয়ে বাঘের বাচ্চাটাকে মেরে গুহা থেকে পালিয়ে এল আর একটা গাছের মগডালে উঠে বসে রইল।

এদিকে ডাইনীর ছেলে লোকটাকে খুঁজতে গিয়ে দেখলে দেয়াল ভাঙা, লোকটা নেই। সে বুঝল নিশ্চয় লোকটা পালিয়েছে। সে তখনই রাগে ফুলতে ফুলতে একটা শেয়াল হয়ে গেল, তারপর গন্ধ শুঁকে খুঁজতে খুঁজতে বাঘের গুহার সামনে এসে দাঁড়াল।

ওদিকে বাঘ ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। সে তার ঘরে গিয়ে দেখলে মানুষটা তো নেই, আর কে যেন তার বাচ্চাটাকে মেরে ফেলেছে। শেয়ালটাকে সে আগেই লক্ষ করেছিল। বাঘ ভাবলে নিশ্চয় এ ঐ শেয়ালের কাজ। শেয়ালটা তো তারই গুহার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর কালবিলম্ব না করে তক্ষুনি বাইরে এসে শেয়ালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পথিক গাছের ডাল থেকে দেখছে বাঘ আর শেয়ালের মারামারি। শেয়াল হ'লেও আসলে সে তো ডাইনীরই ছেলে। গায়ের জোরে কেউই প্রায় কম যায় না। তবু শেষকালে বাঘটা শেয়ালটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। তারপর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে সেও লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। দেখতে দেখতে তারও প্রাণ বেরিয়ে গেল।

লোকটি তখন গাছ থেকে নেমে এল। তারপর সাহস করে ফের চলে এল ডাইনীর ছেলের বাড়িতে। না, ওখানে আর কোনও মালিক নেই। সে ডাইনীর ছেলের বাড়িটা দখল করে নিল। তখন সব চাকরবাকর, জিনিস-পত্রের সেই হ'ল মালিক। সে হুকুম দিল

ডাইনীকে যেন তার বাড়ির চৌহদ্দিতে ঢুকতে না দেওয়া হয়।

সেখানে সে মনের সুখে রাজার মত দিন কাটাতে লাগল। আর, ব্যাপার দেখে, ভয়ের চোটে ডাইনী তার ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেল কে জানে!

দুই চোরের গল্প

(আরব দেশের রূপকথা)

একটি গ্রামে এক সময় দুই চোরের বাস ছিল। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। তারা কেউ কারুর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ করত না। তারপর চুরির মাল নিজেরা সুবিধে মত ভাগ করে নিত। এই দুই চোর ছিল অত্যন্ত ধূর্ত। তারা দিনের বেলা ভালো মানুষ সেজে লোক ঠকাত, আর রাত্রিবেলা মানুষের যথাসর্বস্ব চুরি করে তাকে সর্বস্বান্ত করত। পাড়ার লোকেরা সবাই তাদের চিনত। কিন্তু তাদের কুবুদ্ধির জন্য কেউ তাদের কিছু করতে পারত না।

দুই চোরের বেশ ভালো মতই দিন কাটছিল। শেষে এক সময় দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে এল। চোরেদের দিনও আর চলে না। দুই বন্ধু ভারি মুশ্‌কিলে পড়ল। তারা বসে বসে ভাবতে লাগল কি করে তাদের দিন কাটবে। তারা যখন এইসব দুঃখের কথা বলছে সে সময়ে দেখা গেল একজন বুড়ো লোক সামনের রাস্তা দিয়ে ঠুক ঠুক করে চলেছে। সে আবার বিড় বিড় করে কি যেন মন্ত্র পড়ছে! দেখে মনে হয় লোকটা খুব ধার্মিক।

বৃদ্ধের পেছনে পেছনে তার একটা গাধা চলেছে। গাধার পিঠে মস্ত একটা বোঝা।

চোরেদের একজন বলল, 'আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বুড়োর ঐ গাধাটাকে চুরি করা যাক। তারপর গাধাটা বিক্রি করে ভালোমত ভোজ লাগাব।'

দ্বিতীয় চোর বললে, 'কিন্তু বুড়োর সামনে এই ভর দুপুরে চুরি করবে কি করে?'

প্রথম চোর বললে, 'কিছু ভেব না। যা বলি শুধু তাই শুনে যাও। বুড়ো মাথা নীচু করে চলেছে আর গাধাটা রয়েছে তার থেকে অনেক দূরে। আমি গাধার পিঠ থেকে যখন বোঝাটা আমার ঘাড়ে তুলে নেব, তুমি তখনই গাধাটাকে সরিয়ে ফেলবে। ব্যস্! তারপর সব কাজ আমার।'

ব্যবস্থা মতই সব করা হ'ল। প্রথম চোর



ঐ বুড়োর গাধাটাকে চুরি করা যাক।

যখন গাধার বোঝা নিজের কাঁধে নিয়ে বুড়োর সঙ্গে চলতে লাগল, দ্বিতীয় চোর তখন গাধা নিয়ে তার ঘরে চলে গেল।

বুড়ো এগিয়ে যেতেই এক পরিচিত লোকের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। দু'জনের গল্পে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। তারপর বুড়ো আস্তে আস্তে তার বাড়ির দরজায় এল আর পিছন ফিরে তার গাধাটাকে খুঁজতে গিয়ে সেই চোরকে দেখতে পেল। বুড়ো অবাক্ হ'ল আরও, যখন দেখল গাধার পিঠের সমস্ত মালপত্র এই লোকটির কাঁধে রয়েছে। বুড়ো লোকটাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

চোর তখন বানিয়ে বানিয়ে বললে, 'প্রভু, আমিই আসলে আপনার গাধা। আমি খুব ধনীর ছেলে ছিলাম আর সে জন্য খুব অহংকারও ছিল। সবার ওপর মেজাজ দেখাতাম। একদিন রাগের মাথায় মাকে মারার পরই আমি গাধা হয়ে গেলাম। তারপর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, বাজারে বিক্রি হয়ে, শেষে আপনার কাছে এলাম। আপনি সব সময় প্রার্থনা করে, আমায় মেরে শাসন করে, আবার আমায় মানুষ করে দিলেন। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।'

বুড়ো খুব ধর্মভীরু। সে চোরের দু'হাত ধরে বললে, 'তোমার ওপর ভগবানের অসীম দয়া। চল, আমার ঘরে একটু খাওয়াদাওয়া করবে।'

বুড়ো চোরকে সে দিন অনেক কিছু খাওয়ালে। তার কাছে খেয়েদেয়ে, ঘুমিয়ে, অনেক উপহার নিয়ে চোর বাড়ি ফিরল।

এদিকে পরদিন বুড়ো আবার বাজারে গেল গাধা কিনতে। দেখল, সেখানে তার পুরোনো গাধাটা আবার এসেছে। মনিবকে দেখে সে আনন্দে ডেকে উঠল। কিন্তু বুড়ো গেল বেজায় ক্ষেপে। সে সহজ সরল ধার্মিক মানুষ, তাই ভাবল লোকটা আবার বুঝি কোনও অন্যায় করে গাধা হয়ে গেছে। সে গাধাকে ধমকে উঠল, 'আবার তুই পাপ কাজ করেছিস? আমি আর তোর জন্য প্রার্থনা করতে পারব না।' এই বলে সে অন্য একটা গাধা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

আর চোরেরা? গাধাটা বিক্রি করে সেই টাকায় মস্ত ভোজ লাগিয়ে দিল তারা।

নাক-কেটে-নেওয়া বুড়ো

(বোহেমিয়ার রূপকথা)

এক গ্রামে থাকত এক মস্ত ধনী বুড়ো। ধনী হলে কি হবে, সে ছিল যেমন বদ্‌মেজাজী তেমনি খামখেয়ালি। বুড়োর ছিল এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। একে সুন্দরী, তার ওপর আবার অত টাকার মালিক,—কারণ বুড়োর তো আর ছেলেমেয়ে ছিল না, ভবিষ্যতে তার সমস্ত সম্পত্তি ঐ মেয়েই পাবে,—এজন্য মেয়েটিরও বেশ দেমাক ছিল। বাপের সব ব্যাপারে সেও মাঝে মাঝে ইন্ধন যোগাত।

তা সত্ত্বেও গ্রামের সব ছেলেরা তাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল। অমন সুন্দরী বৌ, আর তার সঙ্গে অত টাকার সম্পত্তি—এ লোভ তো বড় কম নয়! তারা নানা ভাবে বুড়োকে খুশি করবার চেষ্টা করত। নিজে থেকে তার নানা কাজ করে দেবার জন্য এগিয়ে আসত। বুড়ো তা বুঝত এবং তার

পুরো সুযোগ নেবার চেষ্টা করত সব সময়ে। কিন্তু মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে কাউকে পাত্তাও দিত না।

ছেলেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা, যে করে হোক বুড়োকে খুশি করে তার জামাই হতে পারলে সারা জীবনের জন্য নিশ্চিন্ত। তার ওপর টুকটুকে বৌএর লোভ তো আছেই।

ব্যাপার দেখে বুড়ো ভাবল ওদের একটু জব্দ করা যাক। সে ঘোষণা করল—"আমার কাজ করতে হলে তাকে পুরো এক বছর থাকতে হবে। যে কাজ করতে বলব কখনও তাতে আপত্তি করা চলবে না, আর ঐ এক বছরের মধ্যে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়াও চলবে না। যদি কেউ কোন কাজ করতে আপত্তি করে, কিংবা রাগ দেখায় কিংবা এক বছরের আগেই চলে যেতে চায় তা হ'লে যাবার সময় তার নাকের ডগাটি রেখে যেতে হবে। আমি সেটি কেটে রেখে দেব। তবে হ্যাঁ, এক তরফা শর্ত আমি করতে চাই না। আমার বেলাও তাই হবে। আমি যদি কখনও কারো কাজ দেখে রাগ করি, আর এক বছর শেষ হবার আগেই তাকে বিদেয় করে দেবার কথা বলি, তা হলে আমারও নাকের ডগাটি সে কেটে রাখতে পারবে।"

মুখে বলল বটে, কিন্তু বুড়ো আর তার মেয়ে দু'জনেই জানত সে রকম ঘটনা কখনও ঘটবে না। বুড়োর ব্যবহারে ওরাই পালাই পালাই করতে পথ পাবে না।

হঠাৎ শুনলে মনে হবে শর্তটা এমন কিছু কঠিন নয়, কিন্তু আসলে যে তা নয় তা দু'দিনেই টের পাওয়া গেল। জামাই হবার লোভে দু'-একজন বেপরোয়া ছোকরা একে একে ঐ শর্তে রাজী হয়ে কাজে লাগল। কিন্তু বুড়ো তাদেরকে এমন কঠিন কঠিন কাজ দিতে লাগল আর এমন দুর্ব্যবহার শুরু করল যে দু'দিনেই তিতবিরক্ত হয়ে তারা কাজ ছেড়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু বুড়ো তাদের অমনি ছাড়ল না, শর্ত মত চলে যাবার সময় তাদের নাকের ডগাগুলো কেটে রেখে দিতে লাগল।

এই ভাবে একে একে গ্রামের অনেক ছোকরাই এল, কিন্তু কেউ এঁটে উঠতে পারল না বুড়োর সঙ্গে। নাকের ডগাটি খুইয়ে সবাইকেই অসময়ে চলে যেতে হ'ল কাজ ছেড়ে। শেষে আর কাউকে এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাতে দেখা গেল না।

একজন ছাড়া। তার নাম কলিন্থ। ছেলেটি ভারি চালাকচতুর, আর সুন্দরী বৌ-এর ওপর তার ভারি লোভ। সে একদিন এসে বুড়োর কাছে প্রস্তাব করল, সে ঐ শর্তেই কাজ করতে রাজী।

বুড়ো বলল, "জান তো বাবাজী, অনেকেই তোমার মত গোড়ায় বাহাদুরী দেখাতে এসে শেষে নাকের ডগাটি রেখে চলে যেতে পথ পায় নি। ভালো করে ভেবেচিন্তে দেখ। আমি কিন্তু এ বিষয়ে খুব কড়া। শেষে কোন কাকুতিমিনতির ধার ধারব না।"

কলিন্থ বলল, হ্যাঁ, সে রাজী। আজই তাকে কাজে বহাল করা হোক।

বুড়ো বলল, "বেশ। এখন বসন্ত কাল, অর্থাৎ কোকিল ডাকার সময়। ঐ তো কোকিলের ডাক শুনতে পাচ্ছ, তাই না?

তার মানে, এক বছর পরে ফের যখন কোকিল ডাকতে শুরু করবে তখন তোমার ছুটি। এর মধ্যে চলে যেতে পারবে না কিন্তু।"

কলিন্থ বলল, "হ্যাঁ, সেই শর্তেই তো কাজে লাগছি।"

সেদিন থেকেই বুড়ো কলিন্থকে কাজে বহাল করল আর যত রকমের বিদঘুটে, উদ্ভট এবং কঠিন কঠিন সব কাজের ভার দিতে লাগল তার ওপর। তার মেয়ে লিলিয়ানও হ'ল এ কাজে বাপের সহায়।

কলিন্থ কিন্তু খুশিমনেই সব কাজ করে যেতে লাগল। সন্ধ্যার পর বুড়ো তার স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে টেবিলে খেতে বসেছে। সারাদিন সে কলিন্থকে কিছুই খেতে দেয় নি, এখনও কিছু দিল না। । উপরন্তু পরিহাস করে বলল, "কি হে, কেমন লাগছে? খাওয়াদাওয়া ঠিক মত হয়েছে তো? পেটটেট ভরেছে?"

কলিন্থ বলল, "ভারি ভালো লাগছে আপনার কাজ করতে; আর খাওয়াদাওয়াও তো দেখছি আপনার বাড়িতে চমৎকার!" বলেই, কথা নেই বার্তা নেই, উঠে গিয়ে সে লিলিয়ানের সামনে থেকে একথালা খাবার তুলে নিয়ে এসে আরাম করে খেতে বসল।

লিলিয়ান চেঁচিয়ে উঠল, আর বুড়োও রেগে কাঁই। "কী আস্পর্ধা তোমার! আমাদের না বলে আমাদের খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছ!"

কলিন্থ বলল, "ও, আপনি রেগে যাচ্ছেন? বেশ, আমি খাব না। কিন্তু আপনার শর্ত মানতে হবে। আপনার নাকের ডগাটি আমায় কেটে নিয়ে যেতে দিন।"

বুড়ো এতটা ভাবতে পারে নি। প্রথমটা চমকেই উঠেছিল, তার পর সামলে নিয়ে বলল, "না না, আমি তো মোটেই রাগ করি নি। বরঞ্চ খুশিই হয়েছি। তুমি খাও খাও।"

লিলিয়ান বাপের কথায় ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু এ ছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে?

পরদিন বুড়ো কলিন্থকে ডেকে বলল, "দেখ হে ছোকরা, আমরা আজ শহরে বেড়াতে যাচ্ছি। বাগানে অনেক কলিফ্লাওয়ার (ফুলকপি) আছে। তুমি সেই কলি নিয়ে এসে ভালো করে স্টু রাঁধবে। আমরা ঐ স্টু খেতে খুব ভালোবাসি। দেখো, যেন ভালো রান্না হয়।" এই বলে সে তার মেয়ে আর বৌকে নিয়ে শহরে চলে গেল।

এদিকে কলিন্থ দেখল বাগানে একটাও ফুলকপি নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেল না। সে বুঝল তাকে জব্দ করার জন্য বুড়োর এ একটা কৌশল। তখনই তার মাথায় এক মতলব এল। বুড়োর দু'টো কুকুর ছিল—কলি আর মলি। সে সেই কলিটাকে কেটে বেশ করে মশলাটশলা মাখিয়ে স্টু বানিয়ে রাখল।

শহর থেকে ফিরে বুড়ো খেতে বসেই জিজ্ঞেস করল—"স্টু রাঁধা হয়েছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তবে নিয়ে এস।"

কিন্তু এক টুকরো মুখে দিয়েই সে থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। "এ কী ছাই রেঁধেছ! এ তো মানুষের খাবার মত হয় নি, হয়েছে কুকুরের খাওয়ার মত।" বলেই সে ডাকতে লাগল, "এই কলি, এই মলি! নে, খেয়ে যা।"

কলিন্থ বলল, "কলিকে আবার ডাকছেন কেন? তাকেই তো বাগান থেকে এনে কেটে

এই স্টু রান্না করেছি। আপনিই তো বলে গেলেন!"

"কি! কি বললে? আমার কলিকে তুমি কেটে রান্না করেছ! এত বড় সাহস তোমার?"

কলিন্থ সহজ ভাবে বলল, "ও, আপনি তো দেখছি খুব রেগে গেছেন। তা হলে বলুন, আমি চলে যাই। ছুরিটা নিয়ে আসি, আপনার নাকের ডগাটি কেটে নিয়ে যেতে হবে তো!"

বুড়ো তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "কী যে বল, আমি আবার রাগলাম কোথায়? একটু ঠাট্টা করছিলাম।"

পরদিন বুড়ো আবার শহরে যাবে। কলিন্থকে আজ আর ঘাঁটাতে ইচ্ছে নেই তার। সে বলল, "শোন হে ছোকরা, তুমি তো বড় বেশি চালাক দেখছি! তা আজ আর তোমাকে অন্য কোন কাজ করতে হবে না। আমার বাড়িতে অন্য লোকেরাও তো কাজ করছে, তুমি সেই কাজই খানিকটা করে রেখ।"

কলিন্থ দেখল কয়েকজন মিস্ত্রী একটা ভাঙ্গা ঘরের চাল ফেলে দিচ্ছে নতুন করে ছাইবে বলে। অমনি সে গিয়ে বুড়োর সবচেয়ে ভালো ঘরটার চাল খুলে ফেলে দিতে লাগল। দেখতে দেখতে সমস্ত ঘরটার ছাদ একেবারে ফাঁকা।

বুড়ো ফিরে এসে ব্যাপার দেখে রেগে টং। "এ কি কাণ্ড করেছ তুমি!"

"কেন, অন্য লোকেরা যে কাজ করছে তাই তো করতে বলে গেলেন আমাকে! আপনি কি রাগ করলেন? তা হলে চলি, তবে আপনার নাকের ডগাটি কিন্তু চাই।"

বুড়ো উদ্যত ক্রোধ কোন রকমে চাপা দিয়ে বলল, "না না, রাগ করব কেন? রাগ করি নি তো! এমনি বলছিলাম।"

এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। কলিন্থের পাল্লায় পড়ে বুড়ো রোজই নাজেহাল হচ্ছে। তাকে রাগাবার চেষ্টা করলে সে মোটেই রাগে না, যত কঠিন কাজই দেওয়া যাক না কেন এমন কৌশলে তার সমাধান করে যে কিছু আপত্তি করা যায় না। এ যে মহা মুশ্‌কিল! কি করে এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে?

একদিন বাপে মেয়েতে বসে এই আলোচনাই হচ্ছিল। হঠাৎ লিলিয়ান বলল, "আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না? তুমি তো বলেছিলে ফের যখন কোকিলের ডাক শোনা যাবে তখনই বোঝা যাবে বছর ফুরিয়েছে। তখনই ও যেতে পারবে। তা আমি যদি বাগানে গিয়ে লুকিয়ে কোকিলের ডাক ডাকি তা হলেই তো হয়। আমি ঠিক কোকিলের মত ডাকতে পারব, কেউ ধরতে পারবে না।"

মেয়ের বুদ্ধি দেখে বুড়ো খুব খুশি।

পরদিন সকালে কলিন্থ বুড়োর সঙ্গে কথা বলছে, এমন সময় দূরের বাগান থেকে কোকিলের ডাক ভেসে এল—কু-উ! বুড়ো বলল, "আরে, কোকিল ডাকছে যে! তবে তো বসন্ত কাল এসে পড়েছে! তোমারও এক বছর শেষ হ'ল। এবার তবে তোমার ছুটি।"

কলিন্থ বলল, "তাই তো! তা হলে তো আমায় পাততাড়ি গোটাতেই হবে। কিন্তু—কিন্তু কোকিলটা যেন বড় তড়াতাড়ি ডেকে উঠল! এ রকম আগে-আসা কোকিল তো একটা দেখবার জিনিস! আমি যাই, চট্ করে বাগানটা একবার দেখে আসি। দেখি কোকিলের সাক্ষাৎ পাই কিনা।"

বুড়ো কিছু বলবার আগেই কলিন্থ বাগানে

গিয়ে হাজির। লিলিয়ান একটা লিকলিকে ঝোপড়া গাছের ওপর উঠে তখনও কু-উ কু-উ করছে। কলিন্থ পায়ে পায়ে গিয়ে হঠাৎ গাছটা ধরে প্রবল ভাবে ঝাঁকানি দিতে লাগল। আর অমনি লিলিয়ান গাছ থেকে একেবারে মাটিতে। কলিন্থ তাকে জাপ্টে ধরে চেঁচাতে লাগল—"কোকিল ধরেছি গো, কোকিল ধরেছি।"

শুনে বুড়ো ছুটে এল আর রাগে ফেটে পড়ল। —"কি, তোমার এত বড় সাহস, আমার মেয়েকে নিয়ে এমনি ঠাট্টা শুরু করেছ!"

কলিন্থ লিলিয়ানকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "ও, আপনি বুঝি রেগে গেছেন?"

বুড়ো তখনও রাগে কাঁপছে। বলল, "হ্যাঁ, রেগে গেছি। একশ' বার রেগে গেছি। হাজার বার। বেয়াদপ্ ছোকরা! বেরোও বাড়ী থেকে।"

লিলিয়ান তাকে থামাবার চেষ্টা করে বলল, "বাবা, কি বলছ তুমি আবোলতাবোল?"

"না, আমি ঠিকই বলছি। ঐ বেয়াদপ্‌টাকে না তাড়িয়ে আমি জলস্পর্শ করব না।"



না, আমি ঠিকই বলছি···

কলিন্থ এবার অত্যন্ত গোবেচারার মত বলল, "ও, আমাকে চলে যেতে বলছেন? তা হলে ছুরিটা নিয়ে আসি।"

এতক্ষণে বুড়োর খেয়াল হ'ল রাগের মাথায় সে কি বলে ফেলেছে। কিন্তু তখন আর কথা ফেরাবার উপায় নেই। সে বলল, "ঘাট হয়েছে। তুমি আমার যতগুলি ভেড়া, ছাগল, গরু চাও তোমাকে দিচ্ছি, মানে মানে সরে পড়।"

কলিন্থ বলল, "ও সব আমার কিচ্ছু চাই না। আমি চাই শর্ত মত আপনার নাকের ডগাটি—যা আপনি এর আগে অনেক ছোকরার কাছ থেকে আদায় করেছেন।"

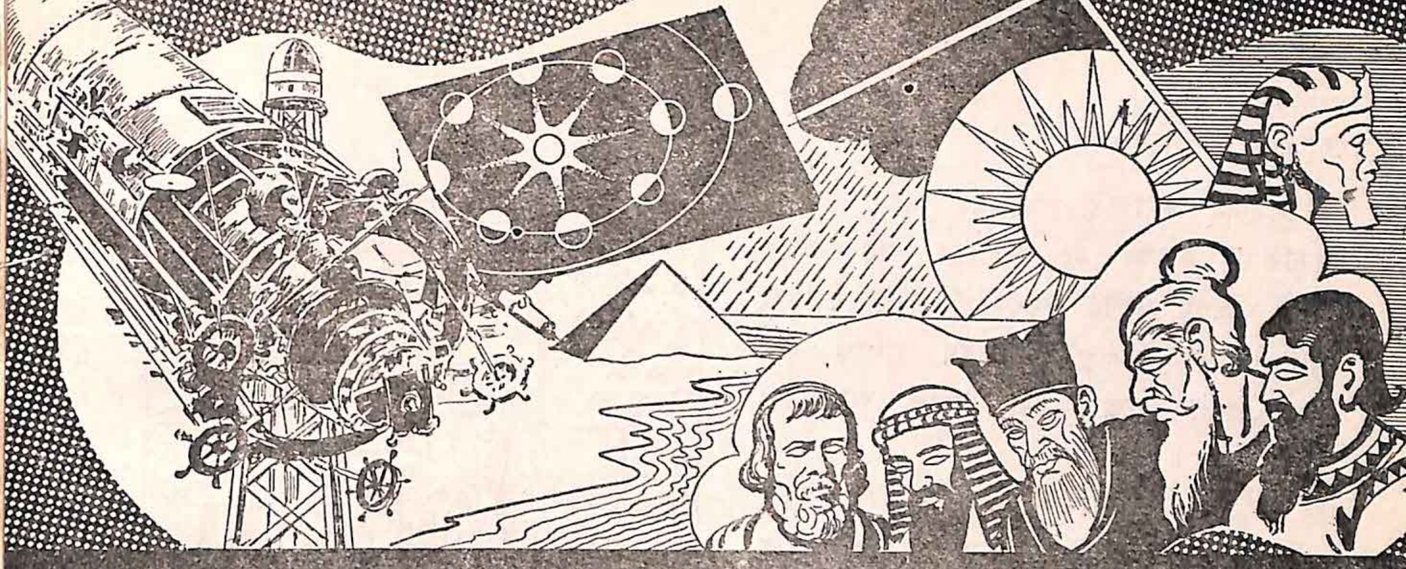
"আচ্ছা, নাকের বদলে কি পেলে আমায় রেহাই দেবে বল? কত টাকা চাই তোমার?"

কলিন্থ বলল, "কিচ্ছু চাই না, আমি শুধু চাই আপনার নাকের ডগাটি। আমি এখনই ছুরিটা নিয়ে আসছি।"

এমন সময় লিলিয়ান বুড়োর কানে কানে কি যেন বলল। বুড়ো একটু থমকে, শেষে বলল, "আচ্ছা, যদি আমার মেয়েকে দিই?"

এবার এক গাল হেসে কলিন্থ বলল, "এ কথাটা আগে বললেই তো সব ল্যাঠা চুকে যেত। অমন বৌ পেলে আপনার নাকের ডগা কে চায়?"

অগত্যা কি আর করা? বুড়ো বাধ্য হয়েই কলিন্থের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিল। কলিন্থ খুব খুশি। সুন্দরী বৌ আর তার সঙ্গে অঢেল সম্পত্তি। আর লিলিয়ান? যতই দেমাক থাক তার, এমন একটি চালাক স্বামী পেয়ে সেও খুব খুশি।



অঙ্ক শাস্ত্রের কথা

আধুনিক যুগের অঙ্ক

আমরা এর আগে এই বইএর অন্যান্য খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যসমাজে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে যে-সব চর্চা হয়েছে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। আধুনিক অঙ্কের প্রাথমিক ধারণা সম্বন্ধেও সেকালকার পণ্ডিতেরা যে নানাভাবে চিন্তা করেছেন তারও উল্লেখ করা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, অঙ্ক সম্বন্ধে সে সময়কার চিন্তাধারা আজ পর্যন্তও কোন কোন ক্ষেত্রে অবিকৃত রয়ে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ ইউক্লিডের সমতল জ্যামিতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের স্কুলে এখনও ওই ধরনের জ্যামিতিই পড়ানো হয়ে থাকে। এবারে একটু আধুনিক অঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

অঙ্কের তিনটি ধারা—পাটিগণিত, বীজগণিত এবং জ্যামিতি কি এবং এর মূল কথাগুলো কি ধরনের তাও আগে বলা হয়েছে। উচ্চতর অঙ্কই হোক বা নীচু ক্লাশের অঙ্কই হোক, পাটিগণিতের চারটি নিয়ম,—অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ যে সব রকম অঙ্কেই লাগে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার জ্যামিতি এবং বীজগণিতের সাধারণ নিয়মগুলোও উঁচু পর্যায়ের জ্যামিতি বা বীজগণিতে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

উঁচু পর্যায়ের অঙ্ক

উঁচু পর্যায়ের অঙ্ক বা হায়ার ম্যাথেমেটিক্স্ কথাটি খানিকটা তুলনামূলক। কোন স্কুলের শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কাছে এ সম্বন্ধে বলতে গেলে বলবেন, "কলেজে তোমরা উঁচু পর্যায়ের অঙ্ক সম্বন্ধে জানতে পারবে।" অর্থাৎ বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি, ক্যালকুলাস, থিওরী অফ্ ইকোয়েশন প্রভৃতিকেই তিনি হয়তো উঁচু পর্যারের অঙ্ক হিসেবে নাম করবেন। আবার একজন কলেজের অধ্যাপক কিন্তু এ সবকে উঁচু পর্যায়ের অঙ্ক বলবেন না। তাঁর কাছে এ-সব নিতান্তই প্রাথমিক বা এলিমেণ্টারী বিষয়। তিনি তাঁর ছাত্রদের বলবেন, "উঁচু পর্যায়ের অঙ্ক হ'ল ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন, অ্যাবষ্ট্রাক্ট অ্যালজেবরা, থিওরী অফ ফাংশন, নন্-

ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতি, থিয়োরী অব্ নাম্বার্স্ প্রভৃতি।” কাজেই উঁচু পর্যায়ের অঙ্ক বলতে একটা বিশেষ শ্রেণীর অঙ্ককে নিশ্চয়ই বোঝায় না। এজন্যে নিতান্তই সাধারণ অঙ্ককে বাদ দিয়ে এগুলি সম্বন্ধে আমরা সামান্য আলোচনা করব।

বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি

স্কুলে যে জ্যামিতি পড়ানো হয় তা হচ্ছে সমতল জ্যামিতি। কোন জ্যামিতিক চিত্রকে বীজগণিতের ফর্মুলা দিয়ে প্রকাশ করার রীতিকেই সাধারণ ভাবে বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি বলা হয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় 'অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রী'। একাদশ শতাব্দীর আগে কেউ বড় একটা ভাবেন নি যে একটি বিন্দু বা একটি সরলরেখাকে একটি সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে বা একটি সংখ্যার মান একটি জ্যামিতির চিত্র দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। পারস্য দেশের কবি ওমর খৈয়াম-এর নাম কে না জানে? তাঁর রুবাইয়াৎ পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। কিন্তু অনেকেই হয়তো জানে না যে ওমর খৈয়াম ছিলেন সেকালের একজন নামকরা গণিতজ্ঞ। তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন যে নানারকম জ্যামিতির চিত্র,—যেমন বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতি দিয়ে বীজগণিতের সমাধান করা যায়।

ওমর খৈয়াম দেহত্যাগ করলেন ১১২৩ খৃষ্টাব্দে। এরপর প্রায় চার শ' বছর কেটে গেল, অঙ্কশাস্ত্রের এ ধারাটির দিকে কারও তেমন নজর পড়ল না। ফরাসী দেশের নামকরা



কবি ওমর খৈয়াম ছিলেন বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণার প্রবর্তক।

দার্শনিক এবং গণিতজ্ঞ দে কার্তের নজর কিন্তু এড়িয়ে গেল না এ ব্যাপারটি থেকে। তিনি এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করে যে বইখানা রচনা করলেন তার প্রকাশকাল ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দ। এবারে সব দেশের গণিতজ্ঞদের চোখ খুলে গেল। তাঁরা ভেবে অবাক্ হলেন যে এ হেন সহজ ব্যাপারটা এতকাল ধরে কি করে তাঁদের নজর এড়িয়ে ছিল?

ব্যাপারটা সত্যিই খুব সহজ

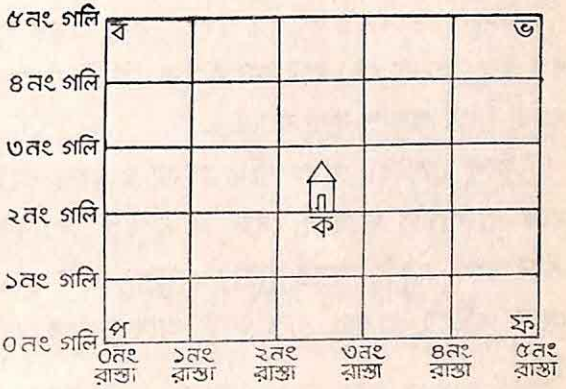
বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি নামটা বেশ গালভারী, অথচ ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ। ছোট একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

কলকাতার মত বড় শহরে কোন একটি বাড়ির খোঁজ করতে হলে শুধু রাস্তা এবং তার

নম্বরটি জানলেই সব হয় না, সঙ্গে সঙ্গে পথ-নির্দেশও থাকা দরকার। যেমন, কেশব সেন স্ট্রীটের অমুক নম্বরের বাড়িটি খুঁজতে সুবিধা হয় যদি জানা থাকে যে আমহার্স্ট স্ট্রীট এবং কেশব সেন স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে পূবদিকে তিনখানা বাড়ির পরের বাড়িটিই হ'ল সেই বাড়ি। কিন্তু এখানেও একটা অসুবিধে দেখা দেবে। কেউ যদি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের দিক্ দিয়ে বাড়িটির হদিস পেতে চায় তবে তাকে নির্দেশ দিতে হবে অন্য ভাবে। বলতে হবে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড এবং কেশব সেন স্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে পশ্চিম দিকে এতগুলো বাড়ির পরই হ'ল আমাদের নির্দিষ্ট বাড়িটি। বাড়িটি রাস্তার কোন্ ধারে, একেবারে রাস্তার ওপরে, না একটু গলির ভিতরে—এ-সব খুঁটিনাটি বিষয় থাকলে ব্যাপারটা আরও সহজ হবে।

আমাদের বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি হ'ল অনেকটা এই ধরনের।

ওপরের ছবিটির দিকে লক্ষ করলেই বিষয়টা তোমাদের কাছে সহজ হবে। ছয়টি সমান্তরাল রাস্তার নাম দেওয়া হ'ল ০, ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ নম্বরের রাস্তা, আর তাদের ওপরে লম্বভাবে অবস্থিত ছয়টি গলির নাম দেওয়া হল ০, ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ নম্বরের গলি। 'ক' চিহ্নিত বাড়িটির পথনির্দেশ দিতে হবে। আমরা বলতে পারি, বাড়িটি হ'ল ২ নম্বরের গলির ওপর এবং ২ এবং ৩ নম্বর রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায়। ধরা যাক, ছবিতে দেখানো প্রতি দু'টি রাস্তা বা গলির ভিতরে দূরত্ব এক ইঞ্চি করে। তা হলে 'ক' বাড়িটির অবস্থান হ'ল প বিন্দু থেকে



'ক' চিহ্নিত বাড়িটি ২ এবং ৩ নম্বর রাস্তার মাঝামাঝি এবং ২ নম্বর গলির ওপরে।

০ নম্বরের রাস্তা ধরে ২ ইঞ্চি গিয়ে তারপর ২ নম্বরের গলি ধরে ২½ ইঞ্চি ডানদিকে যেতে হবে। তা হলে 'ক' বাড়িটিকে এমনি ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—ক (২½, ২)। ০ নম্বরের রাস্তা এবং ০ নম্বরের গলির সংযোগস্থলটি হ'ল প বিন্দু। বিন্দুটিকে প (০, ০) নামে প্রকাশ করা যায়। এমনি ভাবে প্রতিটি রাস্তা এবং গলির সংযোগস্থলকে এক একটি বিশেষ সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব। অবশ্য নির্দিষ্ট একটি রাস্তা এবং একটি গলি (এক্ষেত্রে ০ নম্বরের রাস্তা এবং ০ নম্বরের গলি) থেকেই গণার কাজ শুরু করতে হবে। আবার রাস্তা এবং গলি পরস্পরকে যে সব সময় লম্বভাবে ছেদ করবে এমন কোন কথা নেই। যে কোন মাপের কোণ উৎপাদিত হতে পারে রাস্তা এবং গলির মধ্যে।

এখানে আরও একটা ব্যাপারের দিকে নজর দিতে হবে। প বিন্দু থেকে ওপর এবং ডান দিকের গণার কাজ প্রকাশ করতে হয় ধনাত্মক সংখ্যা দিয়ে এবং নীচের এবং বাঁ দিকের গণার সংখ্যাগুলো হবে ঋণাত্মক সংখ্যা।

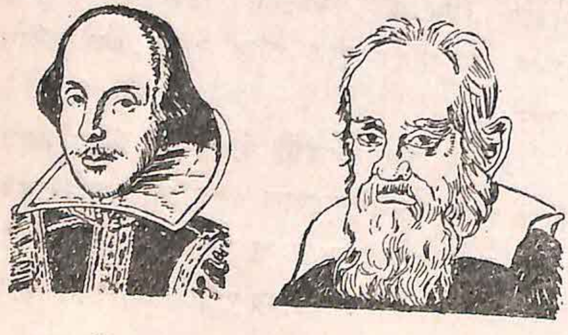
বিন্দুর মত এমনি ভাবে কোন ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত এবং অন্যান্য যে কোন জ্যামিতিক চিত্রই অঙ্কের সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

স্কুলে তোমরা যে লেখচিত্র বা গ্রাফের অঙ্ক করে থাক ব্যাপারটা আসলে সেই জিনিসই। কাজেই এমন সহজ একটা অঙ্কের ধারা সেকালের পণ্ডিতদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া বাস্তবিকই আফশোসের বই কি!

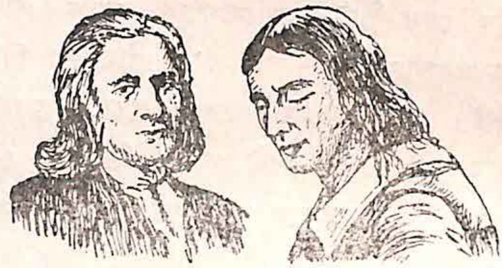
দে কার্তে

এমন সহজ ব্যাপারটা নিয়ে যিনি প্রথম গবেষণার কাজ করেছেন, আগেই বলেছি, তিনি ফরাসী দেশের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ রেনি দে কার্তে। দে কার্তের জন্ম ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ। তাঁর বাবার আর্থিক অবস্থা মোটামুটি খারাপ ছিল না। তবে জন্মের কয়েকদিন পরেই তাঁর মা মারা যান, তাই রেনিকে দেখাশোনার ভার পড়েছিল একজন পাকা আয়ার হাতে। ছোটবেলা রেনির স্বাস্থ্য ছিল ভীষণ রোগাটে, যার জন্যে সে-সময়ে লেখাপড়ায় তিনি ততটা এগিয়ে যেতে পারেন নি।

দে কার্তের সময়টা ছিল ইয়োরোপের এক জটিল সময়। পুরানো দিনের ধ্যান-ধারণা ক্রমে ক্রমে কালের গর্ভে মিলিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু নতুন চিন্তাধারাও তেমনটি শক্ত মাটিতে ভিত গাড়তে পারছিল না। অবশ্য ইয়োরোপের নানা অংশে নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যে। এ সাড়ায় অংশগ্রহণ করেছেন সর্বকালের কয়েকজন মনীষী। একটি হিসেব দিলে মন্দ হয় না। দে কার্তের বয়স যখন কুড়ি বছর তখন শেক্স্পিয়ার মারা যান; গ্যালিলিওর মৃত্যুর পর আট বছর বেঁচে ছিলেন যে কার্তে। দে কার্তের বয়স যখন বারো বছর তখন জন্মগ্রহণ করেন মিল্টন। অন্যদিকে দে কার্তে যে বছর মারা যান সে বছর নিউটন পড়েন আট বছর বয়সে।



শেক্স্পিয়ার গ্যালিলিও



নিউটন মিল্টন

সে যাই হোক, স্কুলের পড়া শেষ করে দে কার্তে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করবার জন্যে সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করেন। অনেক যুদ্ধ তিনি করেছেন; যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্বও নেহাৎ কম অর্জন করেন নি। কিন্তু সবার ওপরে ছিল তাঁর অঙ্ক। আগেই বলা হয়েছে যে বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতির তিনি ছিলেন স্রেষ্টা। এক কথায় বলা যায়, আধুনিক গণিতের শুরুই হয় দে কার্তের এই বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতি থেকে। ১৬১৯ খৃষ্টাব্দেই তিনি এই কাজটি করেছিলেন। ভাবতে অবাক্ লাগে, যে লোকটি চিরদিন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি

লড়াই করে কাটিয়েছেন তাঁর চিন্তা থেকেই বেরিয়েছিল এমনি ধরনের উঁচুস্তরের একটা অভিনব বিদ্যা! শত্রুর একটিমাত্র গুলি স্বচ্ছন্দে তাঁর সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, তেমনটি হতে তিনি দেন নি। হলে, আধুনিক অঙ্কশাস্ত্র আজ যেমনটি আমরা দেখছি তা যে সহজে সে রকমটি হ'ত না তা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অঙ্কের ব্যাপারে দে কার্তের দান যে কতখানি তা বলে বোঝানো যায় না।

১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ৫৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন দে কার্তে স্টকহোম শহরে। এ সময়ে তিনি সুইডেনের রাণী ক্রিস্টিন-এর শিক্ষকতাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরেজিতে তিনটি শব্দ ব্যবহার করলেই নাকি দে কার্তে সম্বন্ধে সব কিছু বলা হয়ে যায়। শব্দ তিনটি হ'ল জেন্টলম্যান, সোল্‌জার এবং ম্যাথেমেটিশিয়ান।

ত্রি-মাত্রিক জ্যামিতি

দে কার্তের অঙ্কের যে উদাহরণটি আমরা আগে দিয়েছি তা সমতলের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু যদি কোন বিন্দু বা কোন জ্যামিতিক চিত্র শূন্যের মধ্যে আঁকা যায় তবে আগের মত রাস্তা এবং গলিকে নির্দিষ্ট বলে ধরে নিলেই শুধু চলবে না, এ ক্ষেত্রে দু'টি নির্দিষ্ট জিনিসের বদলে তিনটি নির্দিষ্ট রেখা দরকার হবে। আগের উদাহরণে 'ক' বাড়িটিকে ক (২২/৩, ২) দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম। এ ক্ষেত্রে বলতে হবে, ক (২২/৩, ২ এবং অন্য একটি সংখ্যা)। এ ধরনের জ্যামিতিকে আমরা বলব বিশ্লেষাত্মক ঘন জ্যামিতি। এমনি ধরনের আরও নানা ধরনের জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছে। তা ছাড়া অতি-আধুনিক কালে নানা দেশের গণিতজ্ঞেরা আরও নতুন ধরনের জ্যামিতির কথা বলেছেন। এমনি ধরনের জ্যামিতিকে এক কথায় বলা হয় 'নন্‌-ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতি', অর্থাৎ এমন জ্যামিতি যা ইউক্লিডের নয়।

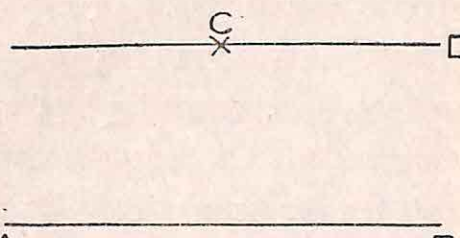
নন্‌-ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতি

ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে কতকগুলো ব্যাপার বিনা প্রমাণে মেনে নিতে হবে প্রথমে। এদের বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ, অর্থাৎ এগুলো ধ্রুব সত্য, অঙ্ক দিয়ে এর কোন প্রমাণ দেওয়া যাবে না। যাকে বলা হয়, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না গোছের আর কি!

কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধ্রুব সত্য বলে কিছু আছে কি?

একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

ইউক্লিডের একটি সিদ্ধান্ত হ'ল, কোনও একটি সরলরেখার বহিঃস্থ কোনও বিন্দু থেকে একটি মাত্র সমান্তরাল সরলরেখা আঁকা যেতে পারে।



ইউক্লিড বললেন, C বিন্দুর ভিতর দিয়ে AB সরলরেখার সমান্তরাল একটিমাত্র সরলরেখা আঁকা যায়।

ইউক্লিড নিজেই এ ব্যাপারটার একটা যুক্তিযুক্ত প্রমাণ খাড়া করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। পরবর্তীকালে অন্যান্য গণিতজ্ঞেরাও অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁরাও, ইউক্লিডের মতই, অকৃতকার্য হয়েছেন। ফলে ইউক্লিডের সেই

ধ্রুব সত্যগুলি ধ্রুব সত্যই রয়ে গেল। তার মানে, প্রমাণ ছাড়াই এগুলো সকলে মেনে নিলেন।

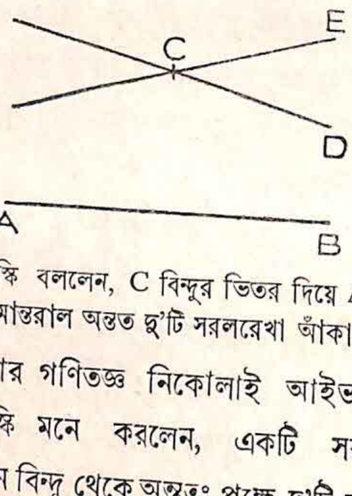
অঙ্কের মত 'সব বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান' সম্বন্ধে এমনি ধরনের একটা নিতান্তই অবৈজ্ঞানিক কথা মেনে নেওয়া যায় কি করে?

কাজেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অন্য ভাবে বিচার করা যেতে পারে। ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলির বদলে আমরা যদি কতকগুলি যুক্তিপূর্ণ ধারণার আশ্রয় নিই তবে 'ধ্রুব সত্যের' ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কোন বিশেষ খেলা, যেমন ধর ফুটবল খেলা,—সম্বন্ধে কতগুলো বিশেষ আইনকানুন মেনে নিতে হয়। আইনকানুনগুলো ধ্রুব সত্যও যেমন নয়, আকাট মিথ্যেও নিশ্চয়ই নয়। কারণ ফুটবল সম্বন্ধে আইনগুলো সত্যি হলেও হকির বেলা সেগুলো কোন কাজে লাগবে না। তবে আইনগুলো তৈরি করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে একটি বিধি যেন অন্য একটির বিপরীত কথা না বলে।

তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? ফুটবল নামে একটি খেলা সম্বন্ধে কিছু আইনকানুন রচনা করা হ'ল, অর্থাৎ কতগুলো যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার মেনে নেওয়া হ'ল। এবং এগুলো সকলে মেনে নেওয়ায় ফুটবল খেলা চলল। কেউ শীল্ড পেল, কোনও দল লীগ্ চ্যাম্পিয়ন হ'ল, কোনও দল হেরে ভূত হয়ে গেল। অথচ এত সব ব্যাপার-স্যাপারের মূলে রয়েছে কিন্তু কতগুলো যুক্তিপূর্ণ ধারণা।

এমনি ভাবে বিচার করলে ইউক্লিডের জ্যামিতির অসঙ্গতির দিক্‌টা তেমন বড় করে আমাদের চোখে পড়বে না।

বিনা প্রমাণে কোন কিছু মেনে নিয়ে তার সাহায্যে অন্য সত্য আবিষ্কার করার এই যে নিয়ম, এর ফলে অন্য ধরনের জ্যামিতি তৈরি হ'ল। ইউক্লিডের যে স্বতঃসিদ্ধটির কথা আগে উল্লেখ করেছি সেখানে যেমন একটা ব্যাপার ধরে নেওয়া হয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে জার্মেনির এক নামকরা গণিতজ্ঞ বার্নহার্ড্ রীমান ধরে নিলেন যে দু'টি সরলরেখা কোনদিন কোনক্রমেই সমান্তরাল হবে না। এর প্রমাণ তো দরকার নেই, কারণ ইউক্লিডের মত রীমানেরও এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বা একটি ধারণা মাত্র। এই ধারণাটির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠল যে জ্যামিতি তার নাম দেওয়া হ'ল রীমানের জ্যামিতি।



লোবাচেভস্কি বললেন, C বিন্দুর ভিতর দিয়ে AB সরল রেখার সমান্তরাল অন্তত দু'টি সরলরেখা আঁকা যায়।

রাশিয়ার গণিতজ্ঞ নিকোলাই আইভ্যানোভিচ লোবাচেভস্কি মনে করলেন, একটি সরলরেখার বহিঃস্থ কোন বিন্দু থেকে অন্ততঃ পক্ষে দু'টি সমান্তরাল সরলরেখা আঁকা যেতে পারে। এই ধারণার ওপর নির্ভর করে আর এক ধরনের জ্যামিতির সৃষ্টি হ'ল। এমনি ধরনের নানা জ্যামিতিকে বলা হয় নন্-ইউক্লিডিয়ান্ জ্যামিতি।

একটি সহজ উদাহরণ

ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং রীমানের জ্যামিতি সম্বন্ধে একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।



অবনীন্দ্রনাথ
শিল্পী—যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

কোন সমতলের ওপর AB একটি সরলরেখা, C হ'ল সরলরেখাটির বাইরের একটি বিন্দু। ইউক্লিড বলেছেন, C বিন্দুর ভিতর দিয়ে AB-র সমান্তরাল করে একটি মাত্র সরলরেখা আঁকা যাবে। CD হ'ল সেই সরলরেখাটি। রীমান বললেন, CD সরলরেখা AB সরলরেখাকে দু'টি বিন্দুতে ছেদ করবে। তারপর এই অনুমানের ওপর নির্ভর করে তিনি যুক্তিগ্রাহ্য এবং প্রমাণ করার যোগ্য বহু তত্ত্বের অবতারণা করলেন।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠবে। দেখা যাচ্ছে, CD রেখা AB রেখার সমান্তরাল, অর্থাৎ উভয় দিকে বাড়িয়ে দিলে CD কোনকালেই AB-কে ছেদ করবে না। দেখছি ঠিকই, কিন্তু এর তো কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু আমরা যা কিছু দেখছি তা কি সব সময় ঠিক ঠিক দেখি? নাস্তিকরা বলবেন, ভগবান্‌কে দেখা যায় না, অতএব তিনি নেই। আস্তিকরা মেনে নেবেন এ কথা? নিশ্চয়ই নয়। ইউক্লিড যখন প্রমাণ দিতে পারেন নি যে AB এবং CD সমান্তরাল, তখন রীমানও প্রমাণ দেবেন না যে AB এবং CD সমান্তরাল নয়। তিনি বললেন, ও দু'টি অসীমে গিয়ে একে অন্যকে ছেদ করবে।

তোমরা আর একটা প্রশ্ন করতে পার। তিন ধরনের জ্যামিতির মধ্যে কোন্‌টা ঠিক? আমরা এক কথায় উত্তর দেব, তিনটেই ঠিক। ইউক্লিডের জ্যামিতি দিয়ে কোন কোন ব্যাপারের ব্যাখ্যা সহজ, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রীমান বা লোবাচেভস্কির জ্যামিতি বেশি কাজের। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদের কোন কোন ব্যাপারে রীমানের জ্যামিতি বিশেষ কাজে লেগেছে।

শুধু সরলরেখার ক্ষেত্রেই নয়, বিন্দু, দূরত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধেও অনেক নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তন হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে।

ক্যালকুলাস

আধুনিক গণিতের একটি প্রধান শাখা হ'ল ক্যালকুলাস। ক্যালকুলাসের আবার রয়েছে প্রধানত দু'টি বিভাগ—ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস ও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস। ক্যালকুলাসের প্রাথমিক ধারণার উল্লেখ রয়েছে প্রাচীনকালের হিন্দু গণিতজ্ঞদের কাজের মধ্যে। সে কথার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৪)।

খৃষ্ট-জন্মের প্রায় পাঁচশ' বছর আগে গ্রীক্ দার্শনিক জেনো একটি অদ্ভুত অঙ্কের ধাঁধার কথা বলেছিলেন। ধাঁধাটি এই রকম:

ধরা যাক, একটি লোক এবং একটি খরগোসের মধ্যে একটা দৌড়ের পাল্লা হচ্ছে। লোকটি দৌড়তে পারে খরগোসটির চেয়ে অনেক বেশি জোরে। কিন্তু মজার ব্যাপার, দৌড়ের পাল্লায় লোকটি কোন সময়েই খরগোসটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কী করে?

মনে করা যাক, শুরুতে খরগোসটি লোকটির চেয়ে একশ' গজ এগিয়ে আছে। খরগোসটি যত জোরে দৌড়তে পারে লোকটি পারে তার দ্বিগুণ জোরে। দৌড় শুরু হ'ল এবার। লোকটি যখন একশ' গজের মাথায় পৌঁছল, খরগোসটি তখন পঞ্চাশ গজ দূরে সরে গেছে অর্থাৎ ওদের মধ্যে দূরত্ব এ সময় পঞ্চাশ গজ মাত্র। এর পর লোকটি যখন আরও পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গেছে, খরগোসটি এগিয়েছে তখন আরও পঁচিশ গজ। অর্থাৎ দূরত্বটা দাঁড়াচ্ছে এবার পঁচিশ গজ।

লোকটি ছুটল, এগোল খরগোসটির দিকে

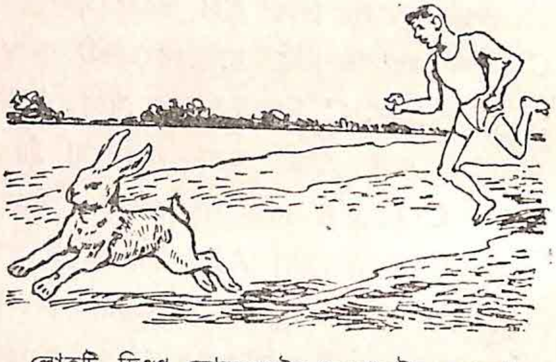
আরও পঁচিশ গজ। খরগোসটি কিন্তু ইতিমধ্যে আরও সাড়ে বারো গজ সামনে এগিয়ে গেছে। বেশ, লোকটি এগোল সামনের দিকে আরও সাড়ে বারো গজ। কিন্তু খরগোসও বসে নেই, সে সামনের দিকে ৬$\frac{১}{৪}$ গজ সরে গেছে। তার মানে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব দাঁড়াচ্ছে এবার ৬$\frac{১}{৪}$ গজ। এমনি ভাবে লোকটি যতই এগোচ্ছে খরগোসের দিকে, খরগোসটিও এগোচ্ছে সামনের দিকে। উভয়ের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে, কিন্তু লোকটি কোন সময়েই খরগোসটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয় কি?

অন্য ভাবে একটু হিসেব করে দেখা যাক।

লোকটি কতখানি দৌড়চ্ছে? সহজ হিসেব। প্রথমে ১০০ গজ, তারপর ৫০ গজ, এরপর ২৫ গজ —এমনি ভাবে নয় কি? লোকটির দূরত্ব দাঁড়াচ্ছে = ১০০ + ৫০ + ২৫ + ১২$\frac{১}{২}$ + ৬$\frac{১}{৪}$ + ৩$\frac{১}{৮}$ + ১$\frac{৯}{১৬}$ + ……অসীম সংখ্যা পর্যন্ত।

ওপরের সংখ্যাগুলি যোগ করলে ২০০ গজের কাছাকাছি একটি সংখ্যা পাওয়া যাবে। সংখ্যাগুলো যত বাড়বে ততই যোগফলটি ২০০-র কাছে এগিয়ে আসবে, কিন্তু কখনই ২০০-র সমান হবে না। অর্থাৎ লোকটি কস্মিন্ কালেও খরগোসটিকে ছাড়িয়ে যেতে পারছে না। কথাটা তাত্ত্বিক কথা। আসলে কি ঘটবে দেখা যাক।

লোকটির গতিবেগ ধরা যাক প্রতি মিনিটে ১০০ গজ, আর খরগোসটির ৫০ গজ। খরগোসটি ১০০ গজ এগিয়ে আছে। দৌড় শুরু হওয়ার দু'মিনিট পরে লোকটি ২০০ গজ পৌঁছে যাবে, খরগোসটি এ সময়ের মধ্যে এগোবে ১০০ গজ। অর্থাৎ লোকটি যখন ২০০ গজ চিহ্নিত স্থানে পৌঁছবে খরগোসটিও ওই সময় ওই একই স্থানে হাজির হবে। এরপর লোকটি খরগোসটিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে স্বচ্ছন্দে। অর্থাৎ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত ধরে হিসেব করলে চলে না।



লোকটি দ্বিগুণ জোরে ছুটেও খরগোসটিকে কখনো পেছনে ফেলে যেতে পারছে না।

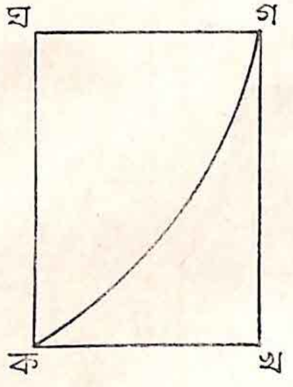
গল্পটি দিয়ে আমরা 'লিমিট' কথাটির ধারণা করতে পারি। কতগুলো সুসংবদ্ধ সংখ্যার সঙ্গে আরও কতকগুলো সুসংবদ্ধ সংখ্যার যোগ করলে যোগফলটি কোন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার খুব কাছাকাছি যেতে পারে বটে, কিন্তু কোন সময়ই তার সমান হবে না। একেই বলা হয় 'লিমিট'।

ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস

আধুনিক কালে ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তার গোড়াপত্তন করেছেন আর্কিমিডিস। অবশ্য এর খুঁটিনাটি বিষয়ে পরে অন্যান্য গণিতজ্ঞরা অনেক কিছু করেছেন। অসীম সংখ্যক সংখ্যার 'লিমিট' বার করাই ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাসের কাজ।

ধরা যাক, ক খ গ ঘ একটি ক্ষেত্র। এবং ক গ একটি বাঁকা রেখা। ক খ গ অংশের ক্ষেত্রফল বার করতে হবে। কাজটি সাধারণ অঙ্কের নিয়ম দিয়ে মোটেই সহজ হবে না। কিন্তু ক খ গ অংশকে অসংখ্য সমান সমান বর্গক্ষেত্রে

ভাগ করা শক্ত কাজ নয়। প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান। কাজেই সবগুলো বর্গক্ষেত্রের



ক খ গ অংশকে অনেকগুলো সমান বর্গক্ষেত্রে ভাগ করে তার পুরো ক্ষেত্রফল পাওয়া যাবে।

ক্ষেত্রফল যোগ করলে আমরা আসলে ক খ গ অংশের ক্ষেত্রফলই পেয়ে যাব। অবশ্য যে ক্ষেত্রফল পাওয়া গেল তা সঠিক ক্ষেত্রফলের একেবারে সমান হয়তো হবে না, পার্থক্য একটু থাকবে। তবে তা এত সামান্য যে সেটুকু আমরা স্বচ্ছন্দে "অবহেলা" করতে পারি।

বিজ্ঞানী, এঞ্জিনীয়ার, অর্থনীতিবিদ্—সকলের কাছেই ইনটিগ্রাল ক্যালকুলাস একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এ যুগের বিজ্ঞানে ক্যালকুলাস ছাড়া এক পা-ও এগোনো যায় না।

ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস

নানা ধরনের সংখ্যা নিয়ে গণিতজ্ঞদের কাজ-কারবার। তার মধ্যে সংখ্যার শ্রেণী আছে আবার কত বিচিত্র রকমের। যেমন,

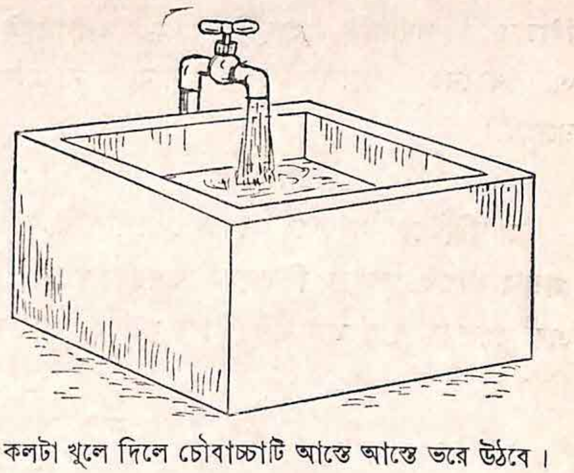
১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬..............

উপরের সংখ্যাগুলোর কোন শেষ নেই, এক এক করে বাড়িয়ে যতদূর খুশি স্বচ্ছন্দে যাওয়া যেতে পারে। যে শ্রেণীর কোন শেষ নেই তাকে বলা হয় অসীম শ্রেণী। আবার, আর একটি শ্রেণীর বিচার করা যাক:

১/২, ২/৩, ৩/৪, ৪/৫, ৫/৬............

দেখা যাচ্ছে, শ্রেণীটিতে সংখ্যা যত বাড়ানো হবে ততই প্রতিটি সংখ্যার মান ১-এর কাছে এগোচ্ছে, কিন্তু ১ আর হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে আমরা বলব, সংখ্যাগুলোর লিমিট ১।

একটা বড় চৌবাচ্চার কলটা খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি আস্তে আস্তে জলে ভরে উঠবে। চৌবাচ্চাটির উচ্চতা রয়েছে, ধর, ৫ ফুট। পুরো চৌবাচ্চা পূর্ণ হতে সময় লাগে এক ঘণ্টা বা ৬০ মিনিট। তার মানে প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চায় জল ঢুকছে গড়ে এক ইঞ্চি করে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে প্রথম ১৫ মিনিটে ২½ ফুট, দ্বিতীয় ১৫ মিনিটে ১½ ফুট, তৃতীয় ১৫ মিনিটে ৯ ইঞ্চি এবং চতুর্থ ১৫ মিনিটে ৩ ইঞ্চি করে চৌবাচ্চাটি জলে ভরে গেল। তার মানে সেই এক ঘণ্টায়ই ৫ ফুট উঁচু চৌবাচ্চা পূর্ণ হওয়া আর কি!



কলটা খুলে দিলে চৌবাচ্চাটি আস্তে আস্তে ভরে উঠবে।

অন্য ভাবে ব্যাপারটা হিসেব করা যাক। ১৫ মিনিটে ২½ ফুট বা ৩০ ইঞ্চি পূর্ণ হ'ল। তা হলে প্রতি মিনিটে জল ঢুকছে ২ ইঞ্চি করে। দ্বিতীয় ১৫ মিনিটে ১৮ ইঞ্চি জল ঢুকল চৌবাচ্চায়।

প্রতি মিনিটে দাঁড়াচ্ছে $\frac{২}{১}\frac{৮}{৫}$ ইঞ্চি করে। এমনি ভাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ ১৫ মিনিটের হিসেব থেকে প্রতি মিনিটের হার সহজেই বার করা যায়। দেখা যাবে চৌবাচ্চা জলে পূর্ণ হওয়ার হার প্রতি ক্ষেত্রেই আলাদা।

এবারে আমরা যদি প্রতি মিনিটে চৌবাচ্চায় কতটা জল ঢুকবে তা আলাদা আলাদা মেপে নেই তবে দেখব জলের ঢুকবার হার প্রতি মিনিটেই আলাদা। প্রতি মিনিটের হিসেব না করে যদি প্রতি সেকেণ্ডের হিসেব করি তবে আরও নতুন নতুন হিসেব পাব।

ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের কাজই হ'ল, কোন একটা বিশেষ মুহূর্তে কোন একটা ব্যাপারের হ্রাসবৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা। আগে যে-সব সংখ্যার শ্রেণীর কথা বলেছি তেমনি নানাধরণের শ্রেণী সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করাও ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাসের কাজ। বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বহু ব্যাপারেই এ ধরনের ক্যালকুলাসের নানা ব্যবহার রয়েছে।

টোপোলজি

জ্যামিতিতে সর্বশেষে এসেছে টোপোলজি, যার প্রভাব অঙ্কের অন্যান্য বিভাগের ওপরও পড়েছে। এর কারবার হ'ল জ্যামিতি বিদ্যার মূলগত গুণাগুণ নিয়ে।

কোন কোন মজার আয়না আছে যার সামনে দাঁড়ালে তোমার একটি প্রতিবিম্ব পাওয়া যাবে ঠিকই, কিন্তু দেখা যাবে তাতে তোমার মাথাটি বিরাট বড় বা চ্যাপটা দেখাচ্ছে, একখানা হাত দেখাচ্ছে খুব ছোট, আর একখানা ভীষণ লম্বা। টোপোলজি হ'ল অনেকটা এই ধরনের জ্যামিতি



তোমার ছবি, অথচ তুমি নেই।

যার ভিতরে তোমার সব কিছুই আছে, অথচ তুমি নেই!

ফলিত গণিত ও বিশুদ্ধ গণিত

আধুনিক অঙ্কশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে আগেই উল্লেখ করেছি। প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে বলা এখানে সম্ভব নয়। বড় হয়ে তোমরা এ সব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানবার সুযোগ পাবে।

এখানে আর একটা কথা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অঙ্কশাস্ত্রের নানা প্রয়োগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় অঙ্ককে বলা হয় ফলিত (অ্যাপ্লায়েড) গণিত। কিন্তু সে-সবের মূলে রয়েছে অঙ্কের নানারকম তত্ত্ব যেগুলি সম্বন্ধে আমরা এখানে সামান্য আলোচনা করেছি এবং যেগুলিকে বলা হয় তাত্ত্বিক গণিত বা বিশুদ্ধ (পিওর) গণিত।



চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা

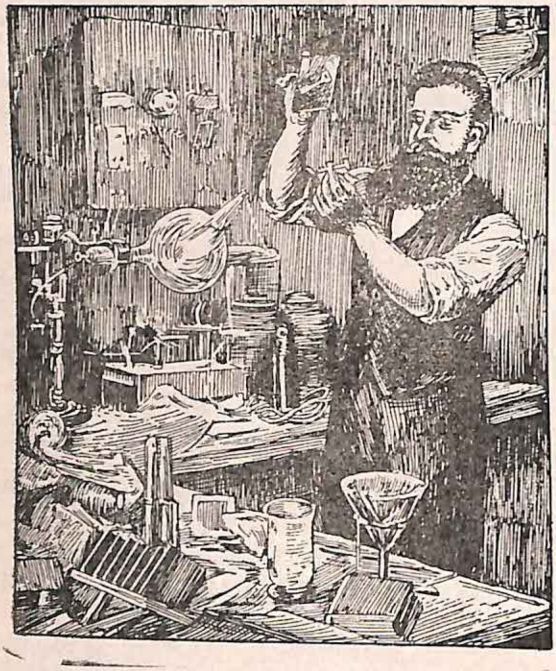
রোগ জয়ের কাহিনী

তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা জয় করতে পেরেছি নানারকম মারাত্মক মারাত্মক ব্যাধিকে। যেমন টাইফয়েড, যেমন যক্ষ্মা। আগে এদের খপ্পরে পড়লে জীবনের কোন আশা থাকত না। এখন আর তা নয়। ফলে অনেকেই বেঁচে যাচ্ছে অনেক বছর। কাজেই বেশি বয়সের কতগুলি ব্যারাম চেপে ধরেছে মানুষদের। তার মধ্যে ক্যান্সার বা কর্কট রোগ একটি। আজও আমরা ক্যান্সারকে জয় করে উঠতে পারি নি, কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই। কেমন করে হঠাৎ এক একটা জিনিসের আবিষ্কার হয়ে যায় আর তা অন্য কাজে লেগে যায় তারই সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হ'ল ক্যান্সার-জয়ের অভিযানের কাহিনী।

এক্স-রে আবিষ্কার

স্যার উইলিয়াম ক্রুক্স্ বিদ্যুৎ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। একটা কাচের নল থেকে যতটা সম্ভব বাতাস বার করে নিয়ে তার দু'মাথায় তিনি জুড়ে দিলেন দু'টো তারের টুকরো। এদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে নলের ভিতর দিয়ে বয়ে যেত বিদ্যুতের কণা। এক দিন তিনি দেখলেন যে কাছের একটা ফটোগ্রাফের প্লেট কেমন যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি কিন্তু এ ব্যাপারটায় তেমন কিছু গুরুত্ব দিলেন না, প্লেটগুলিকে সরিয়ে রেখে দিলেন।

১৮৯৫ সালে জার্মেনির উর্জবুর্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ক্রুক্স্-এর নল নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন অধ্যাপক ভিলহেল্ম্ কনরাড্ রন্ট্জেন বা রঞ্জেন। তিনিও ক্রুক্সের মত দেখলেন যে তাঁর টেবিলের ড্রয়ারের ভিতর ফটো-গ্রাফের প্লেট ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, একদিন এক মজার কাণ্ড ঘটল। রঞ্জেন ঐ প্লেটগুলিকে ডেভেলাপ্ করতে গিয়ে দেখলেন তার একটাতে রয়েছে একটা চাবির ছবি। চাবিটা টেবিলের ওপর ছিল, তারই ছবি উঠে গেছে প্লেটের গায়ে! তিনি সেখানেই থেমে গেলেন না, ভাবলেন যে নলের গা দিয়ে যে আলো বেরুচ্ছে তার জন্যই প্লেটগুলি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে এবং চাবির ভেতর দিয়ে সে আলো যেতে পারে নি বলেই তার ছবি উঠেছে প্লেটে। তিনি তখন কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে দিলেন নলটাকে। কিন্তু



রঞ্জেন ঐ প্লেটগুলিকে ডেভেলপ্ করতে গিয়ে দেখলেন তার একটাতে রয়েছে একটা চাবির ছবি।

কা কস্য পরিবেদনা! প্লেট যেমনি ঝাপসা হচ্ছিল তেমনি ঝাপসাই হয়ে গেল আবার। রঞ্জেন বুঝলেন, নিশ্চয়ই এমন একটা আশ্চর্য আলোর সৃষ্টি হচ্ছে—যা মানুষের চোখেও দেখা যায় না, আর যাকে সাধারণ আলোর মত কালো কাগজও আটকে রাখতে পারছে না।

বীজগণিতে কোন অজানাকে প্রকাশ করতে হলে বলা হয় এক্স (x)। রঞ্জেনও তাই এই অজানা আলোর নাম দিলেন এক্স-রে বা এক্স-রশ্মি।

ডাক্তারীতে এক্স-রে

এই আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাররা একে কাজে লাগাতে লাগলেন। কারণ, দেহের অদৃশ্য জায়গার ছবি তুলতে এর যুড়ি নেই। দাঁতের গোড়ার ঘা, ভাঙ্গা হাড় বা বুকের ভিতর যক্ষ্মা বা অন্য রোগ, অন্ত্রের ঘা, বৃক্কের বা মূত্রাশয়ের পাথর, যা আগে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যেত না, তা 'এখন থেকে এক্স-রে ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়তে লাগল।

এই সব করতে গিয়ে ডাক্তাররা দেখলেন যে এক্স-রে খুব সহজ আলো নয়, এর আরও অনেক গুণ। যে সব তন্তু নতুন করে গড়ে উঠছে এক্স-রে তাদের নষ্ট করে দিতে পারে। ক্যান্সারের কোষগুলিও তো তাই! সেগুলি তরুণ কোষ, আর সেজন্য বাড়েও ভীষণ তাড়াতাড়ি। কাজেই এক্স-রে দিয়ে এদের মেরে ফেলা যায় কিনা চলতে লাগল তারই পরীক্ষানিরীক্ষা। দেখা গেল সত্যিই খুব শক্তিশালী এক্স-রে দিয়ে ক্যান্সারকে কাবু করা সম্ভব।

বেকরেলের পরীক্ষা

ইতিমধ্যে ফ্রান্সে অধ্যাপক হেনরি বেকরেল কাজ করছিলেন সেই সব পদার্থ নিয়ে যাদের রৌদ্রে রেখে দিলে খানিক পরে অন্ধকারের ভিতর আনলেও জ্বল্জ্বল্ করে জ্বলে। বেকরেল পিচেব্লেণ্ড নামে এক রকম খনিজ নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। পিচ্‌ব্লেণ্ডও ঐ রকম রোদে রেখে দিলে অন্ধকারে জ্বল্জ্বল্ করে। কিন্তু বেকরেল দেখলেন, রোদে না রাখলেও তা জ্বল্জ্বল্ করে। অর্থাৎ ওর যে জ্যোতিঃ তা সূর্যের রশ্মি শুষে নিয়ে নয়—সে জ্যোতিঃ ওর নিজেরই। পিচ্‌ব্লেণ্ডের মধ্যে আছে ইউরেনিয়াম ধাতু, কাজেই ওটা সম্ভবত ইউরেনিয়ামেরই একটা গুণ। তিনি ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করলেন তাঁর ছাত্রী মারী কুরিকে।

মাদাম কুরি ও রেডিয়াম

অদ্ভুত জীবন এই মারী কুরির। তিনি পোল্যাণ্ডের মেয়ে। আসল নাম মারিয়া স্ক্লো-

ডোভাস্কা। তখন পোল্যাণ্ড রাশিয়ার জারের অধীন। দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করা তাদের



মারী কুরি

চোখে ভীষণ অপরাধ। মারী কিন্তু সেই দলেই যোগ দিলেন, এবং শেষে ধরা পড়ার ভয়ে পালিয়ে এলেন ফ্রান্সে। রাজনীতি করলেও অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন তিনি। এখানে এসে ভর্তি হলেন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সরবনে। কী অক্লান্ত পরিশ্রমই না তিনি করেছেন! থাকতেন একটা ছোট ঘরে, সে ঘরে শীত নিবারণের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আর খাবারের পয়সা যা জুটত তাতে রুটি-মাখন আর চায়ের বেশি কিছু মিলত না। কলেজের ল্যাবোরেটরীতে যন্ত্রপাতি ধুয়ে পরিষ্কার করে যে সামান্য মজুরী মিলত তাতেই চালাতে হ'ত তাঁকে। তা সত্ত্বেও প্রথম বছরে এম. এ পরীক্ষায় (পদার্থবিদ্যায়) তিনি হলেন প্রথম। আর পরের বছর গণিতের পরীক্ষায় হলেন দ্বিতীয়। পরীক্ষা পাশ করে তিনি শুরু করলেন গবেষণা। সেই গবেষণাগারেই তাঁর ওপরে কাজ করতেন আর একজন তরুণ অধ্যাপক,—পিয়েরি কুরি। দু'জনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তারপর ওঁদের বিয়ে হ'ল। সেই থেকে মারী হলেন মাদাম কুরি।

মারী আর পিয়েরি বেকরেলের প্রশ্নের কথা নিয়ে আলোচনা করলেন, তারপর শুরু করলেন তাই নিয়ে পরীক্ষা। পিচ্ব্লেণ্ড থেকে সমস্তটা ইউরেনিয়াম বার করে নেওয়া হ'ল। কিন্তু ও হরি, ওর তেজনিঃসরণ যেন আরও বেড়ে গেল! নিশ্চয়ই তা হলে ওর মধ্যে আরও এমন কিছু আছে যা ইউরেনিয়ামের চাইতেও বেশি তেজস্ক্রিয়। আবার চলল পরীক্ষা।

দু' বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই নতুন পদার্থটি—যা নাকি আসলে একটা অজানা মৌলিক পদার্থ,—বার করা হ'ল, ইউরেনিয়ামের চাইতেও যার তেজ বার করবার ক্ষমতা অনেক বেশি। মাদাম কুরি নিজের স্বদেশের নামে ওর নাম দিলেন পোলোনিয়াম। কিন্তু পোলোনিয়াম বার করে নিয়েও পিচ্ব্লেণ্ডের তেজনিঃসরণ কমল না—আরও বেড়ে গেল। আবার চলল পরীক্ষা। শেষে সেই আরও তেজস্ক্রিয় পদার্থটি ধরা দিল। কুরি ওর নাম দিলেন রেডিয়াম।



মারী আর পিয়েরি কুরি শুরু করলেন পরীক্ষা।

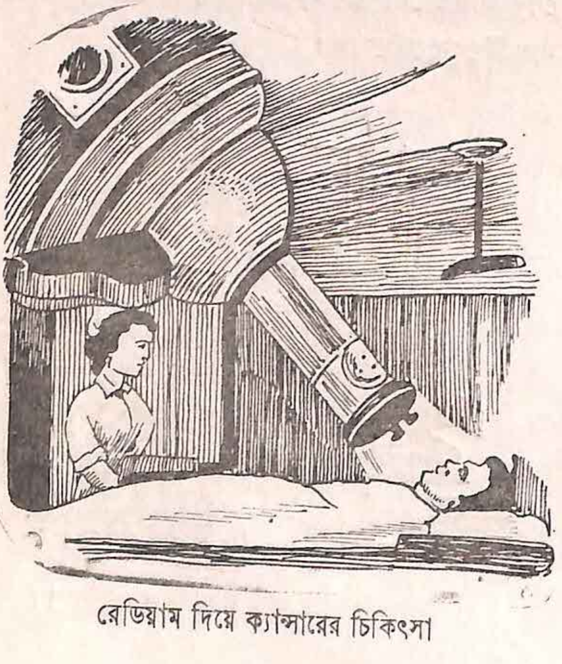
ক্যান্সার রোগে রেডিয়াম

রেডিয়ামের গুণের শেষ নেই। এই রেডিয়াম ক্যান্সার রোগেও অদ্ভুত কাজ করতে লাগল। আজকাল অবশ্য আরও নানারকম পদার্থ বেরিয়েছে যা নাকি রেডিয়ামের মতই ক্যান্সার-ঘাতী। সবই কৃত্রিম উপায়ে তৈরি এবং রেডিয়ামের মতই তেজস্ক্রিয়। এগুলিকে বলা হয় রেডিও-আইসোটোপ।

কিন্তু সেই সঙ্গে কতগুলি ওষুধও বেরিয়েছে যা নাকি শরীরের ভিতর গিয়ে ক্যান্সারের কোষগুলিকে মেরে ফেলতে পারে। তা ছাড়া শল্য-চিকিৎসকেরাও দেহের ক্যান্সারযুক্ত অংশটুকুকে কেটে বাদ দিয়ে সেটাকে করে দিচ্ছেন ক্যান্সারমুক্ত।

শল্য-চিকিৎসার জয়যাত্রা

এ যুগে শল্য-চিকিৎসকেরা অভূতপূর্ব কর্ম করে চলেছেন। তাঁরা পুরানো কিডনী ফেলে দিয়ে লাগাচ্ছেন নতুন কিডনী। হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতর কোন ক্ষত থাকলে তা জোড়া লাগাচ্ছেন, মস্তিষ্কের ভিতর ছুরি চালিয়েও রোগ সারাচ্ছেন।



রেডিয়াম দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা

কিন্তু এ একদিনে হয় নি।

শল্য-চিকিৎসার প্রথম কথাই হ'ল অজ্ঞান করা। আমাদের দেশের শল্য-চিকিৎসার ইতিহাস পড়লে অবাক্ হতে হয়। মাথা ফুটো করা থেকে শুরু করে কত রকমের শল্য-চিকিৎসারই না খবর পাওয়া যায়! কিন্তু আজকাল ডাক্তাররা সবচেয়ে অবাক্ হন এই ভেবে যে সেকালের চিকিৎসকেরা রোগীদের অজ্ঞান করতেন কি করে? আফিম খাইয়ে?

রোগীকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার

যা হোক, পাশ্চাত্য ডাক্তারদের অজ্ঞান করার ইতিহাসও শুরু হয়েছিল একটা মজার খেলার ভিতর দিয়ে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার জেফারসন শহরে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে একটা মজার খেলার চল ছিল। তার নাম "ইথার খেলা"। ইথার হ'ল একটা রাসায়নিক তরল পদার্থ, হাওয়ার সংস্পর্শে এলে এটি ধোঁয়া হয়ে উড়তে থাকে। এই খেলায় একটু ইথার রুমালে নিয়ে শোঁকা হ'ত আর, শুঁকলেই, যে শুঁকত সে মাতালের মত বেহুঁশ হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খেত। এই খেলোয়াড়ের দলে ছিলেন একজন ডাক্তার,—ডাক্তার ক্রফোর্ড উইলিয়াম্‌স্ লঙ্‌। লঙ্‌ ভাবলেন এ-ভাবে তো তা হলে রোগীকে অজ্ঞান করে অপারেশনও করা চলে! তিনি ১৮৪২ সালে ইথার দিয়ে অজ্ঞান করে প্রথম অপারেশন করলেন।

ঠিক এ সময়েই আমেরিকার হার্টফোর্ড শহরে হোরেস ওয়েল্‌স্ নামে একজন দাঁতের ডাক্তার শুরু করলেন লাফিং গ্যাস বা নাইট্রাস অক্সাইডকে তাঁর দাঁত তোলবার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করতে এবং তাতে খুব সাফল্যও



রোগীকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করা চ্ছহে।

লাভ করলেন তিনি। জিনিসটাকে আরও চালু করবার জন্য বোষ্টনে এসে, তিনি সঙ্গে জোটালেন আর একজন দাঁতের ডাক্তারকে—উইলিয়ম টমাস গ্রীন মর্টন। দাঁত তোলার মত ছোটখাট অপারেশনে সাফল্য লাভ করলেও কি ভাবে অপেক্ষাকৃত বড় বড় অস্ত্রোপচারেও এইভাবে অজ্ঞান করার ওষুধ দেওয়া যায় তার কথাও ভাবতে লাগলেন তাঁরা কিন্তু রাস্তা খুঁজে পেলেন না। তখন জ্যাকসন নামে এক বিজ্ঞানী এ ব্যাপারে ইথারের কার্যকারিতার কথা জানালেন এবং তার পরই শুরু হ'ল ইথার দিয়ে অজ্ঞান করে অপারেশন।

মর্টন চলে এলেন ইংল্যাণ্ডে। এর পরে ডাঃ সিমসন বার করলেন অজ্ঞান করার জন্য ক্লোরোফর্মের উপকারিতা। তার পরে বার হ'ল "গ্যাস-অক্সিজেন"। এইভাবে অজ্ঞান করার কৌশল ডাক্তারদের হাতে চলে এল, শুরু হ'ল শল্য-বিদ্যার জয়যাত্রা।

ঘা যদি বিষাক্ত হয়ে যায়

কিন্তু শুধু অপারেশন করলেই হয় না, অপারেশনের পর অনেক সময়েই ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে রোগী মারা পড়ত। ফ্রান্সের লুই পাস্তুার দেখিয়ে দিলেন যে এ সব হয় বাতাসের জীবাণুদের জন্য। যন্ত্রপাতি এবং ঘা জীবাণুমুক্ত রাখলে এ ব্যাপার ঘটতে পারে না। তখন ইংল্যাণ্ডের লিস্টার অপারেশনের সময় যন্ত্রপাতি এবং ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত রাখার ব্যবস্থা করলেন। অপারেশনের পরে ঘা পচে রোগীর জীবনহানি বন্ধ হ'ল।

শল্য-চিকিৎসায় অসাধ্য সাধন

শল্যবিদ্যাবিশারদ্‌রা আজকাল অসাধ্য সাধন করছেন। ফুসফুসে ক্যান্সার হলে ফুসফুস কেটে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন; পেটের ও অন্য জায়গার টিউমার কেটে ফেলে দিচ্ছেন; মাথার ভিতর অপারেশন করে মৃগী রোগ সারাচ্ছেন; হৃদ্‌যন্ত্রের ভিতরে দোষ হলে তা মেরামত করছেন। রুগ্ন কিডনী বাদ দিয়ে নতুন কিডনী



লিস্টার



অ্যালেক্সিস ক্যারেল

লাগিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি অসুস্থ হৃৎপিণ্ডকে পালটে সেখানে সুস্থ হৃৎপিণ্ড বসিয়ে দিচ্ছেন। এবার বোধ হয় মানুষের সব অঙ্গই পালটে নতুন করে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে।

এই শল্য-চিকিৎসার ব্যাপারে বহু লোকের অবদান রয়েছে। এঁদের একজনের নাম অ্যালেক্সিস ক্যারেল। তাঁর প্রতিভার জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি অনেক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন যুদ্ধরোগীদের ওপর অস্ত্রোপচার করে।

প্ল্যাস্টিক সার্জারী

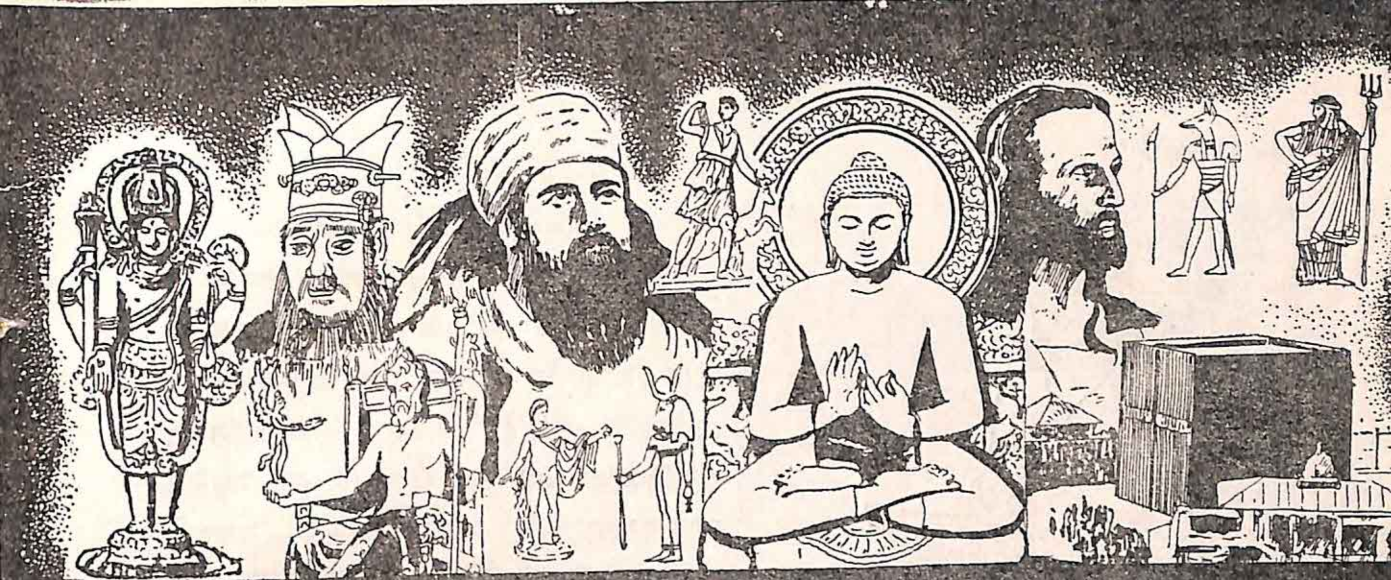
শল্য-চিকিৎসকেরা আর একটা দিকে এগিয়ে গেছেন—অসুন্দরকে সুন্দর করায়। একে বলা হয় "প্ল্যাস্টিক সার্জারী"। তোমরা দেখেছ, কারও কারও জন্মাবার সময়েই ঠোঁট কাটা থাকে। বিকৃত মুখ নিয়ে বেচারা চিরকাল লোকচক্ষে হেয় হয়ে থাকে। কিন্তু আজ আর ভাবনা নেই। আজ তার কাটা ঠোঁট এমন ভাবে যুড়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে বোঝাই যায় না সে কোন কালে ঠোঁট-কাটা ছিল। এমনি ভাবে নাক, চোখ, মুখ, হাত-পা—যার যেখানে কোন খুঁত থাকছে তাই তাঁরা মেরামত করছেন—সুন্দর করে দিচ্ছেন। গত মহাযুদ্ধের পরে কত লোকের নকল হাত-পা এমন নিখুঁত ভাবে করে দেওয়া হয়েছে যে বুঝবার যো নেই যে কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল।

এগিয়ে চলেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞান

হার্ট দুর্বল থাকলে কিংবা অসুখে ভুগে ভুগে অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের গতি বন্ধ হয়ে যায়। এই রকম হঠাৎ-বন্ধ-হয়ে-যাওয়া হৃৎপিণ্ডকেও আজকাল ডাক্তাররা আবার চালিয়ে দিচ্ছেন "ইলেক্‌ট্রনিক" যন্ত্র লাগিয়ে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে। জয় করেছে নানা ব্যাধি। কিন্তু তার থেকেও বেশি বার করেছে রোগ প্রতিরোধ করার উপায়। আজ ছোটদের সাধারণ ব্যারাম—ডিপ্‌থেরিয়া, টেটানাস, হুপিং কাশি, পোলিওমায়েলাইটিস—সবই প্রতিরোধের ব্যবস্থা হয়েছে। জয় করা হয়েছে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত, যক্ষ্মা, আরও কত মারাত্মক সব অসুখ—যা পৃথিবীর কত লোককে একদিন অকালে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে।



ধর্মের কথা

সাধকের দেশ ভারতবর্ষ

এর আগে আমরা পৃথিবীর নানা ধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছি। সব ধর্মের উদ্দেশ্যই প্রায় এক—সৎভাবে জীবন যাপন করে পরমেশ্বরের মহিমা জানতে পারা, তাঁকে লাভ করা। ধর্মকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন হিসেবে যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁদের আমরা বলি সাধক। পৃথিবীর সব দেশেই এ রকম কিছু না কিছু সাধক দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ যেন তারই মধ্যে একটু স্বতন্ত্র। এত অধিকসংখ্যক সাধকের লীলাভূমি হবার গৌরব পৃথিবীর আর কোন দেশই বোধ হয় পায় নি। এঁদের মধ্যে যাঁরা নতুন নতুন ধর্মের প্রবর্তক তাঁদের কথা তো আগেই বলা হয়েছে। তাঁরা ছাড়া আরও কয়েকজন সাধকের কথা এবারে সংক্ষেপে শোনাব। সকলের কথা বলা সম্ভব নয়, তাই এঁদের মধ্যে থেকে সামান্য কয়েকজনকে বেছে নেওয়া হ'ল।

মহারাষ্ট্রের সাধক জ্ঞানদেব

প্রথমেই মনে আসছে জ্ঞানদেবের কথা—যিনি মহারাষ্ট্রের ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে নতুন জোয়ার এনে দিয়েছিলেন। যোগসাধনা এবং ভক্তিবাদ এই দু'টি জিনিসই প্রকাশ পেয়েছিল জ্ঞানদেবের সাধনায়, আর তাঁর সাধনার ধারায় প্রভাবিত হয়েই আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন নামদেব, একনাথ, তুকারামের মত অসামান্য সব সাধক।

জ্ঞানদেব দীক্ষা নিয়েছিলেন তাঁর বড় ভাই নিবৃত্তিনাথের কাছে। এই নিবৃত্তিনাথ ছিলেন অসাধারণ যোগী ও নাথ সম্প্রদায়ের গুরু। মাত্র উনিশ বছর বয়সে জ্ঞানদেব তাঁর মহাগ্রন্থ 'জ্ঞানেশ্বরী' রচনা করেন—১২৯০ খৃষ্টাব্দে। গীতার উপর এটি একটি অসাধারণ ভাষ্য। ন' হাজার শ্লোক নিয়ে লেখা হয়েছিল এই বিরাট গ্রন্থ এবং এই বইখানিই জ্ঞানদেবকে মহারাষ্ট্রে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। শুধু তাই নয়, গুরু নিবৃত্তিনাথের আদেশে তিনি রচনা করেছিলেন আর একখানা অমূল্য গ্রন্থ 'অমৃতানুভব'। এটি একটি মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ। ভক্তিরসে ভরা অনেকগুলি অভঙপদও রচনা করেছিলেন তিনি।



জ্ঞানদেব

জ্ঞানদেবের অসামান্য যৌগিক ক্ষমতার অনেক গল্প শোনা যায়। যেমন, একবার এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের মাথায় হাত রাখতেই তার দেহে নতুন করে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়। নামদেব, যিনি এক সময়ে ছিলেন দস্যু,—তিনি তাঁরই সংস্পর্শে এসে, তাঁরই চরণে আশ্রয় নিয়ে, হয়ে যান অসামান্য সাধক। অলৌকিক কাহিনীও আছে। যেমন—একবার হঠযোগী চান্দদেব জ্ঞানদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য বাঘের পিঠে চড়ে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু তাঁকে আর সবটা পথ যেতে হ'ল না, জ্ঞানদেব যখন খবর পেলেন যে সেই যোগী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন তখন জ্ঞানদেবের কুটীরই আপনা থেকে অগ্রসর হয়ে চলল সেই সাধকের কাছে। মাত্র পঁচিশ বছর পৃথিবীতে কাটিয়ে এই মহাযোগী মহারাষ্ট্রের ধর্মজীবনে এমন একটা নাম রেখে গেছেন, যে নাম জ্যোতিষ্কের মত এখনও জ্বলছে।

শিবাজীর গুরু রামদাস

মহারাষ্ট্রের আর একজন মহান্ সাধকের নাম আমরা সকলেই জানি। তাঁর নাম রামদাস। তিনি ছিলেন নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং অপূর্ব যৌগিক ক্ষমতার অধিকারী এক সাধক। শুধু সিদ্ধ 'রামাইৎ' সাধু হিসেবেই নয়, মহারাষ্ট্রের নবজাগরণে এবং দক্ষিণ ভারতে রামভক্তির প্রচারে তিনি অপূর্ব অবদান রেখে গেছেন। এই রামদাস ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর গুরু। মহারাষ্ট্রের অসংখ্য মঠমন্দির তাঁর অনুপ্রেরণায় গড়ে উঠেছিল। ধর্মরাজ্য বা রামরাজ্য গড়ে তুলবার প্রেরণা এই গুরু রামদাসের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন শিবাজী। এ সম্বন্ধে ভারি সুন্দর একটা গল্প আছে।

একদিন শিবাজী মহারাজ সাতারার দুর্গে বসে লক্ষ করলেন তাঁর গুরু রামদাস দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ফিরছেন। শিবাজী মনে মনে ভাবলেন, এ কি কাণ্ড! স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যাঁর হাতের মুঠোয় তাঁরও বাসনার শেষ নেই! আচ্ছা, দেখা যাক্, কতখানি পেলে গুরুজীর লোভের নিবৃত্তি হয়। পরীক্ষা করার জন্য তিনি একটা চিঠি লিখে গুরুকে জানালেন যে তিনি তাঁর রাজ্য সমেত সমস্ত সম্পদ্ গুরুকে দান করছেন। চিঠি পেয়ে রামদাস শিবাজীকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'এস, আমার সঙ্গে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে পথে তুমিও পরিক্রমা কর আজ।'

দিনের শেষে ভিক্ষান্ন দু'জনে একত্র ভোজন করলেন। তারপর রামদাস শিবাজীকে তাঁর রাজ্য, সম্পদ্ সব ফিরিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে দিলেন নিজের গেরুয়া

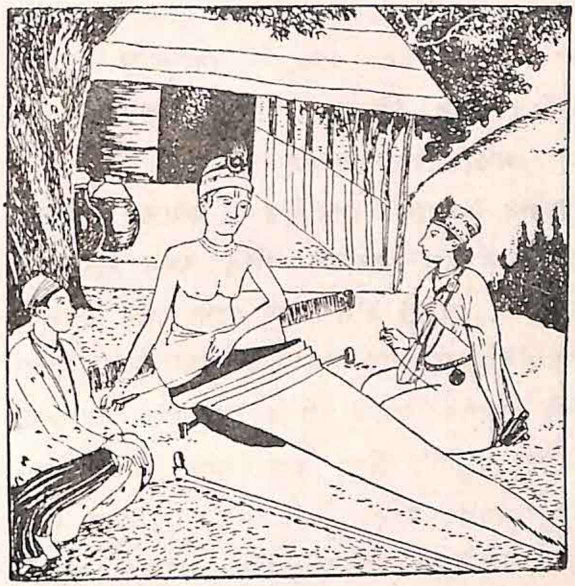
বাস। বললেন, 'আজ থেকে তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করবে। এই গৈরিক বাসই হবে তোমার রাজপতাকা। রাজা হয়েও বৈরাগীর মত সর্বত্যাগী হয়ে প্রজার মঙ্গলের জন্য তোমাকে রাজত্ব চালাতে হবে।' সেদিন থেকে সেই বৈরাগীর উত্তরীয়ই হ'ল শিবাজীর রাষ্ট্রপতাকা—গৈরিক পতাকা।

নাসিকের কাছে পঞ্চবটীতে রামদাসের জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শুরু হয়। এখানেই তিনি পান গুরুর কৃপা আর তারপর অসাধারণ সাধনার ফলে পরিণত হন এক বিরাট সাধকে।

ভক্ত কবীর

আর একজন সাধকের কথা বলি যিনি ভক্তিরসের বন্যা ছড়িয়ে ভারতে যশস্বী হয়ে আছেন। তাঁর রচিত গানের জন্য আমরা তাঁকে বিশেষ ভাবে চিনি। এই গানগুলিকে বলা হয় দোঁহা। দোঁহা বলতে বোঝায় বিশেষ ছন্দের দুই চরণ-বিশিষ্ট পদ—যা নাকি মধ্য-যুগের হিন্দী-সাহিত্যে দেখা যেত। এঁর রচিত এই গান বা দোঁহাগুলি ভারতের ধর্মজীবনে এমন একটা প্লাবন নিয়ে এসেছিল যার প্রভাব এখনও সমানে চলছে। কে এই ভক্ত কবি? এঁর নাম কবীর দাস। আমরা এঁকে ভক্ত কবীর বলেই জানি।

কবীরের জন্ম হয়েছিল কিন্তু বারাণসীর এক মুসলমান পরিবারে,—জোলার (তাঁতীর) ঘরে। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন সংসারে উদাসীন—বৈরাগীর মন ছিল তাঁর। কাপড় বোনার চাইতে ফকির বা সাধুসন্ন্যাসীর সান্নিধ্যই বেশি ভালো লাগত। মুসলমানের ঘরে জন্ম হলেও একদিন বারাণসীর বিখ্যাত সাধক



কবীর

আচার্য রামানন্দের কাছ থেকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিলেন তিনি। সংসার-জীবনে তাঁর আর কোনও আসক্তি ছিল না। তার পর তিনি তাঁর ভক্তিরসে পূর্ণ দোঁহাগুলি একে একে রচনা করে চললেন। শুধু প্রেমভক্তির দিক্ দিয়েই নয়, সাহিত্য হিসেবেও কবীরের দোঁহা এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভক্তকবি রুইদাস, মীরাবাঈ এবং গুরু নানক—সকলেরই জীবনে কবীরের এই দোঁহাগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে গেছে।

কাশীর গোঁড়া মুসলমান এবং রাজ-প্রতিনিধিরা কিন্তু কবীরের সংস্কারমুখী ধর্মকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। তাঁদের অত্যাচারে কবীরকে বারাণসী ছেড়ে চলে যেতে হ'ল। শেষকালে গোরখপুর জেলার মগহরে গিয়ে নিভৃতে বাকি দিনগুলি কাটাবেন ঠিক করলেন তিনি। কিন্তু তা হ'ল না। শত শত শিষ্যও তাঁর সঙ্গ নিলেন সেখানে।

কবীরের দেহরক্ষা সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত

আছে। অমী নদীর তীরে হাজার হাজার শোকার্ত শিষ্যের সামনে দেহত্যাগ করেন তিনি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিলেন। মুসলমানরা চাইলেন তাঁকে সমাধিস্থ করতে, হিন্দুরা চাইলেন দাহ করতে। কিন্তু যখন শবদেহের আচ্ছাদন তোলা হ'ল তখন দেখা গেল সেখানে কতগুলি ফুল পড়ে আছে। তখন মুসলমানেরা সেই ফুলের কতক নিয়ে সমাধিস্থ করলেন, হিন্দুরা বাকিটা নিয়ে দাহ করে সেই চিতা-ভস্মের ওপর মন্দির তৈরি করলেন। গল্প যাই হোক, কবীরের সমাধিক্ষেত্রে আজও একই প্রাচীরের মধ্যে পাশাপাশি একটি সমাধি (কবর) ও একটি মন্দির দেখা যায়, অর্থাৎ কবীরের দেহাবশেষের কতকটা মুসলমান মতে সমাধিস্থ করা হয়, কতকটা হিন্দুমতে দাহ করে সেই চিতাভস্মের ওপর তৈরি করা হয় মন্দির। একই প্রাচীরের মধ্যে এই রকম দুই ধর্মমতের সহা-বস্থান আজও দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের ভক্তদের কাছেই ওই সমাধিস্থল পবিত্র তীর্থ হয়ে আছে, আর কবীর বেঁচে আছেন ভারতের ধর্মজীবনে তাঁর অপূর্ব দোঁহাগুলির ভিতর দিয়ে।

দুই ভাই—রূপ-সনাতন

উত্তর ভারতের বৈষ্ণবসাধনার আকাশে একটি জ্বলন্ত নক্ষত্রের কথা এবারে বলব। আমরা যাকে বলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার ধারা, তারই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই সাধক। এঁর নাম সনাতন গোস্বামী।

সনাতন গোস্বামীর পূর্বজীবনের নাম ছিল অমর, তাঁর ছোট ভাই-এর নাম ছিল সন্তোষ। দু'জনেই তাঁরা ছিলেন মস্ত পণ্ডিত আর নানা শাস্ত্রে ছিল তাঁদের অগাধ জ্ঞান। অমর ছিলেন গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য—দবীর খাস। ছোট ভাই সন্তোষও উঁচু রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁকে বলা হ'ত সাকর মল্লিক। রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দবীর খাস ছিলেন নবাবের ডান হাত।

গৌড়ের উপকণ্ঠে, রামকেলীর কাছাকাছি শ্রীচৈতন্যদেব এই দুই ভাইকে দর্শন দেন এবং তাঁদের নতুন নাম দেন সনাতন আর রূপ।

প্রথম থেকেই দু'ভাই ছিলেন প্রবল ধর্মানুরাগী। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে এসে তা যেন কূল ছাপিয়ে উঠল। মহাপ্রভুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অসম্ভব ভগবৎপ্রেম শীগ্‌গিরই ঘরছাড়া করল দুই ভাইকেই। ধন, মান, রাজ সরকারে প্রতিপত্তি সমস্তই যেন বন্যার জলে ভেসে গেল। সব কিছু ত্যাগ করে, নবাবের চোখ এড়িয়ে তাঁরা পালিয়ে এলেন গৌড় থেকে। আগে এলেন রূপ, তারপর সনাতন। সনাতনকে নবাব বন্দী করে কারাগারে আটকে রেখেছিলেন। সেখান থেকেই তিনি কোন রকমে পালিয়ে এলেন।

বারাণসীতে এসে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সনাতনের মিলন ঘটল। কিন্তু সনাতনের গায়ে তখনও ছিল একটা পশমের কম্বল, সেটি শ্রীচৈতন্যদেবের চোখ এড়াল না। প্রকৃত বৈরাগ্য নিতে হলে হ'তে হবে সর্বত্যাগী। সনাতন বুঝলেন তাঁর বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হয় নি। তিনি তখন একটি বৃদ্ধ ভিখারীর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন তার ছেঁড়া কাঁথা আর তাকে দিয়ে

দিলেন তাঁর গায়ের কম্বল। এইভাবে সনাতনের বৈরাগ্য সম্পূর্ণ হ'ল। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মহাপ্রভুর মুখ।

বারাণসীতেই সনাতন শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে কৃষ্ণ-অবতার এবং বৃন্দাবনলীলার মর্মকথা শোনেন—বৈষ্ণব ধর্মসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় তাঁর। তারপর শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশেই বৃন্দাবনে চলে আসেন তিনি,—যমুনার তীরে বসে একান্ত নিষ্ঠায় সাধনভজন শুরু করেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব-সমাজের মুখপাত্র রূপে শীগ্‌গিরই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

আর একবার নীলাচলে অর্থাৎ পুরীতে মহাপ্রভুর সঙ্গে দেখা হয় সনাতনের। তারপর আবার তিনি চলে আসেন বৃন্দাবনে। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রভুর তিরোধানের পর সনাতন গোস্বামী গভীর ভক্তিসাধনায় ডুবিয়ে দেন নিজেকে। তাঁর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য এবং প্রেমভক্তির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা উত্তর ভারতে। নানা দিক্ থেকে অসংখ্য ভক্ত এসে জড় হয় তাঁর কুটীরের সামনে। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে এই মহাবৈষ্ণব দেহত্যাগ করেন।

সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে বৈষ্ণব দর্শন ও সাধনভজনের গ্রন্থ প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। শুধু অজস্র প্রাচীন ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি, নিজেও অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁরই প্রেরণায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, স্মৃতি ও ভজনপূজনের নানা গ্রন্থ এবং নানা ধরনের ভাষ্যও লেখা হয়েছিল। তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বৃহৎ ভাগবতামৃত' ও 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী টীকা'র নাম করা যেতে পারে।

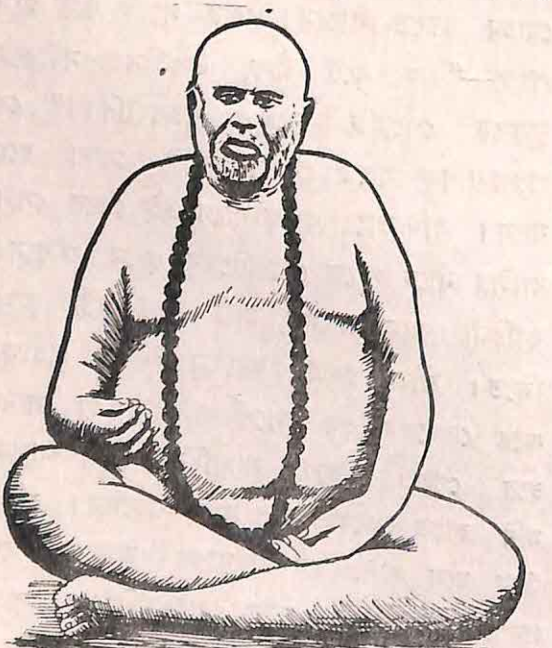
সনাতন গোস্বামীর বৈরাগ্যের কথা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'র একটি কবিতায় এই সনাতন গোস্বামীর কথা তোমরা অনেকেই পড়ে থাকবে। বর্ধমান জেলায় মানকরে থাকতেন জীবন ঠাকুর। বড্ড গরীব, অত্যন্ত কষ্টে দিন কাটত তাঁর। একদিন স্বপ্নে শিবের আদেশ পেলেন—"যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর ধর দু'টি পায়।" তিনি তোমার দুঃখ দূর করবেন। ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে গিয়ে দেখলেন সনাতন নদীর তীরে বসে একমনে জপ করছেন। প্রণাম করে তাঁকে দুঃখের কথা বললেন। সনাতন প্রথমটা বুঝে উঠতে পারলেন না কি করে তিনি ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচন করতে পারেন। তার পরেই তাঁর মনে পড়ল—"ঠিক বটে ঠিক, একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশমাণিক।" সে পরশমাণিক যাতে ঠেকাবে তাই সোনা হয়ে যাবে। যদি কারো কাজে লাগে এই ভেবে সেটা বালির নীচে পুঁতে রেখেছিলেন, এখন জীবনের কাহিনী শুনে বললেন, মাটি খুঁড়ে ওটা তুলে নিতে। জীবন তাই করলেন এবং পরীক্ষা করে দেখলেন ওর স্পর্শে সত্যি লোহা সোনা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ সারাদিন ঐ আশ্চর্য মণি হাতে করে বিহ্বল হয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, যে অমৃতের আস্বাদ পেয়ে সনাতন গোস্বামী এমন পরশমণিকেও তুচ্ছ জ্ঞান করেন সেই অমূল্য ধন না জানি কি! তাই তাঁকে পেতে হবে, এ পরশমণি নয়।

আবার তিনি ফিরে গেলেন সনাতন ঠাকুরের কাছে। বললেন, "যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মান না মণি, তাহারই খানিক মাগি আমি নতশিরে।" এই বলে সেই পরশমাণিকটিকে জীবন ঠাকুর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন যমুনার জলে। সনাতনের কাছে সেই পরম ধনের সন্ধান পেয়ে জীবন ধন্য হ'ল তাঁর।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী বা তৈলঙ্গ স্বামী

দীর্ঘায়ু লোকের কথা উঠলেই মনে পড়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কথা। শোনা যায় তিনি নাকি পৌনে তিনশ' বছর বেঁচে ছিলেন। তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর—যোগসাধনার একেবারে শিখরে উঠে-ছিলেন তিনি। কঠোর তপস্যা করে অর্জন করেছিলেন আশ্চর্য রকমের যৌগিক শক্তি।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অন্ধ্রদেশের ভিজিয়ানাগ্রাম বা বিজয়নগরম্ অঞ্চলে হোলিয়া



ত্রৈলঙ্গ স্বামী

নামে একটি জায়গায় তাঁর জন্ম হয়। বাবা নরসিংহ রাও, মা বিদ্যাবতী। ছেলের নাম রাখলেন তাঁরা শিবরাম। ছেলের কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরে মন টিকল না। নানা পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে শেষে ৭৮ বছর বয়সে তিনি পুষ্করতীর্থে এসে গুরু ভগীরথানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁর নাম হ'ল গণপতি সরস্বতী। তেলঙ্গ দেশ (তেলঙ্গনা) থেকে এসেছিলেন বলে পরবর্তী কালে কাশীর লোকেরা বলত তৈলঙ্গ স্বামী। তাই থেকে হ'ল ত্রৈলঙ্গ স্বামী। তৈলঙ্গ ও ত্রৈলঙ্গ দু' নামেই তিনি পরিচিত।

দীক্ষালাভের পর গণপতি প্রায় দশ বছর কঠোর যোগসাধনা করলেন। তারপর ৮৮ বছর বয়সে বেরিয়ে পড়লেন ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান-গুলি দেখবার জন্য পরিক্রমায়। আর, আশ্চর্য, ৮৮ বছর বয়সেও তাঁর দেহে জরা বা বার্ধক্যের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর শেষ জীবনটা কাটিয়াছিলেন কাশীতে। সুদীর্ঘ কাল,—শোনা যায় প্রায় দেড়শ' বছর তিনি এই কাশীধামে কাটিয়ে গেছেন। কাশীর গঙ্গার জলে কখনও কখনও তাঁকে ভাসতে দেখা যেত। আবার কখনও কখনও দেখা যেত এই মহাকায় উলঙ্গ সন্ন্যাসী আর্তের মধ্যে কৃপা বিলিয়ে চলেছেন। তাঁর অদ্ভুত যোগবিভূতির ক্ষমতায় বহু রোগাক্রান্ত লোককে তিনি নীরোগ করে দিচ্ছেন, বহু মুমূর্ষু ফিরে পাচ্ছে তাদের প্রাণ। জীবনের শেষ দিক্টা তিনি কাশীর পঞ্চগঙ্গার ঘাটে বসেই কাটিয়ে গেছেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে বাংলার দুই মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেব এবং প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অসামান্য আনন্দলাভ করে গেছেন। বিচিত্র ছিল এই সাধুর জীবন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী শোনা যায়। একবার সেতুবন্ধ রামেশ্বরে বিরাট মেলা হচ্ছে। হঠাৎ সেই মেলার মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামীও সেই মেলায় গিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণকে ঐ ভাবে মরতে দেখে তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জল নিয়ে মৃতদেহের ওপর ছিটিয়ে দিলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল মৃতদেহে আবার প্রাণ ফিরে এসেছে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী যোগজ্ঞানের খুব উঁচু স্তরে উঠেছিলেন, তাই তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। তিনি কাপড় পরতেন না, রাস্তায় রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। ব্যাপার দেখে কাশীর এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট খুব চটে যান। তাঁর আদেশে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে হাজতে তালাবন্ধ করে রাখা হ'ল। পরের দিনই সাহেব আবিষ্কার করলেন ত্রৈলঙ্গ স্বামী নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অথচ কয়েদীর বাইরে আসবার কোন উপায় নেই। এবার তাঁকে আবার হাজতে পুরে ডবল্ তালা দিয়ে আটকে রাখা হ'ল। সাহেব এজলাসে এসে হাজির হলেন। খানিকক্ষণ পরে তাঁর নজরে পড়ল, জেল হাজত তো দূরের কথা, আদালত ঘরেরই এক কোণে সেই বন্দী দাঁড়িয়ে আছেন। সাহেবের এবার জ্ঞানোদয় হ'ল। তিনি বুঝতে পারলেন যে ভারতে এমন সব যোগী পুরুষ আছেন যাঁদের শক্তির কাছে পৃথিবীর কোন কাজই অসাধ্য বলে মনে হয় না। তখন তিনি আদেশ জারি করলেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবার থেকে ইচ্ছেমত কাশীর সর্বত্র যে ভাবে খুশি বেড়াতে পারবেন, কেউ তাঁর ওপর কোনও উপদ্রব করতে পারবে না।

এ যুগের কয়েকজন সাধুসন্ত :

কাঠিয়া বাবা

আমাদের আজকের ভারতবর্ষেও কয়েকজন শক্তিশালী সাধক ভক্তিসাধনার সেই ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, অগণিত ভক্ত ও শিষ্যের



রামদাস কাঠিয়া বাবা

সামনে তুলে ধরেছেন ভগবৎসাধনার প্রকৃত রূপ —প্রেমধর্মের আসল পরিচয়। এঁদেরই সংস্পর্শে এসে দারুণ দুঃখের দিনেও আর্ত মানুষেরা

পাচ্ছে মনের শান্তি, বিক্ষুব্ধ জীবনে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা।

এঁদের মধ্যে একজনের কথা বলি। বৃন্দাবনের মোহান্ত রামদাস কাঠিয়া বাবা। অমৃতসরের কাছাকাছি লোনাচামারী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে রামদাসের জন্ম। এঁর গুরু ছিলেন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য স্বামী দেবদাসজী। নানারকম কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবেই রামদাস এই গুরুর কৃপালাভ করেছিলেন। শৈশব থেকেই রামদাসের মধ্যে দেখা দিয়েছিল ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং প্রথম যৌবনেই তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গুরুর আদেশে তাঁকে সর্বদা কোমরে একটা ভারী ও মোটা কাঠের আড়বন্ধ পরে থাকতে হ'ত, আর তার সঙ্গে একটা কাঠের কৌপীন। প্রথম প্রথম বসতে শুতে বেশ কষ্ট হ'ত ঐ নিয়ে, কিন্তু পরে তিনি ঐ নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতেন। ঐ কাঠের পোশাকের জন্যই তাঁর নাম হয়ে যায় কাঠিয়া বাবা।

হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে অনেক দিন ধরে তপস্যা এবং কৃচ্ছ্রসাধনা করে রামদাস অর্জন করলেন অসাধারণ যৌগিক ক্ষমতা। বৃন্দাবন তাঁর সাধন-পূজনের লীলাভূমি হলেও সারা ভারতে তাঁর আধ্যাত্মিক খ্যাতির কথা ছড়িয়ে পড়েছিল।

কাঠিয়া বাবার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে এমন সব কাহিনী আছে যা শুনলে অবাক্ লাগে। যেমন, একবার সিপাহী-বিদ্রোহের সময় যমুনার তীর ধরে তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। নদীর মধ্যে একটা জাহাজ নোঙ্গর করা ছিল। তার মধ্যে একদল ইংরেজ গোরা সৈন্য। দেশী লোকদের ওপর তাদের ভারি রাগ। তার ওপর কাঠিয়া বাবার মত ঐ রকম অদ্ভুত পোশাক-পরা সাধুকে নিশ্চিন্ত মনে নদীর পাড় দিয়ে যেতে দেখে তাদের আর মেজাজ ঠিক রইল না। তাদের একজন সাধুকে লক্ষ করে বন্দুক ছুড়ল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল, আর কাঠিয়া বাবারও কোন দুশ্চিন্তা দেখা গেল না, তিনি যেমন হাঁটছিলেন তেমনি হাঁটতে লাগলেন। এতে গোরা আরও ক্ষেপে গেল। এবার সে সাধুকে লক্ষ করে ক্রমাগত বন্দুক চালিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু এবারেও কিছু হ'ল না, সব গুলিই এপাশ-ওপাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল। গোরার জেদ আরও বেড়ে গেল। তখন হঠাৎ কাঠিয়া বাবা একটু যেন বিরক্ত হয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন। একবার চোখ বুজলেন। মনে মনে কি ধ্যান করলেন। আর, আশ্চর্য, পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মতই গোরার হাত থেকে বন্দুক খসে পড়ল মাটিতে। গোরার তখন বুঝতে বাকি রইল না যে সে কোনও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু বা সন্তের পাল্লায় পড়েছে। তখন সে তো বটেই, তার সঙ্গীরাও টুপি খুলে বার বার কাঠিয়া বাবাকে অভিবাদন জানিয়ে ক্ষমা চাইতে লাগল।

আর একবার। কাঠিয়া বাবা তাঁর কাঠের আড়বন্ধ কখনও কাছছাড়া করতেন না। সেটা হয়তো ছিল গুরুরই আদেশ। তাই দেখে তাঁরই আশ্রমের এক রসুয়ের ধারণা হ'ল নিশ্চয়ই ঐ কাঠের ফোকরে সোনাদানা লুকোনো আছে, সাধু তাই তা কাছছাড়া করেন না। কি করে ওটা আদায় করা যায়? লোভ বড় ভয়ানক জিনিস। সেই লোভে পড়ে রসুয়ে ব্রাহ্মণ কাঠিয়া বাবার খাবারে বেশ খানিকটা আর্সে-

নিক, যাকে বলা হয় সেঁকো বিষ,—মিশিয়ে দিল। কাঠিয়া বাবা সব বুঝলেন কিন্তু সে বিষ তাঁর কিছুই করতে পারল না। যৌগিক প্রক্রিয়ায় তা তিনি দিব্যি হজম করে ফেললেন।

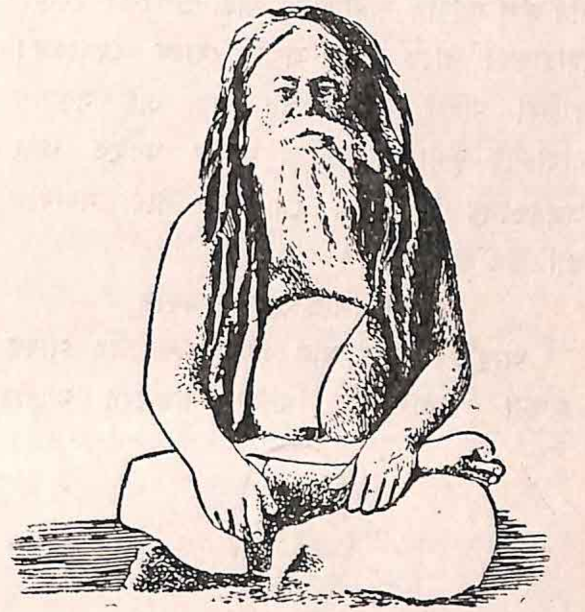
আর একটা গল্প বলি। সেবার প্রয়াগে কুম্ভ মেলা হচ্ছে। কাঠিয়া বাবাও গেছেন তাতে যোগ দিতে। শিষ্যদের সঙ্গে আশ্রমের গরুটিকেও নিয়ে গেছেন। মাঘ মাস, প্রয়াগে তখন প্রচণ্ড শীত। কিন্তু ওরই মধ্যে একদিন ভোর বেলা দেখা গেল কাঠিয়া বাবা সম্পূর্ণ খালি গায়ে নদীর সেই বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে দিব্যি বসে আছেন, আর তাঁর গায়ের কম্বলখানা গরুটির গায়ে জড়ানো।

আরও অনেক গল্প আছে তাঁর সম্বন্ধে। একই সময়ে তাঁকে নাকি এখানে সেখানে দেখা যেত! লোকে বলত, দরকার হলে শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তিনি দিব্য দেহ নিয়ে সর্বত্র বিচরণ করতে পারতেন। সাধুসন্তদের এ-রকম অলৌকিক শক্তির কথা তো প্রায়ই শোনা যায়।

মানুষের জীবনে একমাত্র কল্যাণ আসতে পারে যদি তার অধ্যাত্মজীবন পরিপূর্ণ হয়। ইহজীবনের সুখদুঃখ নিতান্তই অর্থহীন। এই বাণীই তিনি প্রচার করে গেছেন। ১৩১৬ সালে তিনি দেহত্যাগ করেন।

হাইকোর্ট থেকে সোজা বৃন্দাবন

কাঠিয়া বাবার শ্রেষ্ঠ শিষ্য ছিলেন সন্তদাস মহারাজ। তাঁকে কাঠিয়া বাবার মানসসন্তান বলা হয়। সন্তদাস বাবাজীও গুরুর কৃপায় অসাধারণ যৌগিক ক্ষমতা লাভ করেছিলেন আর উঠেছিলেন অধ্যাত্মসাধনার অনেক উঁচু স্তরে। তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল তারাকিশোর



সন্তদাস বাবাজী

চৌধুরী। কলকাতা হাইকোর্টের এক বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন তিনি। আধ্যাত্মিক জীবনের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ওকালতির অমন দুর্দান্ত পশার, যশ-খ্যাতি—সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি রামদাস কাঠিয়া বাবার চরণে আশ্রয় নেন। তাঁর উজ্জ্বল জীবনের সেই থেকে সূত্রপাত। শোনা যায় ১৯১৫ সালে যখন তিনি ওকালতি ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবেন ঠিক করলেন, তখনই হাইকোর্টের জজের পদে তাঁকে নিয়োগ করা হবে বলে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে প্রলোভন তাঁকে আটকাতে পারে নি। যেদিন তিনি হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে এসে চিরকালের জন্য বৃন্দাবন চলে যান সেদিন বিখ্যাত আইন-জীবী স্যর রাসবিহারী ঘোষ তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

সন্ন্যাস নেবার পর তারাকিশোর চৌধুরীর

নাম হ'ল সন্তদাস বাবাজী। সারা ভারতের বৈষ্ণব মোহান্তরা তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। কাঠিয়া বাবার দেহত্যাগের পর এই সন্তদাস বাবাজীই বৃন্দাবনে কাঠিয়া বাবার গদীতে এবং ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদের নেতৃত্বের পদে সমাদরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ভোলা গিরি ও রমন মহর্ষি

আধুনিক যুগে আর একজন শক্তিধর সাধক হচ্ছেন শ্রীভোলানন্দ গিরি। পাঞ্জাবের মালের



শ্রীভোলানন্দ গিরি

খুরদা গ্রামে বাস ছিল ভোলাদাসের। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে কঠোর তপস্যা করে ইনি লাভ করেছিলেন পরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি যা তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল অধ্যাত্মসাধনার অতি উঁচু স্তরে। সন্ন্যাস-জীবনে ভোলাদাসের নাম হ'ল ভোলানন্দ গিরি, সংক্ষেপে ভোলা গিরি। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে এঁর খুব হৃদ্যতা ছিল। গোসাঞিজীকে (বিজয়কৃষ্ণ) ইনি সস্নেহে ডাকতেন 'আশুতোষ' বলে। অগণিত ভক্ত ভোলানন্দ গিরির কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছে। এঁর ভজন-পূজনের স্থান ছিল হরিদ্বারে—লালতারাবাগ আশ্রমে। ভারতের সাধক, যোগী এবং বৈদান্তিকেরা ভোলা গিরিকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। ১৯২৮ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন।

শক্তিধর সাধক বলতে রমন মহর্ষির নামও উল্লেখ করতে হয়। ইনি জন্মেছিলেন দক্ষিণ ভারতে। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভেঙ্কট রমন। দক্ষিণ ভারতের তিরুভান্নামালাই-এর অরুণাচলেশ্বর পাহাড় এই মহাযোগী সাধকের সাধনার লীলাভূমি। ইনিও অধ্যাত্মসাধনার উঁচু স্তরে উঠেছিলেন এবং এঁর সংস্পর্শে এসে

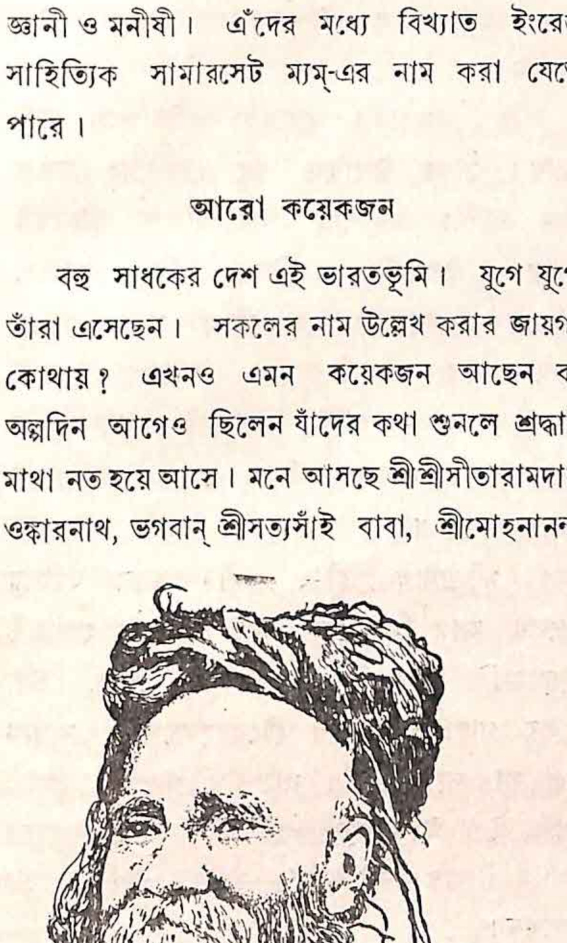


রমন মহর্ষি

প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু জ্ঞানী ও মনীষী। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক সামারসেট ম্যম্-এর নাম করা যেতে পারে।

আরো কয়েকজন

বহু সাধকের দেশ এই ভারতভূমি। যুগে যুগে তাঁরা এসেছেন। সকলের নাম উল্লেখ করার জায়গা কোথায়? এখনও এমন কয়েকজন আছেন বা অল্পদিন আগেও ছিলেন যাঁদের কথা শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মনে আসছে শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, ভগবান্ শ্রীসত্যসাঁই বাবা, শ্রীমোহনানন্দ



শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ব্রহ্মচারী, স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী এবং আরো অনেকের কথা। কিন্তু সকলের কথা বলার মত জায়গা এখানে নেই, তাই আমরা শেষোক্ত জন, অর্থাৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতীর কথাই শুধু বলব।

এ যুগের এক অসামান্য শক্তিধর মহাপুরুষ এই স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী। বৈষ্ণব রীতির যে মূলমন্ত্র তৃণের মত নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান, তরুর মত সহিষ্ণুতা—সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল এই সাধকের জীবনে।

সেই শৈশব থেকেই আশপাশের আর পাঁচজন ছেলের চাইতে এ ছেলেটি যেন একটু স্বতন্ত্র। পাঠশালার পড়ার ফাঁকে একটি নির্জন স্থান বেছে নেয় ছেলেটি। একটি গাছের তলা। চোখের জলে তার বুক ভাসে এক একদিন। একা একা ভগবান্‌কে খোঁজে তার মন। দিনের পর দিন কেটে যায়, এক ভাবী সাধকের ইঙ্গিত—একজন পরম বৈষ্ণবের সন্ধান যেন খুঁজে পাওয়া যায় তার বাল্যজীবনে।

সন্ন্যাসজীবনের আগেকার নাম ছিল মৃণাল-কান্তি দাশ। ১৯১৫ সালে গৌহাটি শহরে প্রাচীন প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তার পর শ্রীহট্টে তাঁর কৈশোরজীবন কেটেছে। পড়াশুনা করেছেন শ্রীহট্টে। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অল্প দিনেই কবি হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা তিনি। বহু প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতাবলী প্রকাশিত হয়েছে। ছবি আঁকার হাতও ছিল তাঁর চমৎকার।

কিন্তু মৃণালকান্তির জীবনে অধ্যাত্মসাধনার তরঙ্গ তাঁর সাহিত্যসাধনার ধারার সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার মত একই ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। কিন্তু তিনি আগে সত্যদ্রষ্টা, তারপর কবি।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর সাধনাদর্শকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে মৃণালকান্তি হলেন স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী। আসামের কামাখ্যা পাহাড়ে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যে, শ্রীবৃন্দাবনে, শ্রীক্ষেত্রে দিনের পর দিন কঠোর তপস্যা করে লাভ করলেন অধ্যাত্মজ্ঞান, পরার পরম প্রসাদ।

তাঁর বিচিত্র জীবন নানা আকর্ষণীয় ঘটনবলীর দ্বারা চিহ্নিত। কর্ম, জ্ঞান প্রেমের সমন্বয়। এখানে তাঁর জীবনের বিশেষ আলোচনার অবকাশ নেই। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, জানালা দিয়ে যেমন আকাশ দেখতে হয় ঘরের মানুষকে, তেমনি সিদ্ধ সাধুদের ভিতর দিয়ে চিনতে হয় অন্য সাধুকে।

তবু ২।১ টি ঘটনার কথা বলছি।

একবার প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় গিয়েছেন ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমানন্দ। তাঁর শিষ্যদের একটি দল তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য পরে পৌঁছেছে। প্রয়াগে তখন দুর্জয় শীত। সন্ধ্যার পর থেকেই শহরের পথঘাট পরিত্যক্ত। কিন্তু দেখা গেল ঐ দারুণ শীতেও তাঁরা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খোলা আকাশের নীচে অতি সামান্য শীতবস্ত্র গায়ে জড়িয়ে দিব্যি বসে আছেন, অমন দারুণ শীত কিছুমাত্র টের পাচ্ছেন না কেউ। আর ওদিকে শ্রীঠাকুর তাঁর শয্যায় শুয়ে প্রচণ্ড শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছেন। আট-দশখানা কম্বল চাপা দিয়েও তাঁর শীত কমছে না। দয়াল ঠাকুর তাঁর নিজ দেহের তাপটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে দিয়েছেন শিষ্যদের বাঁচাবার জন্য আর তাঁদের শীত আকর্ষণ করে নিয়েছেন নিজের দেহে। শিষ্যদের সে সময়টা মনে হয়েছিল তাঁরা যেন এক উষ্ণপ্রবাহের মধ্যে বসে রয়েছেন।

আর একবার। এবারও ঘটনাস্থল সেই প্রয়াগ। ঠাকুর উপস্থিত সব ছেলেদের মস্তক মুণ্ডন করিয়ে যথাশাস্ত্র পারলৌকিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন করালেন। কিন্তু, কি কারণে, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মস্তক মুণ্ডন করতে বারণ করলেন। ঠাকুরের আদেশ, তাই মণীন্দ্রনাথ ছাড়া বাকি সকলেরই মস্তক মুণ্ডন করা হ'ল। তারপর তাঁরা গেলেন সদলবলে বৃন্দাবন। সেখানে রাধাকুণ্ডে স্নান করবার সময় মণীন্দ্রনাথ হঠাৎ গভীর জলে তলিয়ে গেলেন, আর ঠিক সেই সময় তাঁর এক গুরুভাই তাড়াতাড়ি, আর কিছু ধরতে না পেয়ে, তাঁর চুলের গোছা ধরে তাঁকে টেনে তুললেন। মাথায় চুল না থাকলে সে যাত্রা মণীন্দ্রনাথের রক্ষার কোন উপায়ই থাকত না। এই ভাবে গুরুর কৃপায় সেবার মণীন্দ্রনাথ ফাঁড়া থেকে মুক্তি পেলেন।

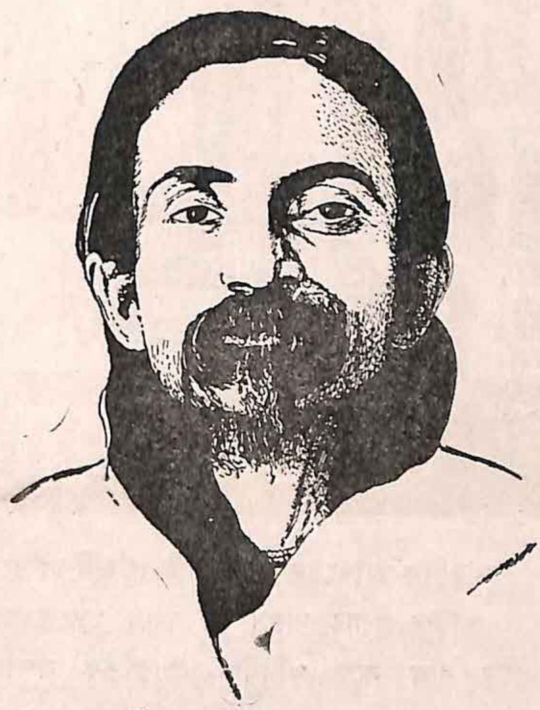
সাধারণ লোকে সাধুকে সব সময় বুঝতে পারে না, কিন্তু সত্যিকার মহাপুরুষের চোখে এ সব ঠিক ধরা পড়ে। মণিপালে শ্রীশ্রীসত্যসাঁই বাবা একবার ঠাকুরের এক শিষ্যকে বহুজনের মাঝ থেকে ডেকে এনে বলেছিলেন, "তুমি তো সাধন লাভ করেছ এক মহান্ গুরুর কাছে।" আর একবার তাঁর এক শিষ্য কোচবিহারে এক সাধকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে কিছু প্রশ্ন করার আগেই তিনি বলতে লাগলেন, "বাচ্চা, তেরা গুরুজী তো বহুত

বড়ী হ্যঁয়—বহুত বড়ী হ্যঁয়। এইসা গুরু দুনিয়ামে কভি নেহি মিল সক্তা। আকাশকে পার মিল সক্তা, উনকো পার নেই মিলে গা। ……তেরা গুরুজীকো কৃপাসে সব কুছ হো সক্তা।”

শ্রীহট্টের পীর, শাহে মহম্মদ আলী চিস্তি একদিন স্বামী পরমানন্দজী মহারাজকে বলেন, —“আপনাদের মধ্যে জায়গায় যাবার লোক অনেক—আমাদের মধ্যে কম। লক্ষ্যে পৌঁছবার পর আচার-নিয়ম, আহারে কৃচ্ছ্রতা ফুরায়। আপনার এখন এ সব মানার আর কি প্রয়োজন?”

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভুর শিষ্য ও জামাতা জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের শিষ্যা সরোজিনী মৈত্র ‘মা-মণি’ নামে শ্রীক্ষেত্রে ভক্ত-সমাজে পরিচিত ছিলেন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে গোস্বামীপ্রভুর অশেষ কৃপাতে তিনি নিত্যলীলা দর্শনের অধিকার লাভ করেন। শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে মা-মণির পরিচয় ও যোগাযোগ অলৌকিক ভাবে ঘটে। মা-মণি লিখেছেনঃ “৬ই চৈত্র ১৩৭২ সালে, শ্রীশ্রীগোসাঞিজীর নির্দেশানুযায়ী আমি স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে স্বর্গদ্বারের ‘নানক মঠে’ ছিলেন। তখন গোসাঞিজী জানান, ‘মা, আমি ওর মধ্যে বাস করি। ও আমার প্রিয় ভক্ত; আমার অসম্পূর্ণ কার্য ওর দ্বারা সম্পূর্ণ হবে’।”

জগদ্বন্ধু মৈত্র মহাশয়ের আর এক শিষ্যা শ্রীমতী জগত্তারিণী দেবীও গোস্বামীপ্রভুর কৃপায় বীরভূম জেলার রামপুরহাটে দুর্লভ অবস্থা লাভ করেছেন। শ্রীমৎ পরমানন্দ সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেন, “তুমি সত্যস্বরূপ। শ্রীভগবানের কাজের জন্য এসেছ।…”

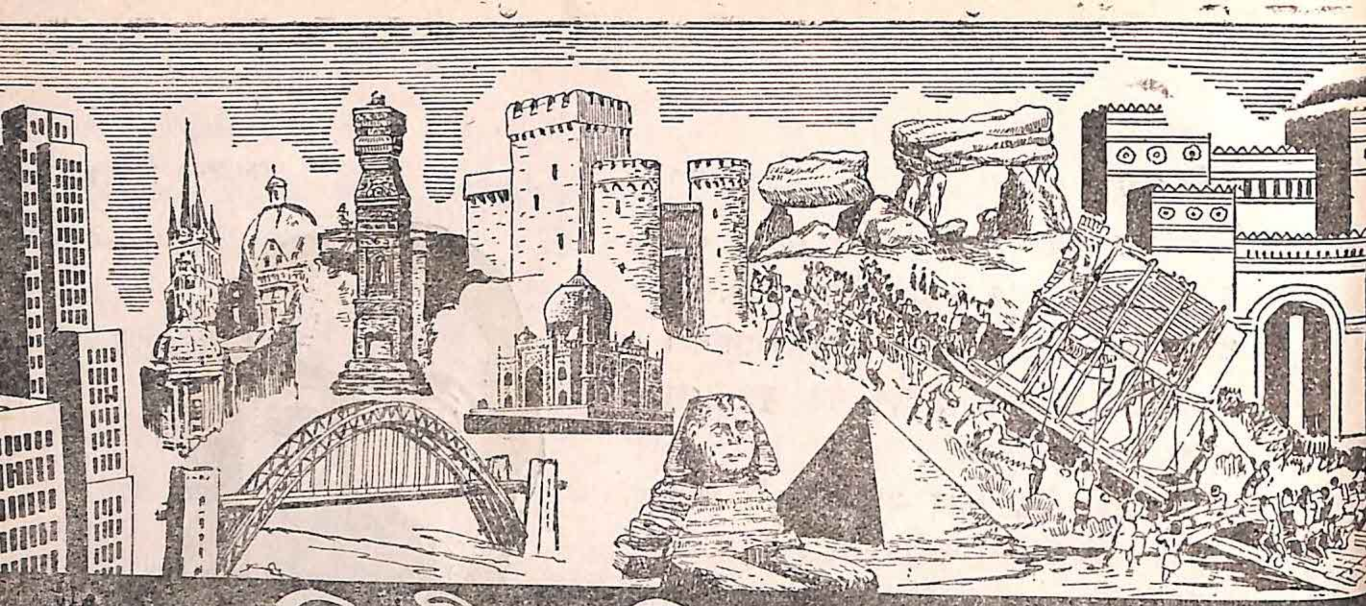


শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ সরস্বতী

অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন ছিল তাঁর। গেরুয়া পরতেন না; অনেক সময় কোঁচার খুঁট,—বড় জোর একটা চাদর জড়াতেন গায়ে। যখন ভক্তদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন তখনই বোঝা যেত তাঁর ঐশী শক্তি।

মহাপুরুষদের সম্বন্ধে যেমন শোনা যায়, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে, স্থানকালের বাধা অগ্রাহ্য করে তাঁরা সর্বজনবান্ধব হিসেবে সংসারে বাস করেন, শ্রীপরমানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধেও সেই কথাটা বলা চলে।

সম্প্রতি অল্পদিন আগে এই মহাসাধক দেহরক্ষা করেছেন।



এঞ্জিনীয়ারিং-এর কথা

আধুনিক জাবনের নিত্যসাথী এঞ্জিনীয়ারিং

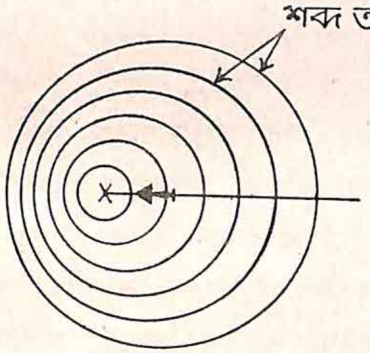
আদিম যুগের মানুষ যে ভাবে জ্ঞানোন্মেষের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ্‌কে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছিল আজকের মানুষ ঠিক তেমনি সহজাত ভাবেই এঞ্জিনীয়ারিং-এর অবদানগুলির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিজলী-বাতির আলো কিংবা রেলগাড়ী কি মোটর বাসে চড়ে বেড়ানো আজ আর কারো কাছে নতুন লাগে না। আধুনিক জীবনযাত্রায় এই রকম অসংখ্য পরিবর্তনের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষের সভ্যতার অগ্রগতি আজকে একান্ত-ভাবেই এঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার বিকাশের ওপর নির্ভর করছে।

অগ্রগতির মাপকাঠি ও নতুন নতুন জটিলতা

বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন আর জটিল গণিতের সূত্রকে প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারে ও সেবায় কতটা কাজে লাগানো গেল—তাকেই আমরা এঞ্জিনীয়ারিংএর অগ্রগতির মাপকাঠি বলতে পারি। বিজ্ঞানকে আজ মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গী,—সঙ্গী কেন, দাসই বলা যেতে পারে,—করে তোলার মূলে রয়েছে এই এঞ্জিনীয়ারিং-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ।

মানুষের জীবনযাত্রার জটিলতার সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনীয়ারিং-এর জটিলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন এঞ্জিনীয়ারিং-এর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও তাই এখন আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। একালের যে কোনও উদ্ভাবন শুধু মাত্র একটি ধারার এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রয়োগে সম্ভব হয় না। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। নতুন যুগের বিমানের কথাই ধরা যাক না কেন! আগেকার দিনের বিমানের চাইতে এখনকার বিমানের গতিবেগ অনেক বেড়ে গেছে। এমন কি মানুষ শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমান তৈরি করতে শিখেছে, যাকে বলা হয় সুপারসোনিক বিমান। কিন্তু এই বিমান তৈরি করার আগে সাধারণ বিমান তৈরির শিল্প-কৌশল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ধরনের কতগুলো সমস্যা দেখা দিয়েছিল যার সমাধান করে নিতে হয়েছে।

শব্দের গতিবেগ হচ্ছে ডাঙ্গায় অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের ঠিক ওপরে সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। সাধারণ বিমান, যা শব্দের চেয়ে কম বেগে চলে, তা ওড়ার সময়ে যে শব্দতরঙ্গ বা বায়ুচাপের ঢেউ সৃষ্টি করে সেটা তার চারপাশেই ছড়িয়ে পড়ে। এই চাপের তরঙ্গ বিমানের সামনেকার বাতাসের

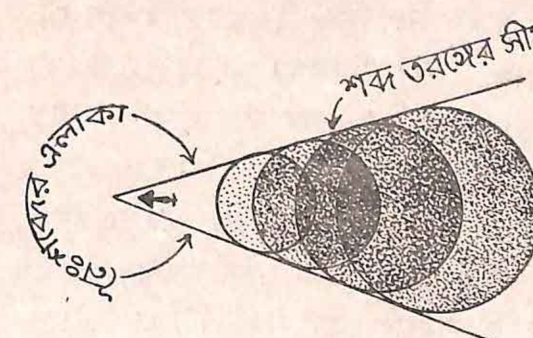


বিমানের গতি যখন শব্দের চেয়ে কম, শব্দতরঙ্গগুলি তখন বিমানের আগে আগে চলে—সামনে পিছনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ঘন হয়ে ছড়িয়ে থাকে।

বাধাকে সরিয়ে দিতে সাহায্য করে এবং বিমানের ওপর বাতাসের ঘর্ষণজনিত পিছুটানও কমিয়ে দেয়। কিন্তু বিমানের গতিবেগ বাড়তে বাড়তে যেই শব্দের গতিসীমা অতিক্রম করে যাবে অমনি শব্দতরঙ্গ বা বায়ুচাপের ঢেউ বিমানের পিছনে পড়ে যেতে থাকবে। এরা তখন আর পিছুটান কমাবার জন্যে কোনও সাহায্যে আসবে না। ফলে বিমানের অগ্রগতি বজায় রাখবার জন্য এই সময় হঠাৎ অনেক বেশি শক্তি জোগানোর প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

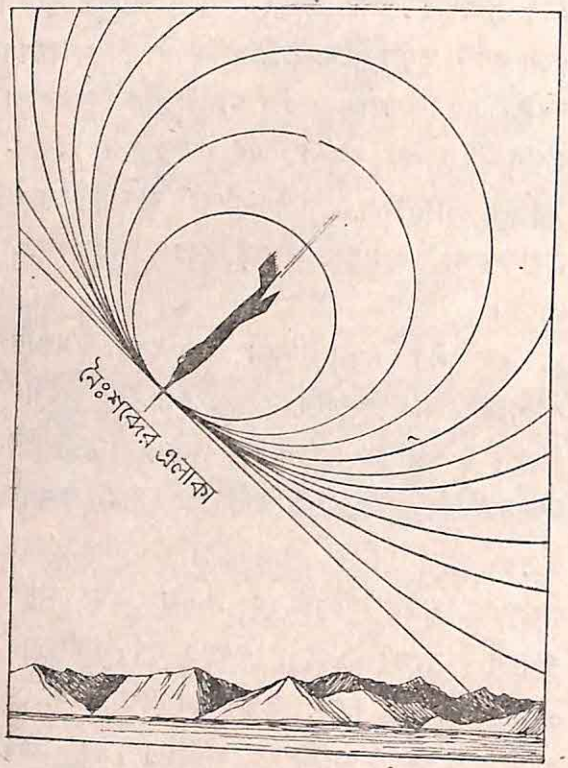
শব্দের গতিসীমা অতিক্রম করার পর শব্দতরঙ্গগুলি অনেকটা কম জায়গায় জড় হয়ে পড়ে এবং বিমানের উচ্চতা যদি এই অবস্থায় কম থাকে তা হলে এই ঘনীভূত শব্দতরঙ্গ এসে পৃথিবীর ওপর অর্থাৎ মাটিতে আঘাত করে। ফলে একটা তুমুল শব্দের সৃষ্টি হয়—ঠিক বিস্ফোরণের মতই। এই বিস্ফোরণ-জাতীয় আওয়াজকে বিজ্ঞানীরা বলেন "সোনিক বুম্"। এই প্রচণ্ড শব্দ বিমান-বন্দরের আশপাশের অধিবাসীদের মনে আতঙ্ক ও বিরক্তির সৃষ্টি করা ছাড়াও বাড়ীঘরেরও ক্ষতি করতে পারে।

এই সব নতুন নতুন ছোটবড় সমস্যার সমাধান না হওয়ায় সুপারসোনিক বিমান বাস্তবে রূপায়িত হবার পরেও যাত্রীবাহী বিমান হিসেবে এদের ব্যবহার চালু হয়ে উঠতে পারে নি। আন্তর্মহাদেশীয় যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তনের বাহক এই নতুন সৃষ্টিকে বাস্তব করে তুলতে বিমানশিল্পের এঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়েছে যান্ত্রিক (মেকানিক্যাল) এঞ্জিনীয়ারদের এর জন্য বিশেষ ধরনের এঞ্জিন তৈরি করতে, ধাতুবিদ্ (মেটালার্জিক্যাল) এঞ্জিনীয়ারদের



শব্দের গতিসীমা অতিক্রমের পরেই শব্দতরঙ্গগুলি বিমানের পিছনে পড়তে থাকে।

এগিয়ে আসতে হয়েছে এর প্রচণ্ড গতিবেগ সামলাবার উপযোগী নতুন মিশ্র বা সংকর ধাতু যোগাতে। তেমনি হাত মেলাতে হয়েছে



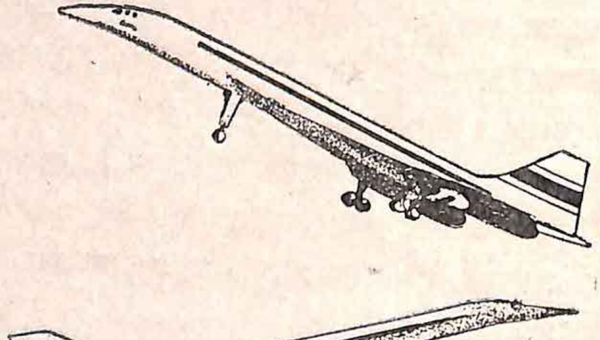
ছবির বিমানটি পৃথিবীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় শব্দের গতিসীমা অতিক্রম করার মুহূর্তে এসে পৌঁছেছে।

আরও অনেক বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়ারদের। যেমন—বৈদ্যুতিক (ইলেক্‌ট্রিক্যাল) এঞ্জিনীয়ারদের এর ভিতরকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য, সিভিল এঞ্জিনীয়ারদের এই বিমানের ভার ও গতি বহনে সমর্থ বিমান-বন্দর তৈরির জন্য, টেলি-কমিউনিকেশন এঞ্জিনীয়ারদের এর উঠবার ও নামবার সময়কার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি তৈরির জন্য ও নগর পরিকল্পন (টাউন প্ল্যানিং) এঞ্জিনীয়ারদের এই বিমানের উপযুক্ত বিমান-বন্দর ও পারিপার্শ্বিক পরিকল্পনার জন্য। তাই বলছিলাম, এঞ্জিনীয়ারিং বৃত্তিটা এখন আর বিভিন্ন বিভাগের নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়,—সব মিলে পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে এখনকার কোনও উন্নয়নের ব্যাপারে এক পা-ও এগোনো চলে না।

এঞ্জিনীয়ারিংএর নবযুগ : পারমাণবিক শক্তির আবির্ভাব

বর্তমান যুগের মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন শুরু হয়েছে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে। পরমাণু, যাকে ইংরেজীতে বলে অ্যাটম্‌,—তার ভিতরকার শক্তিকেই বলা হয় পারমাণবিক শক্তি বা অ্যাটমিক পাওয়ার (বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার)। সভ্যতার ইতিহাসের অন্য অনেক বড় বড় আবিষ্কারের মতই এই নতুন শক্তিরও প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রয়োজনে। কিন্তু খুব অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের শুভবুদ্ধি এই পারমাণবিক শক্তিকে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। এই প্রচেষ্টায় এঞ্জিনীয়ারিং-এর অবদানও বড় কম নয়।

আরব্য উপন্যাসে আমরা আলাদীনের গল্পে



বিমান-শিল্পে শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী সুপারসোনিক বিমান এঞ্জিনীয়ারিংএর চরম উৎকর্ষ

সেই অদ্ভুত দৈত্যের কথা পড়েছিলাম—যে নাকি যে কোনও অসাধ্য কাজ করে দিতে পারত আলাদীনের হুকুম পেলেই। এ যুগের বিজ্ঞানীরাও যেন সেই আলাদীনের দৈত্যের মত এক আজ্ঞাবহ দৈত্যের সন্ধান পেয়েছেন, যে নাকি হুকুম পেলেই ঐ রকম মানুষের অসাধ্য সব কাজ করে দেবে। পারমাণবিক শক্তিই হচ্ছে সেই দৈত্য। এ শক্তি যে কী ভয়ানক একটা ছোট্ট হিসেব থেকেই তা বোঝা যাবে।

মনে করা যাক, আমার হাতে লুডো খেলার ছকের মত একটা ছ'-পিঠওয়ালা ছক (যাকে বলা হয় কিউব) আছে যা ইউরেনিয়াম দিয়ে তৈরি। এই ছকটি ২·৫ সেন্টিমিটার (প্রায় ১ ইঞ্চি) লম্বা, ২·৫ সেন্টিমিটার পুরু। এই ইউরেনিয়ামটুকু যদি কোনও পারমাণবিক চুল্লীর (যাকে বলা হয় অ্যাটমিক পাইল বা রিঅ্যাক্টর) ভিতর পুরে দিয়ে তার পারমাণবিক শক্তি বার করে আনা যায় তা হলে তা দিয়ে কলকাতার চাইতেও বহুগুণ বড় একটা গোটা শহরকে একটি পুরো দিন আলোকিত করে রাখা যেতে পারে। এই পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি আমাদের সাধারণ বিদ্যুৎ-কারখানায় তৈরি করতে গেলে প্রায় ১৫০০ টন বা ৪২,০০০ মণ (১২০০ ঘন মিটার) কয়লা পোড়াতে হ'ত।

পারমাণবিক শক্তিকে গঠনমূলক কাজে নিয়োগের জন্য এঞ্জিনীয়ারিং-এর যে বিশেষ বিভাগ গড়ে উঠেছে তার নাম পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার এঞ্জিনীয়ারিং। এই বিভাগের কাজের রীতি-প্রকৃতি বুঝতে গেলে পারমাণবিক শক্তির গোড়ার কথা একটু আলোচনা করা দরকার।

পারমাণবিক শক্তি কাকে বলে

যারা অল্পস্বল্প বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত তারাই হয়তো জান যে কোনও মৌলিক পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকেই বলা হয় অ্যাটম্ বা পরমাণু—যা নিয়ে ১৯ শতকে ইংরেজ রাসায়নিক ড্যাল্টন্ বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাদারাফার্ড, বোর প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন যে পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নয়, পরমাণুর গঠন অনেকটা সৌরজগতের মত। প্রত্যেক পরমাণুর মাঝখানে অর্থাৎ কেন্দ্রে আছে একটি পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত ভারী অংশ—নিউক্লিয়াস্, আর ঐ নিউক্লিয়াসের চারদিকে কতকগুলি ডিমের মত চ্যাপ্টা পথে নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে প্রোটন—যা পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত, আর আছে নিউট্রন—যার এক-একটির ওজন, বা আরও সঠিক ভাবে বললে 'ভর',—এক-একটি প্রোটনের ভরের সমান, কিন্তু যার মধ্যে কোনও বিদ্যুৎ-শক্তি বা বৈদ্যুতিক 'চার্জ' নেই। একমাত্র হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে কোনও নিউট্রন নেই। প্রোটন আর ইলেক্ট্রনের ভর সমান না হলেও ওদের ভিতরকার বিদ্যুৎশক্তি বা বৈদ্যুতিক চার্জ ঠিক সমান—শুধু বিপরীতধর্মী এই যা। আর গোটা পরমাণুর কোনও বৈদ্যুতিক চার্জ না থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে একটা পরমাণুতে যতগুলি প্রোটন থাকবে, ইলেক্ট্রনও ঠিক ততগুলি থাকবে। প্রত্যেকটি

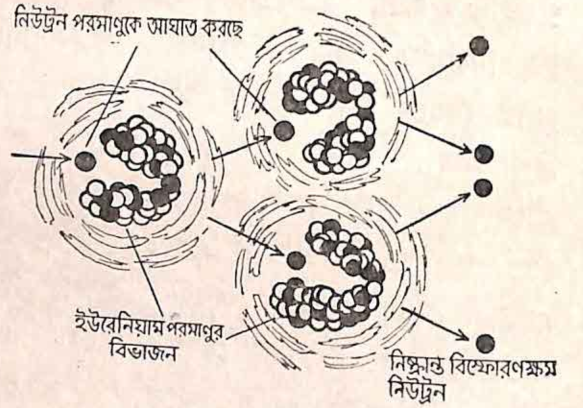
বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ বা মৌলের মধ্যে এই প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন এবং, শুধু বিভিন্ন নয়, নির্দিষ্টও। ঐ সংখ্যাকে বলা হয় ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বা অ্যাটমিক নাম্বার। তবে একই মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে। সে ক্ষেত্রেও ওরা একই মৌলিক পদার্থ, কিন্তু পরস্পরের আইসোটোপ। যেমন, হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে যদি একটা নিউট্রন থাকে তা হলে সেটা হবে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ। এই রকম হাইড্রোজেনকে বলা হয় ভারী হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম্‌।

এর আগে বিজ্ঞানীরা শত শত বছর ধরে এক মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেও সফল হন নি। তার কারণ পরমাণুর এই গঠন সম্বন্ধে তাঁদের কারো কোনও ধারণা ছিল না, আর পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন করতে না পারলে এটা সম্ভবও নয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সেইটেই করেছেন এবং তারই ফলে তাঁদের হাতে এসেছে এক প্রচণ্ড শক্তি।

পরমাণুর নিউক্লিয়াস্‌কে বাইরে থেকে কোন রকমে সজোরে আঘাত করে ভেঙ্গে দিতে পারলে দেখা যাবে যে ভাঙ্গা অংশগুলোর মোট ওজন বা ভর গোটা অংশের ওজন বা ভরের চাইতে কমে গেছে। কিন্তু, আমরা জানি, পদার্থ অবিনশ্বর—তাকে গড়াও যায় না, লোপ করাও যায় না। তা হলে কোথায় গেল ঐ অংশটুকু? কোথায় আর যাবে, ঐ অংশটুকু বস্তু থেকে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই শক্তিই হচ্ছে সেই প্রচণ্ড শক্তি, যাকে আমরা পারমাণবিক শক্তি এই নাম দিয়েছি।

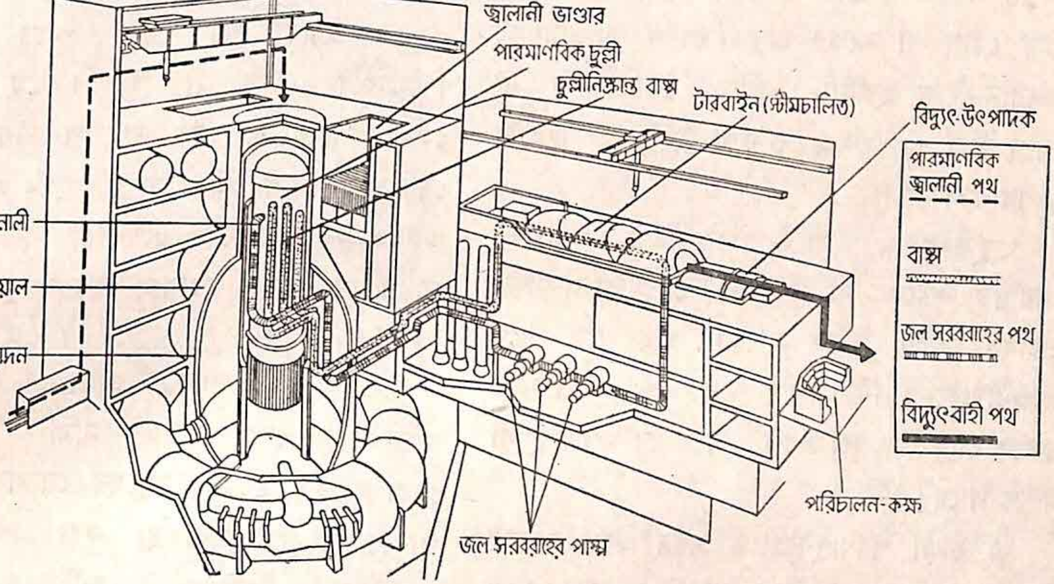
পারমাণবিক শক্তিকে কি করে কাজে লাগানো যাবে

পরমাণুর ভিতরকার এই শক্তিকে কাজে লাগাতে পারলে মানুষের শক্তির প্রয়োজনের ঘাটতি মেটানোর কাজ যে অনেক সহজ করে দেওয়া যায় তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এই শক্তিকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার কাজটা খুব সরল নয়। পারমাণবিক এঞ্জিনীয়াররা এজন্য তৈরি করেছেন পরমাণু-চুল্লী। কিন্তু তারও বহু সমস্যা। প্রথম সমস্যা আসে এই শক্তির প্রাবল্যের থেকে। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদারণে ২০ কোটি ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট শক্তি



পরমাণু বিভাজনের রেখাচিত্র

বেরিয়ে আসে আর তা আসে প্রধানত তাপ-শক্তি হিসেবে। (এক ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট শক্তি বলতে একটা ইলেকট্রন এক ভোল্ট তড়িৎ বিভবের ফলে যে শক্তি অর্জন করে তাই বোঝায়।) পরমাণু-চুল্লী বা পারমাণবিক চুল্লীর বিস্ফোরণ-কক্ষটিকে এই প্রচণ্ড তাপ সহ্য করবার উপযুক্ত করে তৈরি করতে হয়। একটি জল



পারমাণবিক শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিবর্তনের কারখানা

জাতীয় তরল স্রোত এই বিস্ফোরণ-কক্ষটির চারপাশে ঘিরে থেকে এই তাপশক্তিকে প্রয়োজন-মত ব্যবহারের জন্য বাইরে নিয়ে এসে প্রথমে তৈরি করে বাষ্প বা স্টীম্, তারপর তাই দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে উৎপাদন করে বৈদ্যুতিক শক্তি।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের একটা বড় সমস্যা এই যে বিদারণে নিষ্ক্রান্ত নিউট্রন আশপাশের যে কোনও পদার্থের পরমাণুকেও তেজস্ক্রিয় করতে পারে—তার মধ্যেও ঘটতে পারে বিস্ফোরণ। আর সে বিস্ফোরণ চলে বারে বারে—একটা থেকে দু'টো, দু'টো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা এইভাবে। তাই একে বলা হয় শৃঙ্খল-বিক্রিয়া বা চেন্ রি-অ্যাক্‌শন্। কাজেই এই শৃঙ্খল-বিক্রিয়াকে কেবলমাত্র দাহ্য পদার্থের মধ্যে সীমিত রাখা খুবই কঠিন। অ্যাটমিক এঞ্জিনীয়ারকেই এ সব ভাবনা ভাবতে হয় এবং রিঅ্যাক্টর বা চুল্লীর আচ্ছাদনটি কি ভাবে গড়তে হবে তার পরিকল্পনা করতে হয়। এমন জিনিস দিয়ে এটি গড়তে হবে যা প্রচণ্ড তাপ, চাপ এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মির সংঘাত সহ্য করা ছাড়াও উষ্ণ তরল স্রোতের সংস্পর্শে অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরমাণু-চুল্লী

চুল্লীর চারপাশটা সচরাচর বিশেষ শক্তিশালী এবং পুরু কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়। দাহ্য পদার্থটি (সচরাচর ইউরেনিয়াম) ঠিক বিস্ফোরণ-উপযোগী অবস্থায় রাখবার জন্য বিশেষ ধরনের আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তা ছাড়া ঐ চুল্লীর দহন বা বিস্ফোরণকে ঠিক চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত করার জন্য একটা বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও পরিকল্পনা করতে হয়। সচরাচর বিস্ফোরণ-নিষ্ক্রান্ত নিউট্রনকে

আকৃষ্ট করে অবিকৃত থাকতে পারে এই জাতীয় কিছু মৌল বা সংকর ধাতু (যেমন ক্যাডমিয়াম, বোরোন-স্টীল ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি দণ্ড ঐ চুল্লীর মধ্যে প্রয়োজন-মত ঢুকিয়ে দিয়ে এই কাজটা সম্পন্ন করা হয়।

শুধু তাই নয়। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে তেজস্ক্রিয়তা-জনিত ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই সঙ্গে সঙ্গে এঞ্জিনীয়ারদের নিরাপত্তার ব্যবস্থারও পরিকল্পনা করতে হয়। সামান্য একটু ত্রুটীতে কী অঘটনই না ঘটতে পারে!

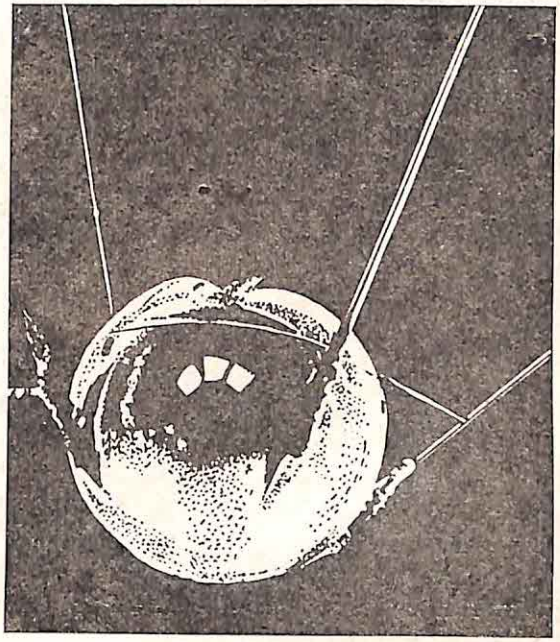
এ ছাড়া পরমাণু-চুল্লীতে দহন হয়ে যাবার পর যা পড়ে থাকে সেই আবর্জনাও প্রচণ্ড রকম তেজস্ক্রিয়। তাই এগুলো সামলাবারও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হয়। মাটির বহু নীচে সেগুলো পুঁতে না রাখতে পারলে সমূহ বিপদ্। আজকাল অবশ্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন সেগুলোকে ঐ ভাবে ফেলে না রেখে তা থেকে প্রয়োজনীয় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বার করে নেবার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কারণ চিকিৎসা, খাদ্য-সংরক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদি নানা কাজে ঐ সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের এখন ভয়ানক চাহিদা।

পারমাণবিক শক্তির কল্যাণমূলক ব্যবহার

প্রধানত এই সব এঞ্জিনীয়ারদের অক্লান্ত চেষ্টায় পারমাণবিক শক্তির কল্যাণমূলক ব্যবহারের চাবিকাঠি আজ মানুষের আয়ত্তে এসে গেছে। এক্ষেত্রেও প্রচণ্ড সাফল্য এসেছে গত কয়েক দশকের মধ্যে। আজকে পৃথিবীর শক্তির চাহিদা মেটাবার ভার কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল ও গ্যাসের পরিবর্তে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ওপর পড়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই বিস্ফোরণের জ্বালানী হিসেবে যে তেজস্ক্রিয় মৌল ব্যবহার করা হয় তার পরিমাণ এত অল্প যে মেরুর দেশের মত সবচেয়ে দুর্গম জায়গায়তেও এই শক্তি উৎপাদনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থা করতে যোগাযোগের জন্য কোনও সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের আরও নানা সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্র আছে। যেমন, সমুদ্রের নোনা জল থেকে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এই জাতীয় কারখানা তৈরিতে সোভিয়েত রাশিয়া ইতিমধ্যেই সাফল্য লাভ করেছে। জাহাজ ও ডুবোজাহাজ চালনার ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের কথা তোমরা আগেই পড়েছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৪৩-৪৪)। রাশিয়ার বরফ-ভাঙ্গা জাহাজ 'লেনিন' ও আমেরিকার মালবাহী জাহাজ 'স্যাভানা' এদিক্ দিয়ে পথিকৃৎ বলা যায়। এক কথায় পারমাণবিক শক্তিকে আজ আর দানবিক শক্তি বলে ভয় করার কারণ নেই। মানুষের কল্যাণময় জয়যাত্রার পথের সে আজ শরিক।

একটা কথা, পারমাণবিক শক্তিকে কেউ কেউ ভুল করে আণবিক শক্তি বলেন। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। অণু হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ যা পৃথক্ ভাবে থাকতে পারে এবং যা অনেক সময়েই একাধিক পরমাণু দিয়ে গঠিত। ইংরেজিতে ওকে বলে 'মলিক্যুল্'। আমরা যে শক্তির কথা বললাম তা পরমাণু ভেঙ্গে পাওয়া যায়, অণু ভেঙ্গে নয়। তাই এই শক্তিকে



মহাশূন্যে পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক এই উপগ্রহটি ১৯৫৭ সালে ৯৪ দিন ধরে পৃথিবীর ৫৬০ মাইল ওপর দিয়ে পাক খেয়েছিল।

আণবিক শক্তি বলাটা ভুল। তোমরা যেন সে ভুলটা ক'র না। খবরের কাগজের সাংবাদিকেরা, যাঁরা স্বভাবতই বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ন'ন, সম্ভবত এই ভুলটা আমদানী করেছিলেন।

মহাশূন্যে অভিযান

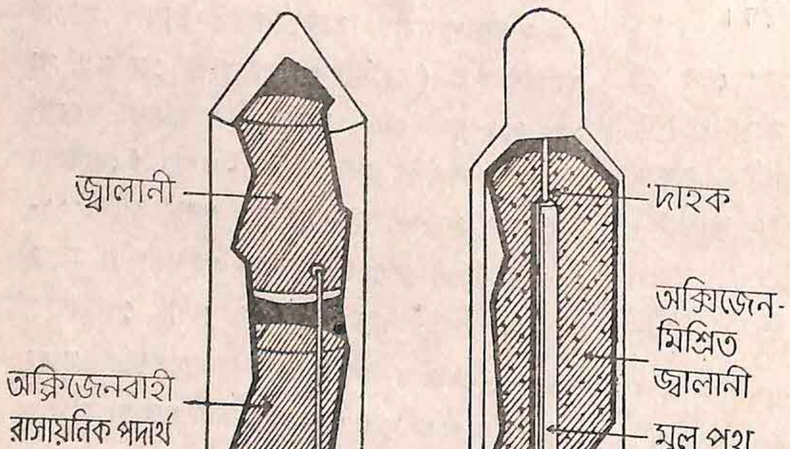
এ যুগের মানুষের জ্ঞানের জয়যাত্রায় আর এক মহৎ নিদর্শন হচ্ছে তার মহাশূন্যে অভিযান। পৃথিবীর ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করেই সে আর খুশি নেই, তাই নিজের অধিকার-সীমা নিজের জগতের বাইরে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, আর এ সাফল্য এসেছে অতি চমকপ্রদ ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। আকাশে ইচ্ছেমত উড়তে শেখার অর্ধশতকের মধ্যেই সে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে শুধু কৃত্রিম উপগ্রহই পাঠায় নি, নিজেও চলে গেছে সেই রাজ্যে। এ সম্বন্ধে এই বইএর অন্যত্র, প্রতিটি খণ্ডেই 'মহাশূন্যের পথে' বিভাগটিতে ভালো করে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাই তার এঞ্জিনীয়ারিং দিক্‌টার কথাই একটু বলব। এ কথা ভুললে চলবে না যে প্রতিটি মহাকাশ-যাত্রার পরিকল্পনা শুরু হয় অসংখ্য জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধানের মধ্যে দিয়ে। যাত্রার প্রতিটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অংশকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ত্রুটিহীন করে নিয়ে তবেই ঐ পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করা যায়। নইলে সামান্যতম ত্রুটিবিচ্যুতিতেও চূড়ান্ত অসাফল্য এবং সেই সঙ্গে চরমতম বিপদ্ ডেকে আনতে পারে।

মহাকাশযাত্রায় রকেটের কৌশল আগেই বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২-২৯৮), বলা হয়েছে আধুনিক জেট-বিমানের সঙ্গেও এর মিলের কথা (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, যানবাহনের কথা, পৃঃ ১৩২২-২৩)। কিন্তু শেষেরটির সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে জেট-বিমান তার জ্বালানী পোড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আবহাওয়ার মধ্যে থেকেই সংগ্রহ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের বাইরে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে অকেজো হয়ে পড়বে। কিন্তু রকেট তার জ্বালানী পোড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন হয় আলাদা কক্ষে তরল অবস্থায়, নয় তো জ্বালানীর সঙ্গেই মিশিয়ে নিয়ে যায়। তাই বায়ুমণ্ডলের বাইরে যেতেও তার কোন বাধা নেই।

রকেটের গড়ন

যে রকেট তরল জ্বালানী নিয়ে মহাশূন্যে ছুটে চলে তার গড়নটা হয় এই রকম ঃ

রকেট যেখান থেকে ছুটে বেরোয় তাকে আমরা বলতে পারি প্রেরণ-ক্ষেত্র। এই প্রেরণ-ক্ষেত্রে রকেটটিকে খাড়া ভাবে দাঁড় করিয়ে দিলে সবচেয়ে ওপরে ছুঁচলো মুখটায় যে অংশটি থাকে তাকে বলা হয় পে-লোড্, বাংলায় মূল বোঝা বলতে পারি। তার নীচে পর পর থাকে যন্ত্রপাতির ঘর, জ্বালানীর ঘর এবং রকেট চালাবার এঞ্জিন-ঘর। কি উদ্দেশ্যে রকেট ছাড়া হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে মূল বোঝাটি কি রকম হবে। যখন মহাশূন্যে অভিযান করা হচ্ছে তখন এটিকে আমরা বলব মহাকাশ-জাহাজ, যার মধ্যে মহাকাশযাত্রী নিরাপদে বসে থাকতে পারে। মারণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হলে মূল বোঝাটি পারমাণবিক বিস্ফোরকের কাজও করতে পারে। কিন্তু এখানে সে কথা উঠছে না।

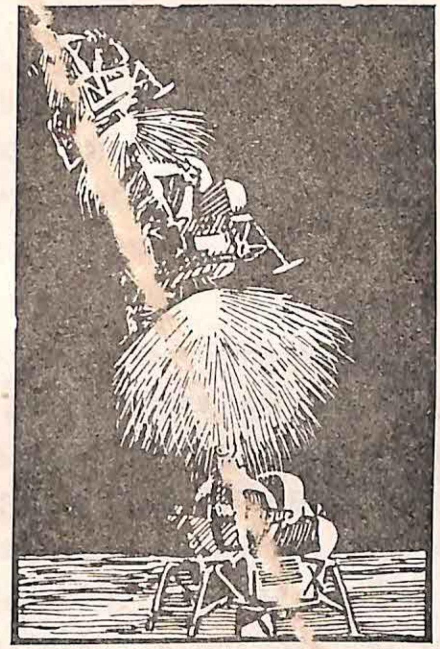


তরল ও কঠিন জ্বালানীর রকেটের তুলনামূলক চিত্র

যন্ত্রপাতির ঘরের কাজ রকেটের গতিবেগ ও কক্ষপথ নিয়ন্ত্রণ করা। বলা বাহুল্য এর যন্ত্রপাতিগুলো সবই স্বয়ংক্রিয়—নিজেরাই নিজেদের কাজ করে চলে। দরকার হলে এটি পৃথিবীর ওপরকার মূল নিয়ন্ত্রণ-কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগও রক্ষা করে। জ্বালানীর ঘরে অ্যালকোহল বা গ্যাসোলিন, এমন কি অনেক সময় তরল হাইড্রোজেন জাতীয় তরল জ্বালানী আর তা পোড়াবার জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন আলাদা আলাদা অংশে মজুত থাকে। এই জ্বালানী আর অক্সিজেন মিলিয়ে নিয়ে এঞ্জিনের ঘরের এক অংশে পোড়ানো হয় আর তার তলায় একটি সরু নজ্‌ল্ বা ছুঁচলো নলের মধ্যে দিয়ে বিস্ফোরণের তেজে তৈরি হঠাৎ-ফেঁপে-ওঠা গ্যাস সজোরে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থা থাকে। এই এঞ্জিনের ঘরেই থাকে চালক মোটর আর তা ছাড়া অন্যান্য আনুষঙ্গিক যন্ত্র —যেমন পাম্প, টারবাইন, গতিনিয়ন্ত্রক হাল ইত্যাদি। গ্যাস বেরিয়ে যাবার নলটি এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে ঐ গ্যাস যথাসম্ভব জোরে বেরিয়ে যেতে পারে। ঐ বেরিয়ে যাবার পথের মধ্যেই

বসানো থাকে গতিপথ আর দিক্ নিয়ন্ত্রণের হাল, যা নাকি তাপ সহ্য করতে পারে এমন কোন জিনিস দিয়ে তৈরি। পৃথিবী থেকে বেতারের সাহায্যে এই হালকে পরিচালিত করা হয়।

রকেটের তিনটি অংশ—মূল বোঝা, জ্বালানী আর কাঠামো—এদের ওজন যোগ করেই



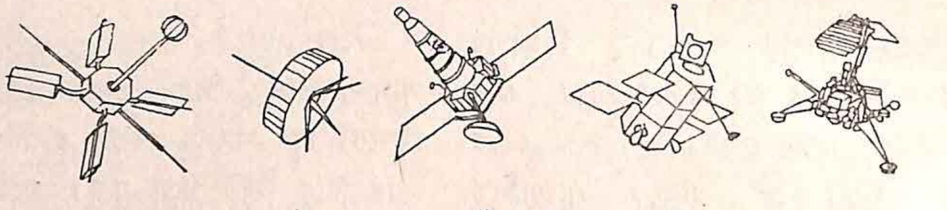
অভিযাত্রীকে নিয়ে চাঁদের ভেলা নামছে।

রকেটটির সম্পূর্ণ ভার হিসেব করা হয়। রকেটের সাফল্য বা উৎকর্ষের বিচারের একটা মাপকাঠি হচ্ছে এর পুরো ও সঙ্গে মূল বোঝা ও কাঠামোর যুগ্ম ওজনের াত। এই অনুপাত সংখ্যাটি যত বেশি যায় রকেটের জ্বালানী অংশটা তত হতে পারে—যার ফলে রকেটের উড়বার মতা আর উঁচুতে উঠবার শক্তিটা বেড়ে যায়।

তরল জ্বালানীর বেলায় রকেটে দহন-ক্রিয়াটি আলাদা কক্ষে একদম তলার দিকে হয় বলে রকেটের চার পাশের দেয়াল বেশ পাৎলা ধাতুর চাদর দিয়ে তৈরি করা যায়। রকেটের নিজস্ব ওজনটাও তাই খুব কম করা যায়। রকেটকে বিস্ফোরণের ধাক্কায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতার বাইরে নিয়ে যেতে হলে প্রচণ্ড শক্তির দরকার। কাজেই ওর ওজন যত কম হবে ততই ওকে ঠেলে তুলে দেওয়ার কাজটা সহজ হবে। রকেটকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ঠেলে মহাকাশে তুলে নিয়ে যেতে হলে রকেটের বেগ কম করেও সেকেণ্ডে সাত মাইল হওয়া দরকার। আর পৃথিবীর চারপাশে ওকে ঘোরাতে হলে সেকেণ্ডে অন্ততঃ পাঁচ মাইল বেগে ওকে ছোটাতে হয়। একটি রকেটের নিজস্ব শক্তিতে এটা অসম্ভব বলেই ধাপে ধাপে বহুস্তর-বিশিষ্ট রকেটের সাহায্য নেওয়া হয়। এই রিলে পদ্ধতিতে কি করে রকেট ছুটে চলে সে কথাও আমরা আগেই আলোচনা করেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৭)। মহাকাশযাত্রায় মহাকাশ-জাহাজটিকে মহাশূন্যে ঠেলে তুলে দিয়ে রকেট নিজে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার পর পৃথিবীর চারপাশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে থাকে। তখন সে মহাশূন্যের আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়।

রকেট কি করে ছোঁড়া হয়

রকেটের প্রেরণ-ক্ষেত্র হচ্ছে একটি বড় কংক্রিটের ধাপ, যেটা প্রাথমিক বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলাবার উপযুক্ত করে তৈরি করা হয়। রকেট ছুঁড়বার মুহূর্তে তার ধরবার কাঠামোটি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। রকেট যাঁরা চালান



বিভিন্ন প্রয়োজনে তৈরি কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ

(১) মহাশূন্যের খবর-সন্ধানী 'এক্‌স্‌প্লোরার' (২) আবহাওয়া-সন্ধানী 'টাইরস'

(৩) চাঁদের আশপাশের তথ্য-সন্ধানকারী 'রেঞ্জার' (৪) মহাশূন্যের জ্যোতিষ্ক-সন্ধানী উপগ্রহ

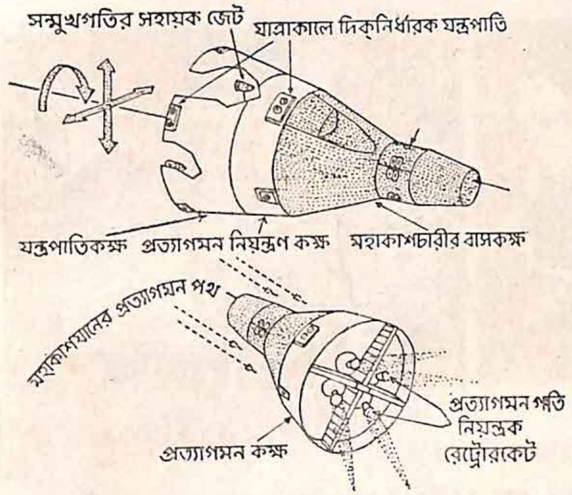
(৫) চান্দ্রযান বা চাঁদের ভেলা 'সারভেয়ার'

সেই বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়াররা ঐ প্রেরণ-ক্ষেত্রের একধারে বিশেষভাবে তৈরি একটি বাড়ীতে বসে থাকেন। এই বাড়ীটাকে বলা হয় ব্ল্যাক্ হাউস, আর এটি এমন ভাবে তৈরি করা হয় যে বিস্ফোরণের ধাক্কা ওর কিছুই করতে পারে না। পরের দিকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চললেও রকেট যখন প্রথম ওপরে যাত্রা শুরু করে তখন তার গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র চল্লিশ ফুট। অবশ্য পরের মুহূর্তেই সেটা হয়ে যায় দ্বিগুণ, তার পরের মুহূর্তে তিন গুণ। এইভাবে বাড়তে বাড়তে যতই সময় যেতে থাকে, রকেটের জ্বালানী পুড়ে যাওয়ায় ওর ওজন ততই কমতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ওপরে বায়ুর চাপও কমতে থাকায় ওর গতি বাড়বার পক্ষে যে সব বাধা তা কমে আসে। কাজেই মাত্র এক মিনিট পরেই ওর গতিবেগ সেকেণ্ডে এক মাইল ছাড়িয়ে যেতে পারে।

নানারকম খুঁটিনাটি হিসেব

রকেটের সাহায্যে যে সব মহাকাশ-জাহাজ মহাকাশে পাঠানো হয় সেগুলির লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সব সময় এক নয়। কি লক্ষ্য নিয়ে, কি উদ্দেশ্যে সেটা পাঠানো হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করে তার পরিকল্পনা এবং, পাঠাবার আগেই, তার খুঁটিনাটি নক্‌শা সম্পূর্ণ করে নিতে হয়। কতকগুলি মহাকাশ-জাহাজকে কৃত্রিম উপগ্রহ হিসেবে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরানো হয় নানা রকম বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনে ব্যবহৃত টেলেস্টার বা আবহাওয়ার সংবাদ সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এই শ্রেণীতে পড়ে।

আর এক শ্রেণীর মহাকাশ-জাহাজকে দূর মহাকাশে অন্যান্য গ্রহ বা উপগ্রহের উদ্দেশে অভিযানে পাঠানো হয়—পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ পাল্লার বাইরে। চাঁদে বা মঙ্গলে অভিযান এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণীর মহাকাশ-জাহাজের কক্ষপথের ব্যাস ও পৃথিবীর অক্ষ-রেখার সঙ্গে কৌণিক দূরত্ব আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিযানে মহাকাশ-জাহাজটি যখন নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবে তখন তার লক্ষ্যস্থলটি মহাকাশের কোথায় সরে আসবে তারও সঠিক হিসেব আগেভাগেই করে নিতে হয়—যাতে সেটি ঠিকমত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে, এদিক্ ওদিক্ গিয়ে না হাজির হয়। অতি নিখুঁত ভাবে এ সব হিসেব করতে হয়, সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতিতে

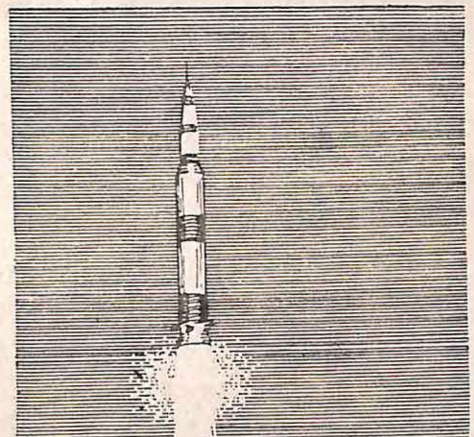


মহাকাশযাত্রীদের যানবাহন পরিচালনার কলাকৌশল : পেছনের রেট্রোরকেটের সাহায্যে পরিচালক গতিবেগ ও যাত্রার দিক্ ঠিক করেন।

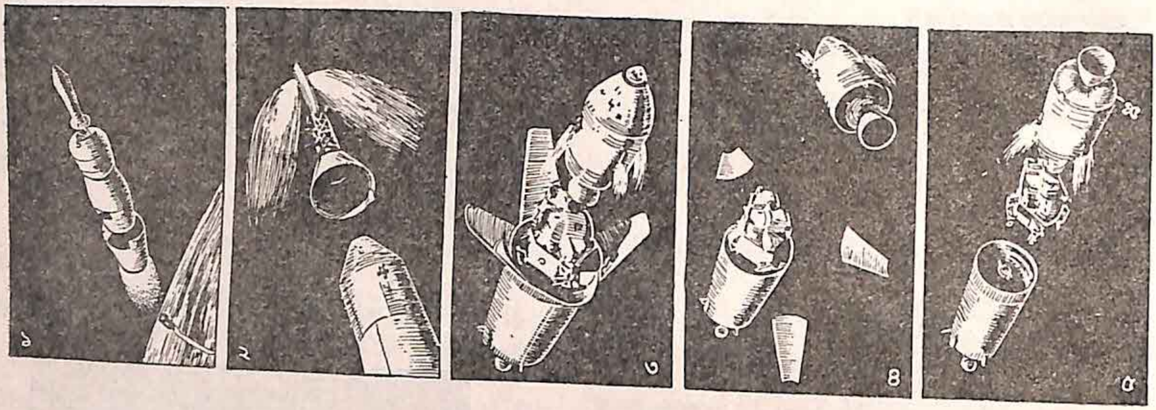
জাহাজটি মহাশূন্যে হারিয়ে যেতে পারে। এজন্য চালক রকেটটিকে একটি পরিচালক প্রণালীর অধীনে রাখা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাকাশ-জাহাজের ভিতরে রাখা বেতার যন্ত্রের পাঠানো সংকেতকে পৃথিবীর ওপরকার নিয়ন্ত্রক স্টেশনের কম্পিউটারের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে নির্দেশ পাঠানো হয়—গতিবেগ ও গতিপথ সঠিক রাখার জন্য। উড়বার সময়ে নিজের যন্ত্রপাতি চালু রাখবার উপযোগী শক্তিসঞ্চয়ের জন্য অধিকাংশ মহাকাশ-জাহাজকেই বিশেষ ভাবে তৈরি ব্যাটারী যোগানো হয়—যে ব্যাটারী সৌরশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

যে সব মহাকাশ-জাহাজকে একবার মহাশূন্যে পাঠিয়ে আবার অক্ষত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের জন্যও আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হয়। প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে পারে এ রকম চাদর দিয়ে তৈরি আচ্ছাদনে ঘিরে রাখতে হয় এদেরকে। কারণ, ফিরবার সময় যখন এগুলি পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন সেই সংঘর্ষে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়। তাতে যাতে এগুলি পুড়ে না যায় সেই জন্যই এটা দরকার।

এ ছাড়া আরও কত কিছুর ওপর নজর রাখতে হয় তার আভাস তো আগেই দেওয়া



চাঁদে অভিযানের পথে অ্যাপোলো মহাকাশ-জাহাজ স্যাটার্ন্ রকেট তিনজন যাত্রী-সহ মহাকাশ-জাহাজটিকে মহাকাশে ঠেলে তুলে দিচ্ছে।



চাঁদে ছুটে চলল মহাকাশ-জাহাজ

(১) স্যাটার্ন রকেটের প্রথম স্তর পুড়ে নিঃশেষ হয়ে পেছনে পড়ে যাচ্ছে। (২) আপৎকালীন নিক্রমণ-যান ফেলে দেওয়া হচ্ছে। (৩) চাঁদের ভেলাকে তার কক্ষ থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে—পরিচালন ও যন্ত্রপাতি-কক্ষও আলাদা হয়ে যাচ্ছে। (৪) পরিচালন-যানটি নিজের অবস্থান ঘুরিয়ে নিচ্ছে চাঁদের ভেলাকে বার করে আনার জন্য। (৫) পরিচালন-যান ভেলাটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিয়ে স্যাটার্ন রকেটের শেষ অংশটিকে পরিত্যাগ করে চাঁদের পথে যাত্রা করছে।

হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮-৩০৩)। মোট কথা, মানুষের মহাকাশজয় এ যুগের এঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতার এক অপূর্ব নিদর্শন।

যান্ত্রিক সভ্যতার আমদানী নতুন জটিলতা

বিজ্ঞান এবং এঞ্জিনীয়ারিং-এর চরম উৎকর্ষ আধুনিক জীবনধারার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে জটিলতারও আমদানী করেছে প্রচুর। খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মতন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছে—যার ফলে যান্ত্রিক সভ্যতার অবদানে সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশগুলি আজ এক নতুন সমস্যায় বিব্রত হয়ে উঠেছে। যে সমস্ত আবিষ্কার একদিন মানুষের কাছে পরম বরণীয় মনে হয়েছিল আজ তার অনেকগুলিই ধীরে ধীরে যেন ভয়াবহ অভিশাপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে। কল-কারখানার চিমনী থেকে দিবারাত্র যে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে তাতে মানুষের সম্পদ্ বোঝাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে বাতাস থেকে মানুষের প্রাণবায়ু অক্সিজেনকেও সরিয়ে দিচ্ছে। যে মোটরগাড়ীকে সভ্যতার অগ্রগতির মাপকাঠি এবং মানুষের বন্ধু হিসেবে এতদিন মনে করা হচ্ছিল তাই এখন শহরে ধোঁয়াশার (ধোঁয়া + কুয়াশা) জনক হিসেবে মানুষের সুস্থ জীবনের বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমেরিকায় বড় বড় শহরে তো এখন পুরোনো ভাঙ্গা গাড়ীগুলোকে নিয়ে কোথায় রাখা হবে বা ফেলা হবে তাও একটা সমস্যা।

কল-কারখানার উৎপাতে শুধু আবহাওয়াই দূষিত হয় নি, নদী-নালা, হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়-গুলিকেও করে তুলেছে দূষিত—বিষাক্ত। এতে



চাঁদের ভেলা পরিচালন-যানটিকে চাঁদের চারদিকে ঘুরতে দিয়ে মহাকাশযাত্রীদের নিয়ে চাঁদে নামবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

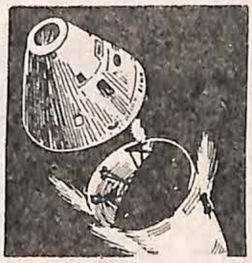
যে মানুষের একটি প্রধান খাদ্য মাছেরই দ্রুত বিনাশ ঘটছে তাই নয়, জলের উষ্ণতা বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপরেও নানান্ রকম বিপজ্জনক পরিবর্তনের ছাপ রাখছে। বহু বড় বড় শহরে কল-কারখানা এলাকায় গ্যাস-মুখোস পরে থাকা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। বিজ্ঞানীরা ভয় পাচ্ছেন, দুই মেরুর চার পাশের বরফের স্তূপও হয়তো ক্রমশ গলতে শুরু করে পৃথিবীব্যাপী বহু বিপত্তির কারণ ঘটাবে, বিপত্তি ঘটবে শস্য উৎপাদনের বেলায়ও। যান্ত্রিক সভ্যতার অতি দ্রুত অগ্রগতির চাহিদায় মাটির নীচে সঞ্চিত কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি অতিপরিচিত শক্তির যোগানগুলিও ক্রমেই নিঃশেষিত হয়ে আসছে। এইভাবে একাধারে শক্তির ভাণ্ডারের দ্রুত ক্ষয় ও আর একদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার আমদানী বিষাক্ত পরিবেশ আজকের বিজ্ঞানী ও এঞ্জিনীয়ারদের খুবই বিব্রত ও চিন্তিত করে তুলেছে।

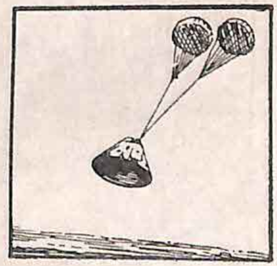
এঞ্জিনীয়ারদের নতুন দায়িত্ব

কিন্তু তাই বলে তাঁরা চুপ করে হাল ছেড়ে বসে থাকবেন তা তো হয় না! তাঁরাই ভবিষ্যতের দিশারী। তাঁদেরই খুঁজে বার করতে হবে নতুন সমাধানের সূত্র। এ যুগের এঞ্জিনীয়াররা তাই নতুন শক্তিভাণ্ডারের সন্ধানে ছুটছেন।

কোথায় পাওয়া যাবে সেই শক্তি? কেন, আমাদের চিরপরিচিত সূর্য তো আর পালিয়ে যায় নি! আর সেই তো হচ্ছে সবচেয়ে বড় শক্তির ভাণ্ডার! এই সূর্যের কাছ থেকেই সংগ্রহ করতে হবে শক্তি—সৌর শক্তি। তা, এ বিষয়ে তাঁরা বেশ খানিকটা সাফল্য ইতিমধ্যেই অর্জন করেছেন।

এ ছাড়াও নতুন নতুন শক্তিভাণ্ডার খোঁজা হচ্ছে। সমুদ্রের জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করে, পৃথিবীর কেন্দ্রের উত্তাপকে কাজে লাগাবার জন্য অতি গভীর কূয়ো খুঁড়ে ওপর থেকে জল তার ভিতরে পাম্প করে বাষ্প



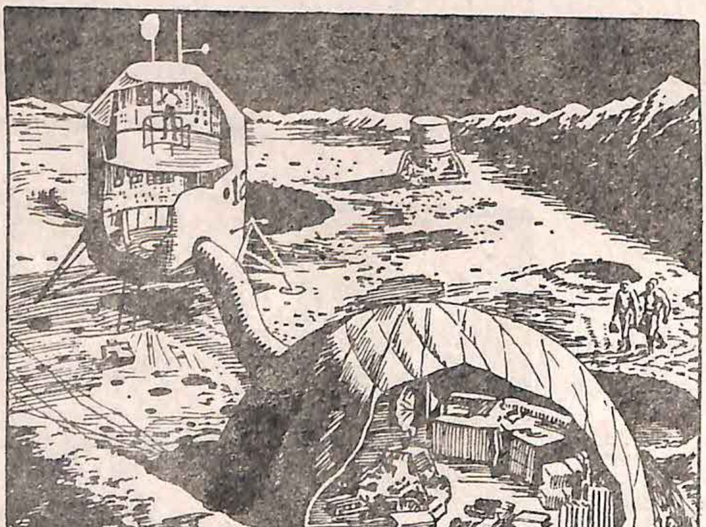


বাঁ-দিকে: অভিযান-শেষে পৃথিবীতে ফিরে চলেছে মহাকাশ-জাহাজ। কাজ শেষ, তাই যন্ত্রপাতি-কক্ষও পরিত্যক্ত। ডান দিকে: সমুদ্রের বুকে ধীরে ধীরে নামবার জন্য প্যারাস্যুটগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে।

হিসেবে বার করে এনে, নিয়ন্ত্রিত ভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে—কত ভাবেই না চলেছে চেষ্টা! সমুদ্রের তলায় রয়েছে খনিজ তেলের ভাণ্ডার, তারও সন্ধান নিয়ে চলেছেন তাঁরা।

এ ছাড়াও ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে রাখবার জন্য অনেক কিছু মৌলিক পরিবর্তনের কথা ভাবতে হচ্ছে তাঁদেরকে। মোটরগাড়ীর ক্ষতিকর ক্ষমতা কমাবার জন্য নতুন ধরনের এঞ্জিনের কথা ভাবতে হচ্ছে—যাতে বিষাক্ত গ্যাস বেরোনো একদম বন্ধ করে দেওয়া যায়। অদরকারী পরিত্যক্ত আবর্জনা দিয়ে মূল্যবান্ জমি আটকে না রেখে সেই সব ভাঙ্গাচোরা আবর্জনাকে কি করে আবার কাজে লাগানো যায় তারই চেষ্টা চলেছে বিশেষ ভাবে পরিকল্পিত কারখানার মাধ্যমে।

ডাঙ্গার ওপর দিয়ে মোটরগাড়ী না চালিয়ে পাতাল-রেল জাতীয় গাড়ীর আরও সম্প্রসারণ, শহরের রাস্তায় ভিড় না বাড়িয়ে যতটা সম্ভব জলপথে যাতায়াত বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানা রকম পরিকল্পনা ঘুরছে তাঁদের মাথায়। এমন কি, যাতায়াত ব্যবস্থার ওপর চাপ কমাবার জন্য, বড় বড় অফিসগুলিকে শহরের কেন্দ্র থেকে কি করে সরিয়ে দেওয়া যায় তাই ভাবতে গিয়ে এখন চিন্তা করে দেখা হচ্ছে অফিসকে আরও স্বল্পপরিসর জায়গায় আঁটানো যায় কিনা। এক একটা অফিসে প্রচুর পরিমাণে কাগজপত্র লাগে—ফাইলে ফাইলে ভর্তি হয়ে থাকে ঘর। এই কাগজের পরিমাণ কমিয়ে যদি সেগুলোকে মাইক্রোফিল্‌মের দখলে আনা যায় তা হলে তার স্থান সংকুলানের জন্য আর মাথা ঘামাতে হয় না। এইভাবে অফিসের কাগজের স্তূপ কমাতে পারলে এবং টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি যন্ত্রের আরও উন্নতি করতে পারলে হয়তো ভবিষ্যতের কর্মীরা অফিসের বেশির ভাগ কাজ বাড়ীতে নিজের ঘরে বসেই শেষ করতে পারবেন। তবে তা করতে গিয়ে হয়তো দেখা যাবে তাঁদের বাড়ীগুলিও নতুন ধাঁচে তৈরি না করলে চলছে না। তখন তার জন্যও প্রয়োজন হবে নতুন পরিকল্পনার।



ভবিষ্যতে চাঁদের বুকে কি ভাবে উপনিবেশ গড়া শুরু হবে তারই কাল্পনিক ছবি

এই রকম নানা ধরনের সুদূর-প্রসারী ভবিষ্যৎচিন্তা আজকের এঞ্জিনীয়ারদের মাথায় সর্বদাই ঘুরছে। কি করে ভবিষ্যতের মানব-সভ্যতাকে আরও উন্নত চেহারায় আনা যায় তারই চিন্তা। নতুন দিনের সেই এঞ্জিনীয়ারিংএর কথা আবার নতুন করে লিখতে হবে অদূরভবিষ্যতে।

যে গল্প চিরকালের

স্ফিংসের ধাঁধা

থিবিস শহরের কাছে পাহাড়ের ওপর থাকে এক দানবী। তার মাথাটা মানুষের মত, শরীরটা সিংহীর। পায়ে ধারাল নখ, পেছনে একটা মস্ত লেজ, আর ছ'পাশে ছ'খানা বিরাট ডানা লাগানো —পাখীর মত। নাম তার স্ফিংস্।

দানবী কিন্তু ভীষণ হিংস্র। সর্বক্ষণ পাহাড়ের ওপর গুটিশুটি হয়ে বসে থাকে আর তার সামনে দিয়ে যদি কোন লোক যায় তবে তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কারো যাবার উপায় নেই। সর্ত, যদি ঠিক উত্তর দিতে পার ভালো, নয় তো তখনই তোমাকে দিয়ে দানবী তার জলযোগ শেষ করবে।

কিন্তু সে তো প্রশ্ন নয়, সে এক বিরাট ধাঁধা! কেউ তার উত্তর দিতে পারে না, দানবীও সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে খেয়ে ফলে।

এই ভাবে কত লোক এল। কেউ জেনে, কেউ না জেনে দানবীর সামনে গিয়ে পড়ল। দানবীর ঐ এক প্রশ্ন আর শেষ পর্যন্ত সকলেরই ঐ এক ভাগ্য।

এখানে একটু আগের ঘটনা বলে নিই। ঐ থিবিস্ ছিল গ্রীসে, আর এক পরাক্রান্ত রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। রাজার ছিল জ্যোতিষীতে অগাধ বিশ্বাস—যা সে আমলে প্রায় সকলের মধ্যেই দেখা যেত।

ঐ রাজার এক ছেলে হ'ল। রাজা জ্যোতিষীদের ডেকে ছেলের ভাগ্য গণনা করতে বললেন। কিন্তু তারা যা বলল তা বড় ভয়ানক কথা। ঐ ছেলেই নাকি বড় হয়ে তাঁকে মেরে ফেলবে।

শুনে রাজার তো চক্ষুস্থির। কিন্তু গণনা করলেই তো আর তা ফলতে দেওয়া যায় না! রাজা তাই আদেশ করলেন, এ ছেলেকে আর বড় হতে দেওয়া হবে না। দূর বনে পাহাড়ের ওপর ওকে রেখে আসা হোক, যাতে সেখানেই না খেতে পেয়ে কিংবা বন্য পশুদের হাতে ও-ছেলের মৃত্যু হয়। নিজের হাতে ছেলেকে কেটে ফেলতে বোধ হয় একটু মায়া হ'ল তাঁর।

শিশুটিকে ঐ ভাবেই জঙ্গলে একটা পাহাড়ের ওপর রেখে আসা হ'ল।

কিন্তু ভগবানের বিধান কে বুঝতে পারে? এক রাখাল ঐ জঙ্গলে কি করতে গিয়েছিল।



একটি অপরূপ সুন্দর খোকা!

গিয়ে দেখে একটি অপরূপ সুন্দর খোকা। রাখালের মায়া হ'ল, সে শিশুটিকে নিয়ে চলে এল তার নিজের দেশ কোরিন্থে। ছেলেটির নাম রাখা হ'ল ইডিপাস্।

ইডিপাস্ একটু একটু করে বড় হতে লাগল। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি অসামান্য তার সাহস, আর তেমনি তার শক্তি। যুদ্ধে তাকে এঁটে ওঠা শক্ত। সে যে থিবিসের রাজার ছেলে তা কিন্তু সে ঘুণাক্ষরেও জানত না।

সেই সময়ে কোরিন্থের সঙ্গে ছিল থিবিসের ভীষণ শত্রুতা। ইডিপাস কোরিন্থের রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। একদিন ঘটনাচক্রে থিবিসের রাজার সঙ্গে ইডিপাসের দেখা হয়ে গেল; আর, সে তো শত্রুপক্ষের রাজা, তাই ইডিপাস তাকে যুদ্ধে হারিয়ে মেরে ফেলতে দ্বিধা করল না।

এই ভাবে জ্যোতিষের গণনা ফলে গেল। নিজের ছেলের হাতেই রাজা প্রাণ হারালেন, যদিও ইডিপাস্ জানতেও পারল না যে নিজের বাপকেই সে হত্যা করেছে।

এখন, থিবিসে নিয়ম করা হয়েছিল যে যদি কেউ স্ফিংসের ঐ ধাঁধার জবাব দিতে পারে তাকেই দেওয়া হবে সে রাজ্যের সিংহাসন। ইডিপাস ঠিক করল সে ঐ প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করবে। উত্তর দিতে না পারলে তার কি দশা হবে তা তার অজানা ছিল না, কিন্তু তাতে সে ভ্রূক্ষেপও করল না। অসীম সাহসে গিয়ে হাজির হ'ল সেই দানবী স্ফিংসের সামনে।

"কি তোমার প্রশ্ন আমাকে বল?"

স্ফিংস্ বলল,—"পৃথিবীতে এক অদ্ভুত জীব আছে যার যুড়ি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও নেই। সেই জীব গোড়ায় চার পায়ে হাঁটে, তার পর চলে দু' পায়ে, আর সবশেষে হাঁটে তিন পায়ে। বলতে পার সে জীবের নাম?"

ইডিপাস্ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "কেন, মানুষ! মানুষই তো ঐ ভাবে চলে। শৈশবে সে খাড়া হয়ে চলতে পারে না, হামাগুড়ি দিয়ে চার পায়ে চলে। তার পর একটু বড় হলেই সে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে দু' পায়ে হাঁটতে শুরু করে। এইভাবে বহু বছর গেলে সে যখন বুড়ো হয়ে পড়ে তখন আর শুধু দু' পায়ের ওপর ভর করে চলার শক্তি তার



ইডিপাস্



"কি তোমার প্রশ্ন আমাকে বল ?"

পৃঃ ১৩৮৮

থাকে না, দরকার হয় একটি লাঠির। ঐ লাঠিই তখন তার তৃতীয় পা। তখন সে তে-পেয়ে জীব ছাড়া আর কিছু নয়।"

জবাব শোনা মাত্র দানবী পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ল আর তার দেহ চুরমার হয়ে গেল।

থিবিসের লোকেরা ইডিপাস্‌কে নিয়ে তাদের রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

এর অনেক পরে ইডিপাস্ ঘটনাচক্রে একদিন জানতে পারল যে তার আগে যিনি থিবিসের রাজা ছিলেন,—যাঁকে সে যুদ্ধে হত্যা করেছে,—তিনিই তার সত্যিকার বাবা। তখন অনুশোচনায় তার মন ভরে গেল। সে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে ভিখারীর বেশে রাজধানী থেকে বেরিয়ে গেল। শুধু তাই নয়, সিংহাসনে বসে সে না জেনে এমন অনেক কাজ করেছে যাতে তার ঘোরতর অপরাধ হয়েছে। সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের চোখ দু'টিও খুঁচিয়ে সে অন্ধ করে ফেলল।

(ইডিপাসের এই করুণ কাহিনীটি প্রাচীন গ্রীক পুরাণে লেখা আছে।)

আলাদীনের প্রদীপ

আফ্রিকা দেশে এক ছিল যাদুকর। তার ছিল একটা যাদুর আংটি। সেই আংটি ঘষলেই একটি দৈত্য এসে তার অনেক কিছুই করে দিত।

যাদুকর জানতে পারল, চীন দেশে একটা আশ্চর্য প্রদীপ আছে যেটি ঘষলেও ঐ রকম একটি আজ্ঞাবহ দৈত্য বেরিয়ে আসে। তার কাছে যা চাইবে তাই সে এনে হাজির করবে।

যাদুকর চলে এল চীন দেশে। কিন্তু ঐ প্রদীপটি আছে পাতালে এক পরীর রাজ্যে। ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গপথ দিয়েই কেবল সেখানে ঢোকা যায় আর ঢুকবার সময় যদি সুড়ঙ্গের দেয়ালে জামাকাপড় ঠেকে যায় তা হলেই মৃত্যু। যাদুকর তাই নিজে না গিয়ে আলাদীন নামে ছোট একটি চীনে ছেলেকে ডেকে বলল, "তুমি যদি ওর ভিতর দিয়ে ঢুকে প্রদীপটি এনে দিতে পার তা হলে তোমাকে আমি পৃথিবীর একজন মস্ত ধনী বানিয়ে দেব।"

আলাদীন রাজী হ'ল। যাদুকর তার হাতে নিজের যাদু-আংটিটি পরিয়ে দিলে সে অতি সন্তর্পণে সুড়ঙ্গপথে ঢুকে এক আশ্চর্য বাগান দেখতে পেল। প্রদীপটি সেই বাগানেই পড়ে ছিল। আলাদীন সাবধানে সেটি তুলে নিল।

সুড়ঙ্গের মুখের কাছে আসতেই যাদুকর বলল, "প্রদীপ পেয়েছ? ওটি দাও, তোমাকে বার করে আনছি।" আলাদীন বলল, "না, আগে আমাকে বার করে আন, তারপর প্রদীপটি তোমাকে দেব।" যাদুকর তখন রেগে গিয়ে সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে চলে গেল।

বন্দী আলাদীন সেই আশ্চর্য বাগানে ঘুরতে লাগল। হঠাৎ একটা গাছের সঙ্গে তার হাতের আংটিটার ঘষা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আংটি থেকে এক বিরাট দৈত্য বেরিয়ে এসে বলল, "হুজুর, আপনার জন্য কি করতে পারি আমি?"

আলাদীন অবাক্ হলেও ভারি চালাক ছেলে সে। সে বলল, "এখনই আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে আমার বাড়ীতে নিয়ে চল।"

পলকে আলাদীন দেখল সে তার নিজের বাড়ীতে তার মা'র সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ভারি খিদে পেয়েছে আলাদীনের, তার ওপর ওরা এত গরীব যে কিছু যে কিনে খাবে সে পয়সাটুকুও নেই ঘরে। আলাদীন মায়ের হাতে

প্রদীপটা দিয়ে বলল, "এটা বাজারে বিক্রি করে সেই পয়সায় কিছু খাবার কিনে আন।" মা বললেন, "প্রদীপটা বড্ড ময়লা, ঘষে-মেজে একটু পরিষ্কার করে না নিলে কেউ কিনতে চাইবে না।"

আর, যেই প্রদীপটা একটু ঘষেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আরও বিরাট এক দৈত্য। হাতযোড় করে সে বলল, "আমি এই প্রদীপের ক্রীতদাস। এই প্রদীপ যাঁর তিনি যা হুকুম করবেন তাই করে দেব।"

মা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আলাদীন খুব সাহসী, সে বলল, "আমাদের এক্ষুনি নানা রকম ভালো ভালো খাবার এনে দাও।"

খেয়েদেয়ে খোশ্‌মেজাজে আলাদীন বেড়াতে বেরিয়েছে। সে দেশের রাজকন্যাও সেই সময়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। রাজকন্যাকে দেখে আলাদীনের ভারি ভালো লাগল। সে তক্ষুনি বাড়ী গিয়ে প্রদীপটা ঘষে দৈত্যকে হুকুম করল, "আমাদের জন্য একটা বিরাট অট্টালিকা করে দাও আর সোনাদানা, হীরেজহরৎ, দাস-দাসীতে তা ভরিয়ে দাও।" দৈত্য তাই করল। আলাদীন তখন গোটা চল্লিশেক সোনার বাটি হীরে-চুনী-পান্না দিয়ে ভর্তি করে রাজার কাছে ভেট পাঠিয়ে দিয়ে বলল সে রাজকন্যাকে বিয়ে করতে চায়। ভেট পেয়ে রাজা তো ভীষণ খুশি, আর অমনি রাজী। বিয়ে হয়েও গেল।

এদিকে সেই যে যাতুকর, সে সেই প্রদীপটির আশা ছাড়ে নি। একদিন আলাদীন বেড়াতে বেরিয়েছে, রাজকন্যা একা বাড়ীতে। যাতুকর এক ফেরিওয়ালা সেজে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে—"পুরোনো বাতি বদলে নতুন বাতি কিনবেন?"

রাজকন্যা তো প্রদীপের গুণের কথা জানে না, সে যাতুকরের সঙ্গে বাতিটা বদলাবদলি করে নিল।

ব্যস্, প্রদীপ এখন যাতুকরের হাতে। সে সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যকে হুকুম দিয়ে বাড়ীঘরশুদ্ধু আফ্রিকায় নিয়ে এল—মায় রাজকন্যা সমেত।

আলাদীন ফিরে এসে দেখে, কোথায় তার বাড়ী, কোথায়ই বা তার রাজকন্যা বৌ! চার দিকে ধুধু করছে মাঠ। হঠাৎ তার হাতের আংটিটার কথা মনে পড়ল। সেটা ঘষে সে তার বাড়ীঘর আর বৌকে ফিরিয়ে আনতে বলল আংটির দৈত্যকে। দৈত্য বলল, "আমি কেবল তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি। প্রদীপের দৈত্যেরই শুধু আছে সেই ক্ষমতা।"

আলাদীন চলে এল আফ্রিকায়—যাতুকরের বাড়ীতে। দেখল রাজকন্যা সেখানেই রয়েছে। রাজকন্যা স্বামীকে দেখে ভারি খুশি। বলল, "সাবধান, এখনই যাতুকর খেতে আসবে, তোমাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে।"

আলাদীন বৌএর হাতে একটা গুঁড়ো দিয়ে বলল, "এটা যাতুকরের সরবতে মিশিয়ে দিও।" বলে সে গালিচার নীচে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই যাতুকর এসে রাজকন্যার পাশে খেতে বসল, আর সেই গুঁড়ো-মেশানো সরবৎ এক চুমুক খেয়েই ঢলে পড়ল চিরদিনের মত।

তার পর? তার পর আর কি, প্রদীপ এখন আবার আলাদীনের হাতে। বাড়ীঘর, রাজকন্যা—সব কিছু নিয়ে সে আবার ফিরে এল চীনে, আর সেখানে তু'জনে মিলে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

(এই গল্পটি একটু অন্য ভাবে আরব্য-উপন্যাসে থাকলেও বিশেষজ্ঞদের মতে আরও অনেক প্রাচীন যুগে কোন নাম-না-জানা লেখকের লেখা এটি।)

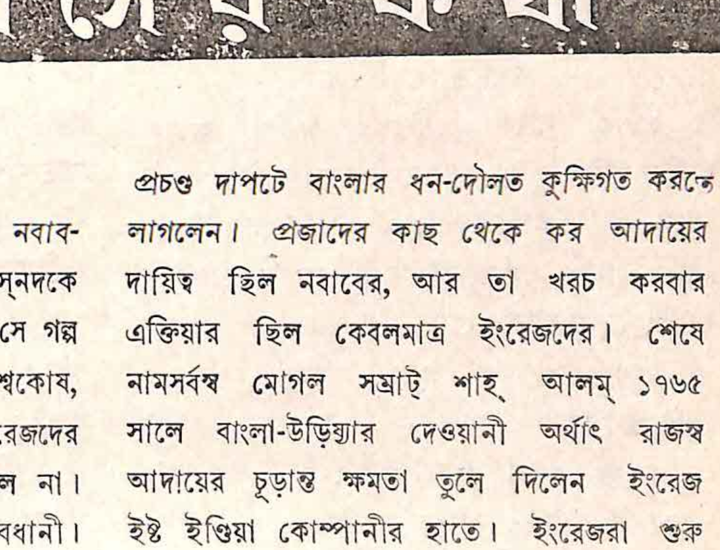


ইতিহাসের কথা

পলাশীর পরে

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজরা নবাব-সেনাদের হারিয়ে দিয়ে বাংলার মস্‌নদকে নিজেদের হাতের মুঠোয় এনে ফেলল। সে গল্প তোমরা আগেই শুনেছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০০১-০২)। কিন্তু ইংরেজদের কাছে সিংহাসনই যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ইংরেজরা ছিল অসম্ভব চতুর আর সাবধানী। ভারতে তাদের আসল স্বার্থ ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ, আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটলে অস্ত্রধারণ করতেও তারা পিছ-পা হ'ত না।

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধে জয় হলেও বাংলার সিংহাসনে নিজেরা না বসে ইংরেজরা বসাল মীর-জাফর (১৭৬৪-৬৫) ও তাঁর ছেলে নজম্-উদ্-দৌলার (১৭৬৫-৬৬) মতো ঠুঁটো-জগন্নাথদের, আর লর্ড ক্লাইভ গভর্নর হিসেবে প্রচণ্ড দাপটে বাংলার ধন-দৌলত কুক্ষিগত করতে লাগলেন। প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়ের দায়িত্ব ছিল নবাবের, আর তা খরচ করবার এক্তিয়ার ছিল কেবলমাত্র ইংরেজদের। শেষে নামসর্বস্ব মোগল সম্রাট্ শাহ্ আলম্ ১৭৬৫ সালে বাংলা-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের চূড়ান্ত ক্ষমতা তুলে দিলেন ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। ইংরেজরা শুরু



ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ

করল শোষণ। শোষণের ফলে দেশময় দেখা দিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সেটা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দ, তাই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। সমস্ত বাংলায় যখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, ঠিক সেই সময় বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। বাংলার রাজকোষ তখন শূন্য। কিন্তু হেস্টিংস ছিলেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি রাজস্ব ও বিচার বিভাগের সংস্কারের মাধ্যমে অবস্থার উন্নতি ঘটালেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭৭৩ সালে হেস্টিংসের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দিল বৃটিশ পার্লামেণ্ট রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামে একটি আইন পাশ করে। বাংলার গভর্নর থেকে গভর্নর জেনারেল হয়ে গেলেন হেস্টিংস, অর্থাৎ বাংলা ছাড়াও বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকারের ওপর খবরদারী করার চূড়ান্ত ক্ষমতা দেওয়া হ'ল হেস্টিংসকে।

চূড়ান্ত ক্ষমতা পেয়ে হেস্টিংসের লক্ষ্য হ'ল যেন-তেন-প্রকারেণ সম্পদ্ আহরণ। এ বিষয়ে হেস্টিংস যে কতদূর নীচে নেমেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো থেকে। বর্ধমানের রাণী হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আনলেন ঘুষ খাওয়ার অভিযোগ। রাজসাহীর রাণী ভবানীর প্রাসাদ লুঠ করে বহু সোনাদানা নিয়ে গেলেন হেস্টিংস্—দুর্ভিক্ষের জন্য রাণী ঠিক সময়ে রাজস্ব আদায় করতে না পারায়। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হ'ল বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের ওপর অত্যাচার ও তাদের ধনসম্পদ্ লুণ্ঠন।

কিন্তু সব চাইতে বড় অভিযোগ আনলেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মহারাজ নন্দকুমার।



ওয়ারেন হেস্টিংস

অভিযোগ—হেস্টিংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণি বেগমের কাছ থেকেও ঘুষ নিয়েছিলেন। কিন্তু হেস্টিংসের ঘুষ নেওয়ার অভিযোগের তদন্ত হওয়ার আগেই নন্দকুমারকে জালিয়াতির দায়ে ফাঁসি দেওয়া হ'ল। ঐতিহাসিকদের মতে এ ব্যাপারে হেস্টিংসের যথেষ্ট হাত ছিল।

হেস্টিংসের অত্যাচারের খবর পৌঁছতে লাগল ইংল্যাণ্ডে। ফলে ১৭৮৫ সালে হেস্টিংসকে পদত্যাগ করে ফিরে যেতে হ'ল ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু সেখানেও হেস্টিংস নিষ্কৃতি পেলেন না। দীর্ঘ সাত বছর ধরে হাউস অব কমন্সে হেস্টিংসের চলল বিচার। শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে গেলেও তাঁর অত্যাচারের কথা ভারতীয়দের এবং ইংরেজদের মধ্যে এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। হেস্টিংসের পররাষ্ট্রনীতির মূলেও ছিল অর্থের প্রলোভন। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার কাছে থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হেস্টিংস বৃটিশ সৈন্যকে ভাড়াটিয়া হিসেবে রোহিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠাতেও কুণ্ঠিত হন নি।

হায়দার আলি ও টিপু সুলতান

ওয়ারেন হেস্টিংস যখন ভারতে পাকা-পোক্ত ভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়তে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে মহীশূর রাজ্যে হায়দার আলি এবং তাঁর ছেলে টিপু প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজদের সঙ্গে শক্তির পাঞ্জা লড়তে এগিয়ে এলেন। হায়দার আলির প্রতিপত্তি মারাঠারা ভালো চোখে দেখত না। হায়দারাবাদের নিজামও ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে হায়দার আলিকে ধ্বংস করতে এগিয়ে এলেন। তা সত্ত্বেও ১৭৬৯ সালে হায়দার আলি ইংরেজদের এক বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। কিন্তু ১৭৮১ সালে ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ার-কূটের হাতে হায়দার আলির ঘটল পরাজয়। এই সময়ে ফরাসী নৌবহর এগিয়ে এল হায়দার আলিকে সাহায্য করবার জন্য। তার আগেই হায়দার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। হায়দারের পর টিপু সুলতান কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন সফলতার সঙ্গে। ১৭৮৪ সালে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিতে ইংরেজ এবং টিপু সুলতানের যুদ্ধ বন্ধ হ'ল।

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ) যখন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন তখন ইংরেজদের সঙ্গে টিপু সুলতানের বিরোধ আবার দানা বাঁধল।

এই সময়ে মারাঠা, নিজাম এবং ইংরেজ এই তিন পক্ষ মিলে টিপু সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করল। দীর্ঘ দু' বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে অবশেষে টিপু বাধ্য হলেন সন্ধি করতে। সন্ধির শর্ত অনুসারে টিপু ছেড়ে দিলেন তাঁর অর্ধেক রাজ্য আর বহু অর্থ দিলেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে (১৭৯২)। ইংরেজ, নিজাম আর মারাঠারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিল টিপুর রাজ্য নিজেদের মধ্যে। এইভাবে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশীয় রাজারাই সর্বনাশ করল এই দেশেরই এক স্বাধীনচেতা নবাবের।



টিপু সুলতান

লর্ড কর্নওয়ালিস ও লর্ড ওয়েলেস্‌লী

লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রে ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য চাই শক্ত বনিয়াদ আর শক্ত বনিয়াদের মূলে রয়েছে আর্থিক সফলতা। তাই কর্নওয়া-লিসের নীতির ফলে যখন বাংলাদেশে জমিদারদের সঙ্গে এবং বাংলাদেশের বাইরে কৃষকদের সঙ্গে ইংরেজদের খাজনা নিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেল ঠিক সেই সময়ে পাকা ভিত্তির ওপরে দাঁড়ানো বৃটিশ সাম্রাজ্যকে আরো বাড়িয়ে দিতে এলেন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী (১৭৯৮-১৮০৫)।

অনেক ভেবেচিন্তে তিনি বার করলেন এমন এক নীতি যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে। অর্থাৎ শক্তিশালী দেশীয় রাজ্যরা এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তিরা যেন ভাবতেও না পারে যে ইংরেজদের আসল লক্ষ্য ভারতবর্ষে রাজ্যবিস্তার যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে। কিন্তু তলে তলে ইংরেজরা বিনা রক্তক্ষয়ে গ্রাস করবে দুর্বল দেশীয় রাজ্যগুলি। এই নীতির নামই 'অধীনতামূলক মিত্রতা'—যার অর্থ হ'ল ইংরেজরা এই চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশীয় রাজাদের বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে সৈন্যসামন্ত দিয়ে আর বিনিময়ে তাদের রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে হবে কোম্পানীকে। এইভাবে লর্ড ওয়েলেস্‌লী দখল করে নিলেন গোরক্ষপুর, রোহিলখণ্ড ও দোয়াবের কিছু অংশ এবং নিজামের রাজ্যেরও একটা অংশ। একে একে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির জাঁতিকলে পড়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দিলেন রথী-মহারথীরাও—যথা পেশোয়া, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া প্রমুখ মারাঠা নায়কগণ।

সারা ভারতে একমাত্র টিপু সুলতানই সেই সময়ে রুখে দাঁড়ালেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ফ্রান্স, আরব, তুরস্ক ইত্যাদি দেশের সাহায্যে ইংরেজদের হঠাতে চাইলেন টিপু। ফলে ওয়েলেস্‌লী টিপুর রাজ্য আক্রমণ করলেন। টিপু বীরের মত লড়াই করে শ্রীরঙ্গপত্তনমের যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজরা মহীশূর রাজ্যের প্রায় সবটুকুই দখল করে নিল।

ইংরেজ বনাম মারাঠা শক্তি

ইতিমধ্যে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যেও যুদ্ধ বাধে এবং ১৭৮২ সালের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয় অনেকটা অমীমাংসিত ভাবে। এর পরে মারাঠাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোল শুরু হয়। পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ ছিলেন নাম-কা-ওয়াস্তে রাজা। আসলে রাজ্য চালাতেন তাঁর পরামর্শদাতা নানা ফড়নবীশ। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর



নানা ফড়নবীশ

ফড়নবীশের প্রধান লক্ষ্য হ'ল মারাঠা সাম্রাজ্য বাড়ানো। কিন্তু মারাঠা সাম্রাজ্য ইতিমধ্যেই সামন্তদের মধ্যে কার্যত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল। বরোদার গাইকোয়াড়, বেরারের ভোঁসলে, ইন্দোরের হোলকার এবং গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ইতিমধ্যে নিজেদের এলাকায় স্বাধীন হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের মধ্যে মহাদ্‌জী সিন্ধিয়াই ছিলেন সব চাইতে বুদ্ধিমান্ এবং শক্তিশালী। ইয়োরোপীয় কায়দায় তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন।

ইংরেজ যখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে সচেষ্ট, ঠিক সেই সময়ে মারাঠা সামন্ত রাজারা নিজেদের মধ্যে শুরু করল ঝগড়া-বিবাদ। সিন্ধিয়া হোলকারের রাজ্য আক্রমণ করে তাকে হারিয়ে দিল। এরপর নানা ফড়নবীশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তোড়জোড় করলেন মহাদ্‌জী। কিন্তু যুদ্ধের আগেই, ১৭৯৪ সালে, মহাদ্‌জী মারা গেলেন। মহাদ্‌জীর মৃত্যুর পর নানা ফড়-নবীশ মারাঠাদের মধ্যে সর্বেসর্বা হয়ে গেলেন। নিজামকে হারিয়ে দিয়ে তাঁর রাজ্যের বহু অংশ নানা কেড়ে নিলেন (১৭৯৫)। ১৭৯৬ সালে পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণ মারা গেলেন। পরবর্তী পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের আমলে নানা ফড়নবীশের প্রাধান্য খর্ব হলেও নানার মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তিকে চালনা করার লোক আর কেউ রইল না।

পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও, হোলকার, সিন্ধিয়া সকলেই সর্বেসর্বা হওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু করে দিলেন। যশোবন্তরাও হোলকার ও দৌলতরাও সিন্ধিয়া একসঙ্গে পুনা আক্রমণ করে পেশোয়াকে হারিয়ে দিলেন। পেশোয়া পালিয়ে গিয়ে ওয়েলেস্‌লীর সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি করলেন যা ব্যাসিনের চুক্তি হিসেবে পরিচিত। পেশোয়ার এই আত্মসমর্পণের নীতিতে মারাঠা সামন্তরা চটে গিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন ১৮০৩ সালে।

আসরে নামলেন প্রথমে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে এবং, দু'জনেই ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে, অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি করতে বাধ্য হলেন। এর পরে যুদ্ধ শুরু করলেন হোলকার। কিন্তু হোলকার ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে চলতেই ওয়েলেস্‌লীর ডাক এল স্বদেশে ফিরে যাওয়ার। তাই হোল-কারকে পুরোপুরি হারিয়ে দেবার আগেই যুদ্ধ শেষ করে ওয়েলেস্‌লীকে ফিরে যেতে হ'ল দেশে।

মারাঠা শক্তির পতন হ'ল লর্ড ময়রার আমলে (১৮১৩-১৮২৩ খৃঃ)। এই সময়ে ইংরেজ ও সংঘবদ্ধ মারাঠা নেতাদের মধ্যে যুদ্ধ লাগে। এই যুদ্ধে মারাঠারা সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হ'ল এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ইংরেজরা মারাঠা সাম্রাজ্যের বেশির ভাগ অংশই দখল করে নিল।

এই তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর ভারতের মানচিত্র থেকে মারাঠা সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেল।

পাঞ্জাবকেশরী

ভারতের আকাশে যখন মারাঠা-সূর্য অস্তাচলে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটল উত্তর-পশ্চিম দিকে। ইনি রঞ্জিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯), লোকে বলত পাঞ্জাবের সিংহ—পাঞ্জাবকেশরী। এক অদ্ভুত সংগঠনী প্রতিভা ছিল এই শিখ নায়কের। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ সামন্তদের অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজের অধীনে এনে সমস্ত শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করলেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব দিকে শিখ সামন্তরাজ্য দখল করতে গিয়েই ইংরেজদের সঙ্গে রঞ্জিতের লাগল বিরোধ। ১৮০৯ সালে ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধিতে রঞ্জিৎ কথা দিলেন শতদ্রু নদীর পূর্বদিকে আর এগোবেন না, কিন্তু উত্তর দিকে কাশ্মীর, মূলতান, কোহাট, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ডেরা

ইস্‌মাইল খাঁ, পেশোয়ার, খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত রঞ্জিৎ সিংহ দখল করে নিলেন। সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে তিনি পাশ্চাত্য কায়দায় শিক্ষা দিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে রঞ্জিৎ সিংহ দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন; কারণ সেই সময়ে দুর্ধর্ষ ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করলে নবজাগ্রত শিখশক্তিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হ'ত। অথচ আকবরের মতই রঞ্জিৎ সিংহ ছিলেন নিরক্ষর। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ রঞ্জিৎকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়েছিলেন।



পাঞ্জাবকেশরী রঞ্জিৎ সিংহ

কিন্তু রঞ্জিতের মৃত্যুর পরই শিখ রাজ্যে সুযোগ্য নেতার অভাবে দেখা দিল নানা বিশৃঙ্খলা। রঞ্জিৎ সিংহের বংশধররা মোটেই তাঁর উপযুক্ত ছিলেন না; ফলে বিশৃঙ্খলার সুযোগে শিখ সেনাবাহিনী অর্থাৎ "খালসা" শাসনক্ষমতা দখল করল। এই সময় রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক ছেলে দলীপ সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাণী এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে নামমাত্র অভিভাবিকা নিযুক্ত করে খালসা নায়ক লালসিংহ ও তেজসিংহ রাজ্যের আসল শাসনভার হাতে নিলেন। ঝিন্দন এটা পছন্দ করলেন না। তিনি খালসা শক্তিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে তাদের উত্তেজিত করলেন বৃটিশদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবার। ফলে ইংরেজরা শিখদের হারিয়ে লাহোরে ঢুকে পড়ল। রাণীমাতা ঝিন্দন ও দলীপ সিংহকে ইংরেজরা স্বীকার করে নিলেও লাহোরে একজন বৃটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হ'ল।

ইংরেজদের এই খবরদারীর বিরুদ্ধে শিখ সৈন্যরা বিদ্রোহ করল। তখন বিদ্রোহী শিখ সৈন্যদের সম্পূর্ণ ভাবে হারিয়ে দিয়ে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব পুরোপুরি ইংরেজদের অধীনে নিয়ে এলেন (১৮৪৯)। এই ভাবেই রঞ্জিৎ সিংহের গড়ে-তোলা বিশাল শিখ সাম্রাজ্য তাঁর উত্তরাধিকারীদের অপদার্থতায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল।

ভারতের নবজাগরণ

ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এবার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশবাসীকে নেতৃত্বে দিতে এলেন। এই সময়ে প্রথম জাতীয়তাবাদের সূচনা হ'ল। এর আগে মারাঠারা, শিখরা, বাঙালীরা নিজেদের মারাঠা, শিখ অথবা বাঙালী বলেই ভাবতেন,—ভারতীয় বলে নয়। কিন্তু এবার এঁরা বুঝতে পারলেন সঘংবদ্ধ ভাবে রুখে না দাঁড়ালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব নয়।

এই নতুন নেতৃত্ব দিল প্রধানত বাঙালীরা। নবযুগের নায়ক রাজা রামমোহন রায় বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ করে দিলেন,

দেশবাসীকে নতুন ভাবধারায় দীক্ষা দিলেন। সমাজসংস্কারেও এগিয়ে এলেন তিনি। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সহায়তায় এ দেশ থেকে সতীদাহ প্রথার বিলোপ ঘটালেন। ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হ'ল। পরে এরই নাম হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কুল বিভাগের নাম হয় হিন্দু স্কুল। এখানকার নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ তরুণ বাঙালীরা পুরোনো অর্থহীন ধর্মীয় গোঁড়ামি



ডিরোজিও

এবং সংস্কারকে ভেঙ্গেচুরে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে এগিয়ে এলেন। এ ব্যাপারে ডেভিড হেয়ার, বেথুন, ডিরোজিও প্রভৃতি ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী মনীষীদের অবদানও কম নয়। নবজাগরণের ঢেউ পৌঁছল সাহিত্যে, কাব্যে, রাজনীতি ও সমাজনীতির নতুন রূপায়ণে।

সিপাহী-বিদ্রোহ

ইংরেজ শক্তিকে ভারত থেকে তাড়ানোর জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে প্রথম যে চেষ্টা হয় তাকে ঐতিহাসিকরা সিপাহী-বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন। কোন কোন ঐতিহাসিক আবার একে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ অথবা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যদিও ঠিক যে সিপাহী-বিদ্রোহ বা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতীয়দের ঐক্য-বদ্ধ ভাবে ইংরেজদের হঠাবার সব চাইতে প্রথম চেষ্টা, তা হলেও একে প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলাটা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হবে না। প্রথমত, এই যুদ্ধে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন সিপাহী শ্রেণীর লোক। এঁদের যাঁরা নায়ক ছিলেন, অর্থাৎ নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতি, —এঁদেরও জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে তেমন কোন ধারণা বা চেতনা ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেই সময়ে দেশবাসীকে যাঁরা জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করছিলেন সেই বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই বিদ্রোহকে সমর্থন জানান নি। তৃতীয়ত, এই বিদ্রোহের কারণগুলো খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় বিদ্রোহের মূলে ছিল অসন্তোষ, কোনও জাতীয়তাবাদী চেতনা নয়।

বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি ছিল গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর (১৮৪৮-১৮৫৬) স্বত্ববিলোপ নীতি। এই নীতির ফলে কোনও রাজ্যের রাজা পুত্রহীন অবস্থায় মারা গেলে সেই রাজ্য ইংরেজদের হাতে আসবে। ইংরেজদের অনুমতি ছাড়া দত্তক পুত্র গ্রহণ করলে তাকে সেই রাজ্যের সিংহাসন দেওয়া চলবে না। এই নীতির অজুহাতে ইংরেজরা সাঁতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, তাঞ্জোর ও কর্ণাটক দখল করে নিল। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতাও বন্ধ করে



সিপাহী-বিদ্রোহ

দেওয়া হ'ল। এর ফলেই নানা সাহেব প্রমুখ নেতারা এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। চারদিকে অসন্তোষ যখন দানা বেঁধেছে ঠিক সেই সময় এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রচলনে দেশীয় সিপাইরা বারুদের মত ফেটে পড়ল। কারণ এই বন্দুকের টোটায় নাকি গরু আর শূয়োরের চর্বি মেশানো ছিল, আর টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে পুরতে হ'ত। গরুর মাংস যেমন হিন্দুদের কাছে ছিল নিষিদ্ধ, তেমনি ছিল মুসলমানদের কাছেও শূয়োরের মাংস। ফলে হিন্দু-মুসলমান দু'জাতের সিপাইরাই বিদ্রোহ করল প্রথমে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ)। ধীরে ধীরে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল মীরাটে, দিল্লীতে, আগ্রায়, কানপুরে এবং শেষে প্রায় সমস্ত ভারত জুড়ে। বিদ্রোহী সিপাইরা 'নামকা-ওয়াস্তে' মুঘল সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্‌কে ঘোষণা করল ভারতের সম্রাট্ বলে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু সিপাইরা যুদ্ধে জিততে পারল না। বাহাদুর শাহ্‌র নামমাত্র সম্রাট্ উপাধিটাও ইংরেজরা কেড়ে নিল। তবে একটা সুফল হ'ল এই যে ইংল্যাণ্ডের রাণী ১৮৫৮ সালে এক ঘোষণার দ্বারা ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটালেন। ভারতের শাসনভার এবার থেকে সরাসরি বৃটিশ সরকারের হাতে এল। ঠিক হ'ল এবার থেকে গভর্নর জেনারেল হবেন ভাইস্‌রয়। বৃটিশ রাজের প্রতিনিধি হিসেবে শাসন-কার্য চালাবেন তিনি।

বঙ্গভঙ্গ ঃ স্বদেশী আন্দোলন

পাশ্চাত্য ভাবধারা ভারতীয়দের মধ্যে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবোধ এনে দিচ্ছিল। ভারতীয়েরা আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইতালির স্বাধীনতা-যুদ্ধ ইত্যাদি আন্দোলন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'ল ইংরেজিশিক্ষার ফলে। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আস্তে আস্তে ভারতীয়দের মধ্যে জাগতে শুরু করল। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে নতুন উদ্যমে গবেষণা শুরু হ'ল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ জগতের কাছে হিন্দুধর্মকে তুলে ধরলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৩ সালে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে এক জাতীয় সভার আহ্বান করলেন। ১৮৮৫ সালে শ্রীউমেশচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং হিউম নামে এক-জন অবসরপ্রাপ্ত আই. সি. এস্-এর সহায়তায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হ'ল। প্রথম দিকে বৃটিশ সরকার জাতীয় কংগ্রেসকে স্বীকার করে

নিলেও, পরে যখন জাতীয় কংগ্রেস সরকারী নীতির সমালোচনা শুরু করল, তখন তার ওপর চটে গেল।

লর্ড কার্জন ভাইস্‌রয় হয়ে এসে দেখলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীরাই সব চাইতে উগ্রপন্থী। তাই তিনি ১৯০৫ সালে বাংলাকে হু'ভাগ করে এক ভাগ আসামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। বাঙালীরা কিন্তু এটা মেনে নিতে রাজী হ'ল না। শুরু হ'ল বঙ্গভঙ্গ-রদ আন্দোলন।



লর্ড কার্জন

নেতৃত্ব দিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসাধারণ বাগ্মী, আর সারা দেশের কাছে তিনি যেন মুক্তিদাতা। তাঁকে বলা হ'ত বাংলার মুকুটহীন রাজা। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি আরও অনেকে। কবি রবীন্দ্রনাথও যোগ দিলেন। দেশের লোকদের সচেতন করতে তিনি রচনা করতে লাগলেন অপরূপ সব স্বদেশী সঙ্গীত। যেমন,—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান্!"

কিংবা

"বিধির বাঁধন কাটবে, তুমি
এমন শক্তিমান্?
তুমি কি এমনি শক্তিমান্?
আমাদের ভাঙ্গাগড়া তোমার হাতে,
এমন অভিমান, তোমাদের
এমনি অভিমান?"

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিলেতী কাপড়চোপড় ও অন্যান্য বিলেতী জিনিস বর্জন এবং তার বদলে স্বদেশী জিনিসের ব্যবহার শুরু হ'ল। এরই নাম "স্বদেশী আন্দোলন"। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" (অর্থাৎ মাকে বন্দনা করি) হ'ল জাতীয় মন্ত্র। ইংরেজ সরকার প্রথমে কড়া হাতে এই আন্দোলন রুখবার চেষ্টা করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের হার মানতে হ'ল। দুই বাংলা আবার এক হ'ল।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে আন্দোলন-চলাকালীন কংগ্রেসের মধ্যে দু'টি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হ'ল—চরমপন্থী ও নরমপন্থী। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা "আবেদন-নিবেদন" নীতি ত্যাগ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ বেছে নিলেন। অন্যদিকে নরমপন্থীরা,—রানাডে, গোখলে প্রভৃতি নেতারা,—আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমেই কার্যসিদ্ধি করতে চাইলেন।

১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশনে নরমপন্থীরা চরমপন্থীদের কংগ্রেস থেকে বার করে দিলেন, কিন্তু চরমপন্থীদের প্রভাব বাংলা

ও পাঞ্জাবে ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করল। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বসু নামে একজন তরুণ কিশোর অত্যাচারী এবং বিবেক-বর্জিত বিচারপতি কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে কেনেডি নামে আর একজন ইংরেজকে হত্যা করে ধরা পড়লেন। তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়বার সময়ে আত্মহত্যা করলেন। অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, কানাইলাল দত্ত, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ ৪৭ জন সন্ত্রাসবাদী মাণিকতলায় বোমা তৈরির মামলায় ধরা পড়লেন। অরবিন্দ ছাড়া পেলেও বাদ বাকিদের শাস্তি হ'ল। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বেড়েই চলল।

এল মুসলিম লীগ

ইংরেজরা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ওপর এবার পরোক্ষভাবে আঘাত হানলেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করে। স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ উনবিংশ শতকেই আলি-গড়ে একটি কলেজ স্থাপন করেছিলেন মুসল-মানদের জন্য। আলিগড়েই মুসলমানদের জন্য পৃথক্ রাজনীতির ছুতোয় জন্ম নিল মুসলিম লীগ।

মুসলমানেরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে ইংরেজদের কাছ থেকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধার দাবী জানাতে লাগল। ১৯০৯ সালে মোরলে-মিন্টো সংস্কার এবং ১৯১৯ সালে মন্টেগু-চেম্‌স্‌-ফোর্ড সংস্কার সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি আরও জোরদার করল। কংগ্রেসের আন্দোলন যতই বাড়তে লাগল, ইংরেজদের অনুপ্রেরণায় মুসলিম লীগ ততই কংগ্রেসবিরোধী পাল্টা আন্দোলন শুরু করল। অবশ্য জাতীয়তা-বাদী মুসলমান নেতারা কংগ্রেসেই রয়ে গেলেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড

১৯১৯ সালে পাশ হ'ল ইংরেজদের রাওলাট্‌ অ্যাক্‌ট্‌। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়ে ওরা ইচ্ছেমত ভারতীয়দের গ্রেপ্তার করতে লাগল। এই দমননীতির প্রতিবাদে অমৃতসরে জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যখন এক সভা চলছিল তখন কোন রকম হুঁশিয়ারি না দিয়ে নিরস্ত্র জনতার ওপর বৃটিশ জেনারেল ডায়ার সাহেব গুলি চালালেন। প্রায় ৪০০ ভারতীয় গুলিতে প্রাণ হারাল এবং অসংখ্য নরনারী আহত হ'ল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্বরতার প্রতিবাদে বৃটিশ সরকারের দেওয়া 'নাইট' অর্থাৎ "স্যর' উপাধি ত্যাগ করলেন।

গান্ধীজীর আবির্ভাব

ঠিক এই সময়ে আবির্ভাব হ'ল একজন নতুন নেতার। তাঁর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি অসম সাহসের সঙ্গে আন্দোলন চালিয়ে ভারতে ফিরে এসেছেন। ইনি এবার এক নতুন পথে আন্দোলন শুরু করলেন। বললেন, হিংসার পথে নয়, খুন-জখমের রাস্তা ধরে নয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে হবে সর্বস্তরে তাদের সঙ্গে অসহযোগিতা করে এবং তা হবে অহিংসার পথ ধরে।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইংরেজরা প্রায় দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। অতএব ভারতবর্ষ থেকে ধনসম্পদ্ লুটে নেবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে তারা দমননীতিকে আরও জোরদার করল।



মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীজীর,—দেশবাসী তখন তাঁর নাম দিয়েছে মহাত্মা গান্ধী,—অসহযোগ আন্দোলনে দলে দলে লোক এসে যোগ দিতে লাগল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহ্‌রু, সৌকত আলি, মোহম্মদ আলি, রাজাগোপাল আচারি, লালা লাজপৎ রায়, গোপবন্ধু দাস, সর্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মৌলানা আজাদ, সরোজিনী নাইডু এবং আরও অনেকে এলেন এগিয়ে। তরুণ জওহরলাল, তরুণ সুভাষচন্দ্র—এঁরাও। সুভাষচন্দ্র আই. সি. এস্. পদ হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এলেন।

ইংরেজ সরকার সবাইকে দলে দলে জেলে পুরতে লাগলেন, কিন্তু আন্দোলন না কমে আরও বেড়েই চলল। শেষে একবার এক জায়গায় জনতা অহিংস পথ ছেড়ে হিংসার পথে নেমে পড়ায় গান্ধীজী তখনকার মত আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন।

এর কিছুদিন পরে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ তাঁর ১৪ দফা দাবী নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে একটা স্পষ্ট রূপ দিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকারও নানা ভাবে দেশের লোকদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় বাদ সাধতে লাগলেন। ফলে গান্ধীজী নতুন করে আন্দোলন শুরু করলেন—যাকে বলা হয় লবণ-সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন।

গান্ধীজী আবার জেলে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেসের আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল। অগত্যা ইংরেজ সরকার বিলেতে একটা গোল টেবিল বৈঠক ডাকলেন। গান্ধীজী এতে যোগদান করলেও কোন রকম মীমাংসা সম্ভব হ'ল না। ১৯৩৫ সালে নতুন ভারত-আইন পাশ করা হ'ল। এই আইন অনুসারে ঠিক হ'ল যে ভারতবর্ষ হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র। তবে তা পুরোপুরি বৃটিশরাজের অধীনেই থাকবে আর দেশীয় রাজারা তাঁদের ইচ্ছেমত এতে যোগদান করতে পারবেন। ১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে মোট এগারোটি ভারতীয় প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র মুসলমানপ্রধান বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ জয়লাভ করল। বাদ বাকি সমস্ত প্রদেশে জিতল কংগ্রেস,—এমন কি পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও,—যেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আবদুল গফ্‌ফর খাঁ ছিলেন সেখানকার নেতা। তাঁর নাম লোকে দিল "সীমান্ত-গান্ধী"।

নতুন উল্কা—সুভাষচন্দ্র

এই সময় কংগ্রেসে আবির্ভাব হ'ল আর একটি উল্কার। ইনি হচ্ছেন সুভাষচন্দ্র বসু—পরে যিনি নেতাজী নামে বিখ্যাত হয়েছেন। পর পর দু' দু'বার কংগ্রেসের সভাপতি হলেন সুভাষচন্দ্র, দ্বিতীয় বারে গান্ধীজীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে। গান্ধীজীর তা পছন্দ হ'ল না। কিছু কিছু বিপরীত মতবাদী কংগ্রেসীর চক্রান্তের ফলে সুভাষচন্দ্রকে বেরিয়ে আসতে হ'ল কংগ্রেস থেকে। তিনি তখন ফরোয়ার্ড ব্লক নামে একটি বামপন্থী দল সৃষ্টি করলেন।



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হ'ল। ইংরেজদের এবার দরকার হ'ল ভারতীয় সাহায্য। সুভাষচন্দ্র চাইলেন ইংরেজদের শত্রু জার্মান্ ও জাপানীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে তাড়িয়ে দিতে। ছদ্মবেশে নজরবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে আফগানিস্থান হয়ে তিনি পাড়ি জমালেন জার্মেনি, জাপান ও রেঙ্গুনে। জাপান তখন বার্মা অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ দখল করে নিয়েছে। ব্রহ্মদেশে ও মালয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈনিকদের নিয়ে নেতাজী তৈরি করলেন তাঁর 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' অর্থাৎ স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যদল, এবং সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার নামে স্বাধীন ভারতের এক সরকার সৃষ্টির কথা ঘোষণা করলেন। এই সময়ে গান্ধীজীও "ভারত ছাড়" দাবী তুলে ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। ইংরেজরা বাধা দিল, শুরু হ'ল বিয়াল্লিশের আন্দোলন (১৯৪২)।

ভারতে ইংরেজদের দমননীতি যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল ঠিক সেই সময়ে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধজয় করতে করতে আসামের প্রান্তে এসে উপস্থিত হ'ল। কোহিমা ও বিষেণপুর দখল করে নিল তারা। ভারতের মাটিতে স্বাধীন ভারতের পতাকা উড়তে লাগল। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'চল দিল্লী! সেখানে লাল কেল্লায় আমাদের পতাকা ওড়াতে হবে।'

কিন্তু তা আর হ'ল না। দেখা দিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। খাবার রসদও গেল ফুরিয়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজকে আত্মসমর্পণ করতে হ'ল ইংরেজদের কাছে। নেতাজী কিন্তু ধরা পড়লেন না। তিনি হয়ে গেলেন নিরুদ্দেশ।

ভারত স্বাধীন হ'ল

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে পর ইংরেজরা বুঝলেন ভারতবর্ষ থেকে এবার তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হবে। এদিকে কংগ্রেস আর মুসলিম লীগের বিরোধ তখন নিয়েছে চূড়ান্ত আকার। জিন্নার এক বুলি—

মুসলমান ভিন্ন জাতি, তাদের জন্য চাই আলাদা রাজ্য, যার নাম হবে পাকিস্তান অর্থাৎ পবিত্র স্থান। কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহ্‌রু এবং স্বয়ং গান্ধীজী প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতারা কিছুতেই তাঁর সঙ্গে



মহম্মদ আলি জিন্না

একটা মীমাংসায় আসতে পারলেন না। তারপর ১৯৪৬এ বাংলাদেশে জিন্নার মুসলিম লীগের নেতৃত্বে বাধল হিন্দু-মুসলমানে প্রচণ্ড দাঙ্গা। অনুরূপ দাঙ্গা বাধল মুসলিমপ্রধান পাঞ্জাবেও। ভাইস্‌রয় লর্ড মাউন্টব্যাটেনের এবং বৃটিশ সরকারের পাঠানো প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় তখন ঠিক হ'ল বাংলা আর পাঞ্জাবকে হিন্দুপ্রধান আর মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে দু'ভাগ করে গণভোটের মাধ্যমে গোটা ভারতকে দু'টি রাষ্ট্রে পরিণত করা হবে—ভারত ও পাকিস্তান। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে কংগ্রেস এ ব্যবস্থা মেনে নিল। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট দ্বিখণ্ডিত ভারত দুই নামে ইংরেজের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করল। প্রথমে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্,—যেমন ছিল অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা প্রভৃতি রাজ্যে। তারপর ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারতীয় সংবিধানে স্বাধীন ভারতকে ঘোষণা করা হ'ল সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু হলেন স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হলেন প্রথম রাষ্ট্রপতি।

দেশীয় রাজ্যগুলি একে একে সকলেই যোগ দিল ভারত রাষ্ট্রে। ভারতের মাঝখানে অবস্থিত নিজামের হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি ২।১টি মুসলিম রাজ্য প্রথমে রাজী না হওয়ায় বলপ্রয়োগে তাদের যোগ দিতে বাধ্য করা হ'ল। ভারতের নানা জায়গায় ইতস্তত ছড়ানো বিদেশীদের যে ২।৪টি উপনিবেশ ছিল,—যেমন ফরাসী চন্দননগর, পণ্ডিচেরী,—তারাও চলে এল ভারতে। পর্তুগীজরা গোয়া ছাড়তে রাজী না হওয়ায় সেখানেও বলপ্রয়োগে তাদের হাত থেকে তা কেড়ে নিতে হ'ল।

ভারতে যোগ দিল কাশ্মীরও। কিন্তু এখানে মুসলমানই বেশি এই অজুহাতে জিন্না জোর করে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করলে পাকিস্তানের সঙ্গে বাধল ভারতের প্রথম যুদ্ধ। যুদ্ধ চালিয়ে গেলে হয়তো ভারত কাশ্মীরের সবটাই নিজের দখলে আনতে পারত কিন্তু ইউ. এন. ও.র মাধ্যমে একটা মিটমাট মেনে নেওয়ায় তা হ'ল না। পাকিস্তানের দখল-করা অংশটুকু তাদেরই তাঁবেদার হয়ে রইল।

এরপর আরও একবার লড়াই বাধে ১৯৬৫ সালে। এবারও পাকিস্তান পরাজিত হ'ত। ভারত ইচ্ছে করলেই তাদের পাঞ্জাব দখল

করে নিতে পারত, কিন্তু তাসখন্দে অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রের অনুরোধে একটা চুক্তি হওয়ায় আর অগ্রসর হ'ল না। জওহরলাল তখন নেই, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হয়েছেন প্রধান মন্ত্রী; কিন্তু ঐ তাসখন্দেই অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটল। এরপর প্রধান মন্ত্রী হলেন জওহরলালেরই সুযোগ্যা কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। স্বল্পকালের জন্য সরে যেতে হলেও আবার তিনি ফিরে এলেন ঐ মর্যাদার পদে।

স্বাধীন বাংলাদেশ

দুই জাতিতত্ত্ব, অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান এরা দুই পৃথক্ জাতি এই মতবাদের ওপর ভিত্তি করে গঠিত হ'ল মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। এর একটি অংশ রইল পশ্চিমে—পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান ইত্যাদি নিয়ে, আর একটি অংশ রইল পূর্বে—পূর্ব বাংলা ও আসামের খানিকটা নিয়ে। তার নাম হ'ল পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু এই দু' অঞ্চলের লোকদের ধর্ম এক হ'লে কি হবে, ভাষা আলাদা; চালচলন, রীতিনীতি সবই আলাদা। অথচ জনসংখ্যায় পূবের এরাই বেশি। কিন্তু তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানই সদর্পে শাসন করত গোটা রাষ্ট্র, পূর্ব পাকিস্তানকে পাত্তাই দিত না তারা। নানাদিক্ দিয়ে শোষণ করে করে শেষ পর্যন্ত ওদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলল তারা।

এদিকে পাকিস্তানে স্থায়ী সরকার গড়া কঠিন হয়ে উঠল। জিন্নার মৃত্যুর পর একের পর এক নেতা এসে কর্তৃত্ব নিতে লাগলেন এবং অল্প পরে পরেই তাঁদেরকে সরে যেতে হ'ল। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে এক নতুন উল্কার আবির্ভাব হ'ল—মুজিবুর রহমান। নির্বাচনে জিতে সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে



মুজিবুর রহমান

তাঁরই গোটা পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হবার কথা, কিন্তু পাকিস্তানের অপর নেতা ভুট্টোর ষড়যন্ত্রে সে পদ তাঁকে দেওয়া হ'ল না। ঢাকায় এসে আলোচনা চালাবার নাম করে তাঁকে বন্দী করে চালান দেওয়া হ'ল পশ্চিম পাকিস্তানে আর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী পাঞ্জাবী ও পাঠান সৈন্যেরা শুরু করল সারা পূর্ব পাকিস্তান যুড়ে নারকীয় অত্যাচার। ঠিক বিদেশী সৈন্য যেমন শত্রুর দেশে এসে করে সেই রকম।

মুজিবুর রহমান যে মুক্তি ফৌজ গড়ে তুলছিলেন সেই মুক্তি ফৌজ রুখে দাঁড়াল। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত পাক-বাহিনীর সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ নয় তো! বিশেষ করে তাদের তো অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই! কিন্তু এই প্রতিরোধে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল পাকিস্তান সরকার। ভারত ভিতরে ভিতরে সাহায্য করছে এই অজুহাতে তারা আক্রমণ করল ভারতকে। আমেরিকা ও চীন পাকিস্তানকে মদৎ দিতে লাগল। কিন্তু এই লড়াইয়ে পাকিস্তান যে এমন বিশ্রী ভাবে পশ্চিম এবং পূর্ব দুই সীমান্তেই হেরে যাবে তা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারে নি। ভারতীয় সৈন্য দুর্বার বেগে কয়েকদিনের মধ্যেই মুক্তি ফৌজের

সাহায্যে পাক-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ঢাকা দখল করল। ভারতীয় সেনানায়কের হাতে আত্মসমর্পণ করল পাক-বাহিনী। গোটা পূর্ব পাকিস্তানটা হ'ল বাঙ্গালীদেরই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, নাম হ'ল বাংলা দেশ (১৯৭১)। মুজিবুর রহমান মুক্তি পেয়ে হলেন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী, তারপর রাষ্ট্রপ্রধান, আর বাংলা দেশ হ'ল ভারতের একটি বন্ধুরাষ্ট্র। একই ভাষায় রচিত একই কবি রবীন্দ্রনাথের লেখা দু'টি গান হ'ল দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত। 'জনগণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা' আর 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

কিন্তু মুজিবের স্বপ্নের "সোনার বাংলার" ভাগ্য আবার মোড় নিল নতুন পথে। মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। তাঁদের হত্যাকারীরা কেউই শাস্তি পেল না। কিছু পাকিস্তানপ্রেমী আবার পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। যে ভারত বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে এত সাহায্য করেছিল এবং যে ভারতের সেনানায়কের হাতেই পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করেছিল নতুন শাসকেরা তা স্বীকার করতেও যেন ভুলে গেলেন।



ম্যাৎসিনি



ক্যাভুর

ক্রমাগত একটির পর একটি অভ্যুত্থান আর নতুন নতুন শাসকের গদি দখল—এই-ই সমানে চলতে লাগল বাংলাদেশে। কার্যত দেশটা চলে গেল সামরিক কর্তাদের হাতে। তবে, সুখের বিষয়, ভারতের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্বটা কিন্তু টিকে রইল ঠিকই।

ইতালির জাতীয়তা সংগ্রাম

আধুনিক কালে নেপোলিয়নই প্রথম সমস্ত ইতালি জয় করে ইতালিকে ঐক্যবদ্ধ করেন নিজের অধীনে। কিন্তু নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা সম্মেলনে রাজনীতিকরা নেপোলিয়নের সমস্ত রাজনৈতিক সংস্কার ও ব্যবস্থাকে উল্টেপাল্টে বানচাল করে দিলেন। ফলে ইতালি নেপোলিয়নের আগে যে রকম খণ্ড-বিখণ্ড রাজ্যের সমষ্টি ছিল সেই অবস্থাতেই ফিরে গেল। ইতালির ওপর খবরদারি করার অধিকার পেল অস্ট্রিয়া। কিন্তু জাতীয় ঐক্যের যে স্বাদ নেপোলিয়ন জাগিয়ে গিয়েছিলেন ইতালিয়দের মধ্যে তাই হয়ে দাঁড়াল অশান্তির

কারণ। ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, ভিক্টর ইমানুয়েল, ক্যাভুর প্রভৃতি নেতাদের নেতৃত্বে সমস্ত ইতালি এবার জাতীয় ঐক্যের সংগ্রামে নামল অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে।

ম্যাৎসিনি ইতালির যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন একটি সংঘ,—নাম নবীন ইতালি। এদের লক্ষ্য হ'ল অষ্ট্রিয়ার অধীনতাপাশ থেকে ইতালিকে মুক্ত করা, বৈদেশিক শক্তির সাহায্য ছাড়াই। ম্যাৎসিনির মন্ত্রশিষ্য ছিলেন রণনায়ক গ্যারিবল্ডি।



গ্যারিবল্ডি

ম্যাৎসিনি ছিলেন আদর্শবাদী। কিন্তু ইতালির ঐক্য আন্দোলনকে সফল করলেন কাউন্ট ক্যাভুর। তিনি ছিলেন পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়া নামে ইতালির একটি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী,—দূরদর্শী এবং কূটনীতিক চালে দক্ষ। তিনি বুঝেছিলেন যে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া ইতালিকে অষ্ট্রিয়ার কবল থেকে মুক্ত করা যাবে না, আর মুক্তিসংগ্রামে পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়াকেই



তৃতীয় নেপোলিয়ন

দিতে হবে সমস্ত ইতালির নেতৃত্ব। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীদের পক্ষে যোগ দিয়ে তিনি ইঙ্গ-ফরাসীদের সহানুভূতিটুকু আদায় করে নিলেন। ফলে এর পর অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে পাইড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার যখন যুদ্ধ বাধল তখন সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির ভাইপো তৃতীয় নেপোলিয়নের সাহায্য পেলেন তিনি।

ক্যাভুর যখন একে একে ইতালির ছোট ছোট রাজ্যগুলি দখল করছিলেন ঠিক সেই সময় বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডি এক হাজার সৈন্য নিয়ে আর এক দিক্ থেকে ইতালির মুক্তিসংগ্রামে নেমে পড়লেন। সিসিলি ও নেপ্‌ল্‌স্ জয় করার পর গ্যারিবল্ডি এগোলেন রোমের দিকে। এই সময়ে ক্যাভুরও পোপের সমস্ত রাজ্যগুলি জয় করে গ্যারিবল্ডির সম্মুখীন হলেন। গ্যারিবল্ডি ক্যাভুরের নেতৃত্বই মেনে নিয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করলেন। এইভাবে রোম ও ভেনিস ছাড়া সব ক'টি রাজ্যকে নিয়েই ইতালি হ'ল ঐক্যবদ্ধ—কাউন্ট ক্যাভুরের নেতৃত্বে।

১৮৬৬ সালে ভেনিস এবং ১৮৭০ সালে রোম নগরী দখল করার পর ইতালি হ'ল পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধ।

জার্মেনীর জাতীয় ঐক্য

ইতালির মত জার্মেনীও ঐক্যবদ্ধ হয় ঐ একই প্রেরণায়। নেপোলিয়ন জার্মেনী জয় করে সমস্ত জার্মেনীকে উনচল্লিশটি রাজ্যে ভাগ করে "কন্‌ফেডারেশন অব্ দি রাইন" নামে একটি রাষ্ট্রসংঘ গড়ে তোলেন। নেপোলিয়নের পতনের পর ভিয়েনা কংগ্রেস জার্মেনীর এই



বিসমার্ক

রাষ্ট্রসংঘকে অষ্ট্রিয়ার অধীনে নিয়ে আসেন। ইতালিতে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন ক্যাভুর, জার্মেনীতেও সে ভূমিকা নেন প্রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী বিসমার্ক। আর, এই বিসমার্ক ছিলেন কূটবুদ্ধির খেলায় ক্যাভুরের চাইতেও বড় খেলুড়ে।

বিসমার্কের কোন আস্থা ছিল না গণতন্ত্রের ওপর। প্রাশিয়ার অধীনে সমস্ত জার্মেনীকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিসমার্ক সামরিক শক্তি বাড়াবার দিকেই মন দিলেন। বিসমার্ক যেন একই সঙ্গে লোফালুফি খেলতেন তিনটি বল নিয়ে, যার ছ'টি বল বিসমার্কের হাতে থাকত, আর একটি থাকত শূন্যে। তাই দেখা যেত ডেনমার্কের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় বিসমার্ক নিচ্ছেন অষ্ট্রিয়ার সাহায্য, আবার অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ে বিসমার্ক নিচ্ছেন ফ্রান্সের সাহায্য। ১৮৭০ সালে ফ্রান্সের সঙ্গেও বিসমার্কের লড়াই বাধল আর বিসমার্কের চালে যুদ্ধের আগে ফ্রান্সও হয়ে গেল একঘরে রাজনীতির আসরে। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্সের সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়নকে হারিয়ে প্রশিয়ার অধীনে জার্মেনীকে ঐক্যবদ্ধ করলেন বিসমার্ক আর প্রথম ভিল্‌হেল্‌ম্ (উইলিয়াম) হলেন জার্মেনীর প্রথম সম্রাট্। এরপর কিন্তু কোন রকম যুদ্ধবিগ্রহ না করেই শুধুমাত্র কূটবুদ্ধির জোরে বিসমার্ক জার্মেনীকে পয়লা নম্বর শক্তিতে পরিণত করলেন।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

১৭৭৬ সালে আমেরিকা স্বাধীন হ'ল। স্বাধীনতা-যুদ্ধের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটনকে প্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত করা হ'ল। নতুন



জর্জ ওয়াশিংটন

সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকা হ'ল একটি যুক্তরাষ্ট্র। সমস্ত ইয়োরোপ যখন বিপ্লব, প্রতি-বিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহের টানাপোড়েনে অশান্ত হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই সময়ে সুদূর আমেরিকায় শুরু হয়েছিল গড়নের পালা। প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলল তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ।

জর্জ ওয়াশিংটনের পর আমেরিকার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রেসিডেন্ট হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরে জন্ম হয় আব্রাহাম লিঙ্কনের। কিন্তু ছোট বেলা থেকেই সততা, সরলতা, দৈহিক ক্ষমতা ইত্যাদি গুণের জন্য আব্রাহাম অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। ১৮৬১ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন। এই আব্রাহাম লিঙ্কনের নীতিকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছিল আমেরিকার গৃহযুদ্ধ। লিঙ্কন চেয়েছিলেন আমেরিকা থেকে ঘৃণ্য ক্রীতদাস-প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করতে। ফলে দক্ষিণ অঞ্চলের ছয়টি রাজ্য, যেখানে এই ক্রীতদাস-প্রথা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করে একটি পৃথক্ যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করল। আব্রাহাম লিঙ্কনও তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা তিনি বজায় রাখবেনই। ১৮৬৩ সালে লিঙ্কন ঘোষণা করলেন ক্রীতদাস-প্রথার অবসান। ১৮৬৫ সালেই বিপক্ষ দল যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হ'ল। কিন্তু আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শেষ হবার মাত্র পাঁচদিন পরেই, লিঙ্কন যখন রঙ্গমঞ্চে বসে থিয়েটার দেখছেন ঠিক সেই সময়, দাসপ্রথার এক উগ্র সমর্থকের গুলিতে তিনি প্রাণ হারালেন। কিন্তু তিনি অমর হয়ে রইলেন আমেরিকার ইতিহাসে একজন মানবতাবাদী ও দৃঢ়চেতা রাজনীতিক হিসেবে।



ক্রীতদাসেরা লিঙ্কনকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

এবার আফ্রিকার পালা

ইয়োরোপে শিল্প-বিপ্লবের ফলে শক্তিশালী দেশগুলি তাদের শিল্প-দ্রব্যের প্রচার এবং বিক্রির জন্য উপনিবেশের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। আফ্রিকা সেই সময় "অন্ধকার মহাদেশ" বলে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। ইয়োরোপের লোকেরা আফ্রিকা বললে ভাবত মরুভূমি আর গভীর জঙ্গল—যেখানে অসভ্য মানুষ-খেকো নিগ্রোদের বাস। উপনিবেশ বিস্তারের তাগিদে তারা ঢুকে পড়ল আফ্রিকাতেও। স্পেক্, লিভিংস্টোন, স্ট্যানলি প্রভৃতি ভৌগোলিকদের



লিভিংস্টোন

অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে আফ্রিকার গহন স্থানগুলিও ইয়োরোপীয়দের কাছে পরিচিত হ'ল। খৃষ্টান ধর্মযাজকরাও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দলে দলে আফ্রিকাতে আসতে আরম্ভ করলেন।

আফ্রিকা ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। কাঁচামালের লোভে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ইয়োরোপীয় শক্তিগুলো এবার আফ্রিকাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে শুরু করল লড়াই। মধ্য আফ্রিকার কঙ্গোরাজ্য দখল করে নিলেন বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড। পশ্চিম আফ্রিকার একটা বিরাট অংশ গেল ফরাসীদের হাতে। ইংরেজরা দখল করল ইজিপ্ট (মিশর), ঘানা, নাইজিরিয়া, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া আর উগাণ্ডা। জার্মান্‌রা দখল করল টাঙ্গানাইকা, ক্যামেরুনস ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একটা ছোট্ট অংশ। পর্তুগীজ, স্পেন এবং ইতালিও ভাগ বসাল আফ্রিকা মহাদেশের এই ভাগ-বাঁটোয়ারায়। এইভাবে খাবার টেবিলে রাখা একটা বিরাট কেকের মতই রাজনীতির বৈঠকে বড় বড় শক্তিরা আফ্রিকাকে খণ্ডবিখণ্ড করে তুলল নিজেদের ভাগে। আর সেই সঙ্গে শুরু হ'ল নিগ্রোদের ওপর সাদা মানুষের অত্যাচারের করুণ কাহিনী।

চীনের ভাগ্য নিয়ে খেলা

মধ্যযুগ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চীন ও জাপান ছিল বাইরের দেশগুলির কাছে অপরিচিত এবং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ দেশ। চীন দেশে কোন বিদেশী দূত ঢুকতে পারত না, আর ক্যাণ্টন ছাড়া কোন বন্দরেই বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্যের সূত্রে আসতে পারত না।

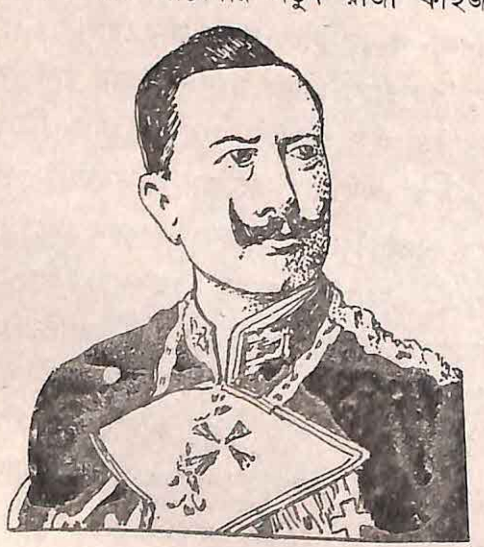
ইংরেজরাই সব চাইতে প্রথম চীনে ঢুকে পড়ে চোরা পথে আফিং চালানের সূত্রে। চীন সরকার আফিং খাওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও আফিংয়ের চোরাই আমদানী বন্ধ করতে পারল না। আফিংয়ের ব্যবসার স্বার্থে এবার ইংরেজরা চীন সরকারের সঙ্গে যুদ্ধে নামল, হারিয়েও দিল (১৮৪২)। এই যুদ্ধ ইতিহাসে "আফিং যুদ্ধ" নামে পরিচিত। এইবার ধীরে ধীরে আমেরিকা ও ইয়োরোপের অন্য দেশগুলিও বাণিজ্য করতে ঢুকে পড়ল চীন দেশে। এই সব বৈদেশিক চাপে চীনের যখন নাভিশ্বাস সেই সময়ে ভিতরেও শুরু হ'ল গোলযোগ—ধর্মীয় বিদ্রোহ। বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে চীন-সম্রাট ১৮৬৪ সালে এই বিদ্রোহ দমন করলেন বটে কিন্তু এরপর থেকেই আরম্ভ হ'ল দুর্বল চীন সাম্রাজ্যকে দখল করার পালা। রাশিয়া ঢুকে পড়ল মাঞ্চুরিয়ায়। ফ্রান্স দখল করে নিল আনাম ও টন্‌কিন। এমন কি ছোট্ট জাপানও বাজপাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল চীনের ওপর। জাপানই শেষ পর্যন্ত চীনের সব চাইতে বড় শত্রু হয়ে দাঁড়াল।

চীনের যখন চরম তুর্দিন তখন সান্-ইয়াৎ-সেন্ নামে একজন দেশপ্রেমিক নেতা কুয়ো-মিং-তাং নামে একটি প্রজাতান্ত্রিক দলের প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯১১ সালে কুয়ো-মিং-তাং দল শুরু করল সশস্ত্র আন্দোলন। এরা দখল করে নিল নান্‌কিন্ এবং সেখানে স্থাপন করল প্রজাতান্ত্রিক সরকার। তারপর ১৯১২ সালে চীন পুরোপুরি পরিণত হ'ল এক প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথে ইয়োরোপ

১৮৭১ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত বিসমার্ক, যিনি ছিলেন অনেকটা গোটা ইয়োরোপের ভাগ্যনিয়ন্তা, কোন যুদ্ধবিগ্রহের ঝুঁকি নেন নি। তবে তাঁর লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী রাজ্যগুলির (যেমন অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালি) সঙ্গে জোট পাকিয়ে ফ্রান্সকে দাবিয়ে রাখা।

ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়াকে বিসমার্ক নিরপেক্ষ রাখবার চেষ্টা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিসমার্কের সঙ্গে জার্মেনীর নতুন রাজা কাইজার



কাইজার দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌ম্

দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌মের মতের মিল না হওয়াতে বিসমার্ক তাঁর মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন। এই কাইজার বিসমার্কের নীতি সব ওলটপালট করে দিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ করে সবাইকে জার্মেনীর বশে আনা। আত্মরক্ষার তাগিদে তাই ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্স এবার জোট বাঁধল জার্মেনী, অষ্ট্রিয়া আর ইতালির বিরুদ্ধে।

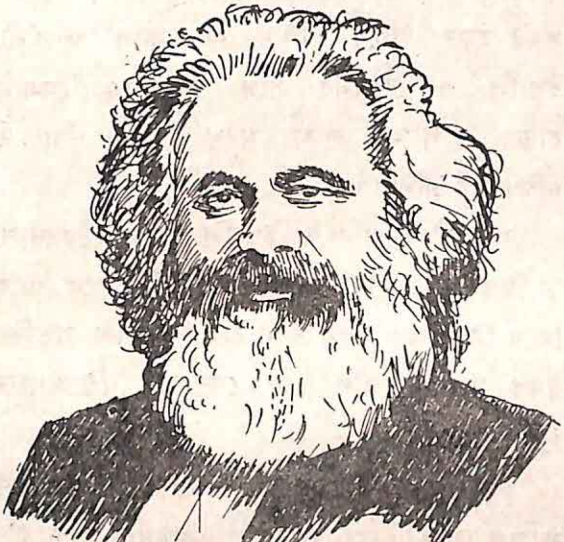
ইয়োরোপের পরিস্থিতি যখন অত্যন্ত জটিল, ঠিক সেই সময় এশিয়ার উঠতি-শক্তি জাপান রাশিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে (১৯০৫) তাক্ লাগিয়ে দিল সবাইকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু বাধল বলকান্‌কে কেন্দ্র করে। ১৯১২ সালে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস ও মণ্টেনিগ্রো এই চারটি বলকান্ রাজ্য এক-সঙ্গে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তুর্কী বাহিনীকে হারিয়ে দিল। ১৯১৩ সালে তুরস্ক আবার যুদ্ধ করে বলকান্ রাজ্যগুলির কাছে পরাজিত হ'ল। এবার ইতালি, অষ্ট্রিয়া তুরস্কের তুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বলকান্ অঞ্চলে ঢুকে পড়ল। ১৯১৪ সালে অষ্ট্রিয়ার রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ড সার্বিয়ায় বেড়াতে গিয়ে নিহত হলেন। অষ্ট্রিয়া চটে গিয়ে সার্বিয়াকে দিল চরম পত্র ৪৮ ঘণ্টার মেয়াদে এবং, তারা তা মানতে না পারায়, অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল। অষ্ট্রিয়ার মিত্র রাজ্য জার্মেনী অষ্ট্রিয়ার পক্ষে যোগ দিল, যোগ দিল তুরস্কও। আর রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যোগ দিল সার্বিয়ার পক্ষে। ইতালি রইল নিরপেক্ষ। ১৯১৪ সালের ২৮শে জুলাই এই যুদ্ধ শুরু হয়ে চলেছিল ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত। আরও বহু দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

তাই একে বলা হয় প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ। স্থল, জল ও আকাশপথে চলেছিল এই প্রচণ্ড যুদ্ধ। যুদ্ধে দুই পক্ষই বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছিল। শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড-ফ্রান্সের দলে আমেরিকাও যোগ দেওয়ায় জার্মেনী ও অষ্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটে। এক কোটি লোক এই যুদ্ধে মারা যায়। কাইজার বন্দী হয়ে নির্বাসিত হন।

রাশিয়ার বিপ্লব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে তখন, ১৯১৭ সালেই, রাশিয়ায় ঘটল এক মহাবিপ্লব। অবসান ঘটল রাজতন্ত্রের। জনসাধারণ দেশের শাসনভার গ্রহণ করল। রাজবংশের প্রত্যেকটি



কার্ল মার্ক্‌স্‌

লোককে নির্মম ভাবে হত্যা করা হ'ল। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়েছিল বল্‌শেভিক দল। এই সময় থেকেই রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ায়।

রুশ বিপ্লবের পয়লা নম্বর কারণ হ'ল রাশিয়ার জার অর্থৎ রাজাদের অত্যাচার।



লেনিন

এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে গোর্কি, টলষ্টয়, তুর্গেনিভ, ডস্‌টয়ভস্কি প্রমুখ মনীষীরা তাঁদের লেখার মাধ্যমে রুশ জনসাধারণকে সচেতন করে তুললেন। রাশিয়ার বিপ্লবের ওপর যাঁর প্রভাব পড়েছিল সব চাইতে বেশি তিনি হলেন একজন জার্মেনীবাসী ইহুদী। নাম কার্ল মার্ক্‌স্‌।

মার্ক্‌স্‌ লিখলেন, পৃথিবীর ইতিহাস দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এ লড়াই বিত্তবানের সঙ্গে বিত্ত-হীনের, শ্রমিকের সঙ্গে মালিক শ্রেণীর। কার্ল



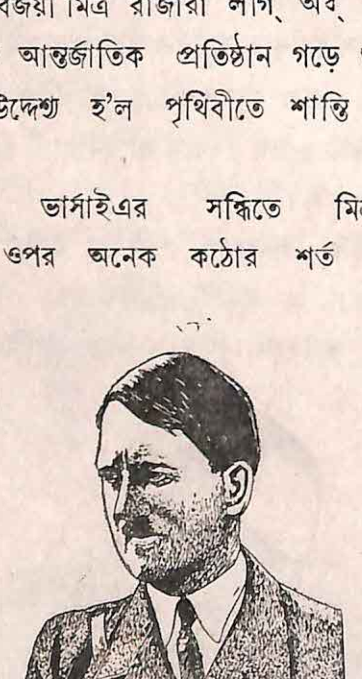
ট্রট্‌স্কি

মার্ক্সের সাম্যবাদ গ্রহণ করলেন তাঁর মন্ত্র-শিষ্য রাশিয়ার লেনিন। মার্ক্স্বাদকে রূপদান করলেন তিনি রাশিয়ায়। লেনিনের দু'জন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন ট্রট্স্কি ও স্তালিন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কি ও স্তালিনের মধ্যে মতবিরোধ বাধলে স্তালিন শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে ট্রট্স্কিকে নির্বাসিত করেন। নির্বাসনেই এক আততায়ীর হাতে ট্রট্স্কি মারা যান। স্তালিনের আমলে রাশিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির পথ ধরে ধীরে ধীরে পৃথিবীর পয়লা সারির শক্তি হয়ে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিসের শান্তি সম্মিলনে বিজয়ী মিত্র রাজারা লীগ্ অব্ নেশন্স্ নামে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন—যার উদ্দেশ্য হ'ল পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখা।

কিন্তু ভার্সাইএর সন্ধিতে মিত্রপক্ষরা জার্মেনীর ওপর অনেক কঠোর শর্ত চাপিয়ে দিয়েছিল। যুদ্ধবিদ্ধস্ত জার্মেনীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক বিরাট অর্থ দাবী করা হ'ল। জার্মেনীকে শোষণ করার এবং চিরকাল পদানত রাখবার পরিকল্পনা একরকম পাকা হয়ে গেল। এর ফলে জার্মেনীতে জাগল অসন্তোষ। এই গণ-অসন্তোষের সুযোগে ক্ষমতায় এলেন জার্মেনীর উগ্রপন্থী নাৎসী নেতা হিটলার। ঘটনাচক্রে ইতালিতেও সে সময় চূড়ান্ত ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিতো মুসোলিনী। আর স্পেনেও একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলেন জেনারেল ফ্রাঙ্কো। প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী পক্ষে থাকলেও যুদ্ধ-শেষে ভাগ-বাঁটোয়ারায় জাপান তেমন সন্তুষ্ট হতে পারে নি। এর ফলে জার্মেনী, ইতালি ও স্পেনের সঙ্গে জাপানও মেলাল হাত। জাপানের লক্ষ্য অবশ্য ছিল চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।



হিটলার

জার্মেনী, জাপান ও ইতালি যখন ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার দুর্বল রাজ্যগুলি একে একে নিয়ে নিতে শুরু করল তখন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতির টনক নড়ল। লীগ্ অব্ নেশন্স্ শান্তি স্থাপনে পুরোপুরি ব্যর্থ হ'ল।

হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সও যুদ্ধে নেমে পড়ল। এইভাবে শুরু হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)।

প্রথমটা জার্মেনীর জয়ের পর জয়। জার্মেনীর হাতে ফ্রান্সের পতন ঘটল, হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে তাকেও কোণঠাসা করে ফেললেন। রাশিয়া অমিতবিক্রমে বাধা দিতে লাগল, স্তালিনগ্রাদের ঘরে ঘরে চলল হাতাহাতি যুদ্ধ। ওদিকে জাপানও বার্মা,

সিঙ্গাপুর ইত্যাদি অঞ্চল দখল করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল পশ্চিম দিকে। চীন যোগ দিল মিত্রপক্ষে। কিন্তু আমেরিকাও এবার যুদ্ধে যোগ দিলে যুদ্ধের মোড় গেল ফিরে।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলেছিল এই ঘোরতর যুদ্ধ—স্থলে, জলে ও আকাশে। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মিত্রপক্ষ অর্থাৎ রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স এবং শেষের দিকে যোগদানকারী আমেরিকা জয়লাভ করে—জার্মেনী, জাপান ও ইতালিকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ক'রে। যুদ্ধে সব চাইতে বড় ঘটনা হ'ল জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর আমেরিকার অ্যাটম্ বোমা নিক্ষেপ (আগষ্ট, ১৯৪৫)।

১৯৪৫ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটল অবসান। জার্মেনীতেও পতন ঘটল হিটলারের। জার্মেনী ভাগ হয়ে গেল পশ্চিম ও পূর্ব তু'টি ভাগে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও পরে

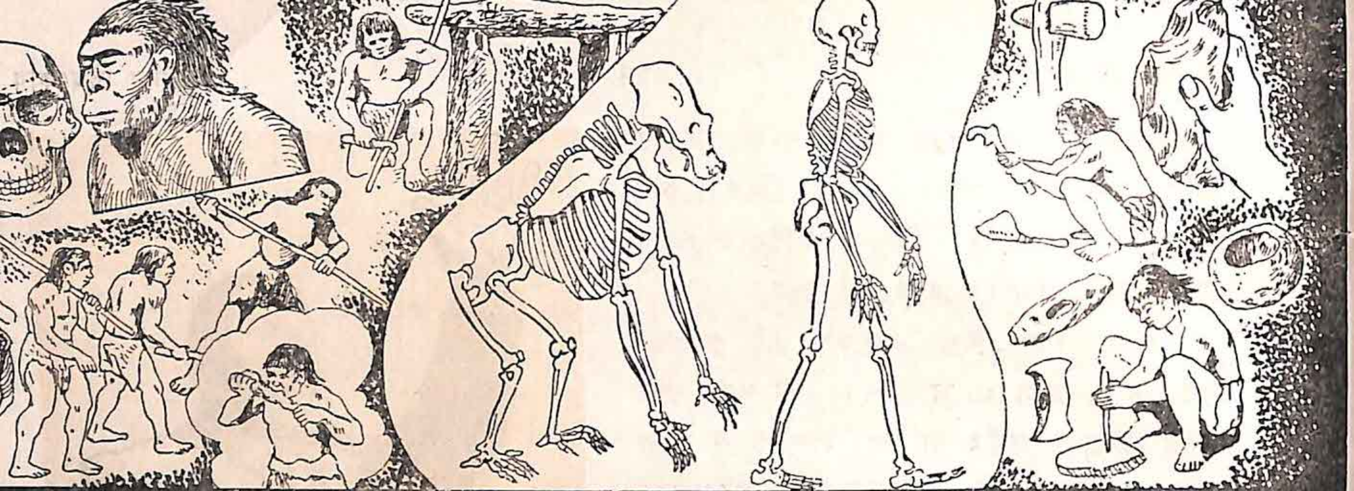
ইতিমধ্যে আরও অনেক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে পৃথিবীতে। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগে জাপান চীনের অনেকটা দখল করে নিয়েছিল দশ বছরের যুদ্ধে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। চীনেও আবার বাধল দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ। মাও সে-তুংএর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল পুরোনো কুও মিং টাংকে হটিয়ে দিল চীন থেকে। ঐ দলের নেতা চ্যাং কাই শেক ছোট্ট ফরমোসায় আশ্রয় নিয়ে সেটাকেই আসল চীন সরকার বলে দাবী জানিয়ে বসে রইল—আমেরিকার ছত্রছায়ায়। ইন্দো-



মাও সে-তুং

চীনে (ভিয়েৎনাম) হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ফরাসীরা পাততাড়ি গোটালে উত্তর ভিয়েৎনামে হ'ল কমিউনিস্ট সরাকর। কিন্তু আমেরিকার সাহায্যে সেখানকার দক্ষিণপন্থী দল আলাদা রাষ্ট্র গড়ল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলল দীর্ঘদিন উত্তর ভিয়েৎনামের। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে সরে আসতে হ'ল এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারকেও পাততাড়ি গোটাতে হ'ল। ওদিকে পশ্চিম এশিয়ায় আরব রাজ্যগুলি এবং মিশর ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। কখনও যুদ্ধবিরতি, কখনও আবার আক্রমণ—এই রকম অশান্তি চলতে লাগল সমস্ত পৃথিবীতেই বারে বারে।

যুদ্ধের পর লীগ্ অব্ নেশনস্-এর মত আবার গড়ে উঠেছে ইউনাইটেড নেশনস্ অর্গানিজেশন (ইউ. এন্. ও.)—পৃথিবীতে যাতে আর মারামারি কাটাকাটি না হয়। অনেকবার তারা থামিয়েছেও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পারবে ?



মানুষের কথা

ভারতের আদিবাসী মানুষ

'আদিবাসী' কথাটির চলন শুরু হয়েছে হাল আমলে। ওর মানে হ'ল যারা দেশের আদিম অধিবাসী। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায়ও আদিম অধিবাসীদেরকেই আদি-বাসী বলা হয়। এরা সাধারণত নদীবহুল উর্বর অঞ্চল এবং গিরিবহুল অরণ্য অঞ্চলই বেশি পছন্দ করে।

আমাদের ভারতবর্ষে অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে—তার খবর তোমরা নিশ্চয়ই ইতিহাসের পাতায় পড়েছ। মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটা ঐতিহাসিক প্রমাণ বা নজির তোমরা দেখতে পাবে না যা থেকে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে ভারতের আদিবাসী সমাজকে আর্যেরা, যারা নাকি পরে এসে এ দেশ দখল করেছিল, নিজেদের আপন জন বলে গ্রহণ করতে পেরেছে।

মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র আলোচনা করলে দেখতে পাবে যে বীর অর্জুন আদিবাসী দুহিতা উলুপীকে এবং ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করলেও ঠিক স্ত্রী ও সহধর্মিণী বলতে যে সম্মান পাওয়া বোঝায় তা কিন্তু কেবল আর্য রমণীদের ভাগ্যেই জুটেছে। রামায়ণ-মহাভারতে তো এদেরই কোন কোন শ্রেণীকে রাক্ষস ও বানর জাতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

হালফিলের ভারতবাসীরাও কি আজ পর্যন্ত আদিবাসী সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের আপন জন করে নিতে পেরেছে? আমাদের সংবিধানে এদের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হ'লেও এখনও কোন কোন আদিবাসী সমাজকে চলতি ভাষায় পাহাড়িয়া, বুনো, এমন কি জংলী ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করতেও কারো কারো বাধে না। অথচ আর্যেরা ভারতে আসবার অনেক আগেই আদিবাসী জনসমাজ-ই ভারতবর্ষকে প্রস্তর যুগের সভ্যতার আলোয় আলোকিত করেছিল।

ওরাও বাইরে থেকে এসেছে

এখন, কথা হচ্ছে, আর্যেরা ভারতবর্ষে তো বহিরাগত, কিন্তু এই আদিবাসীরাই কি গোড়া থেকেই এখানকার বাসিন্দা? নৃতাত্ত্বিকদের মতে ওরাও

নাকি অনেকেই আর্যদের মতই বহিরাগত। আর্যদের আসবার অনেক আগেই কোল, ভীল, মুণ্ডা, গোন্দ, ল্যাপচা, কুকি, নাগা, গারো, আপতানি, দফলা ও মিশমী আদিবাসী গোষ্ঠীরা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছিল। সুতরাং ভারতের খাঁটি সন্তান কে বা কারা এখন আর তা বলা সম্ভব নয়।

এ সব শুনে তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে—তবে কি দূর অতীতে ভারতে একেবারেই কোন মানুষ থাকত না? সবাই কি এখানে তা হলে প্রবাসী? এখনকার বিজ্ঞানীরা এর উত্তরে কি বলেন দেখা যাক্। তাঁরা বলেন—হ্যাঁ,



নিবো পুরোহিত

কতকটা তাই-ই। এমন কি আদিবাসী আখ্যাত মুণ্ডারী জাতিও ভারতের বাইরে থেকেই এসেছে। তবে অতীতে অন্যান্য মহাদেশের মতই ভারতের মাটিতেও এক শ্রেণীর দ্বি-পদ বৃক্ষচর প্রাণী বাস করত। তারাই কালক্রমে, ক্রমবিকাশের ফলে, আজকের মানুষে পরিণত হয়েছে।

ভারতের আদিবাসী মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিকেরা ভারতের আদিবাসী মানুষদের তিনভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে রয়েছে 'প্রোটো-অস্ট্রলয়েড' গোষ্ঠী। বিজ্ঞানীদের মতে এরা হ'ল প্রায়-অস্ট্রেলিয় বংশোদ্ভূত। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী এবং গঙ্গা উপত্যকার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা হচ্ছে এই প্রায়-অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীর মানুষ। মধ্যভারতের মালভূমির ভীল, কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, মাল, বড়গা, কোরায়া, খারোয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং মাল-পাহাড়িয়া প্রভৃতি আদিবাসীরা সকলেই প্রায়-অস্ট্রেলিয় গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুম্বা ও ইয়েরুণ ইত্যাদি উপজাতিরাও প্রায়-অস্ট্রেলিয়। এই সব গোষ্ঠীর আদিবাসী সমাজ ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, আজমীর, মারোয়াড়, রাজপুতানা, বোম্বাই, বরোদা ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে দল বেঁধে বাস করে।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে 'নিগ্রোবটু' গোষ্ঠী। এরা হ'ল বৃহত্তর নিগ্রো বংশের একটি শাখা। মাথায় বেঁটে; মাথার খুলির গড়নেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আর একটা বৈশিষ্ট্য এদের আংটির মতো কোঁকড়ানো চুল। এরা শুধু আকৃতিতেই বামন নয়, এদের মাথা ও চিবুকও ছোট, কপাল ফোলা। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়নও হাল্কা ধরনের। শরীরের তুলনায় এদের হাত লম্বা ও গায়ের রং অত্যন্ত কালো। আদিবাসী মানুষদের এই গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষের

দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে এদের সংখ্যা প্রায় নগণ্য।

তৃতীয় পর্যায়ে নৃতাত্ত্বিকেরা মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর আদিবাসীদের ফেলেছেন। এদের গায়ে লোম খুব কম, দাড়ি-গোঁফও তেমন গজায় না। চওড়া চোয়াল, চ্যাপ্‌টা নাক ও ভারী ভুরু এবং মোঙ্গোলীয়দের মত চোখই হ'ল এই গোষ্ঠীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারত উপমহাদেশের আদিবাসী-দের বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীই হল এই মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোক।

আসাম, হিমাচল প্রদেশ ও নেফা অঞ্চলের আদিবাসী সমাজ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের আদিবাসী সমাজ থেকে ভাষায় ও চেহারায় সম্পূর্ণ আলাদা। মোঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত এই গিরিবাসী সমাজকে 'কালি প্রজা' বা 'ব্ল্যাক্ রেস' বলা হয়। এদের দেহের রং কালোও নয়, আবার সুগৌরও নয়, বরং পীতাভ বলা যেতে পারে। ল্যাপ্‌চা, মিরি, আপতানি, দফলা, মিশমী, লিম্বু, কুকি, লুসাই, সিংকো ও গারো ইত্যাদি আদিবাসীরা এই মোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে।



মিশমী বালক

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী মানুষ

পশ্চিম বাংলার ও আশপাশের মুণ্ডা, ওঁরাও ও গোন্দ গোষ্ঠীর আদিবাসীরা হ'ল অস্ট্রো-এশিয়াটিক্ মানবগোষ্ঠীর একটি শাখা। স্যর হারবার্ট রিস্‌লে ছোটনাগপুর অঞ্চলের সমস্ত আদিবাসীদের দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন। মধ্যভারত ও সমস্ত পশ্চিম ভারতের ভীল সম্প্রদায়ই হ'ল ভারতের প্রধান আদি-বাসী গোষ্ঠী। আজমীর, মাড়োয়ার, রাজপুতানা, বোম্বাই, বরোদা ও হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে প্রায় কুড়ি লক্ষ ভীল গোষ্ঠী ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসীরা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে একই গোষ্ঠীর।

পশ্চিম বাংলার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে রাজ-মহল পাহাড়। বনে-জঙ্গলে পরিপূর্ণ এই পাহাড়িয়া অঞ্চলে মাটির কুটীর বেঁধে বাস করে পাহাড়ী আদিবাসী মালেরা। 'মাল' কথার দ্রাবিড় ভাষার অর্থটি তোমরা এখানে শিখে রাখ। দ্রাবিড় ভাষায় 'মাল' শব্দের অর্থ হ'ল পাহাড়িয়া। এখন বুঝলে তো নাক চ্যাপ্‌টা, গায়ের রং কুচকুচে কালো, বেঁটেখাটো চেহারার এই আদিবাসীদের মাল বলা হয় কেন? এরা দেখতে কিন্তু অনেকটা সিংহলের আদিবাসী ভেড্ডাদের মত। এরাই হ'ল পশ্চিম বাংলার রাঢ় অঞ্চলের আদিম অধিবাসী,

অর্থাৎ আদিবাসী। এই আদিবাসীরাও 'অস্ট্রিক' মানব গোষ্ঠীভুক্ত। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা সময় সময় এই মালেদের 'নিষাদ জাতি' ব'লে ব'লে থাকেন। এ ছাড়া রাঢ় অঞ্চলে বর্তমানে সাঁওতাল আদিবাসীর সংখ্যা হ'ল সাড়ে আট লক্ষের মত।

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া জেলায় সাঁওতাল, ডোম, বাউরী এবং কুর্মি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর মানুষেরা দল বেঁধে বাস করে। পুরুলিয়ার মাহাতো গোষ্ঠী কুর্মি ক্ষত্রিয় বলে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন। সেই সুবাদে এই মাহাতোরাও আদিবাসী। উৎসব-অনুষ্ঠানে, আচার-ব্যবহারে এদের মধ্যে এখনও উগ্র আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে নি। তবুও বর্তমান কালে এদের বর্ণ-হিন্দুদের থেকে আলাদা করে বিচার করা খুবই দুষ্কর।

নেফা অঞ্চলের আদিবাসীরা

আসাম, হিমাচল প্রদেশ ও নেফা অঞ্চলের আদিবাসীরা ভাষা ও চেহারায় সম্পূর্ণ পৃথক্। আন্তর্জাতিক সীমান্ত-পরিবৃত নেফার অভ্যন্তরে রয়েছে উত্তুঙ্গ পাহাড়, অতলস্পর্শী গিরিখাত, অরণ্য-আবৃত পর্বতগাত্র, গভীর উপত্যকা আর অসংখ্য ছোটবড় নদী। সুবর্ণগিরি হ'ল এই



দফলাদের লম্বা বাড়ী

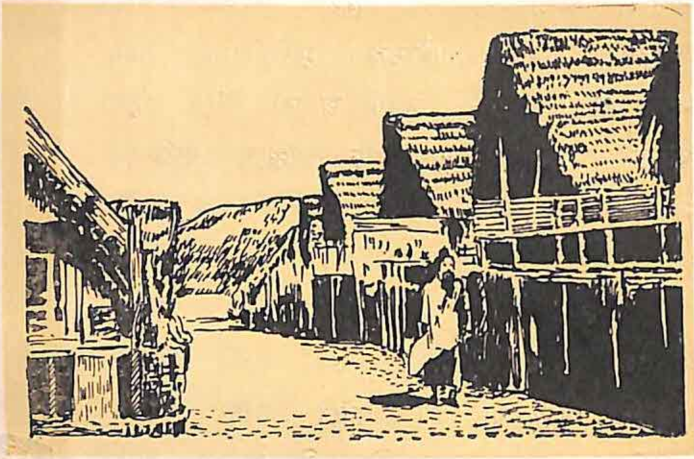


দফলা পুরুষ

অঞ্চলের একটি জেলা। এখানে ছ' হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে-ঘেরা এক বিস্তৃত উপত্যকা জুড়ে আপতানি আদিবাসীদের বাস। আপতানির দেশ সুবনগিরিতে দু'টি প্রধান আদিবাসী উপজাতি হ'ল দফলা ও পাহাড়িয়া মিরি। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্বাঞ্চলের দফলারা নিজেদের 'নিস্থ্' বলে পরিচয় দেয়। দোপুর, দোদুম ও দোল—দফলারা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

'মিরি' উপজাতি আদিবাসীরাও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। মাইখাসি, খাসি, সারাক, পানিবতিয়া ও তারবতিয়া। সুবনগিরির অন্য আর একটি সংখ্যা-লঘু আদিবাসী জাতি হ'ল 'সুলুং'। ছোটবড় নানা আদিবাসী-অধ্যুষিত সুবনগিরি জেলার পার্বত্য অঞ্চলে তিনটি সাংস্কৃতিক ধারা দেখতে পাওয়া যায়। আদিম সংস্কৃতির লক্ষণ দেখতে

পাওয়া যায় স্থলুংদের মধ্যে। যাযাবর বৃত্তির ঊর্ধ্বে এরা এখনও উঠতে পারে নি। এরা এখনও চাষবাস না করে একান্ত ভাবে খাদ্যসংগ্রাহক ও শিকারী-স্তরেই রয়ে গেছে। সেই তুলনায় দফলা ও পাহাড়িয়া মিরিরা অনেক উন্নত। ক্ষেতের কাজ করে ফসল উৎপাদন করতে এরা জানে। শিকার ও অন্যান্য উপায়েও এরা অতিরিক্ত খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে।



আপতানি গ্রাম—দু'পাশে বাড়ী, মাঝখানে রাস্তা

আপতানিরা কোথা থেকে এই সুবনগিরি উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল, কোথায়-ই বা ছিল এদের আদি বাস, কী-ই বা এদের আদি পরিচয় কিছুই সঠিক তোমাদের জানাবার উপায় নেই। তবে মনে হয় আরও উত্তরের কোনও পাহাড়ে আপতানিদের আদি বাস ছিল। সেখান থেকেই এরা এদের বর্তমান আবাসভূমি সুবনগিরিতে চলে আসে। বর্তমানে হিমালয়ের পাদদেশ নেফা অঞ্চলে আপ-তানিরাই সম্ভবত একমাত্র আদিবাসী মানব-সমাজ। ঘনবসতিপূর্ণ গ্রামে এরা দল বেঁধে বাস করে।

চারদিকে ধানের ক্ষেত, মাঝখানে আপতানি গ্রামগুলি বসানো। হঠাৎ দেখলে প্রথমে একটা দ্বীপের মতই মনে হবে। গ্রামের দু'পাশে সব ঘরবাড়ী, মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। বাড়ীগুলি সব চাঙ-ঘরের, মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। সিঁড়ির বদলে খাঁজকাটা কাঠ দিয়ে ওপরে উঠতে হয়। একটি বাড়ীর লাগোয়া আর একটি বাড়ী। এক একটি আপতানি গ্রামে গড়পড়তা একশ' ষাট থেকে একহাজার পর্যন্ত বাড়ী দেখতে পাওয়া যাবে।

পোশাক-বাহুল্য বলতে যা বুঝি তা আপতানিদের বড় একটা কিছু নেই। রাঙানো বেতের একটা জিনিস এরা পরে—যার শেষ দিক্‌টা পেছনে লেজের মত ঝোলানো থাকে। আপতানি মেয়েরা নীলে কালোয় মেশানো রঙের পেটিকোট পরে আর পরে সাদা তুলোর জ্যাকেট। সবই নিজেদের হাতে বোনা।

আপতানিদের প্রায় সকলেরই মুখে উল্কি আঁকা। আপতানি পুরুষেরা উল্কি পরে শুধু মুখের নীচে—ঠিক ঠোঁটের তলায় একটি সমান্তরাল প্রশস্ত রেখায়। মেয়েদের উল্কি কপালের ওপর থেকে আরম্ভ করে নাকের ডগা পর্যন্ত একটি রেখায় এবং ঠোঁটের নীচে থেকে থুৎনি পর্যন্ত তিন-চারটি রেখায়। মেয়েরা আবার নাক ফুটো করে তাতে কাঠের ছিপি বসিয়ে দেয়। নাক তাতে অস্বাভাবিক চ্যাপ্টা আর বড় হয়ে যায়। সারাটা মুখ জুড়েই দেখা যায় শুধু নাক।



আপতানি যুবক

ছেলেরা বেতের টুপি পালক দিয়ে সাজিয়ে পরতে ভালোবাসে। তারা পহম বা চুলের ঝুঁটিতে তামার কাঁটাও পরে। বাদামী রঙের অদ্ভুত জবরজং পোশাক ওদের খুব পছন্দ। পাইনের পাতা থেকে বার করা সুতো দিয়ে বোনা কালো বিচিত্র ধরনের এক রকম বর্ষাতির প্রচলন রয়েছে আপতানিদের মধ্যে। আপতানি পুরুষদের বহিরাবরণ সম্পূর্ণ হয় না যদি না দেড় ফুট লম্বা একটা তলোয়ার তার কোমরে ঝোলানো থাকে। আগে আপতানি মেয়েরা তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনও আবরণ পরত না। এখন আপতানি মেয়েদের মধ্যে ব্লাউজ ও জামার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এখন কোমরের নীচে ওরা সাদা-কালোয় মেশানো কাপড়ও পরে।

জুয়াং নামে অনগ্রসর আদিবাসী গোষ্ঠীর মেয়ে ও ছেলেরা এখনও গাছের পাতা দিয়ে তৈরি পোশাকে নিজেদের দেহ আচ্ছাদন করে থাকে। এখনও এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করে পাহাড়ের গুহায় বা গাছের কোটরে।

আদিবাসী মানব-সমাজের উৎসব

পশ্চিম সীমান্ত বাংলার পুরুলিয়া জেলা হ'ল মাহাতো-প্রধান অঞ্চল। এই মাহাতোদের পূর্বপুরুষেরা কুর্ম ক্ষত্রিয় বা কুর্মি বলে পরিচিত এ কথাও তোমাদের আগেই বলেছি। এই মাহাতো গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সংহত লোক-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই অঞ্চলের ভাদু, ঝুমুর ও করম গীতি হ'ল প্রধান লোকসঙ্গীত। এখানকার আদিবাসী মানুষেরা নৃত্য ও গীত-প্রিয়। তাই বিভিন্ন উৎসবে ভাদু আর টুসুর সঙ্গে ছৌ-নাচের আসরও এরা বেশ জমিয়ে তোলে। পুরুলিয়ার পাহাড়-ঘেরা বনাঞ্চলে মশালের কাঁপা কাঁপা আলোয়, ধামসার গুরু-গম্ভীর তালে তালে মাটি-কাঁপানো পা ফেলে, বেশ কিছু আদিবাসী পুরুষ মেতে ওঠে নাচের আনন্দে। ঢোল, মাদল, ধামসা আর সানাইয়ের ঐকতান এসে সবাইকে আমন্ত্রণ জানায় উৎসবের। ছন্দ-যতির আশ্চর্য মিল রেখে সুঠাম দেহের পৌরুষনৃত্য একটা অপূর্ব স্বপ্নময় জগতের সৃষ্টি করে।

সাধারণত পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে এই সব ছৌ-নাচের বিষয়বস্তু তৈরি হয়ে থাকে। তাই বর্তমান কালে ছৌ-নাচে মুখোস অপরিহার্য। রাক্ষস-অসুরের সঙ্গে দেব-দেবীদের যুদ্ধও ছৌ-নাচে প্রায় অপরিহার্য। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, অসুন্দর মুখকে ঢাকার জন্যই মুখোসের ব্যবহার। মুখোস আর তার সঙ্গে চরিত্রানুযায়ী পোশাক পরেই ছৌ-নাচের

বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য আজ থেকে তু'শ' বছর আগে নাকি এই নাচে মুখোস ব্যবহার করা হ'ত না। তখনকার দিনে নায়ক-নায়িকারা যাত্রার মত জমকালো পোশাক ব্যবহার করত। গায়ে রঙিন কাপড়ে মোড়া, জরির কাজ-করা চাপকান, পায়ে ঘুঙুর



পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্য

আর মাথায় পাগড়ি এবং পালকের মুকুট—এই ছিল নায়কদের পোশাক। নায়িকার পোশাকও প্রায় অনুরূপ। বর্তমানে মাটি, কাগজ, ন্যাকড়া, পাটের ফেসো ও রঙ ইত্যাদি উপাদান দিয়ে তৈরি হয় এই মুখোস। পুরুলিয়া ছাড়া এই ছৌ-নাচ বিহারের সেরাইকেলা ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও প্রচলিত রয়েছে। তবে সেগুলি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। সম্প্রতি পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ আর তার মুখোস সুদূর লণ্ডন ও প্যারিস হয়ে আমেরিকার বিভিন্ন শহরেও পাড়ি জমিয়েছে, আদরও লাভ করেছে।

সাঁওতালদের উৎসব

সাঁওতাল সমাজের 'সেরাই' উৎসব হ'ল নাচ-গান ও হাড়িয়া খাওয়ার উৎসব। খাঁটি আদিবাসী সাঁওতাল সমাজ আধুনিকতার স্পর্শে এসে এখনও ফুরিয়ে যায় নি। সাঁওতালী গানের বৈচিত্র্য আজকেও আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। একটানা বিষণ্ণ সুরের মধ্যে সাঁওতালী সঙ্গীত যে কত আকর্ষণীয় ও ভাবব্যঞ্জক হতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় বাঁধনা, করম ও আখড়া গানে। সাঁওতালরা সাধারণত নিরীহ, সুখী ও স্বাভাবিক আনন্দ ও ঐশ্বর্যে ভরপুর মানুষ। যে কোনও সাঁওতাল-পল্লীতে গেলেই তোমরা দেখতে পাবে—পুরুষেরা কাঠ কেটে, মেয়েরা পাতা কুড়িয়ে, বৃদ্ধেরা মাতুর ও ডালা বুনে এবং ছেলের দল মাঠে মাঠে পাখি আর ইঁতুরছানা তাড়া করে দিন কাটাচ্ছে। তারপর গোধূলি লগ্নে সবাইকার ঘরে ফেরার পালা। ঘরে ফিরে ছেলে-বুড়ো সবাই মহুয়ার চাটনি আর পেট ভরে টাটকা তালের রস খেয়ে নিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে। এরপর সকলে নৈশ ভোজ সারার উদ্যোগ-আয়োজন করে। নৈশভোজ শেষ করে ছেলে-মেয়েরা নিজেদের নানা রকম অলঙ্কারে সজ্জিত করে তোলে। মুরিয়া আর ওঁরাও ছেলে-



আবর রমণী

মেয়েরা তাদের কোঁকড়া চুলে ফুল আর পালক গোঁজে। এরপরই শুরু হয় এদের দল বেঁধে হাতে হাত ধরে অর্ধবৃত্তাকারে সাঁওতালী নাচ—দামামার তালে তালে।

'করম' উৎসব হ'ল আদিবাসী সমাজের বর্ষা-শেষের একটি বিশেষ উৎসব। ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদশীই করম উৎসবের বিশেষ তিথি বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। টুসু বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার একটি লৌকিক শস্যোৎসব। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে যখন মাঠে মাঠে সোনালী ধান হাওয়ায় দুলতে থাকে, যখন কৃষকের গৃহাঙ্গন পূর্ণ হয় সোনালী ফসলে—তখন এই উৎসব চলে আদিবাসী মানুষের ঘরে ঘরে। ছোট একটি মাটির সরায় তুষ ভরা থাকে এবং তার গায়ে একটি মেয়ের মুখ এঁকে, মাটির সরাটি ফুল ও নানারকম মিষ্টি দিয়ে সাজানো হয়। তিন দিন মাটির সরাটি পূজা করার পর মকর সংক্রান্তিতে সেটি নদী কিংবা পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সারি সারি কুমারী মেয়েরা চলে সরাটি নিয়ে গান গাইতে গাইতে।

আপতানিদের উৎসব

আপতানিদের কথায় আবার আসা যাক। এদের বিবাহেও আচার-অনুষ্ঠান বলে বিশেষ কিছু নেই। তেমনি নেই শিশুর জন্মের বেলায়ও। জন্মকে এরা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনা বলেই মনে ক'রে নবীন আগন্তুককে স্বাগত জানায়। মৃত্যুকেও আপতানিরা জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি ব'লে মনে করে। তবে তরুণ বা শিশুর মৃত্যু হলে সেটা ওদের মতে অপদেবতার কুদৃষ্টির ফল।

আপতানিদের প্রধান উৎসব 'মরম'। এটি হ'ল কৃষি-উৎসব,—অধিক ফলনের জন্য দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করার উৎসব। মরমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ছেলে-বুড়োদের বর্ণাঢ্য মিছিল। প্রত্যেকের পরনে ভালো পোশাক। মিছিল এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, পুরোভাগে থাকেন গ্রামের পুরোহিত মশাই। ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে যাবার সময় মিছিলের লোকেরা তলোয়ার উঁচু করে ধরে কিংবা পেতলের থালা বাজিয়ে চলে, আর মাঝে মাঝে 'হা-হো' করে চেঁচায়। পুরোহিত ঠাকুর মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চলেন আর হাতে করে ধানের বীজ ছড়াতে থাকেন রাস্তার দু'ধারে। এক এক গ্রামে পৌঁছে চালের গুঁড়ো বিলোনো হয়। 'মরম' উৎসবের সময়ে তরুণেরা বড় বড় বাঁশ নিয়ে নাচে। এ সবই প্রতীক নাচ।

আপতানিদের অপর আর একটি বিশিষ্ট উৎসব হচ্ছে 'ম্লকো' উৎসব। গ্রামের ভিতরে নির্দিষ্ট বেদীতে পুরোহিত পূজো দেন। মুরগী, শূয়োর ও কুকুর বলি দেওয়া হয়। পূজিত হন তিন দেবতা—কিলো, কিরু এবং কিরলিয়ারি। 'কিরলিয়ারি' হচ্ছেন ধরিত্রী দেবতা। অস্ট্রেলিয়ায়ও কোন কোন আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের উৎসব প্রচলিত আছে।

'ম্লকো' উৎসবের সময় এদের একটি জনপ্রিয় খেলা হচ্ছে 'ববো'। খোলা ময়দানে বিরাট লম্বা বাঁশের খুঁটি পুঁতে তাতে লাগানো হয় বেতের লম্বা দড়ি। দড়ি ধরে টান দিলেই বাঁশটা হেলে পড়ে, আর খেলুড়েরা দড়ি ধরে সব শূন্যে ঝুলতে থাকে। দড়ির টানে শূন্যে উঠে গিয়ে ডিগ্‌বাজী খাওয়ার কসরৎই হ'ল এই খেলার বৈশিষ্ট্য।

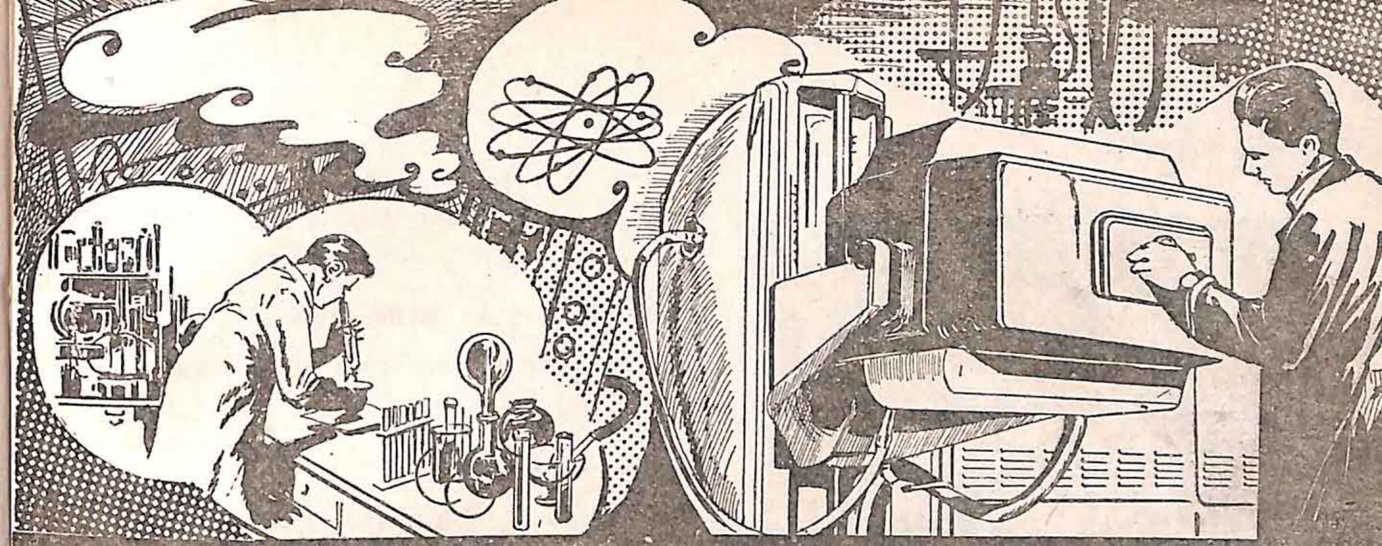


নাগা নৃত্য

নাগা-উৎসব

আসাম ও মিজোরামের নাগা আদিবাসীদের মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের প্রথা দেখতে পাওয়া যেত। এখনও কোন কোন জায়গায় দেখা যায়। অতীতে ভীলেরাও শত্রুমুণ্ড এনে গাছে ঝুলিয়ে রাখত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে নরবলি প্রথা বস্তুত ফসল পূজোর রূপ গ্রহণ করেছিল। বলি দিয়ে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার অর্থ হ'ল আত্মা-বস্তু দিয়ে মাটিকে উর্বর করার অনুষ্ঠান। মরিয়া খন্দেরা নরবলি দিয়ে, তার মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে ক্ষেতের ওপর ও নিজেদের শস্য-ভাণ্ডারে ছড়িয়ে দিত। খন্দদের বলির প্রথা হ'ল একটা তাজা গাছের ফাটলের মধ্যে বলির মানুষটিকে চেপে মেরে ফেলা। বলির মানুষটির চোখ থেকে যত বেশি জল ঝরবে তত বেশি বৃষ্টি হবে—এটাই হ'ল তাদের বিশ্বাস। জীব-বলি ও নরবলি—এ দু'টিই হল উর্বরতার আচার। তবে এ প্রথা, ওরা যতই সভ্য হচ্ছে, ততই কমে আসছে।

নাগাদের মধ্যে নাচ-গানেরও প্রচলন খুব। মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে সেখানে শিকার রেখে গোল হয়ে ওরা নাচতে থাকে, তারপর নাচ ও গানের শেষে শিকারটিকে আগুনে ঝল্‌সিয়ে নিয়ে মাতে খাওয়ার আনন্দে।



সাধারণ বিজ্ঞানের কথা

চুম্বক

চুম্বকের কথা শোনে নি এমন লোক কমই আছে। চুম্বকের গুণ সম্বন্ধেও অনেকেরই একটা মোটামুটি ধারণা আছে। যেমন, চুম্বকের কাছে লোহা আনলে চুম্বক তাকে টেনে নেয়, একটা চুম্বকের পাত বা কাঁটা ঝুলিয়ে দিলে তার এক মুখ দক্ষিণ দিকে, অন্য মুখ উত্তর দিকে মুখ করে থাকে। তা ছাড়া বিদ্যুতের মত চুম্বকেরও আছে এক রকম শক্তি—যাকে বলা যায় চৌম্বক শক্তি। ইংরেজিতে চুম্বককে বলা হয় ম্যাগনেট।

প্রকৃতিতে যে চুম্বক পাওয়া যায় তার নাম প্রাকৃতিক চুম্বক। সেকালে নাবিকেরা দিক্ নির্ণয়ের কাজে এ জাতীয় চুম্বক ব্যবহার করত। একে বলা হ'ত লোডস্টোন বা লিডিং স্টোন। প্রাকৃতিক চুম্বক ছাড়া কৃত্রিম ভাবেও নানা আকারে নানা আকৃতির চুম্বক তৈরি করা যায়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীটাও একটা বিরাট চুম্বক। পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে ছ'মাস ধরে চলে একটানা দিন, তারপর ছ'মাস একটানা রাত। সেখানে যখন রাত তখন মাঝে মাঝে আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে সুন্দর আলোর খেলা। একে বলা হয় মেরুজ্যোতিঃ বা আরোরা। পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ধর্মের জন্যেই নাকি এ ব্যাপারটা ঘটে থাকে। এ বিষয়ে আমরা আগেই মোটামুটি আলোচনা করেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ১৬-১৭)

তড়িৎও এক রকমের শক্তি

তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আমরা আগে কিছু বলেছি। এ সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনার কথা বলি।

১৭৫২ সালের একটি দিন। আমেরিকার একটি জায়গায় সেদিন মেঘের বড় ঘনঘটা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তারই মধ্যে দেখা গেল একটি প্রবীণ লোক মনের সুখে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন আকাশে। ঘুড়িখানা কিন্তু কাগজের নয়,—রেশমী কাপড় দিয়ে তৈরি, আর তার মাথার দিকে একটি লোহার তার উঁচু করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘুড়িটি নিয়ে ফেলা হয়েছে একেবারে মেঘের গায়ে।



একটি প্রবীণ লোক মনের সুখে ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন।

একবার—দু'বার—তিনবার। বিদ্যুতের ঝলক এসে পড়ল তারের গায়ে। প্রবীণ লোকটি, মনে হ'ল, বেশ খুশিই হয়েছেন মনে মনে। তারটির সঙ্গে ওড়াবার সুতো বেঁধে সেটি তিনি নিয়ে এলেন তাঁর পরীক্ষাগারে।

পরীক্ষাগার মানে বিজ্ঞানীর পরীক্ষাগার। আসলে ঐ প্রবীণ লোকটি আর কেউ ন'ন—বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন।

পরীক্ষাগারে ঐ নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন ফ্রাঙ্কলিন, তারপর প্রমাণ করলেন যে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে যে বিদ্যুৎ তৈরি করেন সেই বিদ্যুৎ আর আকাশের বিদ্যুৎ আসলে একই।

বিদ্যুৎ বা তড়িৎ যে এক রকমের শক্তি, তা তো আগেই বলা হয়েছে। এর আছে কাজ করার ক্ষমতা। এবার দেখা যাক, তড়িতের আসল স্বরূপ কি।

তড়িতের আসল স্বরূপ

শীতের দিনে মাথা আঁচড়িয়ে চট্‌পট্ চিরুনীটা টুকরো টুকরো করে কাটা কাগজের কুচির কাছে ধরলে দেখা যাবে চিরুনী কাগজের টুকরোগুলোকে তার কাছে টেনে নিচ্ছে। এর কারণ হ'ল এই যে শুকনো চুলের ঘষায় চিরুনীর মধ্যে তড়িতের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বলতে পারি দু'টি জিনিস ঘষলেই সামান্য তড়িতের সৃষ্টি হয়। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে এ রকমটি হবে তার কোন মানে নেই।

একটা কাচের দণ্ড নিয়ে তার এক মাথা এক টুকরো রেশমী কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচের ভিতরে তড়িৎ উৎপন্ন হয়। আবার রেশমী কাপড়ের টুকরোটি পরীক্ষা করলে তার মধ্যেও তড়িৎ এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা জানি, পরমাণুর ভিতরে রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন আর নিউট্রন। কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে থাকে প্রোটন আর নিউট্রন, আর বাইরে ঘুরছে ইলেকট্রন কণিকা। প্রোটন হচ্ছে পজিটিভ অর্থাৎ ধনবিদ্যুৎ-কণিকা, ইলেকট্রন নেগেটিভ অর্থাৎ ঋণবিদ্যুৎ-কণিকা এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ-হীন কণিকা। ঘষবার সময়ে কাচের ভিতর থেকে কিছু ইলেকট্রন বেরিয়ে রেশমের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফলে কাচের মধ্যে কিছু ইলেকট্রন অর্থাৎ ঋণবিদ্যুৎ-কণিকার ঘাটতি পড়ে। কাচ তখন ধনবিদ্যুৎপূর্ণ হয়ে যায়। কারণ সাধারণ অবস্থায় যে কোন জিনিসের মধ্যে ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা থাকে সমান সমান। রেশমের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা

ঘটে অন্য রকম। কাচের ভিতর থেকে ইলেকট্রনরা বেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছে রেশমের মধ্যে। ফলে রেশমের মধ্যে ইলেকট্রন বা ঋণবিদ্যুৎ-কণিকার সংখ্যা গেল বেড়ে ; রেশম তাই এ-ক্ষেত্রে হ'ল ঋণ-বিদ্যুৎপূর্ণ। তা হলে আমরা বলতে পারি, বিদ্যুৎ দু'জাতের—ধনবিদ্যুৎ (পজিটিভ) এবং ঋণবিদ্যুৎ (নেগেটিভ)।

তড়িৎপ্রবাহ

কোনও পদার্থে তড়িৎ সৃষ্টি করে যদি তা কোনও ধাতুর তারের ভিতর দিয়ে চালিয়ে দেওয়া যায় তা হলে আমরা পাব চলমান বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রিক কারেণ্ট। এ সম্বন্ধে ইটালীর বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্যালভানির সেই ব্যাঙের পরীক্ষা তো তোমাদের প্রায় সকলেরই জানা। সেই যে তামার দণ্ড থেকে সদ্য-ছাল-ছাড়ানো ব্যাঙ ঝুলিয়ে দেওয়া আর দস্তার দণ্ড দিয়ে তা স্পর্শ করে ব্যাঙের মাংসপেশী কুঁচকে যাওয়ার গল্প! তবে গ্যালভানির কাজের সত্যিকারের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পাভিয়া বিশ্ব-



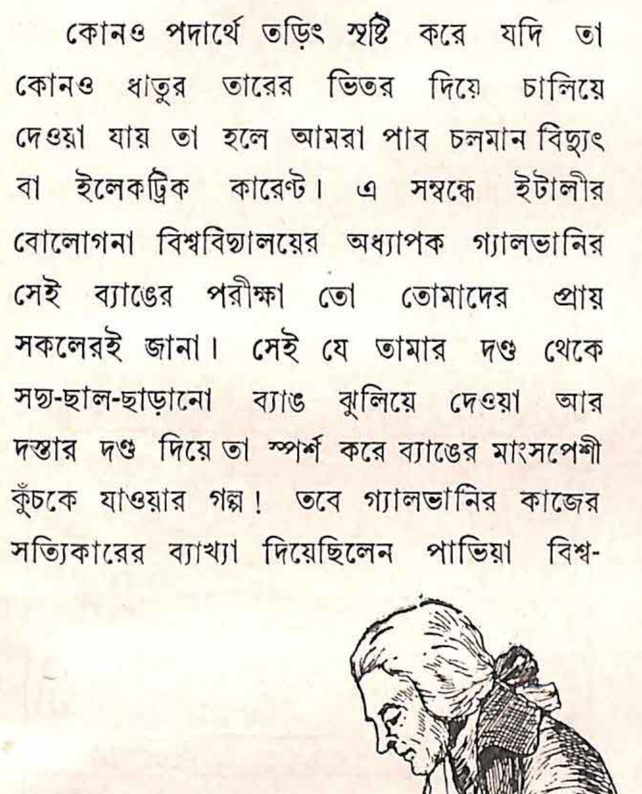
টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক মোর্স

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভোল্টা। এঁর নাম থেকেই প্রবাহ-বিদ্যুৎ অর্থাৎ কিনা কারেণ্ট ইলেকট্রিসিটির আর এক নাম ভোল্টায়িক ইলেকট্রিসিটি। তিনিই প্রথম তড়িৎ-কোষ বা ইলেকট্রিক ব্যাটারী বা সেলের কথা বলেছেন।

ভোল্টার আবিষ্কারের পর কারেণ্ট ইলেক্‌ট্রিসিটির ক্ষেত্রে নতুন যুগ শুরু হয়।

কোন তারের গা বেয়ে তড়িৎ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে কথাটির মানে হ'ল এই যে তারের গা বেয়ে ইলেকট্রনদের প্রবাহ চলছে অবিরত ধারায়।

আজকাল যে কত শত ব্যাপারে এই বিদ্যুৎকে কাজে লাগানো হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। বিজলী বাতি, বিজলী পাখা, ইস্ত্রি, টর্চ লাইট এ সব তো আমরা হরদমই ব্যবহার করে থাকি। ট্রাম চলছে বিদ্যুতের শক্তিতে, ইলেকট্রিক ট্রেন তো ক্রমেই



গ্যালভানি ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষা করছেন।



টেলিফোনের আবিষ্কারক গ্রেহাম বেল

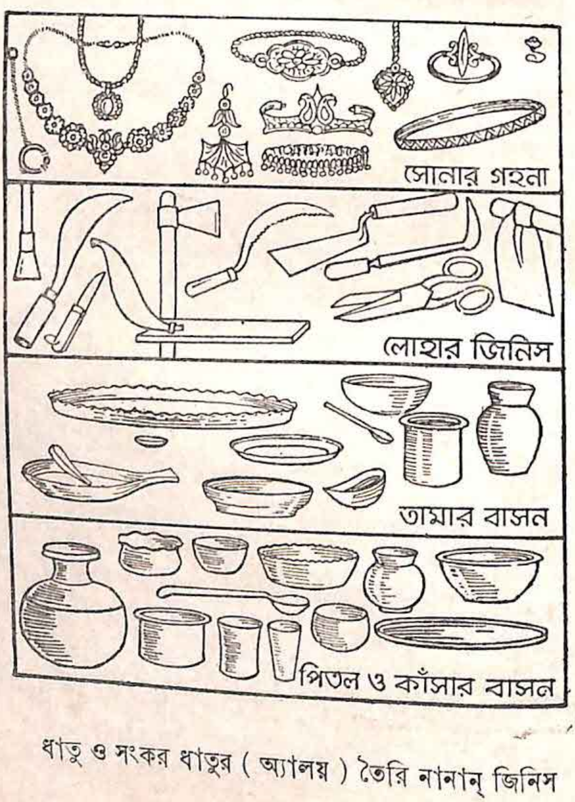
স্টীম এঞ্জিনে টানা ট্রেনকে হঠিয়ে দিচ্ছে। মোর্সের আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ, গ্রেহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন, মার্কনির বেতার বা রেডিও—এ সবই হয়েছে বিদ্যুতেরই কৃপায়। এ ছাড়া এক্স-রে প্রভৃতির কথাও বলা যেতে পারে। এক কথায় বলা চলে বিদ্যুৎ না হলে এ যুগের সভ্য জীবনযাত্রা একদম অচল হয়ে পড়বে।

নানা ধরনের পদার্থ

নানা ধরনের শক্তির কথা সংক্ষেপে বলা হ'ল। এবারে বলি পদার্থের কথা।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রধানত প্রকৃতিতে পাওয়া ৯২টি মৌলিক পদার্থ এবং তাদের অসংখ্য যৌগিক পদার্থ দিয়েই দুনিয়ার সব কিছু তৈরি। মৌলিক পদার্থ বা এলিমেণ্ট বলতে আমরা বুঝি এমন সব পদার্থ যা রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করলে আলাদা ধর্মবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যাবে না। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১০৩টি। দুই বা দুইএর বেশি মৌলিক পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক মিলনে তৈরি হয়েছে অসংখ্য যৌগিক পদার্থ বা কম্পাউণ্ড। এ সব কথা অবশ্য আগেই বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩)। মৌলিক পদার্থকে সংক্ষেপে মৌল ও যৌগিক পদার্থকে সংক্ষেপে যৌগও বলা হয়।

মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে কতকগুলি কঠিন। যেমন—লোহা, তামা, সোনা, রূপো প্রভৃতি; আবার কতকগুলি গ্যাস, যেমন হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি। পারা, ব্রোমিন—এগুলি হচ্ছে তরল মৌলিক পদার্থ। পৃথিবী তার জল ও বাতাস নিয়ে প্রধানত দশটি মৌলিক পদার্থ এবং তাদের



ধাতু ও সংকর ধাতুর (অ্যালয়) তৈরি নানান্ জিনিস

যৌগিক পদার্থ দিয়ে তৈরি। এগুলি হ'ল অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম। এ ছাড়া সামান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস। ক্ষেত্র-বিশেষে অন্য মৌলিক পদার্থও অল্পস্বল্প থাকে। যেমন—কার্বন, ফস্‌ফরাস্‌, ক্লোরিন ইত্যাদি।

কাজের সুবিধের জন্যে মৌলগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ধাতু ও অ-ধাতু। ধাতুর মধ্যে সোনা, রূপো, লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম এবং তাদের মিশ্রণ অর্থাৎ সংকর ধাতু বা অ্যালয় আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে ব্যবহার করছি। তা ছাড়া রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুগুলিও পারমাণবিক শক্তিসৃষ্টির কাজে খুবই প্রয়োজন।

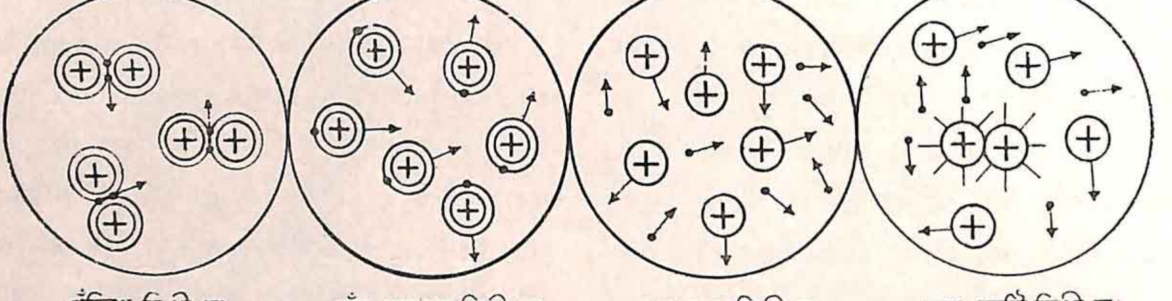
অধাতুগুলির মধ্যে কার্বন, সিলিকন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন প্রভৃতি পড়ে। মৌলিক পদার্থগুলি এবং তাদের অসংখ্য যৌগ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবেই একাত্ম হয়ে রয়েছে। আমাদের খাওয়া-পরা, বাসস্থান, রোগব্যাধির চিকিৎসা—সবেতেই রয়েছে এদের ব্যবহার। এইসব মৌল এবং অগণিত যৌগদের নিয়েই রসায়নবিদ্‌দের কারবার সে কথাও আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যৌগিক পদার্থগুলির মধ্যে আবার আর সবগুলির তুলনায় কার্বনের যৌগ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এত বেশি যে ওদের নিয়ে রসায়ন-বিজ্ঞানের একটা আলাদা শাখাই হয়ে গেছে—যাকে বলা হয় অর্গানিক কেমিস্ট্রি বা জৈব রসায়ন। কার্বন ছাড়া অন্যগুলো পড়ে ইন্‌অর্গানিক কেমিস্ট্রি বা অজৈব রসায়নের আওতায়।

পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

যে কোন পদার্থই কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় এর একটি অবস্থায় থাকতে পারে। তা ছাড়া পদার্থ যে অণু-পরমাণু দিয়ে গঠিত এবং পরমাণুর মধ্যে রয়েছে যে ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন নামে তিন জাতের মৌলিক কণিকা—সে কথাও এই বই-এর ২য় খণ্ডে (সাধারণ বিজ্ঞানের কথা বিভাগে) আলোচনা করা হয়েছে। এবারে আমরা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্বন্ধে বলব।

আমরা জানি কঠিন পদার্থ গরম করলে তা সাধারণত তরল চেহারায় পরিণত হয়; আবার তরল পদার্থ গরম করলে তা পরিণত হয় গ্যাসীয় পদার্থে। কিন্তু কোন গ্যাসীয় পদার্থকে গরম করলে কি ব্যাপার ঘটবে? বিজ্ঞানীরা বলেন, সে অবস্থায় পদার্থ পরিণত হবে প্লাজ্‌মায় অর্থাৎ প্লাজ্‌মাই হ'ল পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। কিন্তু প্লাজ্‌মা বলতে কি বোঝায়?

পরমাণুর মধ্যে তো রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন নামে তিন জাতের মৌলিক কণিকা। প্রোটন আর নিউট্রনরা থাকে পরমাণুর কেন্দ্রীন বা নিউক্লিয়াসে, আর কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘোরে ইলেকট্রনরা। প্রোটন ধনবিদ্যুৎ-সম্পন্ন, ইলেকট্রন ঋণবিদ্যুৎযুক্ত এবং নিউট্রনে কোনও বিদ্যুৎ নেই। এখন, উত্তাপের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে যদি পরমাণু থেকে একটি বা তার বেশি ইলেকট্রন বের করে দেওয়া যায় তবে পরমাণুটি হবে ধনাত্মক-তড়িৎযুক্ত, অর্থাৎ এটির নাম হবে ধনাত্মক আয়ন। প্লাজ্‌মা হ'ল ধনাত্মক আয়ন এবং সমান সংখ্যক স্বাধীন ইলেকট্রনের একত্র সমাবেশ। প্লাজ্‌মার ভিতরে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক তড়িতের পরিমাণ সমান



পঁচিশ ডিগ্রী সেঃ পাঁচ হাজার ডিগ্রী সেঃ এক লক্ষ ডিগ্রী সেঃ দশ কোটি ডিগ্রী সেঃ

২৫° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে পদার্থ রয়েছে অণুর আকারে। ৫০০০° ডিগ্রা তাপে অণু ভেঙ্গে পরমাণু অবস্থায় চলে এল। আরও উত্তাপ বাড়ালে (১ লক্ষ সেন্টিগ্রেড তাপে) তা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হবে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্‌মায়। প্লাজ্‌মাকেও যদি আরও প্রচণ্ড তাপে (১০ কোটি ডিগ্রী সেঃ) উত্তপ্ত করা যায় তা হলেই হবে পরমাণু সংযোজন বা ফিউশন।

বলে প্লাজ্‌মায় কোন তড়িতের প্রকাশ নেই। উদাহরণ হিসেবে ভারী হাইড্রোজেনের (যাকে বলা হয় ডয়টেরিয়াম্) কথা বলা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর অণুগুলো ৫০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপে পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আরও তাপ বাড়লে ওর পরমাণুর কেন্দ্রীনও আর ইলেকট্রনগুলোকে ধরে রাখতে পারে না—সেগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন দু'টোই প্রচণ্ড বেগে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে থাকে। একেই বলা হয় প্লাজ্‌মা বা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা। তাপ আরও প্রচণ্ড ভাবে বাড়াতে পারলে ২টি ধনাত্মক কেন্দ্রীনও আবার যুড়ে যেতে পারে,—যা নাকি ঘটছে সূর্যে ও অন্যান্য নক্ষত্রে।

প্লাজ্‌মার তড়িৎ এবং তাপ পরিবহনের ক্ষমতা খুবই বেশি। চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে প্লাজ্‌মায় প্রভাব বিস্তার করা যায়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় কোন অবস্থায়ই পদার্থের মধ্যে তড়িতের কোন প্রভাব থাকে না।

প্লাজ্‌মা কথাটি প্রথম চালু করেন আর্ভিং ল্যাংমুয়ার ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। ইলেকট্রনদের গতি-বিধির ব্যাপারে কঠিন এবং তরল অবস্থার মাঝামাঝি জেলির মত একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্লাজ্‌মার ভিতরে। এজন্যেই এর নামকরণ হয়েছে প্লাজ্‌মা।

প্লাজ্‌মারও আবার প্রকার-ভেদ আছে। পদার্থের চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্লাজ্‌মার মধ্যে তার সবটাই হ'ল স্বাধীন ইলেকট্রন এবং সমান সংখ্যক ধনাত্মক আয়ন। যে-কোন প্লাজ্‌মার তাপমাত্রা কুড়ি হাজার ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেডের ওপরে উঠলে বিশুদ্ধ প্লাজ্‌মা পাওয়া যায়। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে তার অণু-পরমাণুর সঙ্গে সঙ্গে যদি ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক আয়ন থাকে তবে তাকেও প্লাজ্‌মা বলা হয়, তবে তা বিশুদ্ধ প্লাজ্‌মা নয়। পদার্থ যখন কঠিন ও তরল অবস্থায় থাকে তখন তার মধ্যেও প্লাজ্‌মা থাকতে পারে।

নিওন বাতি ও ফ্লুওরেসেন্ট বা প্রতিপ্রভ বাতিগুলোর ভিতরে পদার্থ থাকে প্লাজ্‌মা

অবস্থায়। সত্যি কথা বলতে গেলে, এ সব বাতির আলোর উৎসস্থল হ'ল এই প্লাজ্‌মা। খুব উঁচু আকাশে বায়ুমণ্ডলের একটি স্তর আছে যার নাম আয়নমণ্ডল বা আয়নোস্ফিয়ার। আয়নমণ্ডলে যে সামান্য পরিমাণ পদার্থ রয়েছে তা রয়েছে প্লাজ্‌মা অবস্থায়। এ ছাড়া প্লাজ্‌মা রয়েছে সূর্যের মধ্যে, তারার মধ্যে, হয়তো কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহেও। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত বস্তু রয়েছে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন তার শতকরা ৯৫ ভাগই সম্ভবত রয়েছে প্লাজ্‌মা অবস্থায়।

পদার্থের প্লাজ্‌মা অবস্থাকে আজকাল নানা কাজে লাগানো হচ্ছে। এর সাহায্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা দু'ধরনের অতি শক্তিশালী এঞ্জিন তৈরির কথা ভাবছেন। প্লাজ্‌মা দিয়ে তৈরি প্লাজ্‌মা-রকেটের সাহায্যে মহাকাশ-জাহাজ চালানোও সহজ হবে। নানা রকমের কঠিন রোগের চিকিৎসায়, গাছপালার হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে নানা তথ্য জানবার কাজে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে এবং আরও নানা কাজে প্লাজ্‌মা ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অ্যাটম্‌ ভাঙ্গার কাজ

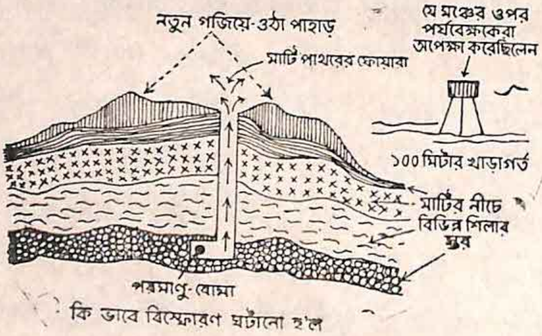
সাধারণ বিজ্ঞানের কথা শেষ করবার আগে অ্যাটম্‌ বা পরমাণুর কথায় আর একটিবার ফিরে আসা যাক। পরমাণুর গঠন কেমন সে কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৮)।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের বাইরে যে-সব ইলেকট্রন অনবরত ঘুরতে থাকে তাদের সহজেই পরমাণুর আওতা থেকে বার করে দেওয়া যায়। কিন্তু নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীন ভারি শক্ত, একে সহজে ভাঙ্গা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন এমন অস্ত্র যা দিয়ে কেন্দ্রীনও ভাঙ্গা সম্ভব হ'ল। এ কাজ করতে গিয়ে উপরি পাওয়া গেল শক্তি, যার পরিমাণ হ'ল অসীম। ধ্বংসের কাজে লাগালে এ শক্তি যেমন চরম সর্বনাশ করতে পারে, তেমনি আবার শান্তির কাজেও এ শক্তির ক্ষমতা বিপুল।

প্রকৃতিতে বিশেষ ধরনের কয়েকটি ভারী মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি এমনি ধরনের মৌলিক পদার্থ। রেডিয়াম আবিষ্কার করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মাদাম কুরী। এখন, এই সব ভারী মৌলিক পদার্থ থেকে আপনা আপনি তিন রকমের অদৃশ্য রশ্মি বেরিয়ে আসে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি এবং গামা-রশ্মি। আসলে কিন্তু আল্‌ফা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি ঠিক রশ্মি নয়—অতি ক্ষুদ্র কণিকা। গামা-রশ্মি অবশ্য সত্যিকারই রশ্মি, অর্থাৎ খুব ছোট মাপের আলোকতরঙ্গ। এই জাতের মৌলগুলির নাম দেওয়া হয়েছে রেডিওঅ্যাক্টিভ এলিমেণ্ট বা তেজস্ক্রিয় মৌল।

পরীক্ষায় দেখা গেল, নিউট্রন কণিকাকে যদি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম কেন্দ্রীনে ঠিকভাবে আঘাত হানা যায় তবে তা ভেঙ্গে গিয়ে ভাগ হয়ে যেতে পারে এবং উপরি পাওয়া যায় বিপুল শক্তি। অ্যাটম্‌ বোমা তৈরির মূল কথা এখানেই। পরমাণুর কেন্দ্রীন ভেঙ্গেই তার শক্তি—এ শক্তি পাওয়া যায় খানিকটা বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ফিশন্‌ বা পরমাণু বিভাজন।

শুধু ভারী পরমাণু ভাঙ্গাই নয়, একাধিক হাল্কা পরমাণু যুড়েও এই রকম প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যেতে পারে এবং সে শক্তি আরও বেশি—আরও তীব্র হয়। সূর্যে, দূর মহাকাশের নক্ষত্রদের মধ্যে এ ব্যাপার প্রতিনিয়তই ঘটছে। বিজ্ঞানীরা এ প্রক্রিয়াটিও কৃত্রিম ভাবে ঘটাবার কৌশল আয়ত্ত করেছেন। হাইড্রোজেন বোমায় এই কৌশলই খাটাবার ব্যবস্থা হয়েছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ফিউশন বা পরমাণু সংযোজন।



রাজস্থানের মরু অঞ্চলে ১৯৭৪ সালের ঐতিহাসিক পরমাণু বিস্ফোরণ

ফিশন প্রক্রিয়াটিকে পরমাণু-চুল্লীর সাহায্যে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করে সে শক্তিকে মানুষের হিতকর কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। ফিউশন প্রক্রিয়াটিকেও ঐ ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। যদি সম্ভব হয় তা হলে শক্তির জন্য মানুষকে আর কখনও মাথা ঘামাতে হবে না।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করবার মত। পারমাণবিক বোমা বানাবার কৌশল অর্থাৎ পরমাণুর ভিতরকার প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগাবার কৌশল এ পর্যন্ত পৃথিবীর সামান্য কয়েকটি দেশই রপ্ত করতে পেরেছে। ১৯৭৪ সালে ভারতও এই দলের মধ্যে এসে গেছে, তবে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আকাশে এই বোমা না ফাটিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন রাজস্থানের মরু অঞ্চলে, ১০০ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৩৫০ ফুট মাটির নীচে। কি ভাবে এ কাজ হাসিল করা হয়েছিল তার একটা ছবি পাশে দেওয়া হ'ল। মাটির নীচে প্রায় সাড়ে তিনশ' ফুট খাড়া গর্ত, গর্তের নীচের দিক্‌টা ইংরেজী L অক্ষরের মত একটু বাঁকানো। সেইখানে রাখা হয়েছিল বিস্ফোরক পরমাণু বোমা। গর্তের নীচের দিক্‌টা বালির বস্তা দিয়ে বন্ধ করে ওপরের দিক্‌টা মাটি আর বালি দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বসে ছিলেন চার কিলো-মিটার দূরে একটা উঁচু মঞ্চে। যথাসময়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হ'ল, মনে হ'ল কতকগুলি মাটি-পাথর যেন ফোয়ারার মত ওপরে উঠে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল প্রচণ্ড ভূমিকম্প। তার পরে দেখা গেল গর্তের পাশে গজিয়ে উঠেছে একটা ছোটখাট পাহাড়। বিস্ফোরণের ফলে তলাকার মাটি-পাথর ঠেলে উঠেই এই পাহাড়ের সৃষ্টি। বিজ্ঞানীরা দেখলেন পরীক্ষা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

আমাদের সামনে আজ দু'টি প্রশ্ন। ধ্বংসের কাজে বিজ্ঞান ব্যবহার করব, না মানুষের সুখ-সুবিধা বাড়ানো তথা শান্তির কাজে লাগানো হবে বিজ্ঞানকে? বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য ধ্বংস নয়, শান্তিপ্রতিষ্ঠা। একদল স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়ে বিজ্ঞান কখনও কখনও ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে, কিন্তু সে তো বিজ্ঞানের দোষ নয়! পৃথিবীকে সুন্দর করে, মানুষকে অভাব-অনটন থেকে মুক্ত করে অমৃতের সন্ধান দিতে পারলে তবেই সার্থক হবে মানুষের বিজ্ঞান-সাধনা।



ভাষা ও লিপির কথা

ছাপার বিভিন্ন পদ্ধতি

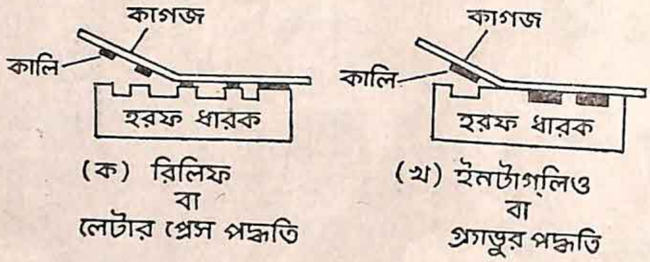
হাতে লেখা পুঁথিপত্তরকে সরিয়ে দিয়ে কি করে পৃথিবীতে ছাপার আবিষ্কার হ'ল সে কাহিনী আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি। বলেছি গুটেনবার্গের অসাধারণ আবিষ্কারের কথা, তার পর কি করে সেই ছাপাখানা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ল তার কথা। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৪২-১১৪৭) আমাদের দেশে,—ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলায় ছাপাখানার আবির্ভাবের কাহিনীও বলা হয়েছে সেই সঙ্গে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১১৪৭-১১৫১)। এ কথা বোধ হয় না বললেও চলে যে আজকের দিনে এই ছাপা—ভালো কথায় যাকে বলা হয় 'মুদ্রণশিল্প'—তার ভূমিকা অসাধারণ; তা সে যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারেই হোক বা বার্তাবিনিময়ের ব্যাপারেই হোক বা লোককে শিক্ষা ও আনন্দ দেবার কাজেই হোক।

এবার আমরা মুদ্রণশিল্পে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির কারিগরীর দিক্‌টা নিয়ে একটু আলোচনা করব এবং বিশেষ জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সাধারণ ভাবেই তার একটু আভাস দেব।

ছাপার কাজে প্রথমেই প্রয়োজন—যে লেখা বা নক্‌সাটি ছাপতে হবে তার "আয়নায় ফেলা" বিপরীত চেহারাটা প্রস্তুত করা। সেই চেহারাটিকে কাঠে, ধাতুতে অথবা কোন অধাতব কঠিন পদার্থের ওপর খোদাই করে অথবা নতুন বস্তুর সংযোজনে সৃষ্টি করা যায়। এর পরের কাজ হচ্ছে উপযুক্ত রঙ বা কালির প্রলেপ এই বিপরীত নক্‌সার ওপর বুলিয়ে দিয়ে কাগজ, কাপড় বা নির্দিষ্ট বস্তুর ওপর তার ছাপ গ্রহণ করা। এই সাধারণ পদ্ধতির ভিত্তিতে একই লেখা ও রেখার অসংখ্য অনুকৃতি পাওয়া যেতে পারে।

মুদ্রণতল বা 'প্লেট' থেকে কাগজ বা যার ওপর ছাপা হবে সেখানে কালি লাগানোর কাজটা সাধারণতঃ তিনটি মুখ্য উপায়ে হয়ে থাকে।

এক: মুদ্রণতলের উঁচু-করা পিঠের ওপর আঠালো অবস্থায় কালির প্রলেপ দিয়ে গ্রাহক কাগজ বা কাপড়ে তাকে চেপে ধরলে তার একটা হুবহু অনুলিপি সহজেই লাভ করা যায়।

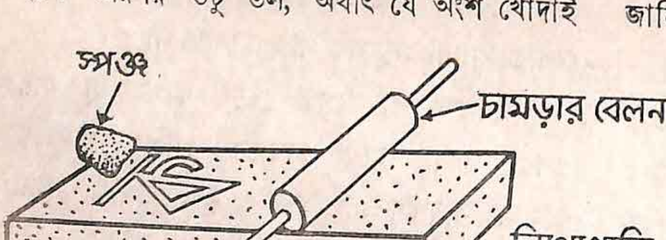


দু'রকম ছাপার পদ্ধতি

বাঁয়ে—লেটার প্রেস পদ্ধতি, ডাইনে—ইন্ট্যাগ্লিও বা গ্র্যাভুর পদ্ধতি

একে বলা হয় 'লেটার প্রেস' পদ্ধতি। এই লেটার প্রেস মুদ্রণ-প্রথাই সবচাইতে পুরোনো এবং সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বেশির ভাগ ছাপাখানাতেই আজও এই পদ্ধতিতেই ছাপা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণীয় অংশ অর্থাৎ টাইপ বা ব্লক অমুদ্রণীয় অংশের থেকে বেশ একটু উঁচু থাকে। সেজন্য এর আর একটা নাম রিলিফ (অর্থাৎ উঁচুনীচু) পদ্ধতি।

দুই: ইন্ট্যাগলিও বা গ্র্যাভুর পদ্ধতি—যাতে রাসায়নিক উপায়ে রেখা বা লেখা খোদাই করে ছাপার কাজ করা হয়। অপেক্ষাকৃত তরল কালি প্রথমে ধারক অংশের (যাকে বলা হয় ফর্মা) মুদ্রণতলে সাধারণ ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর উঁচু তল, অর্থাৎ যে অংশ খোদাই



লিথোগ্রাফি ছাপার প্রণালী

না হওয়ায় উঁচু হয়ে আছে, তা থেকে কালি মুছে ফেলে কাগজ বা কাপড়ে তা চেপে ধরা হয়। এ ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে, কালি, —যা কেবলমাত্র নীচু তলে অবস্থান করছিল, তা চাপের ফলে শুষে নেয় নরম কাগজ, আর এই ভাবে নক্‌সার অনুলিপিও কাগজের গায়ে চলে আসে।

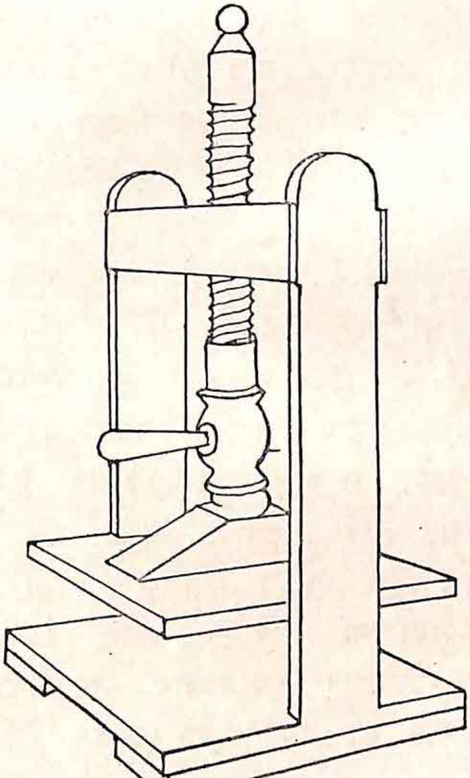
তিন নম্বর হচ্ছে: লিথোগ্রাফি মুদ্রণ। এতে মুদ্রণতলটা সমতলই থাকে, তবে তার কিছু অংশ রাসায়নিক পদ্ধতিতে 'তৈরি' করা হয়। প্রয়োজন মত রঙকে গ্রহণ বা বর্জন করা এই অংশের ধর্ম। অবশ্য এর উদ্ভাবন হয়েছে অনেক পরে।

ছাপার হরফ, কালি আর কাগজ

রিলিফ পদ্ধতিতে ছাপা আবিষ্কার হওয়ার পর এর সঠিক প্রচলনের জন্য দরকার হ'ল উপযুক্ত হরফ তৈরি করা, উপযুক্ত কালি তৈরি করা আর তা ছাপবার উপযোগী কাগজ তৈরি করা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হ'ল নক্‌সা বা লেখা উপযুক্ত ভাবে কাগজের গায়ে মুদ্রিত করার কুশলতা। প্রাচীন রোমান সভ্যতার আমলেও স্থূলভাবে এই পদ্ধতির যে চলন ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মার্কোপোলো তাঁর সফর-বৃত্তান্তে জানিয়েছেন যে ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে কুবলাই খানের রাজত্বকালে একটি বিশেষ নামাঙ্কিত নক্‌সা সিঁদুরে ডুবিয়ে কাগজের ওপর ছাপা হ'ত এবং তা কাগজের মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত।

ভুষোকালির সঙ্গে আঠা মিশিয়ে প্রথম দিকে কালি তৈরি হ'ত। পরবর্তীকালে কাঠকয়লার গুঁড়ো ও তিসির তেল দিয়ে উন্নততর কালি তৈরি হয়। এখন ছাপার প্রায় সমস্ত কালো কালিই তৈরি করা হয় কার্বন

ব্ল্যাক্-এর সঙ্গে তিসির তেল ও আরো সামান্য কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে। আর সে কালিই কি এক রকমের? বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের কালি তৈরি করা হচ্ছে। খবরের কাগজে ছাপার সস্তা কালি (যাকে বলা হয় নিউজ ইঙ্ক), বই



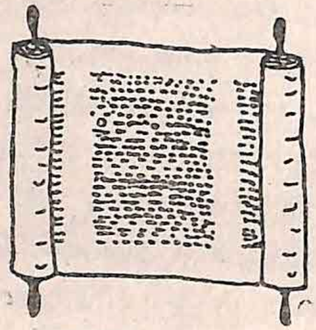
গুটেনবার্গের সময়কার ছাপার যন্ত্র

ছাপার কালি, পোস্টার বা প্ল্যাকার্ড ছাপার কালি, ছবি ছাপার কালি, চক্‌চকে ছাপার কালি, খুব তাড়াতাড়ি ছাপা যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এমন কালি, কাপড়ের ওপর ছাপার কালি—কত নাম করব? রঙিন ছবি ছাপার কালি, তিন-রঙা মলাট ছাপার কালি। সে রঙও কি একটা? লাল, নীল, বেগুনী, হলদে, সবুজ, কমলা, ছাই রং, সোনালি, রূপালি—গাঢ়, ফিকে—নানা রকম 'শেড্'-এর কালি! এক কথায় শত শত রকমের কালি। কখনও ছোট-বড় টিউবে ভরে, কখনও ছোট-বড় টিনে ভরে, কখনও পিপে ভর্তি করে সে কালি কারখানা থেকে ছাপাখানায় পাঠানো হয়। বড় বড় খবরের কাগজ,—যা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা হয়,—তার জন্য গাড়ীভর্তি কালি এনে পাম্প করে লোহার ট্যাঙ্কে ভরে দেওয়া হয়। প্রতি দিন টন টন কালি চাই যে!

গুটেনবার্গের সময় স্ক্রু-প্রেসকে কিছু অদল-বদল করে যে ছাপার যন্ত্র তৈরি হয়েছিল তাতে দিন ৩০০ পাতা ছাপতে পারলে তা একটা বড় কৃতিত্ব বলে সে দিন গণ্য করা হ'ত। অসুবিধা ছিল কাগজ নিয়েও। ছাপবার জন্য যে ধরনের কাগজ তখন পাওয়া যেত তা ছিল খুব শক্ত। ফলে যে পরিমাণ চাপ মুদ্রণযন্ত্রে পাওয়া সম্ভব তা দিয়ে মুদ্রণের অনুলিপি ফুটিয়ে তোলা বেশ কঠিন কাজ ছিল। তাই ছাপা শুরু করতে হ'ত ভেজা কাগজে। পরে আবার তা শুকিয়ে নিতে হ'ত। বুঝতেই পারছ, এ সব পদ্ধতিতে সময় আর পরিশ্রম দুই-ই অনেক বেশি লাগছিল। এত সব করেও কিন্তু পরিচ্ছন্ন ছাপা হচ্ছিল না। ভেজা কাগজ বিভিন্ন জায়গায় সমান পুরু নয়। তাই ছাপা কোথাও গভীর, কোথাও বা হাল্কা হ'ত। আর সে কাগজ দু'পিঠে ছাপা হলে প্রায় কিছুই পড়া যেত না। কাগজের উন্নতিসাধন তাই হয়ে পড়ল অপরিহার্য।

আগে কাগজ তৈরি হ'ত পাৎলা চামড়া দিয়ে—যাকে বলা হ'ত পার্চমেণ্ট পেপার কিন্তু এখনকার সমস্ত কাগজই প্রায় তৈরি হয়

সেলুলোজ দিয়ে। সেলুলোজ হচ্ছে কার্বো-হাইড্রেট জাতের একটি পদার্থ, যা পাওয়া যায় গাছের আঁশ থেকে। কাঠের কুচি, বাঁশ, বিশেষ বিশেষ ধরনের ঘাস—এই সব থেকে বৈজ্ঞানিক



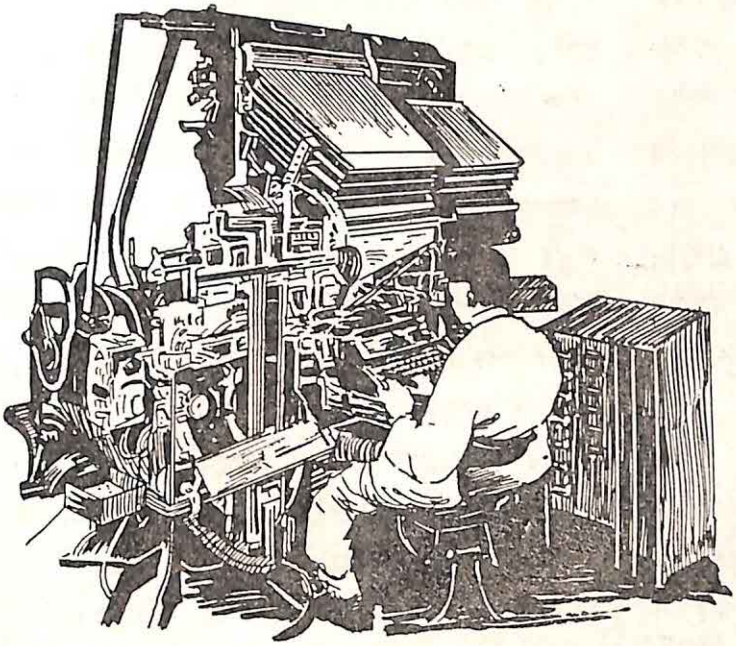
প্রথম যুগের ছাপা কাগজ
কাগজের মাঝখানে ছাপা, দু'পাশে কাগজ গোটানো থাকত।

উপায়ে সেলুলোজের আঁশ বার করে নিয়ে তার পর তাকে দলাইমলাই করে মণ্ডে পরিণত করা হয়, ময়লা রং তাড়িয়ে দেওয়া হয় ব্লিচিং পাউডার (যার মধ্যে রয়েছে ক্লোরিন) জাতীয় মশলা মিশিয়ে। এ ছাড়াও নানা রাসায়নিক মশলা মেশানো হয় কাগজ যাতে লিখল চুপসে না যায়, ভালো কালি টানতে পারে—এ সবের জন্য। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে কাগজ 'সাইজ্' করা। রঙিন কাগজের জন্য দরকার নানা রকমের রং যা সহজে ফ্যাকাসে হয়ে যায় না। সমস্ত কাঁচা মাল ও মশলা মিশিয়ে জল দিয়ে দুধের মত ঘোলা করে নিয়ে কাগজ-কলের বিরাট বিরাট চলন্ত ঢালু পাটাতনের ওপর দিয়ে তা ছেড়ে দেওয়া হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও বা উপযুক্ত তাপ দিয়ে, কোথাও রোলারে পিষে এবং আরও নানান্ খুঁটিনাটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে তা কলের অপর প্রান্তে কাগজের থান হয়ে বেরিয়ে আসে। সে একটা দেখবার জিনিস। এবার পছন্দসই মাপে কেটে নিলেই হ'ল। তাও হয় ঐ কলেই। খবরের কাগজ ছাপবার কাগজ আর কাটা হয় না—লম্বা লম্বা থান ভাবেই রাখা হয় রোল্ করে। এক-একটা থান মাইল খানেক লম্বা হওয়াও বিচিত্র নয়।

কালি গেল, কাগজ গেল, এবার হরফ বা অক্ষর। ইংরেজিতে বলে টাইপ্। প্রথম যুগে কাঠের হরফ দিয়ে কাজ শুরু হ'লেও এখনকার সব হরফ বা টাইপই তৈরি হয় ধাতু দিয়ে। একটা ধাতু নয়, কয়েকটি ধাতু মিশিয়ে তাই দিয়ে এই টাইপ বানানো হয়। এর মধ্যে থাকে সীসে, টিন আর অ্যান্টিমনি। সীসেই বেশি, সাধারণতঃ শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ, টিন শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ আর অ্যান্টিমনি শতকরা ১৫ থেকে ৩০ ভাগ। তা ছাড়া কত রকমারি টাইপই না তৈরি হচ্ছে! হাল্কা, গাঢ়, অতি গাঢ়, টেরচা (যাকে বলা হয় ইটালিক), চওড়া, সরু, ভিতর-ফাঁকা বা ইন্‌লাইন, ছোট, বড়—কত রকমের টাইপ! এক-একটার নামও দেওয়া হয়েছে এক এক রকম। ক্ষুদে বর্জাইস, ব্রিভিয়ার থেকে শুরু করে স্মল পাইকা, পাইকা, গ্রেট, ডবল গ্রেট ইত্যাদি। আজকাল অবশ্য পয়েন্ট দিয়ে নামকরণের রীতিই বেশি প্রচলিত। যেমন পাইকা হ'ল প্রায় ১২ পয়েন্ট, স্মল পাইকা হ'ল প্রায় ১১ পয়েন্ট ইত্যাদি। এই যে লেখাটি পড়ছ এটিও ছাপা হয়েছে পাইকা টাইপে।

লাইনোটাইপ আর মোনোটাইপ

আগেকার দিনে বেশির ভাগ ছাপাখানাতেই হাতে একটি একটি করে অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে



লাইনোটাইপে কম্পোজ করা হচ্ছে ।

যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে একটি লাইন তৈরি হয়ে গেলে চাবি টিপলেই গলন্ত ধাতু এসে ছাঁচে প'ড়ে একটি পুরো লাইন ঢালাই করে দেয়। এবার ছাঁচের ধাতু যথাস্থানে ফেরৎ পাঠিয়ে কম্পোজ-করা লাইনটিকে ব্যবহার-উপযোগী করে যথাস্থানে নিয়ে আসা হয়।

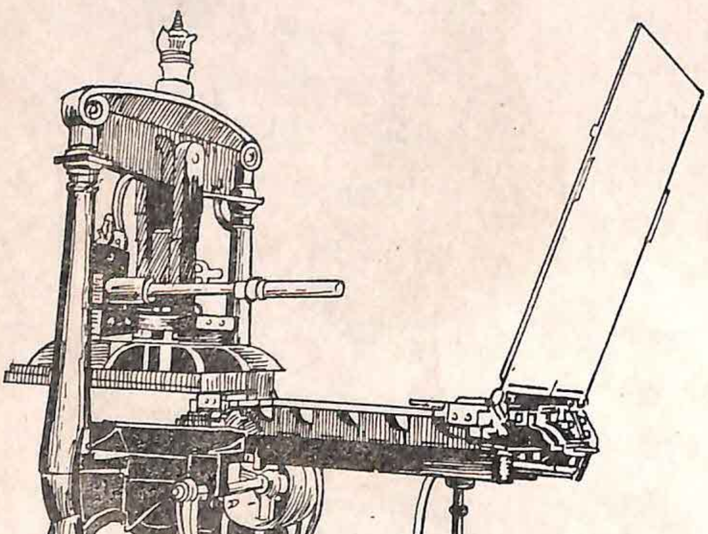
মোনোটাইপের বেলায় পুরো লাইন না হয়ে একটি একটি আলাদা অক্ষর ঢালাই হয়। 'মোনো' কথাটার মানেও 'এক'। তবে লাইনো আর মোনোয় একটু তফাৎও আছে। মোনো-টাইপের

এক একটি ছাপার লাইন সাজানো হ'ত। ছাপাখানার ভাষায় এর নাম কম্পোজ করা, আর যারা এ কাজ করে তাদের বলা হয় কম্পোজিটর। এখনও সাধারণ ছোটখাট ছাপাখানায় এই পদ্ধতিই চালু আছে। কিন্তু খুব ভালো করে এবং খুব তাড়াতাড়ি ছাপতে হ'লে এখন আর ও-ভাবে করা হয় না। টাইপ রাইটারে যে ভাবে দ্রুতবেগে কাগজ টাইপ করা হয় তেমনি দ্রুতগতিতে কম্পোজিটররাও কম্পোজ করে যায়। তার জন্য তৈরি হয়েছে লাইনোটাইপ আর মোনোটাইপ মেশিন। লাইনোটাইপে এক একটা লাইন এক একবারে সাজানো হয়ে যায়। এতে থাকে অনেকটা টাইপ রাইটারের মতই একটা করে কী-বোর্ড। পাশে থাকে গলন্ত ধাতুর মিশ্রণ। কী-বোর্ডে কোনও অক্ষর টিপলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অক্ষরের একটি ছাঁচ তৈরি হয়ে



মোনোটাইপে প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা ভাবে ঢালাই হয়ে যায়।

বেলায় পাশাপাশি দু'টি যন্ত্র থাকে। একটির মধ্যে থাকে কী-বোর্ড, অপরটি হচ্ছে টাইপ ঢালাই করার যন্ত্র। কী-বোর্ডে কোন অক্ষর টিপলেই তা একটা চলন্ত কাগজের ফিতের ওপর সেই অক্ষর অনুযায়ী একটা গর্ত করে দেয়। এই ফিতেটাই সরে এসে ঢালাই-যন্ত্রে ঢুকলে ছাঁচের ভিতর ঐ অক্ষরটি ঢালাই হয়ে তার পর বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ লাইনো টাইপে যেমন পুরো লাইনটা একবারে তৈরি হয়ে যায়, এখানে তা না হয়ে প্রতিটি অক্ষর আলাদা আলাদা ভাবে তৈরি হয়। এতে কম্পোজে কোন ভুল হলে লাইনোর মত সমস্ত লাইনটাই ভেঙ্গে ফেলতে হয় না, শুধু ঐ অক্ষরটা সংশোধন করে দিলেই হয়। দুই পদ্ধতিতেই ছাপা হয়ে যাবার পর আবার সেই টাইপের ধাতু তার নিজের জায়গায় ফিরে আসে এবং আবার গলন্ত অবস্থায় নতুন করে ব্যবহার করা চলে। ধাতু-মিশ্রণটিকে গলিয়ে রাখবার জন্য গ্যাস বা বৈদ্যুতিক হিটার ব্যবহার করা হয় এবং গলন্ত মিশ্রণের উষ্ণতা যাতে সব সময় এক রকম থাকে তারও ব্যবস্থা রাখা হয় থার্মোস্ট্যাট যন্ত্রের সাহায্যে। লাইনোটাইপ আর মোনো-টাইপে সুবিধে হচ্ছে—প্রথমত, সর্বদাই নতুন-ঢালাই-করা টাইপের দরুণ ছাপাটা হয় নিখুঁত; দ্বিতীয়ত, কাজটা হয় অতি অল্প সময়ে। দৈনিক খবরের কাগজের বেলায়, যেখানে অনেক-রাতে-আসা-খবরও সঙ্গে সঙ্গে কম্পোজ করে সকালের আগে ছেপে দিতে হবে,—সেখানে আজকাল এ ধরনের মেশিন ছাড়া কাজ করা অসম্ভব। তা ছাড়া মুদ্রণ-পারিপাট্যের জন্যেও এর কদর বড় কম নয়।



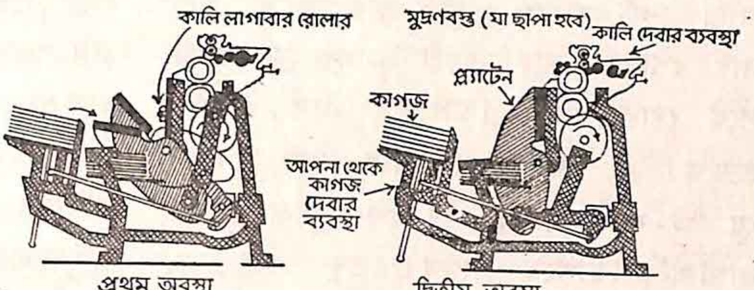
প্রথম যুগের হাতে চালানো ছাপার যন্ত্র। এখনও এর ব্যবহার একেবারে লোপ পায় নি।

প্ল্যাটেন মেশিন

এবারে আসা যাক মুদ্রণ-যন্ত্রের কথায়। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে মুদ্রণের ব্যাপক প্রচলন শুরু হলেও ওর কারিগরী পদ্ধতিতে ধীরে ধীরে যে উন্নতি হচ্ছিল তা ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। তার পরই আবার শুরু হ'ল বিরাট পরিবর্তন। প্রথমেই ধরা যাক প্ল্যাটেন প্রেসের কথা। এক সময়ে, পা দিয়ে চালানো হ'ত ব'লে, একে ট্রিডল মেশিনও বলা হ'ত। এখনও ছোটখাট প্রেসে এ জাতীয় মেশিন পা দিয়ে চালানো যে হয় না তা নয়, তবে বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেই এই মেশিন চলে।

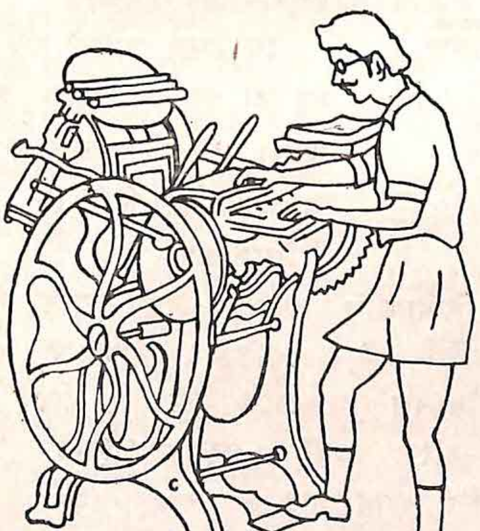
যে পদ্ধতিতে হাতে চালানো কাঠের যন্ত্রে মুদ্রণের কাজ চলত তারই ক্রমোন্নতির ফল হচ্ছে আধুনিক প্ল্যাটেন মেশিন। হাতের বদলে যান্ত্রিক উপায়ে অতি সহজে এ দিয়ে আজ ছাপার কাজ চালানো যায়। মেশিনম্যান্ যেমন হাত দিয়ে কাগজ বসিয়ে একই সঙ্গে পা দিয়ে এ মেশিন চালিয়ে ছেপে যেতে পারে তেমনি স্বয়ংক্রিয় কৌশলে এ দিয়ে দ্রুততর ছাপাও সম্ভব। এই পদ্ধতিতে কাগজকে প্ল্যাটেন বা চাপপ্রদানকারী তলের সংস্পর্শে আনা হয় সরাসরি যান্ত্রিক উপায়ে, তারপর কাগজ সহ প্ল্যাটেনকে যন্ত্রই চেপে ধরে মুদ্রণতলের ওপর। ছাপার ফর্মা (অর্থাৎ কম্পোজ করা সাজানো অক্ষর, যা ছাপা হবে) খাড়াভাবে রাখা থাকে। এর ওপর কালির প্রলেপ দেওয়া হয় যন্ত্রচালিত রোলার বা বেলনের সাহায্যে। যন্ত্রের পেছনে বা ওপরের দিকে থাকে কালির ভাণ্ডার। সেখান থেকে প্রথমে একটি ঘূর্ণায়মান রোলার কালি তুলে নেয়। তারপর একের পর এক অন্যান্য রোলারে সে কালি সঞ্চালিত হয় মুদ্রণতলের দিকে। শেষে কালি-বয়ে-আনা কয়েকটি রোলার একসঙ্গে এসে কালির প্রলেপ দিয়ে যায় ফর্মার হরফগুলোর ওপর, আর প্ল্যাটেন তখন কাগজকে তার ওপর চেপে ধরে।



প্রথম অবস্থা (কাগজ দেওয়া ও কালি লাগানো)

দ্বিতীয় অবস্থা (প্ল্যাটেনের চাপ দিয়ে ছাপা)

প্ল্যাটেন মেশিনে কি করে ছাপা হয়

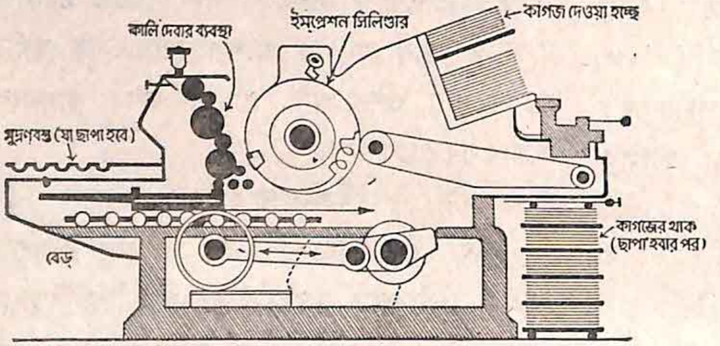


প্ল্যাটেন মেশিন

সিলিণ্ডার প্রেস

আর এক ধরনের যন্ত্র হ'ল সিলিণ্ডার প্রেস। এই যন্ত্রে মুদ্রণতল অর্থাৎ ফর্মাটি বিছানো থাকে শোয়া অবস্থায়। যে কাগজে ছাপা হবে তা সাজানো থাকে যন্ত্রের ডান পাশে ওপরের অংশে। এই কাগজগুলোকে এক এক করে পাঠানো হয় একটি বড় সিলিণ্ডারের গায়ে। ঘুরন্ত সিলিণ্ডার তাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসে কালি-মাখানো ফর্মার ওপর—যাকে আমরা বলছি মুদ্রণতল। সঙ্গে সঙ্গে চাপ, এবং মুহূর্তে ছাপার কাজ সারা। সিলিণ্ডার ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গে ছাপা কাগজ এসে পৌঁছোয় পেছনের দিকে নীচু স্তরে। ততক্ষণে

অপর একটি কাগজে ছাপার কাজ চলছে, আর তার পেছনে আর একটি কাগজ মুদ্রণতলের পথে রোলারে বা সিলিণ্ডারে এসে উপস্থিত হয়েছে। এ কথা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে এই যন্ত্র আগেকার সব যন্ত্রের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি ছাপতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, যন্ত্রের আকার বেশ বড় হওয়ায় এই যন্ত্রে এক-সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠা, ১৬ পৃষ্ঠা এমন কি ৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক একবারে ছেপে ফেলা যায়, যা প্ল্যাটেন যন্ত্রে কখনই সম্ভব নয়। বেশির ভাগ বই-ই তাই আজকাল ছাপা হয় এই রকম যন্ত্রে। তোমরা এখন যে বইটি পড়ছ—অর্থাৎ ছোটদের বিশ্বকোষ—সেটিও ছাপা হয়েছে এই রকম যন্ত্রে।



আধুনিক যুগের উন্নত ধরনের ছাপার যন্ত্র সিলিণ্ডার প্রেস

খবরের কাগজ ছাপার মেশিন

এর চাইতেও আরো অনেক দ্রুত ছাপার কাজ করা সম্ভব রোটারী যন্ত্রে। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গেই হাতের কাছে সকাল বেলার খবর-কাগজটি না পেলে মেজাজ বিগড়ে যায় অনেকেরই। কিন্তু ভেবে দেখেছ কি এই পত্রিকা কি ভাবে, কত অল্প সময়ের মধ্যে ছাপা হয়? গত দিনের শেষ খবরটি,—এমন কি গভীর রাত্রে বিশ্বের দূর প্রান্তের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিও তুমি পরের দিন সকালেই জানতে পারছ। এ কী করে সম্ভব?

এর পেছনে রয়েছে—শুধু ছাপাখানার নয়, পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কর্মীদের সদাজাগ্রত এক অভাবনীয় ভূমিকা। সম্পাদকের দপ্তর থেকে যে খবর ছাপতে হবে তা অনেক প্রয়োজনীয় পথ ধরে ছাপার মেশিনে যখন এসে হাজির হয় তখন রাত পোহাতে অল্পই বাকি থাকে। রোটারী যন্ত্র তার কারিগরী কৌশলে এক অসাধ্যসাধন করে দু'ঘণ্টা-আড়াইঘণ্টার মধ্যে লক্ষাধিক কাগজ ছেপে ফেলে। ছাপার কাজ শেষ করে যন্ত্র যখন বিশ্রাম নিচ্ছে ভোরের কাক হয়তো তখনও ডাকে নি। তোমার প্রিয় হকারটি তার ভাগের কাগজগুলি সাইকেলে চাপিয়ে রওনা হ'ল তোমার বাড়ির পথে। তোমার ঘুম ভাঙ্গবার আগেই তাকে পৌঁছে দিতে হবে তোমার প্রিয় কাগজটি।

কি ভাবে রোটারী যন্ত্রে ছাপা হয় তা জানবার আগে আমরা আরো দু'-একটি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে নিচ্ছি।

লিথোগ্রাফি

লিথোগ্রাফি পদ্ধতির উল্লেখ আগে একবার করেছি। এই পদ্ধতিতে মুদ্রণতলে রাখা মুদ্রণীয় বস্তু তল থেকে উঠে বা নেমে থাকে না—থাকে একই তলে। 'চট্‌চটে গ্রীজ্‌ জাতীয় পদার্থ আর জল কখনো মিশ খায় না' —এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেই লিথোগ্রাফি গড়ে উঠেছে। যে জিনিসটি ছাপা হবে অর্থাৎ

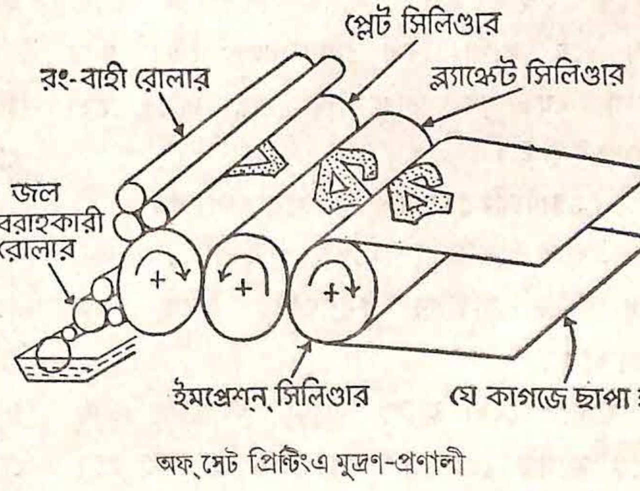
মুদ্রণবস্তু প্রথমে ঐ গ্রীজ্ জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈলাক্ত করে রাখা হয়, আর যে অংশ ছাপার জন্য নয় তা থাকে স্বাভাবিক। এবার গ্রীজ্ মাখানো লেখা বা আঁকার ওপর কালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জলীয় কালিকে গ্রীজ্ ধরে রাখতে পারে না, চাপ বা ঘর্ষণ সহযোগে কাগজের সংস্পর্শে এসে সে কালিকে কাগজে স্থানান্তরিত করে দেয়। জার্মেনীতে ১৭৯৮ সালে এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়।

যে বিষয়টি ছাপতে হবে তা গ্রীজের মাধ্যমে একটি অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত লাইমষ্টোনের ওপর প্রথমে লেখা বা আঁকা হয়। পাথরের ছিদ্রে এর কিছু অংশ ঢুকে যায় এবং সেই ছিদ্রগুলোই একে ধরে রাখে। তার্পিন তেল দিয়ে এবার অঙ্কিত অংশটি মুছে ফেলা হয়। শেষ পর্যায়ে পাথরে জল দিয়ে কালির প্রলেপ দেওয়া হয়। এইবার যে কাগজে ছাপা হবে সেটি জলে ভিজিয়ে নিয়ে পাথরের ওপর রেখে তার ওপর একটি শক্ত বোর্ড বসিয়ে দেওয়া হয়; তারপর কাঠের একটি দণ্ড বা চাকা দিয়ে ওপর থেকে চাপ দেওয়া হ'তে থাকে আর পাথরটিকে ধীরে ধীরে চাকার ওপর অনুভূমিক তলে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

(ছবি : পৃঃ ১৪৩২)

অফ্‌সেট প্রিন্টিং কাকে বলে

পাথর ব্যবহার না করে ধাতুর পাতের ওপরেও লিথোগ্রাফির পদ্ধতিতে মুদ্রণের কাজ করা সম্ভব। মুদ্রণযন্ত্রে একটি সিলিণ্ডারের গায়ে এই ধাতুর পাত বা প্লেট মুড়ে রাখা হয়। অর্ধ-বেলন আকৃতির বাঁকানো পাতে ঢালাই করে মুদ্রণীয় বস্তু তৈরি করা হয়। এর নাম 'ষ্টিরিও-টাইপিং'। প্রথমে ঈপ্সিত অংশ ধাতুতে টাইপিং বা এন্‌গেভিং করে তৈরি করা হয়, তার পর 'প্যাপিয়ার মেশ' নামে এক রকম ভারী কাগজের ওপর তাকে চেপে ধরে তার প্রতিচ্ছবি কাগজের তলে অসমান উচ্চতায় ফুটিয়ে তোলা হয়। এখানে কালি ব্যবহৃত হয় না। এর নাম 'ম্যাট্রিক্স'। একটি ধাতব মিশ্রণ (শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ সীসে, ১৫-২০ ভাগ অ্যান্টিমনি ও ৩-৫ ভাগ টিন) এই ভারী কাগজের বা ম্যাট্রিক্সের ওপর চেপে ধরা হয় একটি বিশেষ ঢালাই যন্ত্রের রোলারের সাহায্যে। একটি ম্যাট্রিক্স থেকে প্রায় ২০টি ঢালাই হ'তে পারে। ঢালাই করা ধাতব বস্তুটিকে প্লেট সিলিণ্ডারের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। রীল থেকে কাগজ ক্রমাগত এসে এর ওপর দিয়ে চলে যায় এবং কালি-সহযোগে এর সংস্পর্শে এলেই কাগজে ছাপা ফুটে ওঠে। তবে একটা কথা, ধাতব প্লেট থেকে সরাসরি কাগজে ছাপ ফেলা হয় না, মাঝে থাকে একটি রবারের রোলার বা ব্ল্যাঙ্কেট সিলিণ্ডার। সেটি কালি



অফ্‌সেট প্রিন্টিংএ মুদ্রণ-প্রণালী

বা রঙকে ধরে পাঠায় ইম্প্রেশন্ সিলিণ্ডারে মোড়া কাগজের ওপর। এইভাবে ছাপ পাঠাবার কারিগরী নাম 'অফ্‌সেট প্রিন্টিং'।

সমস্ত ব্যাপারটির প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে 'অফ্‌সেট্' যন্ত্র তিনটি ঘূর্ণ্যমান্ সিলিণ্ডারের সমষ্টি। এগুলো হ'ল যথাক্রমে প্লেট, ব্ল্যাঙ্কেট ও ইম্প্রেশন্ সিলিণ্ডার।

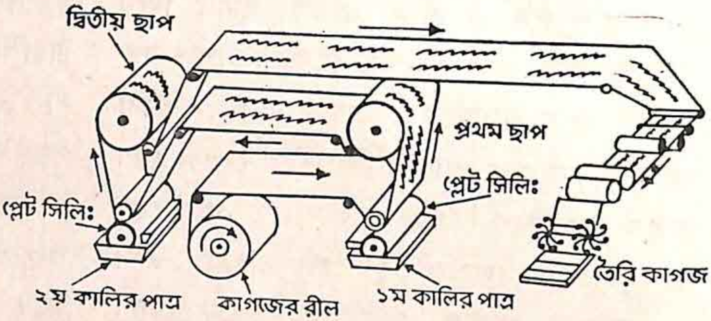
ছবিতে (পৃঃ ১৪৩৯) দেখ, প্লেট সিলিণ্ডারকে খানিক ভিজিয়ে রাখবার জন্য সীমিত পরিমাণে জল সরবরাহ করছে কতকগুলি রোলার। পরবর্তী পর্যায়ে জলে ভেজা সিলিণ্ডার কালি বা রঙ-বাহী রোলারের সংস্পর্শে আসছে ও রঙ তুলে নিচ্ছে কেবল মাত্র তৈলাক্ত চিহ্নিত অংশের ওপর থেকে।

যে সব ক্ষেত্রে একাধিক রঙে ছাপা হয় সেখানে দুটি প্লেট সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি সিলিণ্ডারে প্রত্যেকটি রঙ সরবরাহের জন্য আলাদা রোলারের ব্যবস্থা থাকে। অফ্‌সেট প্রণালীতে বেশ খস্‌খসে কাগজেও পরিষ্কার ছবি ছাপা যায়—রঙ-বেরঙের ছবি, এবং সে ছাপা বেশ মোলায়েমও হয়। আর ছাপা যে খুব তাড়াতাড়ি হয় তাতে তো সন্দেহই নেই।

রোটারী মেশিনে কি করে ছাপা হয়

এবারে রোটারী যন্ত্রের খুঁটিনাটি জটিলতা বাদ দিয়ে সাধারণ কর্মপদ্ধতির দিকে লক্ষ করা যাক।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি কাগজের রীল থেকে কাগজ রোলারের সহায়তায় ক্রমাগত এসে



রোটারী মেশিনে কি করে ছাপা হয়

পৌঁছচ্ছে ডানদিকের প্রথম প্লেট্ সিলিণ্ডারের গায়ে। নীচে আছে কালি পাঠাবার ব্যবস্থা। এখানে কাগজের একপিঠে পর পর অসংখ্য মুদ্রণ এই প্লেট থেকে হয়ে যাচ্ছে। কাগজ এরপর বড় ছোট অনেক রোলার বেয়ে বাঁ-দিকে এসে আর একটি প্লেট সিলিণ্ডার থেকে অপর পিঠে অন্য খবর-সম্বলিত অংশের ছাপ তুলে নিচ্ছে। এখানে আলাদা ভাবে কালি সরবরাহ করা হচ্ছে।

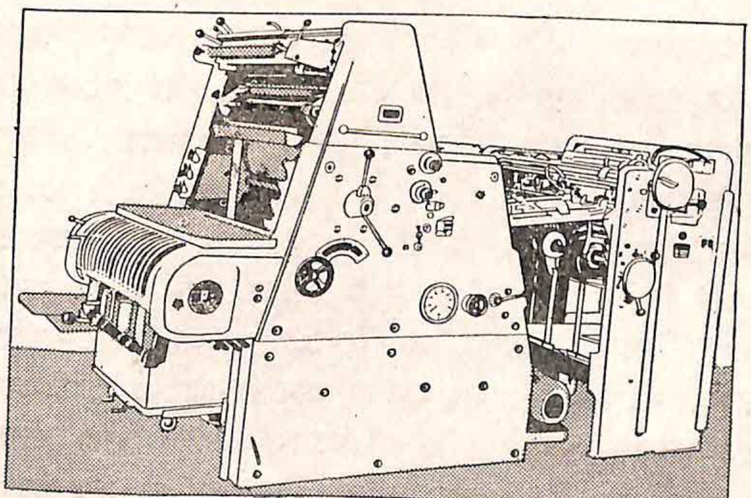
এখন দু'পিঠে ছাপা কাগজকে টেনে আনা হচ্ছে আরো অনেক রোলারের মধ্যে দিয়ে এবং যান্ত্রিক উপায়ে কাগজকে ঠিক মাপে কেটে, ভাঁজ করে, যন্ত্র থেকে বার করে দেওয়া হচ্ছে।

এক একটা রোটারী মেশিন আকারে কি বিরাট হতে পারে তা সাধারণ লোকে, যারা দেখে নি, হয়তো ধারণাই করতে পারবে না। আজকাল আবার খবর-কাগজ ছাপা ছাড়াও এই রকম রোটারী প্রেসে সস্তা বই, সাময়িক পত্রিকা—এ সবও ছাপা হচ্ছে। কারণ অনেক সাময়িক পত্র বা বই এক-একবারে লক্ষাধিকও ছাপতে হয়। এই সব কাজের জন্য আজকাল দোতলা তেতলা রোটারী মেশিনও তৈরি

হচ্ছে। তাতে এক-একবারে একটি সম্পূর্ণ বই বা সাময়িক পত্রিকা ছাপা হয়ে, ভাঁজ হয়ে, কাটা হয়ে, গুণতি হয়ে, সোজা চলে যাচ্ছে সেলাই করা কলের ভিতর, আর মুহূর্তের মধ্যে সেলাই হয়ে, মলাট-মোড়া অবস্থায় বেরিয়ে এসে, থাক দিয়ে জমা হয়ে যাচ্ছে যথাস্থানে নিয়ে যাবার অপেক্ষায়।

অফ্‌সেট প্রিন্টিং ছাপার ব্যাপারে যুগান্তর আনল

আবার অফ্‌সেট ছাপার প্রসঙ্গে আসা যাক। অফ্‌সেট ছাপার চল হওয়ার পর শুধু কাগজ কেন,—রেশম, পশম, রেক্সিন, নাইলন, চামড়া, নকল চামড়া, টেরিলিন ইত্যাদি কত কিছুর ওপরেই না রঙিন ছাপা সম্ভবপর হয়েছে! এমন কি ধাতুর চাদরের ওপরেও! টিনে ভরা রকমারি খাবারদাবার, ওষুধপত্র, প্রসাধন-সামগ্রীতে দোকানগুলি আজকাল ঝক্‌মক্ করে। প্রত্যেকটি টিনের গায়ে কী সুন্দর সুন্দর রঙিন ছবি, রঙিন লেখা, রঙিন নক্সা আঁকা! আর কী জ্বলজ্বলে! এ সবই সম্ভব হয়েছে অফ্‌সেট ছাপার দৌলতে। কোলাপ্‌সিবল টিউবে ভরা টুথপেস্ট বা ওষুধ-বিষুধ টিপে টিপে বার করবার সময় একবারও কি আমাদের মনে হয় ওর গায়ের ঐ বিচিত্র ছাপা কি করে সম্ভব হ'ল? লজেন্স, টফি, চকোলেট, এমন কি কোন কোন ওষুধের বড়িও আজকাল রংচঙে-ছবি-আঁকা রাংতা দিয়ে মোড়া থাকে,—এগুলিই বা কি করে ছাপা হয়? রঙিন খেলনার কথা না হয় না-ই বললাম। বাস্তবিক, অফ্‌সেট যেন ছাপার রাজ্যে একটা তোলপাড় এনে দিয়েছে! মোটর-গাড়ীর গদী অনেক সময় দেখা যায় দানাদার চামড়া দিয়ে মোড়া। মোটেই কিন্তু ওরকম চামড়া নয় সেগুলো; আসলে চামড়াই নয়। ছাপার গুণে নকল চামড়া বানিয়ে তাকে ঐ রূপ দেওয়া হচ্ছে। ফটোগ্রাফিও এ কাজে সাহায্য করছে প্রচুর। লিথোগ্রাফিতেও আজকাল ফটোগ্রাফের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতির নাম ফটো-লিথোগ্রাফী।



আধুনিক অফ্‌সেট ছাপার যন্ত্র

শুধু এ ব্যাপারেই নয়, ফটোর সাহায্যে হরফ বসাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। একটি কলের মধ্যে হরফের নেগেটিভ ভরা থাকে, দরকার মত এক একটি হরফের নেগেটিভ ছবি তুলে এক একটি লাইন সাজানো হয়। এইভাবে পাতার পর পাতা ছবি তোলা যায়। দরকার মত ছোট, বড়, টেরচা, সরু অক্ষর বেছে নেওয়া যায়। এক একটি পৃষ্ঠার ছবি তোলা হয়ে গেলে তা থেকে ব্লক করে নিয়ে ছাপা চলে।

ছবি কি করে ছাপে

আজকাল ছাপার মধ্যে একটা প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে ছবি। ছবি ছাড়া মাসিক পত্র বা ছোটদের বই যেন আমরা ভাবতেই পারি না। বড়দের বইতেও—বিশেষ করে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-কাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের বইতে দরকার মত ছবি দিতে না পারলে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর এ সব ছবিও ছাপা হচ্ছে কত সুন্দর ভাবে! ৭০।৮০ বা শ' খানেক বছর আগেকার ছাপা একখানা বই-এর ছবির সঙ্গে এখনকার ছাপা একখানা ছবি মিলিয়ে দেখলেই তফাৎটা চোখে পড়বে।

ছবি ছাপা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের অনেকেরই দেখেছি তেমন ভালো ধারণা নেই। সময় সময় বেশ শিক্ষিত লোককেও এ বিষয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করতে দেখেছি। অবশ্য ব্যাপারটার মধ্যে বহু খুঁটিনাটি আছে। তার সম্পূর্ণ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভবও নয়। তাই ব্যাপারটা সংক্ষেপে মোটামুটি ভাবে বলব।

ছবি ছাপার কয়েক রকম পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রচলিত যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে ব্লকের সাহায্যে ছবি ছাপা। ব্লক্ বলতে বোঝায় একটা কাঠের চাকতির ওপর তামা বা দস্তার (ইংরেজীতে যাকে বলে জিঙ্ক) পাত বসানো, সেই পাতের ওপর থাকে ছবি উল্টো করে খোদাই করা,—ঠিক যেমন থাকে টাইপের মাথায় খোদাই করা অক্ষর। সমস্ত ব্লক্টা মাপে হয় টাইপের ঠিক সমান উঁচু, যাতে টাইপের পাশে বসিয়ে কাগজে চাপ দিলে অক্ষরের পাশে ছবির ছাপও উঠে যেতে পারে।

ব্লক্ আবার হু'রকমের। এক হচ্ছে লাইন ব্লক্, আর হচ্ছে হাফটোন ব্লক্।

লাইন ব্লক

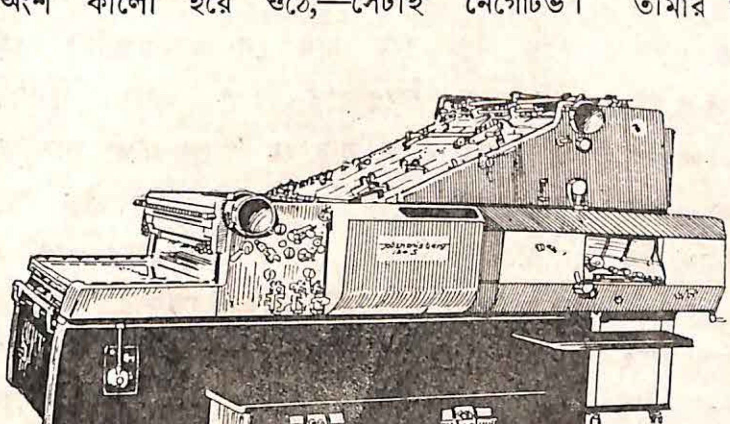
'লাইন'—অর্থাৎ শুধু রেখা দিয়ে আঁকা যে ছবি—তাই যে ব্লকের সাহায্যে ছাপা হয় তাকেই বলে লাইন ব্লক্। এতে সাদা আর কালো রেখা ছাড়া অন্য কিছু পাবে না। অবশ্য রঙিন কালিতে ছাপলে কালোর জায়গায় সেই কালির রঙটাই আসবে। কিন্তু ছবিতে যদি সাদা-কালোর মাঝামাঝি কোনও রঙ থাকে—যেমন ফটোগ্রাফের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, তূলি দিয়ে আঁকা ছবির মধ্যেও দেখি—কোথাও হাল্কা কালো, কোথাও ছাই-ছাই, আবার কোথাও বা ঘোর ছেয়ে রং ইত্যাদি—এগুলো লাইন ব্লকে ছাপা যায় না। তার জন্য চাই হাফটোন ব্লক্। বলা বাহুল্য লাইন ব্লকের ব্যাপারটাই অনেকটা সহজ।

আগেকার দিনে ছবি দেখে শিল্পীরা কাঠের ওপর তার অনুকরণ করতেন হাতে খোদাই করে। তাও আবার করতে হ'ত উল্টো করে। ফলে তার জন্য শুধু যে বেশ ওস্তাদ্ শিল্পীরই দরকার হ'ত তাই নয়, সে ছবিও অনেক সময় হ'ত কিম্ভূতকিমাকার। সেকালকার বটতলার ছাপা বই-এ, পঞ্জিকায় এ রকম ছবি তোমরা দেখে থাকবে। আধুনিক প্রক্রিয়ায় লাইন ব্লক্ তৈরির পথ যিনি দেখান তিনি একজন ফরাসী ভদ্রলোক, নাম গিলোৎ। সে প্রায় সওয়া শ' বছর আগেকার কথা। তখন ফটোগ্রাফির উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে। গিলোৎ তার সাহায্য নিলেও আগাগোড়া কাজটা ফটোগ্রাফির সাহায্যে না করায় শিল্পটা তাঁর সময়েও বেশ কঠিন এবং বেশ

ওস্তাদ্ কারিগরের কাজ হয়েই থাকে। সে ত্রুটি দূর করলেন তাঁর ছেলে। তিনি ফটোগ্রাফির সাহায্যেই ছবি থেকে নেগেটিভ তুলে সেই ফটোগ্রাফির সাহায্যেই তা থেকে ব্লক্ খোদাই-এর ব্যবস্থা করলেন। এ হচ্ছে ১৮৭২ সালের কথা। লাইন ব্লকের সত্যিকার জন্ম বলতে গেলে ঐ সময় থেকেই ধরা যেতে পারে।

লাইন ব্লক্ কি করে করা হয় এইবার বলি। আগেই বলেছি লাইন ব্লকের ছবি শুধু রেখা দিয়ে আঁকা হওয়া চাই, সাদা কালোর মাঝামাঝি কোনও ছোপ—যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'শেড অ্যাণ্ড লাইট', মানে আলো আর ছায়া,—লাইন ব্লকে তা আনা যায় না।

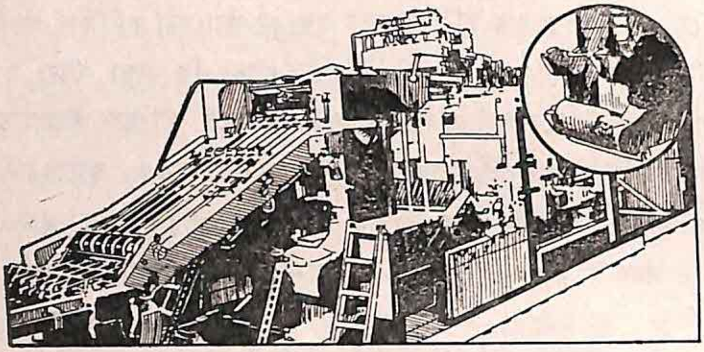
ব্লক্ তৈরির প্রথম কাজ হচ্ছে, যে-ছবির ব্লক্ হবে ক্যামেরার সাহায্যে তার একটা নেগেটিভ তুলে নেওয়া। ফটোর নেগেটিভ কাকে বলে নিশ্চয়ই জান। (ছোটদের বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২১৯ দেখ)। ফটো প্লেটের ওপর প্রথম যে ছাপটা পড়ে,—যাতে কালো অংশ সাদা আর সাদা অংশ কালো হয়ে ওঠে,—সেটাই নেগেটিভ।



ফ্ল্যাটবেড মেশিন প্ল্যাটেন মেশিনকে পিছে ফেলে অনেক এগিয়ে দিয়েছে ছাপার কাজ।

ব্লকের ছবি তোলার জন্য যে ক্যামেরা তা কিন্তু একটু বিশেষ ভাবে তৈরি। এতে খুব লম্বা ভাঁজ বা 'বেলো' দেওয়া থাকে—যার ফলে ছবিকে ইচ্ছেমত মাপসই রেখে ছোট বা বড় করা যায়। ক্যামেরার লেন্সও খুব উৎকৃষ্ট হওয়া দরকার। তা ছাড়া লেন্সের সামনে একখানা আয়না লাগানো তিন-কোণা কাচ বসানো থাকে। এই তিন-কোণা কাচের কাজ হচ্ছে নেগেটিভকে সোজা করে দেওয়া। সাধারণ ফটোগ্রাফিতে নেগেটিভে সমস্ত কিছুই উল্টো ওঠে। ব্লকের বেলায় সে রকম হলে চলে না। তাই ক্যামেরার মধ্যেই এই ভাবে নেগেটিভকে ফের উল্টে সোজা করে দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়।

এর পরের কাজ হচ্ছে নেগেটিভের ছবি ধাতব পাতের ওপর তোলা। সাধারণ ফটো তোলার সময় নেগেটিভ থেকে যেমন ব্রোমাইড পেপারের ওপর ছবির ছাপ তোলা হয় এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম। তবে এখানে ঐ কাগজের বদলে ব্যবহার করা হয় দস্তা বা তামার পাত। খুব পরিষ্কার পাত হওয়া চাই। এই পাতের ওপর মাখানো হয় এমন একরকম মশলা যাতে নাকি আলো লাগলেই রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যায়। অ্যামোনিয়াম্ ডাইক্রোমেট, অ্যামোনিয়া, অ্যালবুমেন, জল, শিরীস ইত্যাদি মিশিয়ে ঐ আঠালো মশলা তৈরি হয়। মশলা-মাখানো পাতটিকে আলোর সংস্পর্শে না এনে শুকিয়ে নিয়ে অন্ধকার ঘরে একটা কাচ-বসানো ফ্রেমের মধ্যে নেগেটিভের



আর একটি উন্নত ধরনের আধুনিক ছাপার কল
রোটোগ্র্যাভিওর প্রিন্টিং মেশিন

কোনও রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে নি, শক্তও হয় নি,—সে সব জায়গার মশলা ধুয়ে বেরিয়ে যায়। এর পর পাতটা আবার গরম করে শুকিয়ে নিয়ে তার ওপর একরকম সূক্ষ্ম রজন জাতীয় গুঁড়ো মাখিয়ে ফের গরম করলে সে গুঁড়ো গলে গিয়ে শক্ত জায়গা-গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে জায়গাগুলোকে আরও দৃঢ় করে দেয়। তখন আর তা আরকে ক্ষয়ে যেতে পারে না। এই গুঁড়োকে চলতি কথায় বলা হয় 'ড্রাগন্‌স্ ব্লাড্'—ড্রাগনের রক্ত।

সঙ্গে সেঁটে দেওয়া হয়। খুব ঘন ভাবে আটকাতে হয়। এ জন্য স্ক্রু ব্যবহার করা হয়। আরও আধুনিক উপায় হচ্ছে ভ্যাকুয়াম ফ্রেম ব্যবহার করা। এইবার সেই ফ্রেমটি নিয়ে রোদে রাখলেই নেগেটিভের ওপর সূর্যের আলো এসে পড়ে। নেগেটিভের যেখানটা যেখানটা সাদা সেখানটাতেই আলো ঢুকতে পারে, কালো অংশে কি করে ঢুকবে? ফলে ঐ আলোকিত অংশগুলিতেই শুধু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং সে জায়গাগুলো শক্ত হয়ে যায়। আজকাল অবশ্য বেশির ভাগ জায়গায়ই সূর্যের আলোর বদলে কৃত্রিম ইলেকট্রিক আর্ক্ লাইট ব্যবহার করা হয়, কারণ এতে ইচ্ছেমত আলো কম-বেশি করা চলে। তা ছাড়া মেঘলা দিনে বা রাত্রে কাজ করতেও কোন অসুবিধে হয় না।

এর পর পাতখানা বার করে নিয়ে ঈষৎ গরম করে তার ওপর বিশেষ ভাবে তৈরি একরকম কালি মাখিয়ে দেওয়া হয়। এবার গরম জলে ভিজিয়ে তুলো দিয়ে ঘষলে যেখানে যেখানে আলো লাগে নি এবং ফলে মশলার

এর পর খোদাই করার পালা। এজন্য পাতখানাকে নিয়ে আরকে ডুবিয়ে নাড়তে হয়। সাধারণত নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে জল মিশিয়ে এই আরক তৈরি হয়। খানিক-ক্ষণের মধ্যেই আরক পাতের নরম অংশগুলি—অর্থাৎ যেখানে আলো লাগে নি সেই জায়গা-গুলি ক্ষইয়ে দেয়। আলো-লাগা অংশগুলির চেয়ে নীচু হয়ে যায় সে জায়গাগুলি। এই প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে বলে এচিং। ঠিকমত এচিং হলে দেখা যায় যে আলো-লাগা অংশটুকু, অর্থাৎ মূল ছবির রেখাগুলিই শুধু উঁচু হয়ে রয়েছে। 'ঠিকমত, বলছি এই জন্য যে এ কাজটায় বেশ একটু কৌশল দরকার। অভিজ্ঞ কারিগর ছাড়া অন্য লোক এ কাজ ভালোমত করতে পারে না। অনেক সময় বারে বারেও করতে হয়। এচিং শেষ হলে পাতখানা নিয়ে মাপমত কাটা কাঠের টুকরোর ওপর সাবধানে পেরেক দিয়ে আটকে দিলেই হ'ল। একে বলা

হয় 'মাউণ্ট' করা। ব্যস্, লাইন ব্লক্ তৈরি হয়ে গেল।

হাফটোন ব্লক্

হাফটোন ব্লক্ তৈরির পদ্ধতি অনেকটা একই রকম হ'লেও কোন কোন জায়গায়, বিশেষ করে গোড়ার দিকের প্রক্রিয়ায় অনেকটা তফাৎও আছে। হাফটোন ব্লক্ তৈরির উপায় বার হয়েছে আরও পরে, ১৮৮২ সালে। বহু লোকের বহু দিনের চেষ্টায় এই প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়। এঁদের মধ্যে একজন ইংরেজ, ট্যালবট তাঁর নাম, এ সম্বন্ধে প্রথম আভাস দেন; কিন্তু সত্যিকার কাজ দেখান একজন জার্মান—মাইসেনবুক্। তাই তাঁকেই বলা যেতে পারে হাফটোন ব্লকের প্রবর্তক। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রথম হাফটোন ব্লকের চলন করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের কিছু কিছু আবিষ্কারও উল্লেখযোগ্য।

হাফটোন নাম কেন হ'ল? মনে হয়, এই পদ্ধতিতে ছবির ধরন বা 'টোন'কে ভেঙ্গে নিয়ে কাজ হাসিল করা হয় বলেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের ব্লকে সমস্ত ছবিটাকে কতকগুলি সূক্ষ্ম ফুটকিতে রূপান্তরিত করা হয়। কোন হাফটোন ছবি ভালো করে লক্ষ করলেই দেখা যাবে সে ছবিগুলি কতকগুলি ফুটকির সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। কোথাও খুব ঘন করে বসানো, কোথাও বেশ ফাঁক ফাঁক। এমন কৌশলে ফুটকিগুলো বসানো যে তারই ফলে হুবহু ছবিটি ফুটে উঠেছে। একখানা ম্যাগ্নিফাইং লেন্স দিয়ে দেখলে এ ব্যাপারটা আরও ভালো করে বোঝা যাবে।

কি করে ছবিকে এই রকম ফুটকিতে পরিণত করা হয়? ব্যাপারটা এখন শুনলে খুব কঠিন মনে হবে না—যদিও যাঁরা ভেবে বার করেছেন তাঁদের অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে ওর জন্য। হাফটোন ব্লকের নেগেটিভ তুলবার সময়ে ক্যামেরার ভিতর, যেখানটায় প্লেট ভরা হয় তার সামনে, একখানি জালিদার কাচের পর্দা বসিয়ে দেওয়া হয়। একে বলে স্ক্রীন্। স্বচ্ছ অথচ জালিদার, তার মানে সবটাই স্বচ্ছ নয়,—ওর আগাগোড়া আড়াআড়ি ভাবে রুল টানা থাকে। কতক খাড়া রুল, কতক শোয়ানো রুল। জিনিসটা দেখতে অনেকটা সূক্ষ্ম তারের জালের মত কিন্তু এর জাল আরও অনেক সূক্ষ্ম। অবশ্য এরও রকমফের আছে। সাধারণত এক ইঞ্চিতে ৬০ থেকে ২০০ পর্যন্ত রুল টানা থাকে। সময় বিশেষে ৪০ থেকে ৪০০ পর্যন্তও হয়। তবে ৬০ থেকে ২০০ পর্যন্তই বেশি ব্যবহার করা হয়। কত লাইনের স্ক্রীন্ ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে ছবির ওপর এবং, তার চেয়েও বেশি, কি রকম কাগজে সে ছবি ছাপা হবে তার ওপর। মোটা খবরের কাগজের (নিউজ প্রিণ্ট) জন্য সাধারণত মোটা স্ক্রীন্—৬০ লাইনের স্ক্রীন্ ব্যবহার করা হয়। খুব মসৃণ কাগজ—আর্ট পেপারের জন্য আরও সূক্ষ্ম স্ক্রীন্—১২০, ১৫০ বা ২০০ লাইনের স্ক্রীন্ও ব্যবহার করা যায়। মোটা, সস্তা কাগজে সূক্ষ্ম স্ক্রীন্ ব্যবহার করলে ছবি ভালো ওঠে না, জাবড়ে যায়। যত সূক্ষ্ম স্ক্রীন্ হবে তত ছবির খুঁটিনাটি ছাপায় আসবে। এজন্য ছবি ছাপার কাগজও খুব মসৃণ হওয়া দরকার—যদি ব্লকের সাহায্যে তা ছাপতে হয়। কাগজের কলে

এই রকম ছবি ছাপার জন্য আলাদা কাগজ তৈরি করা হয়। এতে কাগজের মণ্ডের সঙ্গে মিহি চীনেমাটির গুঁড়ো, কেয়োলিন, কেসিন, শিরীস ইত্যাদি মেশানো হয়। এতে কাগজের আঁশের মাঝখানে যে ফাঁকগুলো থাকে তা ভরাট হয়ে গিয়ে কাগজ মসৃণ রূপ নেয়।

যাই হোক, ক্যামেরায় স্ক্রীন্ বসিয়ে ছবির নেগেটিভ নিলে গোটা ছবিটা হাজার হাজার ফুটকিতে পরিণত হয়। তারপর ঠিক লাইন ব্লকের মতই ধাতুর ওপর ছবির ছাপ তোলা হয়—যাকে বলে এক্সপোজ্ দেওয়া। এক্সপোজ্ দেবার আগে ঠিক লাইন ব্লকের মতই ধাতুটিকে মাছের-আঠা-মেশানো এক রকম রাসায়নিক মশলা লাগিয়ে 'প্রতিক্রিয়াশীল' করে নেওয়া হয়,—যাকে ইংরেজিতে বলে, সেন্‌সিটাইজ্‌ড্ করা। এক্সপোজ দেবার পর ধাতুটিকে অ্যামোনিয়াম ডাইক্রোমেট সলিউশনের ভিতর ডোবালে ঐ ধাতুর গায়ে গাঢ় নীল রঙের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। পরে গরম করলে সেটা চকোলেট রঙে পরিণত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে যায়। এর পর, দস্তার পাত হলে নাইট্রিক অ্যাসিড, আর তামার পাত হলে আয়রন পারক্লোরাইড দিয়ে এচিং করা হয়। হাফটোন ব্লকে নানারকম টোন থাকে বলে এই এচিং-এ ভালো কারিগরী বিদ্যার প্রয়োজন হয় এবং তামা বেশ শক্ত ধাতু বলে হাফটোন ব্লক এতেই ভালো হয়।

রঙিন ছবি

ব্লকের সাহায্যে রঙিন ছবি ছাপতে হলে একখানা ব্লক্ হ'লে চলে না—পর পর তিন-খানা ব্লক্ একটার ওপর একটা ছাপতে হয় হলদে, লাল এবং নীল কালিতে। শুনতে মজা লাগবে যে এই তিনটি রঙ মিশিয়ে সাতটা রঙের যে কোনও রঙ আনা চলে। সবুজ রঙ আনতে হলে হলদের সঙ্গে নীল মেশাতে হবে। বেগুনী রঙ আনতে হলে লালের সঙ্গে নীল, কমলা রঙ আনতে হলে হলদে আর লাল। এমনি ধারা বহু রকম রঙ হতে পারে। কালো রঙ হয় লাল, নীল এবং হলদে তিনটে রঙ মিশিয়ে। আজকাল অবশ্য ছবিকে আরও নিখুঁত—আরও বৈচিত্র্যময় করার জন্য তিনটের ওপরে চার, পাঁচ বা তার চেয়েও বেশি ব্লক্ ব্যবহার করার রেওয়াজ হয়েছে। ছোটদের বিশ্বকোষের মলাটটিও ঐ রকম চার রঙে ছাপা হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে ঐ তিনটে রঙ মিশিয়ে যখন যে কোনও রঙ আনা সম্ভব তখন যদি কোনও রঙিন ছবি নিয়ে এমন ভাবে ফটো তোলা যায় যাতে সে ছবির যেখানে যেখানে যতটা যতটা হলদে রঙ আছে, লাল রঙ আছে, নীল রঙ আছে—শুধু সেইগুলো পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটা নেগেটিভে এসে পড়ে তা হলেই কার্যসিদ্ধি হতে পারে। এই ভাবে রঙ ছেঁকে ফটো তোলা খুব কঠিন নয় যদি বিশেষ ভাবে তৈরি "বর্ণ-অনুভূতিপ্রবণ" ("কালার সেন্‌সিটিভ") প্লেট ব্যবহার করা যায়।

হলুদ রঙকে যদি কোনও হলুদ কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায় তবে সেটা সাদা দেখায়। তেমনি কমলা রঙের কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলে হলুদ ও লাল দু'টোকেই সাদা দেখাবে, আর নীল কাচের মধ্যে দিয়ে দেখলে সাদা দেখাবে লাল আর নীল রঙ দু'টোকে। আবার সবুজ কাচের মাধ্যমে নীল এবং

১



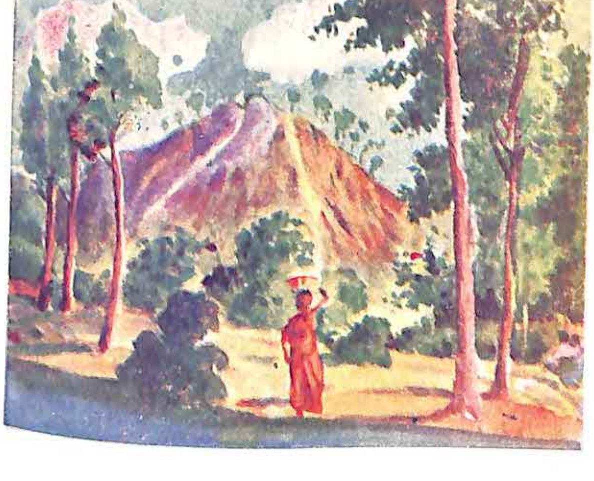
২



৩



৪



৫

রঙিন হাফটোন ছবি কেমন করে ছাপা হয়

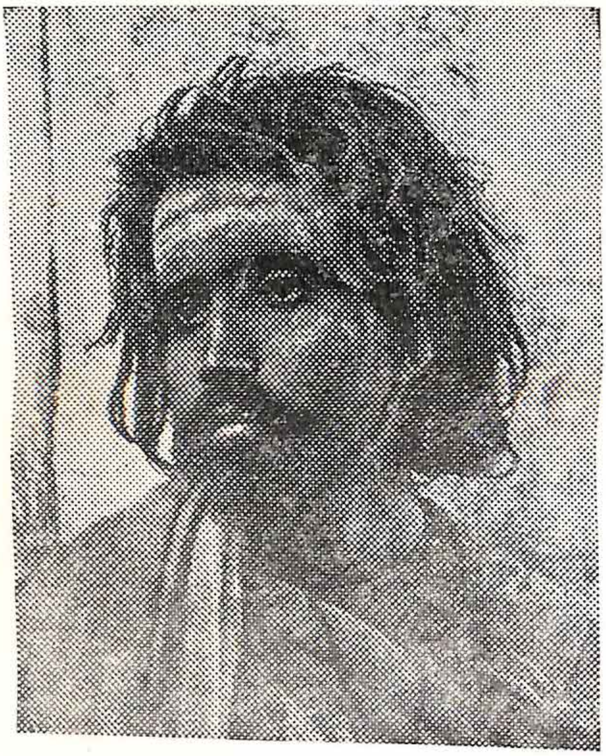
১—শুধু হলদে কালিতে ব্লকটি ছাপা হয়েছে।

২—শুধু লাল কালিতে ব্লকটি ছাপা হয়েছে।

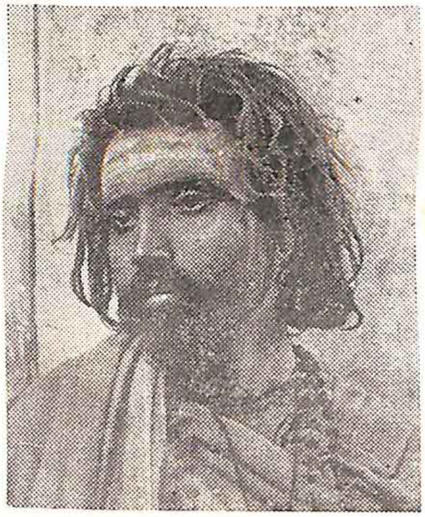
৩—হলদে কালির ওপর লাল কালিতে ছাপা হয়েছে রং কিছুটা বদলে গেল।

৪—শুধু নীল কালিতে ব্লকটি ছাপা হয়েছে।

৫—এবারে হলদে লালের ওপর নীল কালিতে ছাপা হল; ছবির চেহারা একেবারে পালটে গিয়ে ফুটে উঠল নানারঙে রাঙা রঙিন ছবি।



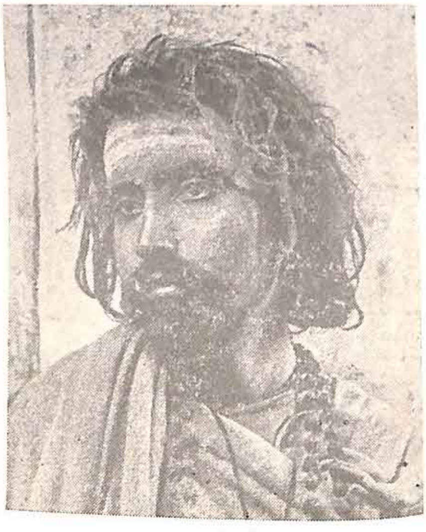
45⁰
হাফটোন ব্লক ঃ ৪৫ স্ক্রীনে



65⁰
হাফটোন ব্লক ঃ ৬৫ স্ক্রীনে



85⁰
হাফটোন ব্লক ঃ ৮৫ স্ক্রীনে



100⁰
হাফটোন ব্লক ঃ ১০০ স্ক্রীনে

একই ছবি বিভিন্ন স্ক্রীনে কেমন দেখায়।

হলুদকেও বাদ দেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতেই তিনটি বিভিন্ন রঙের নেগেটিভ করা হয়, এবং যে নেগেটিভে যে রঙ বাদ দেওয়ার দরকার সেখানে সেই রঙের কাচের পর্দা বসিয়ে নেওয়া হয়। রঙিন হাফটোন ব্লকের সময় আর একটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় নেগেটিভ করার সময়। আগেই বলা হয়েছে হাফটোন ব্লকের বেলায় স্ক্রীন দিয়ে নেগেটিভ করতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই করতে হয়, তবে তিনটি রঙের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোণের স্ক্রীন ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে জালের সৃষ্টি হয়ে ছবি ঠিকমত আসে না। রঙ-ছাঁকা কাচের পর্দা বসিয়েই তা করা যেতে পারে।

ঐ রকম তিনখানা নেগেটিভ নিয়ে সাধারণ ব্লকের মতই তা থেকে তিনখানা পৃথক্ ব্লক্ তৈরি করা হয়। তার পর ছাপবার সময়ে প্রথমে হলদে কালি দিয়ে হলদে প্লেটের ব্লক্, তার পর সেটা শুকোলে লাল কালি দিয়ে সেই ছবির ওপরেই লাল প্লেটের ব্লক্ এবং সেটা শুকোলে তারই ওপর ফের নীল প্লেটের ব্লক্ ছাপতে হয়। তখন তিন ব্লকে মিলিয়ে ভোজবাজীর মতই ছবিটা ফুটে উঠবে কাগজে হুবহু মূল ছবিটার মতই।



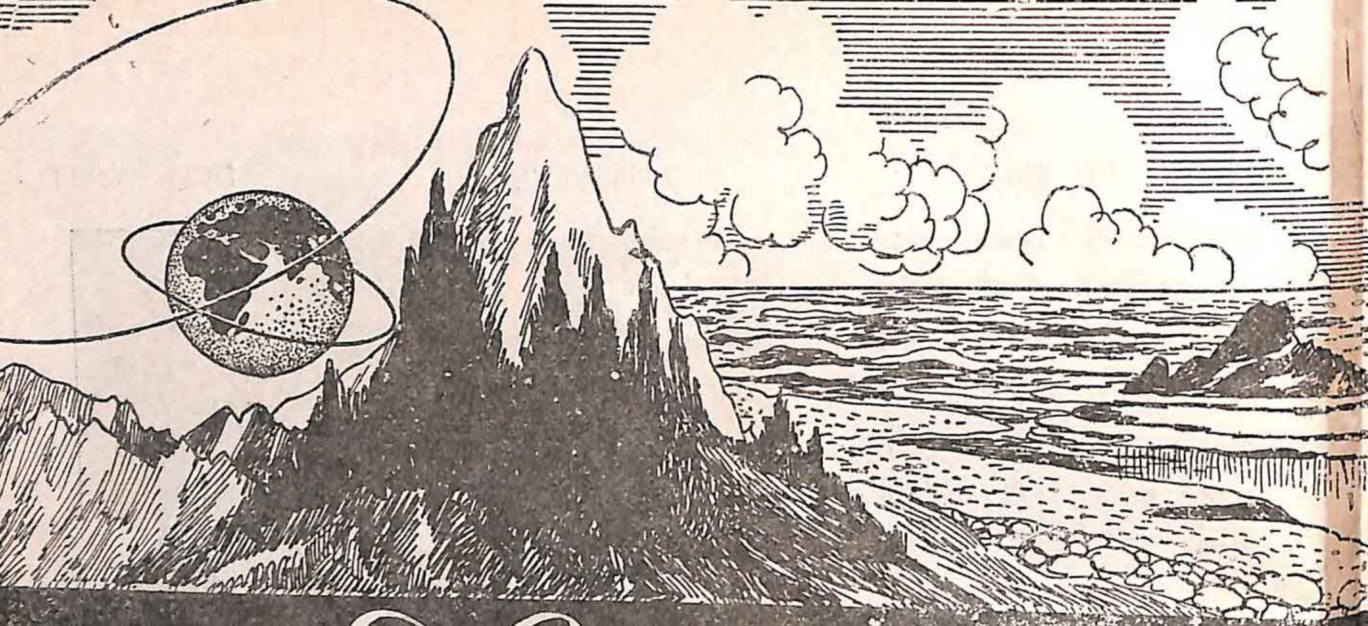
এই লাইন ব্লকে তিন রকম স্ক্রীন দেখানো হয়েছে

হাফটোনের মত লাইন ব্লক্ দিয়েও রঙিন ছবি ছাপা যায়। সেটা বেশ উজ্জ্বল হ'লেও হাফ-টোনের মত তাতে অমন আলোছায়ার খেলা (শেড অ্যাণ্ড লাইট) দেখানো যায় না। তবে রেখার সঙ্গে ফুটকি-দেওয়া স্ক্রীন্ বসিয়ে কিছুটা আলোছায়ার আভাস এবং রকমারি রঙের বাহার লাইন ব্লকেও আনা যেতে পারে। একরঙা লাইন ব্লকেও খানিকটা আনা যায়।

ব্লক্ ছাড়া রঙিন ছবি ছাপার নানা আধুনিক প্রক্রিয়া হচ্ছে লিথোপ্রিন্টিং, অফ্‌সেট প্রিন্টিং। বড় বড় ম্যাপ, পোস্টার—এ সব ঐ পদ্ধতিতেই সাধারণত ছাপা হয়·আজকাল। আর, ওর সুবিধের কথা তো আগেই বলেছি



একই লাইন ব্লক (স্ক্রীন ছাড়া)



পৃথিবীর কথা

পৃথিবীর বয়স কত

জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড থেকে ঠাণ্ডা হয়ে হয়ে ক্রমে বদলাতে বদলাতে পৃথিবী কি করে বর্তমান চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে,—ভূগোলের ভাষায় যার তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল,—তার একটা মোটামুটি চিত্র আমরা এর আগেই দিয়েছি। অবশ্য সব কথা বলা যায় নি, অল্প কথায় তা বলা সম্ভবও নয়। তবে এটুকু বুঝতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে না যে আমাদের এই শ্যামা পৃথিবীকে তার চেহারা পালটে এখনকার চেহারায় আসতে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা—অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কত রকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে!

এজন্য কত দিন লেগেছে তার? অর্থাৎ, এক কথায়, আমাদের পৃথিবীর বয়স এখন কত?

খুব গোলমেলে প্রশ্ন সন্দেহ নেই। নানা বিজ্ঞানী নানা ভাবে এর জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একজনের হিসেবের সঙ্গে আর একজনের হিসেব কম ক্ষেত্রেই এক রকম হয়েছে। ১০০ বা ২০০ কোটি বছর থেকে ৬০০ কোটি বছর পর্যন্ত,—অর্থাৎ ৪।৫ শ' কোটি বছর এদিক্ ওদিক্ ফারাক্! তাজ্জব ব্যাপার বলতে হবে। তবে সম্প্রতি "তেজস্ক্রিয় পদ্ধতিতে" বয়স বার করবার যে উপায় বেরিয়েছে সেটাই অনেকটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

ব্যাপারটা কি রকম জান? পৃথিবীতে রয়েছে নানা রকমের তেজস্ক্রিয় মৌল, আগেও ছিল। ইংরেজিতে এদেরকে বলা হয় রেডিও-অ্যাক্টিভ এলিমেণ্ট। যেমন ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি। এগুলি ক্রমাগতই বিভিন্ন ধরনের রশ্মি বা তেজ বিকিরণ করে একটার পর একটা নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরি করতে করতে এক সময় সাধারণ সীসেতে পরিণত হয়। কোন্‌টার বেলা ঠিক কত দিনে এই পরিবর্তন ঘটে বিজ্ঞানীরা তা হিসেব করে বার করেছেন। দেখা গেছে, কোন

তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেকটা ক্ষয় হয়ে যেতে একটা নির্দিষ্ট সময় লাগে। কোনটার হয়তো সামান্য কয়েক সেকেণ্ড বা মিনিট, আবার কোনটার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর। একে বলা হয় 'অর্ধ-জীবন' বা 'হাফ্ লাইফ'। রেডিয়ামের বেলা এই অর্ধজীবন হচ্ছে ১৬২০ বছর, কিন্তু ইউরেনিয়ামের অর্ধজীবন সবচেয়ে বেশি—$৪\frac{১}{২}$ × $১০^{৯}$ বছর ($১০^{৯}$ মানে ১০ × ১০ × ১০ × ১০ × ১০ × ১০ × ১০ × ১০ × ১০)। এখন, যদি কোন পাথরে বা খনিজ পদার্থে পাশাপাশি ইউরেনিয়াম আর সীসে পাওয়া যায় তা হ'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে ঐ সীসে ঐ ইউরেনিয়াম থেকেই তৈরি হয়েছে। ঐ ইউরেনিয়াম আর ঐ সীসের পরিমাণ সহজেই বার করা যায় এবং তাদের অনুপাত থেকে ঐ পরিবর্তন কত দিনে হয়েছে তাও হিসেব করে বার করা কিছু কঠিন নয়। এই ভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে পৃথিবীর কোন কোন পাথর ৪৫০ কোটি বছরের চাইতেও পুরোনো। এই রকম অনেক—অনেক পাথর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এখন ধরে নিয়েছেন যে পৃথিবীর বয়স ৪৫০ কোটি বছরের কম তো নয়ই, ৬০০ কোটি বছর পর্যন্ত হ'তে পারে। তবে তার চেয়ে বেশি নয়।

পাথরে লেখা ইতিহাস

৪৫০ থেকে ৬০০ কোটি বছরের এই বুড়ো পৃথিবীর বয়স না হয় অনুমান করা গেল কিন্তু তারপর এই দীর্ঘ দিনকার ইতিহাসও তো জানা চাই! কিন্তু কে বলবে সে ইতিহাস? মানুষ তো পৃথিবীতে এসেছে বড় জোর মাত্র পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে। তাও সেকালকার সেই বুনো মানুষ ছিল আচার-আচরণে প্রায় জংলী পশুদেরই সমগোত্র। ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার মত শিক্ষাদীক্ষা ছিল না তার। তা ছাড়া তাদেরকে মানুষ না বলে প্রায়-মানুষ বললেই ঠিক বলা হয়। সত্যিকার মানুষ এসেছে বড় জোর ৩৫।৩৬ হাজার বছর আগে, আর সে মানুষও সভ্য হয়েছে বড় জোর ৫।৭ হাজার বছর আগে। কাজেই তার আগের ইতিহাস পাওয়া যাবে কি করে?

কিন্তু যাঁরা পড়তে জানেন তাঁরা সে ইতিহাস ঠিকই পড়ে নিয়েছেন। পৃথিবী নিজেই রেখে গেছে তার বিভিন্ন যুগের ইতিহাস তার পাথরের ভাঁজে ভাঁজে। সেকালকার জীবজন্তু বা গাছপালার পাথুরে দেহাবশেষ, গায়ের ছাপ, পায়ের চিহ্ন, কঙ্কালের টুকরো বা সময় সময় পুরো কঙ্কালটাই রয়ে গেছে ঐ সব পাথরের স্তরে। এইগুলোকে আমরা বলি ফসিল বা, ভালো বাংলায়, জীবাশ্ম। (অশ্ম মানে পাথর।) এই ফসিল কি করে তৈরি হয় এবং কি করে তাই দেখে পাথরে-লেখা আদ্যিকালের ইতিহাস পণ্ডিতেরা খুঁজে বার করেন সে কথা আমরা এর আগেই ভালো করে আলোচনা করেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, জীবজন্তুর কথা—পৃঃ ১০৭-১০৯)।

এই সব ফসিল এবং বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন জাতের পাথর পরীক্ষা করে পণ্ডিতেরা পৃথিবীর ইতিহাসকে কয়েকটি যুগে ভাগ করে নিয়েছেন। এগুলিকে বলা হয় ভূতাত্ত্বিক যুগ। অবশ্য সাধারণ ইতিহাসের মত এ যুগগুলো যে ঠিক বছর বছর বা শতাব্দী দিয়ে ভাগ করা যায় না তা তো সহজেই বুঝতে

পারছ। কিছুটা অনুমান, কিছুটা আন্দাজ ওর মধ্যে থাকবেই। ফলে দশ-বিশ লাখ বা দু'-দশ কোটি বছর এদিক্ ওদিক্ হয়ে গেলে সেটাও তেমন দোষের বলে ধরলে চলবে না। তা সত্ত্বেও বলব, এই সব যুগগুলিকে বিজ্ঞানীরা আশ্চর্য কৌশলে ভাগ করে নিয়েছেন এবং প্রমাণ, যুক্তি ইত্যাদির দিক্ থেকেও সেগুলি একরকম নিখুঁত বলা চলে। অবশ্য দু'-একটা ভুলভ্রান্তি যে মাঝে মাঝে হয় নি এমন নয়, কিন্তু পরবর্তী কালে তা শুধরে নিতেও দেরি হয় নি।

ভূতাত্ত্বিক যুগগুলিকে ভাগ করে নেওয়া হ'ল

ভূতাত্ত্বিক যুগগুলিকে এইভাবে প্রথমে কয়েকটি বড় বড় ভাগে ভাগ করে নিয়ে তারপর সেগুলিকেও আবার আরও ছোট ছোট যুগে ভাগ করে নিয়ে আসা হয়েছে। বুঝবার সুবিধের জন্য আমরা এর সবগুলিকেই 'যুগ' বলছি, কিন্তু ভূতাত্ত্বিক সময়-গণনার বিচারে এদের নাম দেওয়া হয়েছে "এরা" বা অধিকল্প, "পিরিয়ড" বা কল্প এবং "ইপক" বা অধিযুগ। সেগুলিকেও আবার ছোট ছোট সময়-সীমানার মধ্যে এনে আরও নানা রকম নাম দিতে ছাড়েন নি ভূবিজ্ঞানীরা।

পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব হয়েছে মাত্র ৬০ কোটি বছর আগে। তাই এই ৬০ কোটি বছরের ইতিহাসটাই আমাদের মোটামুটি ভালোভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ৪৫০-৬০০ কোটি বছরের মধ্যে ঐ ৬০ কোটি বছরের হিসেব দিলেই তো আর চলবে না! তার আগেকার যুগ সম্বন্ধেও কিছু বলা দরকার— যদিও সে বিবরণ খুবই অস্পষ্ট এবং শুধুই পাথরের ইতিহাস। পৃথিবীর জন্মের পর প্রথম ২০০ কোটি বছর কোনও জীবের যে আবির্ভাব হয় নি—হতে পারে না এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা স্থিরনিশ্চয়। তাই এই যুগটাকে তাঁরা বলেন "অ্যাজোইক" বা অজীবীয় যুগ, অর্থাৎ প্রাণের অস্তিত্বহীন কাল। এর পরে দীর্ঘ আর একটা যুগ,—সেও প্রায় ২০০ কোটি বা অন্তত ১৯০ কোটি বছর হবে,—এমন ভাবে কেটে গেছে যে সময়টায় প্রাণের কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হলেও তার কোনও চিহ্ন তারা রেখে যায় নি। কিন্তু সঠিক কিছু বলা যায় না তো, তাই এই দীর্ঘ সময়টার নাম দেওয়া হয়েছে "ইওজোইক" যুগ। আরও গোটা কয়েক নাম আছে এ যুগের। যেমন—"আর্কিও-জোইক", "প্রোটেরোজোইক" বা "আর্কিয়ান" যুগ। অর্থাৎ অনিশ্চিত প্রাণের যুগ কিংবা আদিম অজানা প্রাণের যুগ। পরবর্তী ষাট কোটি বছরটাকেই বলা যায় সত্যিকার ভূতাত্ত্বিক যুগ—যার প্রায় সঠিক প্রমাণ পণ্ডিতদের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের পাতায় ধরা পড়েছে।

প্রথমে তিনটি 'এরা' বা অধিকল্পে ভাগ করা হয়েছে এই ভূতাত্ত্বিক যুগকে। সর্ব-



প্রিক্যাম্ব্রিয়ান্ যুগের চিহ্ন

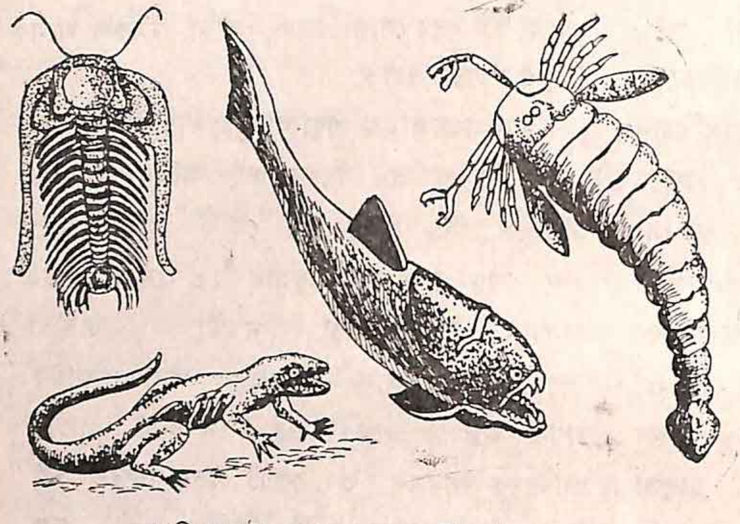
প্রথমটিকে বলা হয় 'প্যালিওজোইক' বা পুরাজীবীয় অধিকল্প। প্যালিওজোইক অধিকল্পের ঠিক আগেকার দিনগুলিকে প্রিক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগ বলা হয়। ষাট কোটি বছরেরও আগে পৃথিবীতে সম্ভবত খুব নিম্নস্তরের শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ্ এবং কিছু না-উদ্ভিদ্-না-প্রাণী জাতীয় জীবের আবির্ভাব হয়েছিল, তবে তা সবই জলে অর্থাৎ সমুদ্রে। সাধারণত জীবাণু গোছের কিছু বস্তু, অ্যাল্‌গী জাতীয় কিছু উদ্ভিদ্ ছিল এদের দলে। এদের বেশির ভাগই হয়তো ছিল এককোষী, অর্থাৎ একটা কোষ দিয়েই তৈরি হয়েছিল তাদের সমস্ত শরীর। অ্যামিবা জাতের প্রথম প্রাণীর কাহিনী তোমরা এর আগে পড়েছ (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০২-১০৩)। অবশ্য একাধিক কোষযুক্ত উদ্ভিদ্ বা প্রাণীও যে ছিল না এমন নয়। কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা যে আদিম প্রবাল, স্পঞ্জ, জেলিফিশ জাতীয় প্রাণীরাও কিছু কিছু এই সময়ে দেখা দিয়ে থাকবে। এ যুগের জীবেদের যে সব ফসিল এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে কিংবা, আরও সঠিকভাবে বললে, যে সব ফসিলকে এ যুগের বলে অনুমান করা হয়—তাদের সংখ্যা নগণ্য বলা চলে। সমস্ত ইওজোইক যুগটাকেও এর মধ্যে ফেলা হলেই বা আপত্তির কি আছে ?

যাই হোক, বলা বাহুল্য অনেকখানি সময় এই প্রিক্যাম্‌ব্রিয়ান্ যুগের মধ্যে পড়ে। এই সময়টায় গোটা পৃথিবী যুড়ে যে নানান্ ধরনের ওলটপালট হয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নতুন মহাদেশ গজিয়েছে, আবার ক্ষয়ে ক্ষয়ে ধ্বংসও হয়ে গেছে। দেখা দিয়েছে নানা রকম ধাতুর খনি। সে সব ধাতুর মধ্যে ইউরেনিয়াম থেকে শুরু করে সোনা, তামা, লোহা, নিকেল অনেক কিছুই হয়তো ছিল।

প্যালিওজোইক এরা বা পুরাজীবীয় অধিকল্প

পণ্ডিতেরা মনে করেন এই অধিকল্পটি শুরু হয়েছিল আজ থেকে ষাট কোটি বছর আগে এবং শেষ হয়েছিল অনুমান ২৩ কোটি বছর আগে। 'পুরাজীবীয়' নামটা বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন বাংলায়,—ইংরেজী প্যালিওজোইক শব্দটি অনুবাদ করে। ওর মানে হচ্ছে প্রাচীন প্রাণীদের আমল। ৩৭ কোটি বছর বিস্তৃত এই অধিকল্পটিকে আবার ৬টি পিরিয়ড বা কল্পে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে ক্যাম্‌ব্রিয়ান্—যা নাকি প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে চলেছিল। এই ক্যাম্‌ব্রিয়ানের আগেকার সময় বলেই প্যালিওজোইক যুগের আগের যুগকে প্রি-ক্যাম্‌ব্রিয়ান অর্থাৎ ক্যাম্‌ব্রিয়ানের আগের যুগ বলা হয়। ক্যাম্‌ব্রিয়ান কল্পকে আবার তিনটি 'ইপক্' বা অধিযুগে ভাগ করা হয়েছে—নিম্ন, মধ্য, এবং উচ্চ অধিযুগ। এই রকম সব ক'টি কল্পকেই ইপক বা অধিযুগে ভাগ করে নিয়েছেন ভূবিজ্ঞানীরা।

ক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগের যে সব ফসিল পাওয়া গেছে তার মধ্যে নিরস্থিক অর্থাৎ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর ফসিলই প্রচুর দেখা যায়। এর মধ্যে ট্রাইলোবাইট নামে এক জাতের কাঁকড়া-পোকা গোছের প্রাণী (অর্থ্রোপড্) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গাছপালা বলতে সামুদ্রিক অ্যাল্‌গী ; কোন ডাঙ্গার গাছের বা প্রাণীর চিহ্ন এই সব ফসিলের মধ্যে পাওয়া যায় নি। মনে হয় এ সময়কার আবহাওয়া মোটামুটি বেশ গরমই ছিল। মাটির নিচে যে পেট্রোলিয়াম বা খনিজ



প্যালিওজোইক যুগের যে সব ফসিল পাওয়া গেছে

ভালো হয়। যেমন, কোনটা হয়তো দেখতে মাছের মত, কিন্তু সে মাছের চোয়াল বলে কোন পদার্থ নেই। এ সময়েও কোন ডাঙ্গার প্রাণীর চিহ্ন পাওয়া যায় না।

তার পর এল তৃতীয় কল্প—ছ' কোটি বছর যুড়ে সিলিউরিয়ান এবং তার পর ৪র্থ কল্প—ছ' কোটি বছর যুড়ে ডিভোনিয়ান কল্প। প্রথমটিতে দেখতে পাওয়া যায় আরও বেশি মেরুদণ্ডহীন জলচর প্রাণীর ফসিল। সামুদ্রিক কাঁকড়া-বিছে জাতীয় প্রাণী, নানা শতপদী বা বহুপদী প্রাণীর সমাবেশ দেখা যায় এই সময়ে আর তারই সঙ্গে দেখা যায় আদিম যুগের বর্মধারী মাছ—যারা নাকি মেরুদণ্ডী-প্রাণীদের পূর্বপুরুষ। এই কল্পের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে—এই সময়েই প্রথম ডাঙ্গার গাছের ফসিলের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা। শুধু ডাঙ্গার গাছ কেন, প্রথম ডাঙ্গার প্রাণীরও। অবশ্য সে প্রাণীও খুব নিম্নস্তরেরই প্রাণী—কাঁকড়া-বিছে, কেন্নো—এদেরই জাতভাই। তবে খুব সম্ভবত ওরা ওদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ডাঙ্গার ওপরকার বাতাসের ওপরেই নির্ভর করতে শিখেছিল।

ডিভোনিয়ান কল্পেও প্রচুর সামুদ্রিক নিরস্থিক প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে। তবে এই সময় ট্রাইলোবাইটরা প্রায় নিঃশেষ হয়ে আসছিল। তার বদলে দেখা দিচ্ছিল প্লাকোডার্ম (পাত-জোড়া) জাতের মাছ যা এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। বড় বড় হাঙ্গরেরও আবির্ভাব হয়েছিল এই সময়ে। ডাঙ্গায়ও দেখা দিয়েছিল প্রথম সত্যিকারের অস্থিক প্রাণী। তবে

তেল পাওয়া যায় তাও এই সময় থেকে জমা হতে থাকে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। শুধু খনিজ তেল নয়, মার্বল পাথর, স্লেট পাথর, অ্যাস্‌বেস্‌টস্ এবং নানা রকম ধাতু এই সময়টায় পৃথিবীর নানা জায়গায় জমা হতে শুরু করে।

প্যালিওজোইক অধিকল্পের ২য় কল্প হচ্ছে অর্ডোভিসিয়ান পিরিয়ড। এটির বিস্তৃতি প্রায় সাত কোটি বছর। এই সময়কার ফসিলের মধ্যেও প্রচুর ট্রাইলোবাইটের ফসিল পাওয়া গেছে। এ ছাড়া নীচুস্তরের আরও নানারকম শিরদাঁড়াহীন প্রাণী,—বিশেষ করে মোলাস্ক জাতীয় প্রাণীর (যার মধ্যে শামুক-ঝিনুকও পড়ে, আবার স্কুইড, অক্টোপাস জাতীয় প্রাণীও পড়ে) চিহ্ন দেখা যায় এই সময়কার ফসিলগুলোতে। এ ছাড়া কাঁটাওয়ালা একিনোডার্মিস, প্রবাল ইত্যাদি হরেক রকম প্রাণীর ফসিলও আছে তার মধ্যে। আর একটা মজা, এই সময়েই প্রথম মেরুদণ্ডী বা অস্থিক প্রাণী গোছের এক জাতের প্রাণীর আবির্ভাব হয়। তবে তাকে ঠিক অস্থিক না বলে বর্মধারী প্রাণী বললেই বোধ হয়

প্রথম যুগের এই সব ডাঙ্গার প্রাণীরা প্রায় সকলেই ছিল উভচর। ডাঙ্গার প্রাণীদের মত ডাঙ্গার গাছপালারও অনেক ফসিল পাওয়া গেছে এই সময়কার। তার মধ্যে আছে ফার্ন, মস্ ইত্যাদি। এদের কোনটাই কিন্তু ফুল-ফল-দেওয়া গাছ নয়,—যাদেরকে ভালো বাংলায় আমরা বলি সপুষ্পক গাছ। এদের বংশবৃদ্ধি কি ভাবে হ'ত তা অন্যত্র "গাছপালার কথায়" জানতে পারবে। ডিভোনিয়ান কল্পেও খনিজ তেল এবং কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

এর পরের কল্প অর্থাৎ ৫ম পর্বকে বলা হয় কার্বনিফেরাস কল্প। আজকালকার আমেরিকান ভূবিজ্ঞানীরা আবার এটিকেও দু'ভাগ করে নিয়ে তাঁদের দেশের পরিবেশ অনুযায়ী মিসিসিপিয়ান কল্প আর পেনসিলভ্যানিয়ান কল্প নাম দিয়েছেন। তবে আমরা একে কার্বনিফেরাস কল্পই বলব, কারণ কার্বনিফেরাস কথাটার মানে হচ্ছে কয়লা তৈরির কাল। এই সময়টাতেই পৃথিবীর বহু অঞ্চলে কয়লা তৈরি হয়ে জমতে শুরু করে, তাই ঐ নামটিই বেশ খাপ খায়।

তাই বলে মনে ক'র না যে এ সময়টায় বুঝি শুধু কয়লাই তৈরি হয়েছে মা বসুমতীর বুকে। মোটেই তা নয়। জীবজগতেও প্রচুর পরিবর্তন আসছিল এই সময়টায়। ডাঙ্গায় যেমন দেখা দিয়েছিল উভচর প্রাণীর সঙ্গে সঙ্গে সরীসৃপ জাতের প্রাণী, জলেও তেমনি দেখা দিয়েছিল বড় বড় হাঙ্গর, নানা জাতের অতিকায় নিরস্থিক প্রাণী। তা ছাড়া নানারকম কীটপতঙ্গও দেখা দিয়েছিল ডাঙ্গায়। তাদের মধ্যে ছিল অতিকায় আরশোলা, অতিকায় মাকড়সা, ফড়িং, অতিকায় জলফড়িং,—আরও কত কি! শুধু প্রাণীর সংখ্যাই বেড়ে যায় নি ডাঙ্গায়—নানা জাতের ফার্ন, মস্, পাইনের পূর্বপুরুষে ছেয়ে গিয়েছিল ডাঙ্গা। অবশ্য এখনকার মত উঁচু জাতের গাছেরা দেখা দেয় নি তখনও। তবে এদিকে ওদিকে ঐ সব সেকেলে গাছের ঘন জঙ্গল ছেয়ে ফেলছিল ডাঙ্গা। সে ডাঙ্গায় আবার যখন তখন সমুদ্রের জল এসে হানা দিত। যখন জল ফিরে চলে যেত তখন রেখে যেত জলাভূমি। গাছগুলি তারই মধ্যে ঠেলাঠেলি করে দাঁড়াবার জায়গা করে নিতে চেষ্টা করত। যেগুলি ধ্বসে পড়ত সেগুলি মাটি চাপা পড়ে যেত। ধীরে ধীরে তার ওপর জমত স্তরের পর স্তর আরও মাটি। ক্রমে সে মাটিও রূপান্তরিত হ'ত পাথরে আর ক্রমাগত চাপ দিতে থাকত নীচের দিকে। এই ভাবে চলল লক্ষ লক্ষ বছর। সেই মাটি-চাপা-পড়া গাছের জঙ্গলকেও লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সহ্য করতে হ'ল ওপরের চাপ। এদিকে পৃথিবীর ভিতরটা তো বরাবরই ভীষণ গরম, সেই প্রচণ্ড উত্তাপে আর প্রচণ্ড চাপে সেই জঙ্গল ধীরে ধীরে পরিণত হতে লাগল কয়লায়। তাই এ সময়টাকে বিশেষ করে নাম দেওয়া হয়েছে কার্বনিফেরাস কল্প।

কার্বনিফেরাস কল্পের আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে পাহাড়-পর্বতে প্রচণ্ড নাড়াচাড়া চলতে থাকে, আর ইয়োরোপের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় 'আল্প্স্' এই সময়ে মাথা ঠেলে ওপরে উঠতে শুরু করে। বিজ্ঞানীদের মতে কার্বনিফেরাস কল্প চলেছিল সাড়ে ছয় কোটি বছর ধরে।

প্যালিওজোইক অধিকল্পের সবশেষ কল্প হচ্ছে পারমিয়ান কল্প। এটিও চলে পাঁচ কোটি

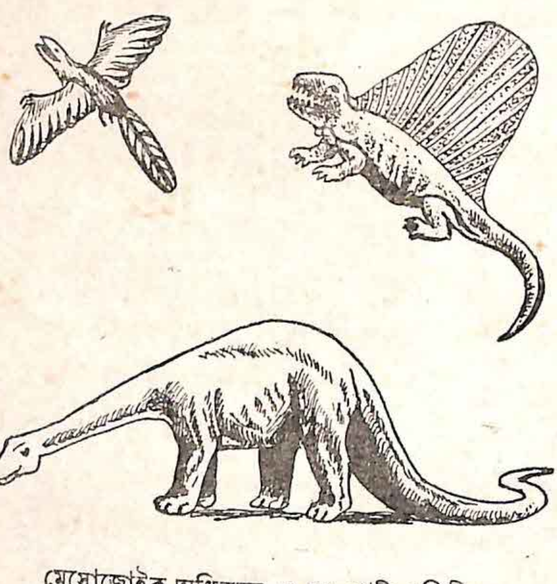
বছর ধরে। প্রাণিজগতে আরও নতুন নতুন প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। শুধু সমুদ্রে নয়,—নদী, হ্রদ, পুকুর প্রভৃতি মিষ্টি জলেও মাছের আবির্ভাব হয়। এ মাছেরা আবার সবাই আগেকার মত আদিম জাতের মাছ নয়, দস্তুরমত হাড়-কাঁটাওয়ালা শিরদাঁড়া-বসানো মাছ। সরীসৃপরাও সংখ্যায় তখন বেশ বেড়ে গেছে, উভচরের সংখ্যা বেশ কমেছে। ট্রাইলোবাইটরা একদম লোপ পেয়ে যেতে বসেছে। প্রাণীদের মত গাছপালাতেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে ডাঙ্গায়। পাইন জাতের গাছের সংখ্যা তো প্রচুর, আবার সাগু জাতীয় পাম্ গাছও গজাচ্ছে এখানে সেখানে। সবই বিরাট উঁচু উঁচু গাছ।

পাহাড়-পর্বতে যে ওলটপালট দেখা গিয়েছিল কার্বনিফেরাস কল্পে তা চরমে উঠল এই কল্পে। বিরাট বিরাট পর্বতমালা দেখা দিতে লাগল পৃথিবীর নানা অঞ্চলে। তার পর? তার পর হঠাৎ শুরু হ'ল প্রচণ্ড খরা। বৃষ্টি আর পড়ে না। নদীনালা, ঝিল-বিল সব শুকিয়ে খাঁ-খাঁ করছে। এ অবস্থায় কি হয় তা তো তোমরা আগেই পড়েছ এই বইএরই অন্য জায়গায় (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৫)। এই ভাবেই গোটা পৃথিবী যুড়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে শেষ হ'ল প্যালিওজোইক অধিকল্পের শেষের ক'টা দিন।

এখানে আর একটা কথা বলে নিই। প্যালিওজোইক অধিকল্পের বিভিন্ন কল্পের নামকরণ কেন ঐ রকম হয়েছে তা জানতে হয়তো তোমাদের কৌতূহল হতে পারে। সাধারণত যে সব জায়গায় ঐ সব কল্পের পাথর প্রথম দেখা যায় কিংবা যেখানে ঐ সব কল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি বেশি চোখে পড়ে সেখানকার নামই নেওয়া হয়েছে কল্পের নামকরণে। যেমন ক্যাম্ব্রিয়া হচ্ছে প্রাচীন ওয়েল্স্-এর নাম, তাই থেকে হয়েছে ক্যাম্ব্রিয়ান। ঐ রকম অর্ডোভিসেস্ও প্রাচীন ওয়েল্স্-এর এক জাতের লোকের নাম, তাই থেকে হয়েছে অর্ডোভিসিয়ান। সিলিউরিস্ হচ্ছে প্রাচীন বৃটেনের এক জাতের লোকের নাম, তাই থেকে হয়েছে সিলিউরিয়ান। ঐ রকম ইংল্যাণ্ডের ডিভোন থেকে হয়েছে ডিভোনিয়ান, রাশিয়ার পার্ম্ থেকে হয়েছে পারমিয়ান।

মেসোজোইক এরা বা মধ্যজীবীয় অধিকল্প

নাম শুনেই বুঝতে পারছ মেসোজোইক মানে মধ্যজীবীয়। ওটা পণ্ডিতদের তৈরি সাধু ভাষা। সহজ ভাষায় ওটাকে আমরা বলব মাঝের যুগের প্রাণীদের আমল। আজ থেকে আন্দাজ ২৩ কোটি বছর আগে এর শুরু, আর আন্দাজ ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে এর



মেসোজোইক অধিকল্পে যে সব প্রাণী পৃথিবীতে রাজত্ব করত

শেষ। অর্থাৎ এই অধিকল্পটির মোট মেয়াদ প্রায় ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ বছর। এই ১৬ কোটি ৭০ লক্ষের মধ্যে আবার আছে তিনটি কল্প—ট্রায়াসিক, জুরাসিক আর ক্রেটেশাস।

আগেই বলেছি প্যালিওজোইক অধিকল্পের শেষটা ছিল প্রচণ্ড খরার যুগ। এজন্য জলের অভাবে সে যুগের বহু প্রাণীকে মেসোজোইক যুগের গোড়ায় আর দেখতে পাওয়া যায় না—অর্থাৎ এ যুগের ফসিলে তাদের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। বিশেষ করে উভচর প্রাণীদের সংখ্যা গেল সবচেয়ে কমে। অনেকেই একেবারে লোপ পেয়ে গেল ; যারা কোন রকমে টিকে রইল তাদেরও হালচাল তেমন যুৎসই মনে হয় না। ওদের ফসিল দেখলেই তা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু বাড়বাড়ন্ত হ'ল সরীসৃপদের, যারা আগে থেকেই ডাঙ্গার—বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত শুকনো ডাঙ্গার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। এজন্যই মেসোজোইক অধিকল্পের প্রথম কল্প ট্রায়াসিক কল্পে আমরা দেখতে পাই অতিকায় সব সরীসৃপদের। ধরতে গেলে এই ট্রায়াসিক এবং তার পরের জুরাসিক কল্পটাতে সরীসৃপরাই ছিল ডাঙ্গার সবচেয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জীব। তাই এই দুই কল্প যুড়ে সমস্ত সময়টাকেই বলা হয় সরীসৃপ-যুগ বা রেপটাইল-এজ।

সরীসৃপরা হচ্ছে টিকটিকি, গিরগিটি, কুমীর—এদেরই জাতভাই। ট্রায়াসিক কল্পে যে সব সরীসৃপ দেখা দিয়েছিল তাদের অনেকগুলির টুকরো টুকরো, এমন কি পুরো কঙ্কালও পাওয়া গেছে। অনেকেরই সামনের দু'টি পা হ'ত ছোট, পেছনের দু'টো বড়। কিন্তু সে দু'পায়েই এরা বেশ জোরে ছুটতে পারত। অবশ্য অনেকে চার পায়েও হাঁটত। কেউ কেউ খেত নিরামিষ, কেউ কেউ ছিল ঘোরতর মাংসাশী এবং অসম্ভব রকম হিংস্র। কেউ থাকত জলে, কেউ জলা জায়গায়, আবার কেউ বা জঙ্গলে। এই সব অতিকায় সরীসৃপদেরকেই বলা হয় ডাইনোসর।

ডাইনোসরদের মধ্যে নিরামিষভোজীরাই হ'ত আকারে বেশি বড়—ষাট, সত্তর, এমন কি আশি ফুট লম্বা। মাংসাশীগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও অনেকেই এ যুগের হাতীর চাইতে অনেক বড় হ'ত। সমস্ত ট্রায়াসিক এবং জুরাসিক কল্প ধরে অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি বছর ধরে এদের দাপটে অন্যান্য প্রাণীরা ত্রাহি ত্রাহি করেছে। এদের কথা আমরা এর আগেও একবার আলোচনা করেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৪-১১৭)।

তার পর হঠাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ডাইনোসর নির্বংশ হয়ে যায়। কিন্তু কেন? আজকাল কোন কোন পণ্ডিত বলছেন ঐ সময় হঠাৎ মহাকাশের একটা জ্বলন্ত গ্রহাণু (ক্ষুদে গ্রহ) প্রশান্ত মহাসাগরে এসে ধাক্কা মারে। সমুদ্রের সব জল বাষ্প হয়ে অপরিমিত ধূলিকণা সমেত ঘন মেঘের আকারে সুদীর্ঘ কাল সূর্যের আলোকে আটকে রাখে। ডাইনোসররা এই প্রতিকূল অবস্থা সামলাতে পারে নি, তাই লোপ পায়। অবশ্য সব পণ্ডিতই যে এ কথা মেনে নিয়েছেন তা নয়।

অনেক পণ্ডিতের মতে ট্রায়াসিক কল্পেই সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবের আভাস পাওয়া যায়, আর জুরাসিক কল্পে

প্রথম যুগের স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য প্রথম দিকের স্তন্যপায়ীরাও অনেকেই ডিম পাড়ত এবং সেই ডিম ফুটেই বেরোত বাচ্চা। তারপর সে বাচ্চা মায়ের দুধ খেত। প্ল্যাটিপাস্ (বাংলা নাম হাঁসঠুঁটো) নামে এই ধরনের এক রকম অদ্ভুত প্রাণী এখনও টিকে আছে পৃথিবীতে। ক্যাঙ্গারুর মত মায়ের-পেটের-থলিতে-আশ্রয়-খোঁজা বাচ্চা দেয় এমন প্রাণীরাও হয়তো এই সময় থেকেই দেখা দেয়। ট্রায়াসিক কল্পে সাইকাড জাতীয় গাছের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়।



জুরাসিক কল্পের অতিকায় উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোড্যাকটিল—এরাই পাখীর পূর্বপুরুষ। এ যুগের গাছপালাও লক্ষণীয়।

ট্রায়াসিক কল্প চলল পাঁচ কোটি বছর ধরে। তার পর জুরাসিক কল্প—সেও চার কোটি ৫০ লক্ষ বছরের কম নয়। ট্রায়াসিক কল্পেই এক জাতের সরীসৃপ হয়তো আকাশে উড়তে শুরু করেছিল, জুরাসিক কল্পে এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এরা পাখীর পূর্বপুরুষ টেরোড্যাকটিল। আকারে এবং হিংস্রতায় এই উড়ুক্কু সরীসৃপরাও ডাইনোসরদের চাইতে বড় কম যেত না।

সমুদ্রেও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় রকমারি অতিকায় প্রাণীর দল। এদের কেউ কেউ আগেই এসে গিয়েছিল পৃথিবীতে। হাতীর চাইতেও বড় আটশুঁড়ো অক্টোপাস, পঞ্চাশ ফুট লম্বা স্কুইড। নীচুস্তরের প্রাণী হ'লে কি হবে, এদের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রাণীরাও বিশেষ আরামে থাকতে পারত না নিশ্চয়ই। এ সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল ডাঙ্গায় প্রথম দেখা দিল ফুল-ফল-দেওয়া গাছপালা—যাদের আমরা বলেছি সপুষ্পক গাছ। অর্থাৎ এখনকার উন্নত ধরনের গাছেরাও ধীরে ধীরে এসে আত্মপ্রকাশ করল এই জুরাসিক কল্পে।

মেসোজোইক অধিকল্পের শেষ ধাপ হচ্ছে ক্রেটেশাস্ কল্প—প্রায় সওয়া সাত কোটি বছর ধরে যা চলেছিল। এই কল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে সরীসৃপ-রাজত্বের অবসান। অতিকায় ডাইনোসররা সবই এই সময়ে হঠাৎ লোপ পেয়ে গেল, যে সব সরীসৃপ রইল তাদের সংখ্যা গেল একেবারে কমে। উড়ুক্কু সরীসৃপ থেকে জন্মাল পাখী—অবশ্য দাঁতাল পাখী। আর একদল সরীসৃপ থেকে জন্মাল সাপেরা। পুরোনো আমলের গাছপালারাও একে একে লোপ পেতে লাগল, তাদের জায়গা দখল করল নতুন যুগের উন্নত শ্রেণীর গাছপালা। সমুদ্রের নানা জায়গায় গজিয়ে উঠতে লাগল চুনাপাথরের পাহাড়—সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা থেকে যাদের জন্ম। ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী, কিন্তু কোটি কোটি একত্র হয়ে তারা যেন অসাধ্যসাধন করে বসল। প্রবাল দ্বীপও জন্মাতে লাগল ঠিক ঐ ভাবে।

কেনোজোইক এরা বা অধুনাজীবীয় অধিকল্প

ভূতাত্ত্বিক যুগের শেষ যুগ হচ্ছে "কেনোজোইক এরা" বা অধুনাজীবীয় অধিকল্প। অর্থাৎ আধুনিক প্রাণীদের আমল। এর শুরু ধরা হয় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে থেকে। এ অধিকল্প এখনও চলছে। এই অধিকল্পে আছে দু'টো ভাগ—টার্সিয়ারী অর্থাৎ তৃতীয় কল্প (৬ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত) এবং কোয়াটার্নারী বা চতুর্থ কল্প (১০ লক্ষ বছর আগে থেকে আজকের দিন পর্যন্ত)। অবশ্য এই কল্পগুলোকেও আবার বিভিন্ন অধিযুগ বা ইপকে ভাগ করা হয়েছে। টার্সিয়ারী কল্পের প্রথম ৫০ লক্ষ বছরকে বলা হয় প্যালিওসিন



শিল্পীর চোখে টার্সিয়ারী কল্পের পৃথিবী : এই সময় থেকেই উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা দিতে লাগল।

অধিযুগ, তারপর ইওসিন—২ কোটি ২০ লক্ষ বছর, ওলিগোসিন—১ কোটি ১০ লক্ষ বছর, মায়োসিন—১ কোটি ২০ লক্ষ বছর এবং প্লায়োসিন—এটাও ১ কোটি ২০ লক্ষ বছর।

টার্সিয়ারী কল্পের আগেই স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে। এ সময়ে আরও উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা দিতে লাগল। তাই এ যুগটাকে বলা যায় স্তন্যপায়ী-যুগ। ডাইনোসরের মত অত বড় না হলেও অতিকায় অনেক স্তন্যপায়ীও দেখা দিল একে একে—যার অনেকগুলিই এখন লোপ পেয়ে গেছে। পাখীদেরও দাঁত লোপ পেয়ে তার বদলে শক্ত ঠোঁট দেখা দিল, কোন কোন পাখীও হ'ল অতিকায়,—উটপাখীর মত কিংবা তার চেয়েও বড়। অবশেষে এল প্রাইমেটরা—মানুষের নিকট জ্ঞাতি এবং নিকট পূর্বপুরুষ। পৃথিবীর চেহারাও তখন অনেকটা এ যুগের মত হয়ে এসেছে। মাটির নীচে জমছে নানারকম খনিজ —তার মধ্যে রয়েছে নানান্ ধাতু, বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়াম। সেই সঙ্গে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি আরও নানা দরকারী জিনিসও জমা হচ্ছে মাটির নীচে।

কোয়টার্নারী কল্পেই আমরা একেবারে আধুনিক জীবজন্তুর দেখা পেলাম। প্রথম দিক্‌কার অতিকায় স্তন্যপায়ীরা অনেকে তো আগেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল, এ সময়ে আরও কিছু লোপ পেল। চার-দাঁতওয়ালা হাতী ম্যাস্টোডন, লোমশ অতিকায় হাতী ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, গুহা-ভালুক, খাঁড়ার মত দাঁতাল বাঘ এদেরও দিন শেষ হ'ল। কিন্তু তার জায়গায় এল সৃষ্টির সবচেয়ে শক্তিশালী জীব—মানুষ। শক্তিশালী গায়ের জোরে নয়,—মগজের জোরে, বুদ্ধির জোরে।

প্রথম যুগের প্রায়-মানুষের এবং সত্যিকার মানুষের কথা তো আমরা আগেই বলেছি

প্রথম যুগের স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাব ঘটে। অবশ্য প্রথম দিকের স্তন্যপায়ীরাও অনেকেই ডিম পাড়ত এবং সেই ডিম ফুটেই বেরোত বাচ্চা। তারপর সে বাচ্চা মায়ের দুধ খেত। প্ল্যাটিপাস্ (বাংলা নাম হাঁসঠুঁটো) নামে এই ধরনের এক রকম অদ্ভুত প্রাণী এখনও টিকে আছে পৃথিবীতে। ক্যাঙ্গারুর মত মায়ের-পেটের-থলিতে-আশ্রয়-খোঁজা বাচ্চা দেয় এমন প্রাণীরাও হয়তো এই সময় থেকেই দেখা দেয়। ট্রায়াসিক কল্পে সাইকাড জাতীয় গাছের সংখ্যা আরও বেড়ে যায়।



জুরাসিক কল্পের অতিকায় উড়ুক্কু সরীসৃপ টেরোড্যাকটিল—এরাই পাখীর পূর্বপুরুষ। এ যুগের গাছপালাও লক্ষণীয়।

ট্রায়াসিক কল্প চলল পাঁচ কোটি বছর ধরে। তার পর জুরাসিক কল্প—সেও চার কোটি ৫০ লক্ষ বছরের কম নয়। ট্রায়াসিক কল্পেই এক জাতের সরীসৃপ হয়তো আকাশে উড়তে শুরু করেছিল, জুরাসিক কল্পে এদের সংখ্যা বেড়ে যায়। এরা পাখীর পূর্বপুরুষ টেরোড্যাকটিল। আকারে এবং হিংস্রতায় এই উড়ুক্কু সরীসৃপরাও ডাইনোসরদের চাইতে বড় কম যেত না।

সমুদ্রেও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় রকমারি অতিকায় প্রাণীর দল। এদের কেউ কেউ আগেই এসে গিয়েছিল পৃথিবীতে। হাতীর চাইতেও বড় আটশুঁড়ো অক্টোপাস, পঞ্চাশ ফুট লম্বা স্কুইড। নীচুস্তরের প্রাণী হ'লে কি হবে, এদের অত্যাচারে সমুদ্রের প্রাণীরাও বিশেষ আরামে থাকতে পারত না নিশ্চয়ই। এ সময়কার আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল ডাঙ্গায় প্রথম দেখা দিল ফুল-ফল-দেওয়া গাছপালা—যাদের আমরা বলেছি সপুষ্পক গাছ। অর্থাৎ এখনকার উন্নত ধরনের গাছেরাও ধীরে ধীরে এসে আত্মপ্রকাশ করল এই জুরাসিক কল্পে।

মেসোজোইক অধিকল্পের শেষ ধাপ হচ্ছে ক্রেটেশাস্ কল্প—প্রায় সওয়া সাত কোটি বছর ধরে যা চলেছিল। এই কল্পের বিশেষত্ব হচ্ছে সরীসৃপ-রাজত্বের অবসান। অতিকায় ডাইনোসররা সবই এই সময়ে হঠাৎ লোপ পেয়ে গেল, যে সব সরীসৃপ রইল তাদের সংখ্যা গেল একেবারে কমে। উড়ুক্কু সরীসৃপ থেকে জন্মাল পাখী—অবশ্য দাঁতাল পাখী। আর একদল সরীসৃপ থেকে জন্মাল সাপেরা। পুরোনো আমলের গাছপালারাও একে একে লোপ পেতে লাগল, তাদের জায়গা দখল করল নতুন যুগের উন্নত শ্রেণীর গাছপালা। সমুদ্রের নানা জায়গায় গজিয়ে উঠতে লাগল চুনাপাথরের পাহাড়—সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা থেকে যাদের জন্ম। ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণী, কিন্তু কোটি কোটি একত্র হয়ে তারা যেন অসাধ্যসাধন করে বসল। প্রবাল দ্বীপও জন্মাতে লাগল ঠিক ঐ ভাবে।

কেনোজোইক এরা বা অধুনাজীবীয় অধিকল্প

ভূতাত্ত্বিক যুগের শেষ যুগ হচ্ছে "কেনো-জোইক এরা" বা অধুনাজীবীয় অধিকল্প। অর্থাৎ আধুনিক প্রাণীদের আমল। এর শুরু ধরা হয় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর আগে থেকে। এ অধিকল্প এখনও চলছে। এই অধিকল্পে আছে দু'টো ভাগ—টার্সিয়ারী অর্থাৎ তৃতীয় কল্প (৬ কোটি ৩০ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে পর্যন্ত) এবং কোয়ার্টার্নারী বা চতুর্থ কল্প (১০ লক্ষ বছর আগে থেকে আজকের দিন পর্যন্ত)। অবশ্য এই কল্পগুলোকেও আবার বিভিন্ন অধিযুগ বা ইপকে ভাগ করা হয়েছে। টার্সিয়ারী কল্পের প্রথম ৫০ লক্ষ বছরকে বলা হয় প্যালিওসিন



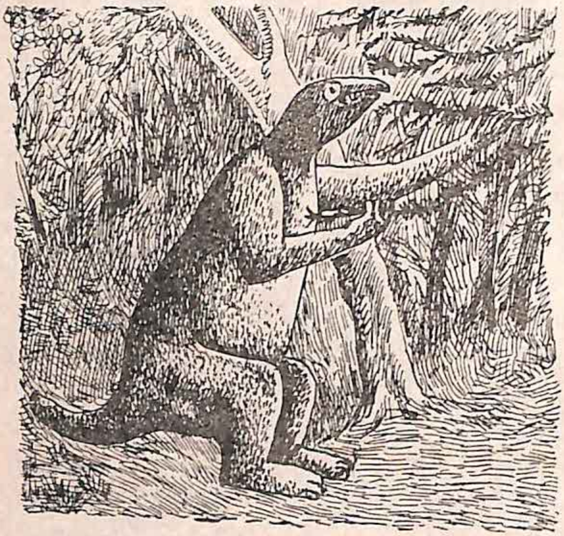
শিল্পীর চোখে টার্সিয়ারী কল্পের পৃথিবী : এই সময় থেকেই উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা দিতে লাগল।

অধিযুগ, তারপর ইওসিন—২ কোটি ২০ লক্ষ বছর, ওলিগোসিন—১ কোটি ১০ লক্ষ বছর, মায়োসিন—১ কোটি ২০ লক্ষ বছর এবং প্লায়োসিন—এটাও ১ কোটি ২০ লক্ষ বছর।

টার্সিয়ারী কল্পের আগেই স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব ঘটেছিল পৃথিবীতে। এ সময়ে আরও উন্নত ধরনের স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা দিতে লাগল। তাই এ যুগটাকে বলা যায় স্তন্যপায়ী-যুগ। ডাইনোসরের মত অত বড় না হলেও অতিকায় অনেক স্তন্যপায়ীও দেখা দিল একে একে—যার অনেকগুলিই এখন লোপ পেয়ে গেছে। পাখীদেরও দাঁত লোপ পেয়ে তার বদলে শক্ত ঠোঁট দেখা দিল, কোন কোন পাখীও হ'ল অতিকায়,—উটপাখীর মত কিংবা তার চেয়েও বড়। অবশেষে এল প্রাইমেটরা—মানুষের নিকট জ্ঞাতি এবং নিকট পূর্বপুরুষ। পৃথিবীর চেহারাও তখন অনেকটা এ যুগের মত হয়ে এসেছে। মাটির নীচে জমছে নানারকম খনিজ —তার মধ্যে রয়েছে নানান্ ধাতু, বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়াম। সেই সঙ্গে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি আরও নানা দরকারী জিনিসও জমা হচ্ছে মাটির নীচে।

কোয়টার্নারী কল্পেই আমরা একেবারে আধুনিক জীবজন্তুর দেখা পেলাম। প্রথম দিক্‌কার অতিকায় স্তন্যপায়ীরা অনেকে তো আগেই লোপ পেয়ে গিয়েছিল, এ সময়ে আরও কিছু লোপ পেল। চার-দাঁতওয়ালা হাতী ম্যাস্টোডন, লোমশ অতিকায় হাতী ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, গুহা-ভালুক, খাঁড়ার মত দাঁতাল বাঘ এদেরও দিন শেষ হ'ল। কিন্তু তার জায়গায় এল সৃষ্টির সবচেয়ে শক্তিশালী জীব—মানুষ। শক্তিশালী গায়ের জোরে নয়,—মগজের জোরে, বুদ্ধির জোরে।

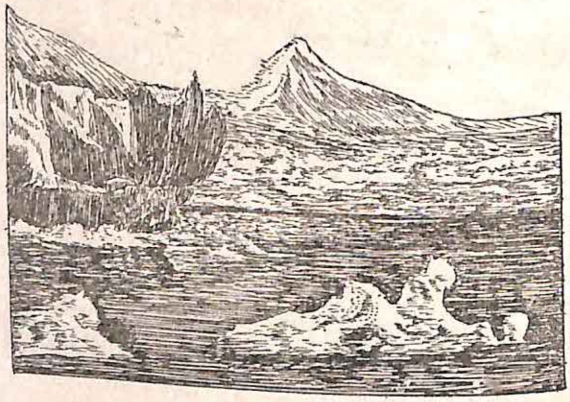
প্রথম যুগের প্রায়-মানুষের এবং সত্যিকার মানুষের কথা তো আমরা আগেই বলেছি



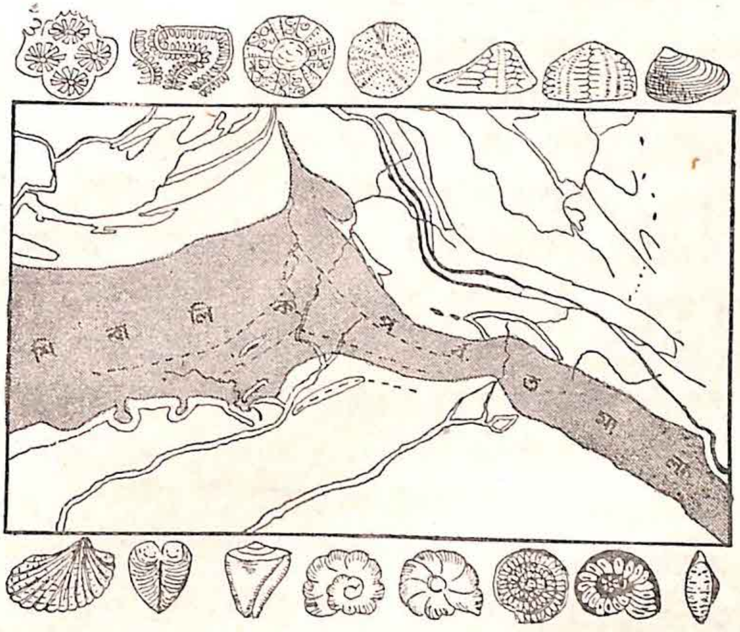
আজ থেকে হাজার বারো বছর আগে পৃথিবীতে যে তুষার যুগ শেষ হয় তাতে অনেক অতিকায় স্তন্যপায়ী জীব নির্বংশ হয়ে যায়। কিন্তু এই অতিকায় হাতীর মত স্লথ জাতীয় জীবটি (মাইলোডন) এখনও লোপ পায় নি বলে বছর ৫০।৬০ আগেও পণ্ডিতদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। অবশ্য একে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

(ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৮-১৩৯)। কোয়াটার্নারী কল্পের প্রথম ভাগেই,—যাকে বলা হয় প্লিস্টোসিন অধিযুগ এবং যেটা শুরু হয় আজ থেকে দশ লক্ষ বছর আগে,—হয়তো এই প্রায়-মানুষদের আবির্ভাব ঘটে। তবে, আগেই বলেছি, সত্যিকার মানুষ এসেছে আরো অনেক পরে, বড় জোর ৩০।৩৫ হাজার বছর আগে। ২য় অধিযুগ,—যাকে বলা হয় রিসেন্ট বা আধুনিক অধিযুগ,—তার শুরু ধরা হয় মাত্র হাজার বারো বছর আগে থেকে। মানুষ তখনও ঠিক সুসভ্য হয় নি, কিন্তু পৃথিবীর আর আর প্রাণীদের চাইতে অনেক বিষয়েই অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এমন কি আগুনের ব্যবহারও শিখে ফেলেছে—যা আজও পর্যন্ত আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী পারল না।

প্লিস্টোসিন অধিযুগের প্রথম দিকেই: কিন্তু পৃথিবীতে একটা অসম্ভব পরিবর্তন ঘটে—ভূতত্ত্বের ইতিহাসে যাকে বলা হয় তুষার যুগ। এ রকম তুষার যুগ অবশ্য আরও কয়েকবার এসেছিল পৃথিবীতে। একবার এসেছিল প্রায় ৭০ কোটি বছর আগে, একবার প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে, আর একবার প্রায় ২০ কোটি বছর আগে ; কিন্তু এত কাছাকাছি সময়ে আর কখনও ঘটে নি এ ব্যাপার। কাছাকাছি বলতে আন্দাজ দশ লক্ষ বছর আগে এর শুরু আর, এক-আধ দিন নয়, এই তুষার যুগ শেষ হয়েছে মাত্র হাজার বারো বছর আগে, যখন থেকে আধুনিক অধিযুগের শুরু। এই দীর্ঘ সময়টা অসম্ভব ঠাণ্ডার পাল্লায় পড়ে হাঁসফাঁস করেছে সমস্ত পৃথিবী। পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক ভাগই চাপা পড়ে গিয়েছিল বরফের তলায়—যা নাকি ছিল কয়েকশ' ফুট পুরু। লক্ষ লক্ষ প্রাণী মারা পড়ল সেই বরফ চাপা পড়ে, কেউ বা মারা গেল খাবারের অভাবে। নির্বংশ হয়ে গেল অনেকেই। যারা ভাগ্যক্রমে বা কৌশলে সেই বরফের হাত



আজ থেকে আন্দাজ দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে শুরু হ'ল এক তুষার যুগ

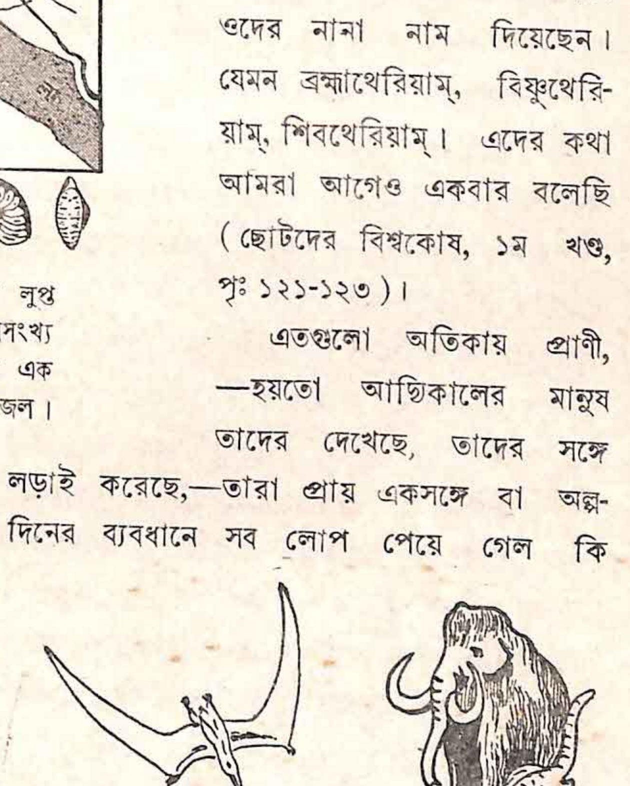


শিবালিক পর্বতমালা—যেখানে একসঙ্গে বহু অতিকায় লুপ্ত স্তন্যপায়ী জীবের ফসিল পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে অসংখ্য সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিলও জানিয়ে দিচ্ছে যে এখানটায় এক সময়, ঐ পাহাড় জেগে উঠবার আগে, টলটল করত সমুদ্রের জল।

এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত গরম জায়গায় আশ্রয় নিতে পেরেছিল তারাই শুধু টিকে রইল।

তোমরা, যারা কলকাতার যাদুঘর দেখেছ, তারা ঢুকেই বাঁ দিকে ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ঘরটিতে দেখবে লেখা আছে "সিউয়ালিক গ্যালারী"। ইংরেজিতে ঐ রকম উচ্চারণ করা হয়, বাংলায় আমরা বলব "শিবালিক"। এই শিবালিক গ্যালারীতে দেখবে বহু অতিকায় স্তন্যপায়ী প্রাণীর টুকরো টুকরো হাড়গোড়, কখনও বা পুরো কঙ্কালের ফসিল সাজানো রয়েছে। প্রথমেই তো চোখে পড়বে একটা বিরাট চার-দাঁতওয়ালা হাতীর মাথা। অত বড় হাতীর কথা এ যুগে আমরা ভাবতেও পারি না। এদেরকেই বলা হয় ম্যাস্টোডন। শিবালিক হচ্ছে একটি পর্বতমালার নাম। এই পর্বতমালা দেরাদুন থেকে বেশি দূর নয়—ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে হিমালয়েরই একটি অংশ বলা যায় একে। এখানে এক সময়ে থাকত অতিকায় সব স্তন্যপায়ীর দল—যাদের বেশির ভাগই এখন পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গেছে। অবশ্য বিজ্ঞানীরা ঐ সব ফসিল দেখে ওদের নানা নাম দিয়েছেন। যেমন ব্রহ্মাথেরিয়াম্, বিষ্ণুথেরিয়াম্, শিবথেরিয়াম্। এদের কথা আমরা আগেও একবার বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২৩)।

এতগুলো অতিকায় প্রাণী,—হয়তো আদিকালের মানুষ তাদের দেখেছে, তাদের সঙ্গে লড়াই করেছে,—তারা প্রায় একসঙ্গে বা অল্পদিনের ব্যবধানে সব লোপ পেয়ে গেল কি

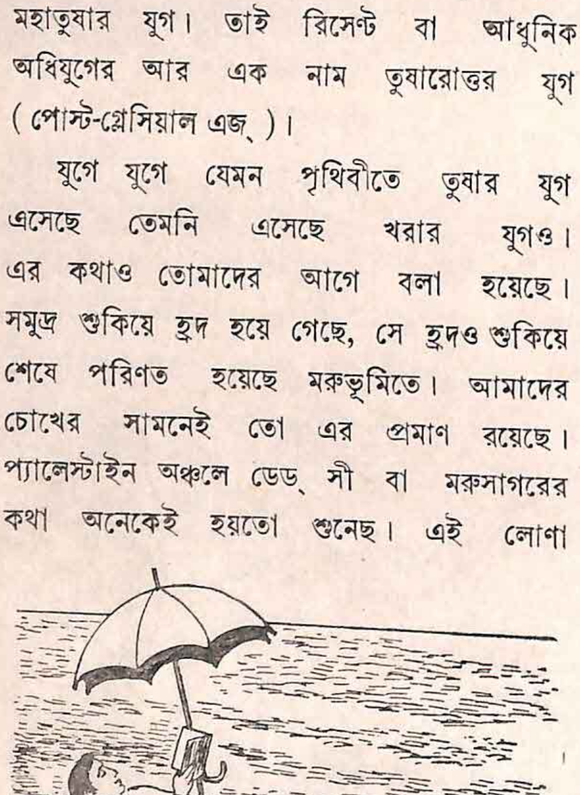


কেনোজোইক অধিকল্পের গোড়ার এবং শেষ দিকের কয়েকটি জীব। এই অধিকল্পেরই সবশেষ প্রাণী হচ্ছে মানুষ। এই অধিকল্প শেষ হয়েছে আধুনিক অধিযুগ দিয়ে

করে? পণ্ডিতদের ধারণা, এর কারণ ঐ তুষার যুগ। ওরাও আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি, তাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

যাই হোক, অবশেষে আস্তে আস্তে একদিন শেষ হ'ল তুষার যুগ, আস্তে আস্তে আবহাওয়াও গরম হতে লাগল। যেটুকু বরফ টিকে রইল তা গিয়ে জমা হ'ল উত্তরের আর দক্ষিণের দুই মেরু অঞ্চলে। পণ্ডিতেরা এই তুষার যুগটার নাম দিয়েছেন "গ্রেট আইস্ এজ্"—অর্থাৎ মহাতুষার যুগ। তাই রিসেন্ট বা আধুনিক অধিযুগের আর এক নাম তুষারোত্তর যুগ (পোস্ট-গ্লেসিয়াল এজ্)।

যুগে যুগে যেমন পৃথিবীতে তুষার যুগ এসেছে তেমনি এসেছে খরার যুগও। এর কথাও তোমাদের আগে বলা হয়েছে। সমুদ্র শুকিয়ে হ্রদ হয়ে গেছে, সে হ্রদও শুকিয়ে শেষে পরিণত হয়েছে মরুভূমিতে। আমাদের চোখের সামনেই তো এর প্রমাণ রয়েছে। প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ডেড্ সী বা মরুসাগরের কথা অনেকেই হয়তো শুনেছ। এই লোণা



মরুসাগরের জল শুকিয়ে এত ভারী হয়ে গেছে যে ঐ সাগরে শুয়ে থাকলেও ডুববার কোন ভয় নেই।

জলের হ্রদ শুকিয়ে শুকিয়ে এখন ওর জলে শতকরা ২৩ ভাগই লবণ। তার ফলে ওর জল এত ভারী যে ওখানে কোন মানুষের ডুববার আর কোন ভয় নেই। ছবিতে দেখ এক ভদ্রলোক কেমন এই হ্রদের জলে শুয়ে শুয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বই পড়ছেন! তাঁর শরীরের ভার ঐ হ্রদের জলের চাইতে হাল্কা বলেই তিনি দিব্যি ভেসে রয়েছেন ঐ জলে।

আমাদের ভারতবর্ষে কি ঘটেছিল

ভূতাত্ত্বিকরা পৃথিবী জন্মাবার পর বিভিন্ন যুগকে কি ভাবে ভাগ করে নিয়েছেন সে কথা তো বললাম, কিন্তু এই দীর্ঘ সময় ধরে গোটা পৃথিবী যুড়ে কোথায় কি পরিবর্তন হয়েছে তা বলা হয় নি। অল্প কথায় তা বলা সম্ভবও নয়। তাই আমরা সে চেষ্টা না করে শুধু আমাদের দেশ ভারতবর্ষে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে তার কথাই শুধু বলব। তাও যতদূর সম্ভব সংক্ষেপেই বলতে হবে।

আমরা ছেলেবেলায় ভারতবর্ষের যে ম্যাপের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম এখনকার ভারতবর্ষ আর সে রকমটা নেই। তার মাথার দিকে পশ্চিম কোণে বেশ খানিকটা জায়গা হয়েছে পাকিস্তান, আবার পূবদিকেও আমাদের সাবেক বাংলার খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে হয়েছে বাংলাদেশ—গোড়ায় সেটাও ছিল পাকিস্তান,—পূর্ব-পাকিস্তান। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক-দের ম্যাপ তো রাজনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না! মানুষের কয়েক শ' বা কয়েক হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস দিয়ে তার হিসেব করা যায় না। লক্ষ লক্ষ—

কোটি কোটি বছর নিয়ে সেখানকার হিসেব। জলস্থল, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদীর ভাঙ্গাগড়ার সে ইতিহাস লেখা আছে পাথরের গায়ে। পণ্ডিতেরা সেই সব পরীক্ষা করেই তাঁদের সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন।

ভারি মজার এ সব সিদ্ধান্ত, শুনলে বিশ্বাসই হতে চাইবে না। যেমন ধর, ভারতবর্ষের জন্মের সময় তার মাথার দিক্‌টা ছিলই না, ছিল কেবল মাঝখান থেকে নীচের দিক্‌টা—যেটাকে আমরা বলি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ, বা আরও ভালো করে বললে, দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপ। কতটা জায়গা? তা কম করে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ বর্গ মাইল হবে। অবশ্য এর সবটাই একসঙ্গে জন্মায় নি কিংবা জলের তলা থেকে মাথা তোলে নি। কিছু অংশ আগে, আবার কিছু অংশ হয়তো কিছু পরে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ আদিম ভারতবর্ষ বলতে গোটা আর্যাবর্তটাই বাতিল হয়ে যায়, শুধু দাক্ষিণাত্য নিয়েই ছিল সেই ভারতবর্ষ। আর হিমালয়? কোথায় তখন হিমালয়! তার নামগন্ধও ছিল না কোথাও।

নগাধিরাজ আরাবল্লী

হ্যাঁ, তবে তার বদলে আর একটা মস্ত পাহাড় ছিল। আরাবল্লী পাহাড়। পাহাড় না বলে পর্বতমালা বলাই ঠিক। এখনকার গুজরাট থেকে শুরু করে রাজপুতানার ভিতর দিয়ে সোজা দিল্লী পর্যন্ত চলে গেছে যে আরাবল্লী তার কথাই বলছি। দিল্লীর রিজ্ অঞ্চলটিও এই আরাবল্লীরই অংশ। আজ অবশ্য আরাবল্লীর সেদিন আর নেই। ক্রমাগত ভেঙ্গে ভেঙ্গে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে, ধুয়ে ধুয়ে সে এখন এমন চেহারায় এসে দাঁড়িয়েছে যে তাকে দেখলে এখন আর বড় পাহাড় বলে কেউ পাত্তা দেবে না। দিল্লীর আরাবল্লী তো একটা সাধারণ মাটির ঢিবি বা টিলা বলেই মনে হয়। কিন্তু সত্যি, চিরকালই আরাবল্লীর এ চেহারা ছিল না। সুদূর মহাকাশে মাথা তুলে সে যখন তার বিরাট্ চেহারা নিয়ে অসীম নির্জনতার দিকে চেয়ে থাকত তখন তার ছিল আর এক-রূপ। মাথার ওপর বরফের চূড়া, সেখান থেকে কত নদী এসে চারদিকে গড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু সেই সুস্বাদু নদীর জল খাবার জন্য কেউ এগিয়ে আসত না, সে নদীতে স্নান করে স্নিগ্ধ হবার কথাও কেউ ভাবতে পারত না। কি করে পারবে? সে যে দু'শ' কোটি বছর আগেকার কথা। আরাবল্লীর বয়স এখন ২৪০ কোটি বছরের কাছাকাছি; আর পৃথিবীতে, আগেই বলেছি, প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে আন্দাজ ৬০ কোটি বছর হবে। কাজেই কী নিঃসঙ্গ, নির্জন, নীরবতার মধ্যে আরাবল্লীর প্রথম জীবন কেটেছে তা সহজেই অনুমেয়।

দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জায়গা

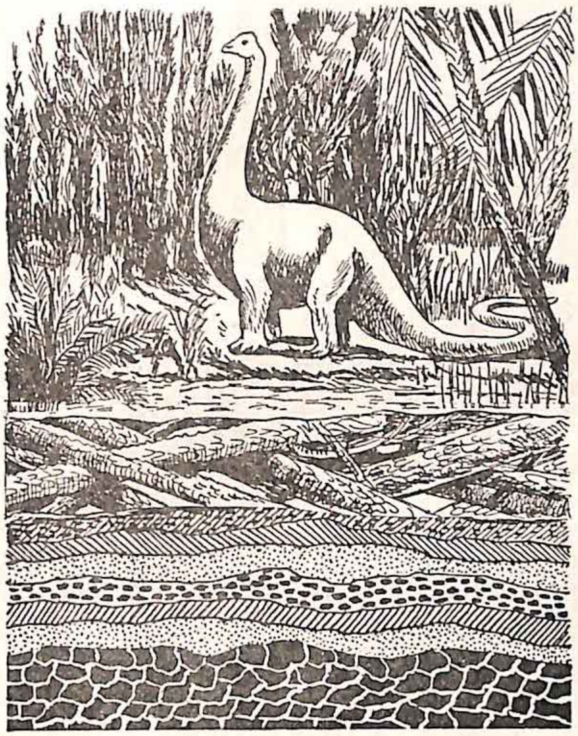
আরাবল্লীর জন্মের অল্প কিছু পরে দাক্ষিণাত্যে আর যে সব জায়গা গজিয়ে ওঠে তাদের মধ্যে কোলার-এর নাম করা যেতে পারে। সেই সোনার খনি কোলার। শুধু সোনার খনি কেন, উড়িষ্যার লোহার খনিও এর কাছাকাছি বয়সী হবে। তারও কিছু পরে, এখন থেকে আন্দাজ ১৫০।১৬০ কোটি বছর আগে আর একটা পর্বতমালা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে পূর্ব প্রান্তে। আমরা এখন সেটার নাম দিয়েছি পূর্বঘাট।

এর পরে এল সাতপুরা পর্বত, বিন্ধ্য পর্বত, গোলকুণ্ডা। সবই দাক্ষিণাত্যে। তখন আরাবল্লী মাথায় আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। পাহাড়কে ভালো বাংলায় "নগ"ও বলা হয়। পাহাড়ের রাজা, তাই নগাধিরাজ। নগাধিরাজ বলতে তো তখন হিমালয়ের কথা ওঠেই না, সে নগাধিরাজ ছিল আরাবল্লী। গোটা ইওজোইক, প্যালিও-জোইক আর মেসোজোইক অধিকল্প ধরে সে-ই সকলের ওপরে।

ভাবতে অবাক্ লাগে, পৃথিবীর মাটি-পাথরে, শিলায় শিলায় এত বার এত রকম বড় বড় পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মাল-ভূমিতে তার ছোঁয়া খুব কমই লেগেছে। সেই আদিম শিলাস্তর নিয়ে সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় ভূমিকম্পেও বিশেষ কিছু ওলটপালট হয় নি তার শরীরে। তবে হ্যাঁ, এর অনেক পরে, কেনোজোইক অধিকল্পের প্রথম দিকে একবার সেখানে একটা বড় রকমের ফিশার ইরাপ্‌শন্ হয়েছিল। ব্যাপারটা কি রকম জান? আগুনে পাহাড়ের কথা তোমাদের আগে বলেছি। সেই যে তিনকোণা পাহাড়ের মুখে থাকে বিরাট গহ্বর বা ক্রেটার! বাংলায় জ্বালামুখও বলা হয়। সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসে ধোঁয়া, আগুন, ছাই আর পৃথিবীর তলাকার গলিত পাথর—যাকে বলা হয় লাভা। ফিশার ইরাপ্‌শনের বেলাও অনেকটা সেই রকমই হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে কোন পাহাড় গজায় না—মাটির বুক চিরে হাজার ধারায় গল্ গল্ করে বেরিয়ে আসে তরল লাভা আর আশপাশ ছেয়ে ফেলে। তার পর যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায় তখন দেখা যায় সেই লাভা হাজার হাজার ফুট পুরু আগ্নেয় পাথরের স্তর হয়ে জমে গেছে। দাক্ষিণাত্যের এই ফিশার ইরাপ্‌শান্ প্রায় পাঁচ লক্ষ বর্গ মাইল জায়গা যুড়ে তার আগ্নেয় পাথরের স্তর জমা রেখে গেছে। সব বেসল্ট পাথর। ইংরেজিতে ওর নাম রাখা হয়েছে ডেকান ট্র্যাপ্। এই রকম পাথরের বুকেই খোদাই হয়ে তৈরি হয়েছে বিখ্যাত অজন্তা গুহাগুলি।

গণ্ডোয়ানা মহাদেশ

এর চেয়েও একটা মজার খবর শোন। শুনলে হয়তো বিশ্বাসই করতে চাইবে না। দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপটা ভারতের অংশ হলেও এক সময় ওটা ছিল আর একটা বিরাট মহা-দেশের সামান্য একটু অংশ মাত্র। আজ যেখানে ভারত মহাসাগর সেটা তখন ছিল ডাঙ্গা। দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে একদিকে দক্ষিণ আমেরিকা, মালয়, দাক্ষিণাত্য, আর ওদিকে মাদাগাস্কার, আফ্রিকা পর্যন্ত যুড়ে ছিল এই প্রকাণ্ড মহাদেশ—যার নাম দেওয়া হয়েছে গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। মহাভারতের গণ্ডো বা গোঁড় জাতির নাম থেকেই নাকি এই নাম। প্যালিওজোইক অধিকল্পের শেষ দিক্ থেকে মেসোজোইক অধিকল্পের শেষ পর্যন্ত—অনুমান প্রায় ১৫ কোটি বছর ধরে এই মহাদেশটি টিকে ছিল। টিকে ছিল বলছি এই জন্য যে ভূমিকম্পে এবং পৃথিবীর ভিতরকার নানা বিপর্যয়ে বড় বড় দেশও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং একটা অংশ থেকে আর একটা অংশ দূরে সরে যায়। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে "মহীসঞ্চরণ" বা "কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্‌ট্"। গাণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের বেলায়ও ঠিক তাই ঘটেছিল —টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে সরে গিয়েছিল এই



ওপরে : গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের জলা জঙ্গল। মেসোজোইক অধিকল্পে এই সব জঙ্গলেই ঘুরে বেড়াত অতিকায় সরীসৃপ ডাইনোসররা। মাঝখানে : পরবর্তী যুগে ঐ জঙ্গলের গাছগুলি মরে গিয়ে মাটি চাপা পড়ছে। নীচে : ওপরের চাপ আর পৃথিবীর ভিতরকার তাপে সে গাছ রূপান্তরিত হচ্ছে কয়লায়। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, ইত্যাদি কয়লা-খনি অঞ্চল এই ভাবেই গড়ে উঠেছে।

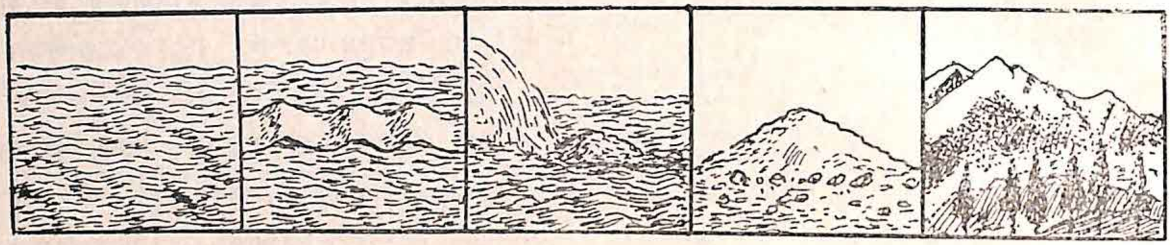
বিরাট মহাদেশের এক একটি অংশ। মাঝখানে ভেসে উঠেছিল সমুদ্র। এইভাবে দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, আফ্রিকা—সব দূরে দূরে আলাদা আলাদা দেশে পরিণত হ'ল। অবশ্য ব্যাপারটা যে হঠাৎ এক মুহূর্তে হয়ে গেল তা মনে ভেব না। এই মহীসঞ্চরণ ব্যাপারটি ঘটতেও কত লক্ষ বা কোটি বছর লেগে গেছে কে বলতে পারে ?

এখন যেখানটাকে আমরা রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ইত্যাদি কয়লা-খনি অঞ্চল বলে জানি সেখানেও ছিল গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। এই জায়গাটায় হয়তো ছিল বিস্তৃত জলাভূমি, আর ছিল সেকালকার এক বিশাল অরণ্য। সে সব জাতের গাছপালা এখন আর বিশেষ দেখা যায় না, কিন্তু তারই মধ্যে ঘুরে বেড়াত সেকালকার সব অতিকায় ডাইনোসররা। নিরামিষভোজী ডাইনোসরদের নিশ্চয় ঐ গাছপালাগুলিই ছিল খাদ্য। কত দিনের কথা সেটা ? তা পনেরো কোটি বছর বা ঐ রকম হবে।

চিরকাল কোন জীবই বাঁচে না। ঐ ডাইনোসররাও বাঁচে নি, ঐ গাছপালাগুলিও বাঁচে নি। মরা গাছ স্যাঁৎসেঁতে জলাভূমিতে হেলে পড়েছে, তার পর পড়েছে মাটি চাপা। যত দিন গেছে, ওপরে নতুন নতুন মাটি এসে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত সে মাটিও মাটি থাকে নি, জমে পাথরে পরিণত হয়েছে। ওপরের সেই পাথরের প্রচণ্ড চাপ আর নীচে পৃথিবীর ভিতর দিক্‌কার প্রচণ্ড তাপ এই দুইএ মিলে সে সব গাছপালাকে কালে রূপান্তরিত করেছে কয়লায়। কয়লার জন্ম তো ঐ ভাবেই হয়। বাংলার প্রান্তদেশে ঐ অঞ্চলটিকে যে কয়লা-খনির অঞ্চল বলা হয় পণ্ডিতদের মতে সেই কয়লার উৎপত্তি হয়েছে এই ভাবেই,—গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের মহারণ্য চাপা পড়ে।

হিমালয়ের জন্ম

তা হলে আবার হিমালয় পাহাড়টা এল কোত্থেকে ? আগেই বলেছি, আমরা যাকে ভারতবর্ষ বলি প্রথম যুগে তা ছিল শুধু দাক্ষিণাত্য উপদ্বীপটুকু যুড়ে। তার উত্তরে প্রায় সমস্তটা যুড়ে ছিল এক বিরাট সমুদ্র, পণ্ডিতেরা এখন তার নাম দিয়েছেন টেথিস



হিমালয়ের জন্ম

একেবারে বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে টেথিস সাগর। তারপর উত্তর দিক্ থেকে ঠেলা খেয়ে ওর তলাটা ভাঁজ হয়ে জায়গায় জায়গায় ঠেলে উঠল। তারপর পলি জমতে জমতে পালল পাথর তৈরি হয়ে একদিন তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল কিন্তু তার গায়ে সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল তার পূর্বপরিচয় ভুলতে দিল না। শেষ পর্যন্ত সে-ই হয়ে দাঁড়াল গিরিরাজ হিমালয়।

সাগর। এই সাগর ৫।৬ কোটি বছর আগেও যে ছিল তার নানা রকম প্রমাণ পাওয়া গেছে আর সে সাগর যে পূর্ব-পশ্চিমে টানা ছিল তারও প্রমাণ যোগাড় করেছেন পণ্ডিতেরা।

টেথিস সাগরের দক্ষিণে কঠিন শিলাস্তর। দুর্ভেদ্য না হলেও তাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া সহজ নয়। যদি উত্তর দিক্ থেকে কোনও প্রবল চাপ বা ধাক্কা এসে লাগে, যা পৃথিবীতে অহরহই ঘটছে,—তা হলে কি হবে? ঘরের মেঝেতে একটা সতরঞ্চ পেতে তার একটা দিক্ শক্ত দেয়ালে ঠেকিয়ে রেখে যদি অন্য দিক্ থেকে ক্রমাগত ঠেলতে থাক তা হলে কি হয় পরীক্ষা করে দেখত পার। সতরঞ্চটা সরে যাবে না, কিন্তু জায়গায় জায়গায় দুমড়ে গিয়ে ভাঁজ হয়ে ওপরে উঠে আসবে। টেথিস সাগরেও নিশ্চয়ই এই রকম একটি কাণ্ড হয়েছিল যার ফলে ওর তলাটা ভাঁজ হয়ে জায়গায় জায়গায় ঠেলে উঠেছিল। ফলে এই সাগর কালক্রমে ভাগ হয়ে গিয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল দু'টি উপসাগরে —যার একটি রইল উত্তর-পশ্চিম দিকে, আর একটি রইল তার বিপরীত দিকে। উত্তর-পশ্চিম উপসাগরে আবার একটা মস্ত নতুন নদী এসে পড়তে লাগল, বিজ্ঞানীরা যার নাম রেখেছেন ইন্দো-ব্রাম নদী।

শুধু ঐ একটা কেন, আরো নানান্ ছোট-বড় নদী নিশ্চয়ই নেমে এসে মিশেছিল টেথিস সাগরের জলে। কিন্তু নদী তো একা আসে না, সঙ্গে নিয়ে আসে প্রচুর পলিমাটি। টেথিস সাগরেও ক্রমাগত জমতে লাগল পলি। আর সেই পলিই শক্ত হতে হতে ক্রমে তৈরি হতে লাগল পালল পাথর—যা নাকি পলিমাটি থেকেই গড়ে ওঠে সমুদ্রের তলায়।

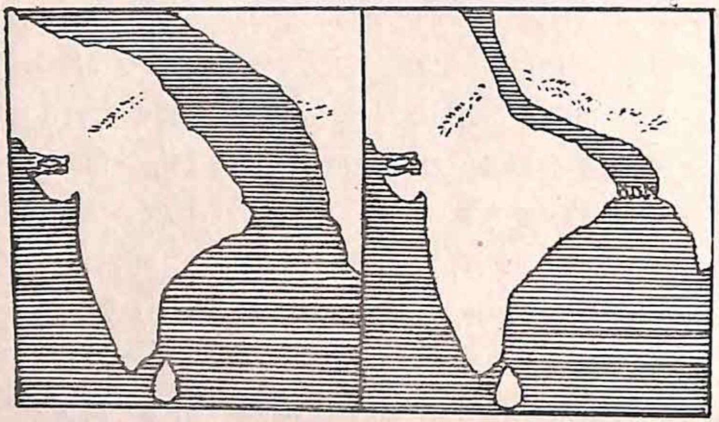
পালল পাথর জমতে থাকে স্তরে স্তরে—ঠিক যেমন কাপড়ের দোকানে তাকের ওপর বা আলমারীর ভিতর থাকে থাকে কাপড় সাজানো থাকে—সেই ভাবে। কিন্তু যদি পৃথিবীর ভিতরকার অশান্ত শক্তিগুলি তলা থেকে যখন তখন মাথা চাড়া দিতে শুরু করে তখন তো আর সে পাথর সুবিন্যস্ত ভাবে থাকতে পারে না, দুমড়ে, মুচড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

টেথিস সাগরের পালল পাথরেও ঠিক এই রকম কাণ্ড হতে লাগল। থেকে থেকে তলাকার

পাথর ঠেলে উঠতে লাগল ওপরে। ঐ ঠেলে-ওঠা অংশগুলিই যে কালে বিশাল হিমালয় পাহাড়ে পরিণত হবে—তখন, সেই ছ' কোটি বছর আগে, কেউ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এ কথা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ত। কিন্তু সত্যিই তাই হ'ল। সেই পালল পাথর জমে জমেই এবং থেকে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ক্রমে সেটা এক বিরাট পাহাড় গড়ে তুলতে লাগল। ঐ সমুদ্রে সে সময়ে যে সব প্রাণী বাস করত—শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ ইত্যাদি—তাদের শক্ত খোলা ফসিলে পরিণত হয়ে এখনও হিমালয়ের স্তরে স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। ডাঙ্গায় তো আর ও-সব প্রাণী থাকতে পারে না, কাজেই সমুদ্রের পলি জমে জমেই যে হিমালয়ের উৎপত্তি এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। অবশ্য মাঝে মাঝে যে তাকে বিরাট এক একটা ধাক্কা হজম করতে হয়েছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান উপমহাদেশের ম্যাপ্‌টা একবার ভালো করে দেখলেই নজরে পড়বে আসামের উত্তর থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত এই হিমালয় যেন একটা ধনুকের মত ঈষৎ বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আবার কাশ্মীরের কাছে নাঙ্গা পর্বতের কাছে সেটা হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড মোচড় খেয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে গেছে—যেখানটাকে বলা হয় সুলেমান পর্বত। তারপর আবার একটু দক্ষিণে গিয়ে বেলুচিস্তানে এসে আর একটা প্রচণ্ড মোচড়! প্রায় ইংরেজী S অক্ষরের মতই বাঁকানো সেটা। এখানে তার নাম থিরথর পাহাড়। এ রকম মোচড় পূবদিকেও দেখতে পাওয়া যাবে। আসামের উত্তর-পূব কোণেও এই রকম একটা মোচড় তাকে ঘুরিয়ে দিয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। পাটকাই বা মণিপুরী পাহাড়, আরাকান ইয়োমা—এ সবেরই উৎপত্তি এই তীব্র মোচড়ের ফলে। এ রকম মোচড়ানো, দোমড়ানো, বিপর্যস্ত স্তর ছড়িয়ে আছে সারা হিমালয়ের অঙ্গে। তার মানে, টেথিস সাগরের পলিমাটিতে তৈরি পালল পাথরে তার শরীর গড়ে উঠলেও সে ঠিক স্তরে স্তরে ঠেলে উঠবার সুযোগ পায় নি, তার আগেই এদিক্ ওদিক্ কোনও দিক্ থেকে প্রচণ্ড চাপ এসে সেই স্তর-গুলিকে কুঁচকে, কুঁকড়ে, দুমড়ে ঠেলে তুলেছে ওপরের দিকে। চাপটা যেখানে খুব বেশি এসেছে সেখানে পাথরের স্তরগুলি হয় অতি-মাত্রায় পিষে গেছে পরস্পরের গায়ে, নয় তো এ ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে পিছলে গেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন এ চাপ প্রধানত এসেছিল উত্তর দিক্ থেকে। টেথিস সাগরের পালল পাথরকে সেই চাপই ঠেসে ধরেছিল গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ডের গায়ে, আর তারই ফলে গোটা পাহাড়টাই বেঁকে গেছে ধনুকের মত। ঠিক একটা চেরা বাঁশকে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে ঠেসে ধরলে যেমনটা হয় তেমনি আর কি! গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড থেকে যে চাপটা আসে নি এ বিষয়ে বেশির ভাগ পণ্ডিতই একমত। কারণ, তাঁদের অনুমান, সে সময়টাতেই গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি কবে তৈরি হ'ল

ইন্দো-ব্রাম নদী সম্ভবত লোপ পেয়েছে আজ থেকে ৫।৬ লক্ষ বছর আগে। কিন্তু তখন আর হিমালয় তুচ্ছ করার মত পাহাড় নয়।



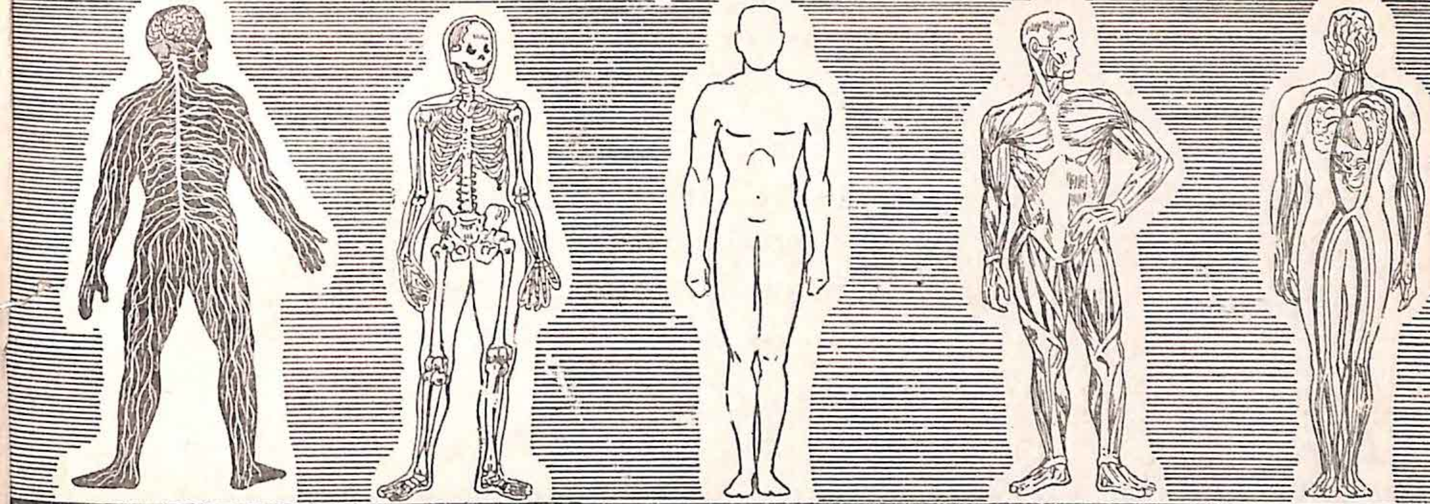
• এখন যেখানে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার,—সেখানেও ৭।৮ লক্ষ বছর আগে ছিল সমুদ্র। তার পর সিন্ধু, গঙ্গার জলধারা পলিমাটি বয়ে এনে এনে ভরাট করে দিয়ে ঐ জায়গাগুলি গড়ে তুলেছে। আমাদের বাংলার জন্ম হয়েছে তারও পরে।

ধাপে ধাপে মাথা উঁচু করতে করতে সে আরাবল্লীকেও ছাড়িয়ে উঠেছে বহু দিন আগেই। তার ওপর দিয়ে একদিক্ থেকে তখন বইতে শুরু করেছে সিন্ধু, গঙ্গা আর যমুনা, অপর দিক্ থেকে ব্রহ্মপুত্র। এদিকে হিমালয় গড়ে উঠবার সময় উত্তর দিক্ থেকে যে প্রবল চাপ এসেছিল তাকে ঠেকাতে গিয়ে দক্ষিণ দিকের প্রায় ২০০ মাইল পর্যন্ত জায়গা নীচের দিকে বেঁকে গিয়েছিল—সেই ধনুকেরই মত। সেই ঢালু জমি দিয়ে ঐ সব নদীর জল সহজেই হু-হু করে বয়ে চলল। বিশেষ করে সিন্ধু আর গঙ্গা নদী শত শত ধারায় পলি এনে সেই নীচু খাদ ভরাট করতে লেগে গেল। ভরাট হয়ে হয়ে সে জায়গা উঁচু হতে হতে ক্রমে গোটা ভারতের সঙ্গে প্রায় সমতল হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ যেখানে এক সময়ে টল টল করত টেথিস সাগরের নীল জল সেইখানেই গড়ে উঠল সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমি। এই ভাবে একে একে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি দেশগুলি গড়ে উঠল সেই সমভূমিতে।

সবশেষে আমাদের বঙ্গভূমি

আর আমাদের বাংলা ? না, তখনও তার জন্ম হয় নি, হয়েছে আরও অনেক পরে। ভারত-মাতার সবচেয়ে ছোট মেয়ে বলতে পার তাকে। পশ্চিম থেকে গঙ্গা আর পূব থেকে ব্রহ্মপুত্রের বয়ে আনা পলি থেকে তার জন্ম। কত দিন আগে ? বড় জোর পাঁচ-ছ' লক্ষ বছর, তার বেশি নয়। পৃথিবীতে মানুষ হয়তো তার আগেই এসে গেছে।

বাংলা (পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ) গড়ার কাজ কিন্তু এখনও শেষ হয় নি। বাংলার নীচেই টলমল করছে বঙ্গোপসাগর তারও খানিকটা খানিকটা বুজে আসছে একটু একটু করে এবং এ ব্যাপার চলছে তো চলছেই। অর্থাৎ এখনও তিল তিল করে গড়ে উঠছে আমাদের এই বঙ্গভূমি। হয়তো ২।১ লক্ষ বছর পরেই দেখা যাবে সেটা দক্ষিণে আরও এগিয়ে গেছে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ওপর টেক্কা দিয়ে। তবে ততদিন পৃথিবীতে এখনকার মানুষ থাকবে কিনা বলা কঠিন। হয়তো মানুষেরই উন্নততর কোন প্রজাতি এসে দখল করবে পৃথিবী। চেহারায়, চালচলনে তারা হয়তো হবে কতকটা আলাদা জীব। ক্রমবিকাশ তত্ত্ব যদি মানতে হয় তবে তো সেই রকমটা হওয়াই স্বাভাবিক।



আমাদের শরীরের কথা

পঞ্চ ইন্দ্রিয়

এর আগে আমরা বলেছি যে আমাদের দেহের রাজা হচ্ছে মস্তিষ্ক। আমাদের শরীরের সব কাজই চলছে এই মস্তিষ্কের হুকুমে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০২৬)। কিন্তু মস্তিষ্ক তো বসে আছে মাথার খুলির ভিতর,—চতুর্দিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ, যেন কোন রকম শত্রু ওর ভিতরে ঢুকতে না পারে। তা হলে শরীরের কাজকর্মের,—বিশেষ করে বাইরের খবরাখবর সে পায় কি করে? এ কাজের জন্যই তৈরি হয়েছে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়—ভালো বাংলায় যাকে আমরা বলি চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্। অর্থাৎ চোখ, কান, জিভ, নাক, আর স্পর্শশক্তি—এরাই বাইরের সব খবর জোগাড় করে জানিয়ে দেয় মস্তিষ্ককে, আর এদেরই সাহায্যে মস্তিষ্ক জানতে পারে দেহের বাইরের তুনিয়ার হালচাল। যেমন ধর, তোমাকে যদি পাগলা কুকুরে তাড়া করে, তা হলে তোমার চোখ তক্ষুনি জানিয়ে দেবে তোমার মস্তিষ্ককে। মস্তিষ্ক তখন তোমার পায়ের মাংসপেশীদের বলবে, "ছুটে পালাও।" অমনি তোমার পা তু'টি আরম্ভ করবে ছুটতে।

আমরা জিভ, নাক আর ত্বকের গল্প তোমাদের বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৯-১০, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৭১০-১১, ৭১৩-১৫)। এবার বলব চোখ আর কানের কথা।

চোখ

চোখ কিন্তু আসলে চামড়া থেকেই তৈরি। কিন্তু ভেবে দেখ, চামড়ার সঙ্গে তার তফাৎটা কী সাংঘাতিকই না হয়েছে! চামড়ার কোষ-গুলি চোখের কাছে এসে সামনে হয়েছে স্বচ্ছ আর পেছনে হয়েছে বেশ কালো। তার ফলে আমাদের চোখ হয়ে উঠেছে একটা ছোট্ট ক্যামেরার মত। ক্যামেরার থেকে চোখ কত ছোট, অথচ কত বেশি কারিগরী তাতে! আমাদের চোখের সামনের জিনিস দূরেই থাক আর কাছেই থাক, চোখের ভিতরের লেন্স কিন্তু ঠিক তা দেখতে পাবে নিজেকে কুঁচকে বা বাড়িয়ে।

বাইরে থেকে ভালো করে চোখটাকে দেখা

যাক। প্রথমেই তো দেখতে পাচ্ছ যে যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন আমাদের চোখে যাতে কোন রকম ময়লা পড়তে না পারে তার জন্য চোখটা চোখের পাতা দিয়ে ঢাকা থাকে। চোখের পাতা খুললেই সামনে যে পর্দা চোখকে ঢেকে রেখেছে তার নাম নেত্রবর্ত্মকলা বা কন্‌জাংক্টাইভা। বাংলা, ইংরেজি দু'টোই বেশ খটমটে নাম। সে যাই হোক, এই কন্‌জাংক্‌টাইভা বা নেত্রবর্ত্মকলা আবার আমাদের চোখের ওপরের ও নীচের চোখের পাতার ভিতরের দিকে একটা আচ্ছাদন তৈরি করেছে। এই নেত্রবর্ত্মকলা প্রতি মুহূর্তেই পরিষ্কার করে দিচ্ছে আমাদের চোখের জল। এই চোখের জল আবার তৈরি করছে অশ্রুগ্রন্থি। চক্ষুকোটরে লুকিয়ে আছে ছোট্ট বাদামের মত একটি গ্রন্থি। এরই নাম অশ্রুগ্রন্থি। ছোট ছোট কতগুলি নল দিয়ে এই গ্রন্থি ক্রমাগত চোখে জল সরবরাহ করে যাচ্ছে—যাতে চোখের ভিতরে যত বাইরের ধুলোবালি পড়ছে সব ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।

শুধু কি তাই? এর ভিতরে আছে জীবাণু মারবার এনজাইম—লাইসোজাইম। এ ছাড়াও ছোট ছোট অশ্রুগ্রন্থি আছে কনজাংক্টাইভার। তোমরা হয়তো ভাবছ, অনবরত এত জল যদি চোখে আসে সে জল যায় কোথায়? যায় ছোট্ট একটা নল দিয়ে নাকে। চোখের জল নাকের ভিতর দিয়েই চলে যায়, কাজেই "নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া" ব্যাপারটা মোটেই কাল্পনিক নয়।

কনজাংক্টাইভার ভিতরে হ'ল অক্ষিগোলক। অক্ষিগোলকের আচ্ছাদন হ'ল তিনটি: (১) বাইরের পর্দা, শ্বেতমণ্ডল এবং অচ্ছোদপটল (স্ক্লেরা এবং কর্নিয়া)। (২) মাঝখানের পর্দা—কৃষ্ণমণ্ডল, সিলিয়ারী বডি ও কনীনিকা। (৩) পেছনের পর্দা—অক্ষিপট।

বাইরের পর্দা

পেছনের ছ'ভাগের পাঁচ ভাগের নাম হ'ল শ্বেতমণ্ডল। তার ভিতর দিয়ে কোন আলো ঢুকতে পারে না। সামনের ছ'ভাগের একভাগের নাম হ'ল অচ্ছোদপটল, এটাই আমাদের চোখে চক্‌চক্ করে, কারণ এ পর্দা একেবারে স্বচ্ছ আর এর ভিতর দিয়েই আলো চোখের ভিতরে ঢোকে। তোমরা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে পড়েছ যে কোন কোন পরোপকারী লোক মরবার সময় চক্ষু দান করে যায়। সে চোখের কাজ হ'ল যাদের অচ্ছোদপটল নষ্ট হয়ে চোখ অন্ধ হয়ে গেছে তাদের চোখে নতুন আচ্ছোদপটল লাগানো।

মাঝখানের পর্দা

এখানে আছে পেছন থেকে ধরতে গেলে কৃষ্ণমণ্ডল (কোরয়ড), সিলিয়ারী মাংসপেশী, আর কনীনিকা (আইরিস)। কৃষ্ণমণ্ডল সত্যি দেখতে একেবারে কালো। কারণ এর ভিতরে আছে চোখের ভিতরের রঙ। কৃষ্ণমণ্ডল তৈরি হয়েছে রক্তজালি দিয়ে আর এই পর্দা থেকেই রক্ত ছড়িয়ে পড়ে চোখের সব দিকে।

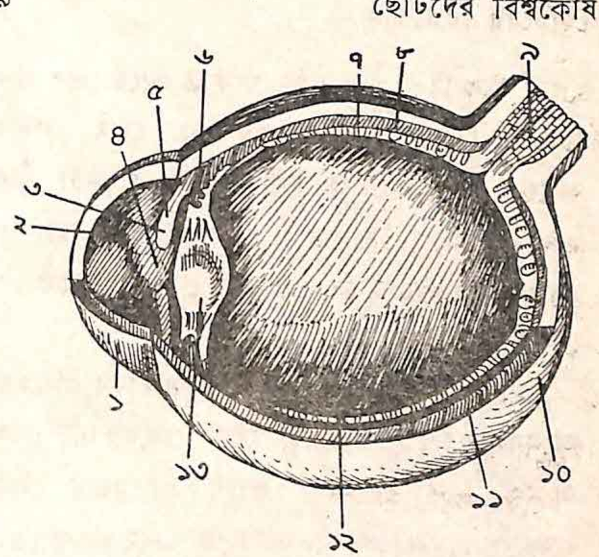
কৃষ্ণমণ্ডল থেকে চোখের সামনে গোল হয়ে চোখের লেন্সের ওপর দেখতে পাওয়া যায় সিলিয়ারী বডি। এর আবার তিনভাগ—পেছনের ভাগ যেন কৃষ্ণমণ্ডলেরই অংশ; দ্বিতীয় ভাগ প্রায় সত্তরটা ছোট ছোট ত্রিকোণ তন্তু দিয়ে গড়া; আর তৃতীয় ভাগ হচ্ছে সিলিয়ারী

মাংসপেশী। এই সিলিয়ারী তন্তু থেকে কতগুলি সুতোর মত জিনিস গিয়ে লাগে লেন্সের গায়ে। এদের নাম সাস্‌পেন্সারী লিগামেণ্ট। এদের কাজ হ'ল দরকার মত লেন্সটিকে ছোট-বড় করা। এদেরও সামনে রয়েছে কনীনিকা। কনীনিকা হচ্ছে একটা গোল পর্দা যার মাঝখানটা ফুটো করে চলে গেছে চক্ষুর তারারন্ধ্র বা পিউপিল। লেন্স আর অচ্ছোদপটলের মাঝখানের জায়গাটাকে কনীনিকা দু'ভাগে ভাগ করে তৈরি করেছে সামনের বড় আর পেছনের ছোট কক্ষ বা ঘর। এর কাজ হ'ল তারারন্ধ্র দিয়ে কত আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রিত করা,—ঠিক ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মত। উজ্জ্বল রৌদ্রে তারারন্ধ্রকে কনীনিকা ছোট করে দেয়, তখন চোখে খুবই কম আলো ঢুকতে পারে। আবার অন্ধকার ঘরে এলে তারারন্ধ্রকে করে দেয় বড়, কাজেই তখন চোখে ঢোকে বেশ একটু বেশি পরিমাণে আলো।

অক্ষিপট বা রেটিনা

সবার ভিতরে আছে চক্ষুর নার্ভতন্তু—অক্ষিপট বা রেটিনা। রেটিনা চক্ষুর পেছন থেকে সামনে সিলিয়ারী বডি পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে আছে। রেটিনা আসলে চোখের নার্ভ—অপটিক নার্ভেরই শাখাপ্রশাখা দিয়ে তৈরি। এই অক্ষিপটের ওপরে কোন ছায়া পড়লে তবেই আমরা তা দেখতে পাই। আর ঐ ছায়া ফেলার কাজটা করছে আমাদের চক্ষুরন্ধ্রের ভিতরের লেন্স।

অক্ষিপটের একটা অংশ তৈরি হয় কতগুলি বিশেষ নার্ভ-কোষ দিয়ে, তাদের নাম রড্‌স্ ও কোন্‌স্। এতে রডপ্‌সিন নামে একটি রঙ



চোখের ছবি

১। কর্নিয়া। ২। অ্যাকুয়াস হিউমার। ৩। কনীনিকা। ৪। তারারন্ধ্র। ৫। কনীনিকা। ৬। সিলিয়ারী মাংসপেশী। ৭। অক্ষিপট। ৮। কৃষ্ণমণ্ডল। ৯। অপ্‌টিক নার্ভ। ১০। বাইরের আচ্ছাদন। ১১-১২। রড্‌স্ ও কোন্‌স্। ১৩। লেন্স।

থাকে। এই রঙ আমাদের চোখে আছে বলেই আমরা দেখতে পাই। এই রঙের জন্য দরকার ভিটামিন 'এ'। সেজন্যই, যাদের খাদ্যে ভিটামিন 'এ'-র অভাব থাকে, তাদের দেখতে অসুবিধা হয়।

চোখের লেন্স

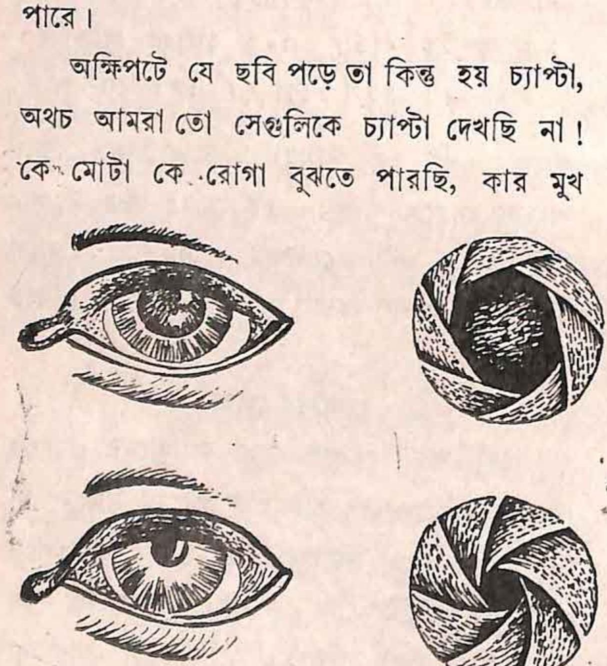
কনীনিকার ভিতরে আছে আমাদের চোখের লেন্স। এই লেন্সের কাজ হ'ল চোখের সামনে যা কিছু এসে পড়ে তাদের ছবি ভিতরে অক্ষিপটে ফেলা, যাতে অক্ষিপটের নার্ভতন্তু সে সব ছবির খবর পৌঁছে দিতে পারে মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কে ঐ খবর না পৌঁছনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা কিছুই দেখতে পাই না।

আমাদের চোখের গড়নটা যাতে ঠিক থাকে, যে সব অংশের কথা বলা হ'ল সে সব অংশগুলি

যাতে ঠিক ঠিক জায়গামত থাকতে পারে তার জন্য চোখের ভিতরে জেলির মত এক রকম পদার্থ আছে। তারই কাজ হ'ল চোখের গড়নটা ঠিক রাখা। লেন্সের সামনে এর নাম জলীয় রস বা অ্যাকুয়াস হিউমার, আর লেন্সের পেছনে কাচিক রস (ভিট্রস্ হিউমার)।

যদিও আমাদের চোখ আর সাধারণ ক্যামেরা অনেকটা একই রকমের, কিন্তু চোখের এই লেন্স অনেক উন্নত ধরনের। কারণ ক্যামেরার লেন্স হচ্ছে শক্ত, চোখের লেন্স হচ্ছে নরম। কাজেই দূরের বা সামনের—যেখানকার জিনিসই দেখবার দরকার হোক না কেন, চোখের লেন্স নিজের দেহকে দরকার মত গোল বা চ্যাপ্টা করে নিতে পারে।

অক্ষিপটে যে ছবি পড়ে তা কিন্তু হয় চ্যাপ্টা, অথচ আমরা তো সেগুলিকে চ্যাপ্টা দেখছি না! কে মোটা কে রোগা বুঝতে পারছি, কার মুখ



ম্লান• আলো আর তীব্র আলো অনুযায়ী আমাদের চোখের তারারন্ধ্র ক্যামেরার ডায়াফ্রামের মতই বড় বা ছোট করা যায়। ওপরে ম্লান আলোয় এবং নীচে তীব্র আলোয় তারারন্ধ্র কেমন হয় তাই দেখানো হয়েছে।

লুচির মত, কার মুখ উঁচু-নীচু বা সুন্দর বেশ বুঝতে পারি! এ সম্ভব হয় আমাদের এক জোড়া চোখ আছে বলে। আমরা দু'চোখে ঠিক একই রকম ছবি দেখি না। এই দু'টি ছবি একটার উপর আর একটা পড়ে বলে জিনিসের ঘনত্বটা ঠিক বুঝতে পারা যায়।

তোমরা হয়তো জান যে ক্যামেরায় যে-ছবি ওঠে সেটা ওঠে উল্টো; তেমনি আমাদের অক্ষিপটের ছবিও হয় উল্টো। কিন্তু মস্তিষ্কে গিয়ে যখন ছবিটা পৌঁছয় তখন তা হয়ে যায় সোজা। আমাদের "স্মৃতি-ই" একে মিলিয়ে নেয় তার জমা-করা ছবিগুলির সঙ্গে এবং সে ভাবেই সে চিনতে পারে যে আমি "রাম" আর তুমি "শ্যাম"।

আর একটা কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান যে আমরা আমাদের চোখে নানান্ রকমের রঙ দেখতে পাই। আমাদের অক্ষিপটের রড্স্ ও কোন্স্রাই আমাদের বলে দেয় কোন্টা লাল, কোন্টা নীল, কোন্টা সাদা, কোন্টা কালো।

কানের কথা

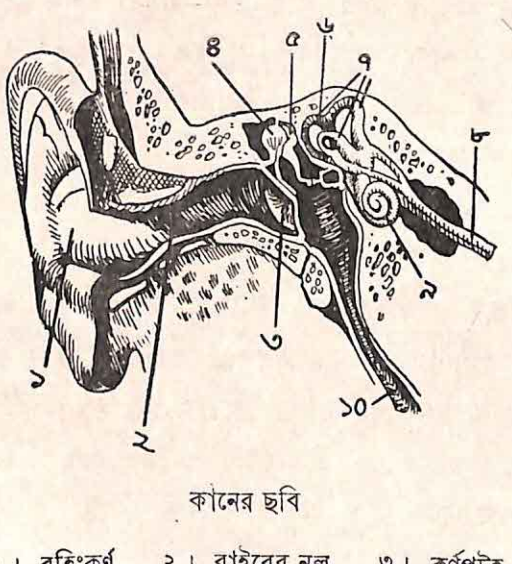
আমাদের মাথার দু'দিকে দু'টো কান। কান না থাকলে আমরা শুনতে পেতাম না—এমন কি কথাও বলতে পারতাম না, কারণ কথা বলাটা তো শিখতে হয় শুনে শুনে। সে জন্য যে যে-দেশে মানুষ হয়, সে সে-দেশের ভাষাই প্রথম শেখে। সেজন্যই বাঙ্গালী ছেলে যখন জলকে বলে "জল", ইংরেজ ছেলে তখন জলকে বলে "ওয়াটার"। অর্থাৎ যে যা শোনে সে শেখে সেই ভাবেই। সে জন্য জন্ম-বোবা কেউ নেই, বেশির ভাগই হ'ল কানে শুনতে পায় না বলে

কথাও বলতে পারে না। কাজেই কান যে শরীরের খুব একটা ফেলনা জিনিস নয় তা তো সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

কানের তিনটি অংশ

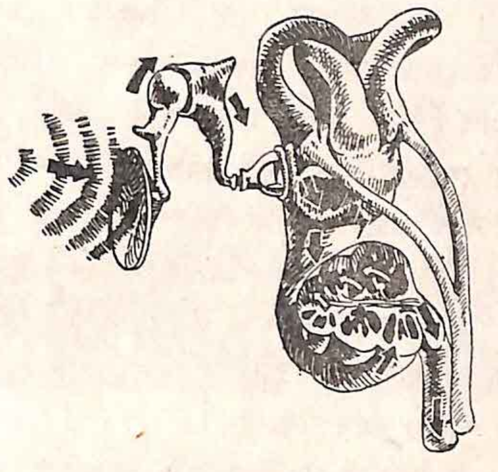
আমাদের কানের তিনটি অংশ, সাধু বাংলায় যাদেরকে বলা হয় বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ।

বাইরের কান তো তোমরা দেখেইছ। হাতীর কান তো কেমন কুলোর মত, বেশ হাওয়া-টাওয়াও খায় তারা ঐ কান দিয়ে। (নাক দিয়েও হাতী অনেক কিছু করে—কারণ শুঁড়টাই ওর নাক)। কিন্তু বাইরের কানের আসল কাজ হচ্ছে শব্দ ধরা। যার কান যত বড় তার শব্দ ধরার শক্তিও তেমনি বেশি। এই কারণেই হাতী আমাদের থেকে অনেক দূরের শব্দ শুনতে পায়।



কানের ছবি

১। বহিঃকর্ণ ২। বাইরের নল ৩। কর্ণপটহ
৪। হাতুড়ি ৫। নেহাই ৬। জীনের পা-দান
৭। অঙ্গবিন্যাসের যন্ত্র ৮। শ্রবণ-স্নায়ু ।৯ অন্তঃকর্ণ
১০। কানের সঙ্গে গলার সংযোগবাহী নল
(ইউস্টেকিয়ান টিউব)



এই ছবিতে দেখানো হচ্ছে কি করে শব্দ আমাদের বহিঃকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে যায়।

এই সব শব্দ সংগ্রহ করে বাইরের কান পাঠায় একটা নলের ভিতর দিয়ে, যেখানে ময়লা জমলে আমাদের কান খুস্‌খুস্ করে। সেই নলটা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা পর্দায়,—তার নাম কর্ণপটহ। বহিঃকর্ণ শেষ হয় কর্ণপটহে।

এবার শোন কর্ণপটহের কি কাজ। তোমরা জান যে শব্দ হ'ল হাওয়ায় একটা তরঙ্গ। এই তরঙ্গ যখন গিয়ে কর্ণপটহে লাগে তখন সেই তরঙ্গের তালে তালে কর্ণপটহও কাঁপতে থাকে।

কর্ণপটহের ভিতর দিকে হ'ল মধ্যকর্ণ। এই মধ্যকর্ণ দিয়ে শব্দ অন্তঃকর্ণে যায় তিনটি খুব ছোট ছোট হাড়ের ভিতর দিয়ে। প্রথম হাড়টির নাম 'হাতুড়ি', কারণ হাতুড়ির মতই দেখতে সেটা। ঐ হাতুড়ির হাতলটি লাগা থাকে কর্ণপটহে। আবার তার সঙ্গে লাগা আছে দ্বিতীয় হাড়টি—যেটি দেখতে নেহাইএর মত —ইংরেজিতে যাকে বলে কামারের 'অ্যান্‌-

ভিল'। কাজেই তার নামও নেহাই। নেহাই আবার লেগে আছে ঘোড়ার জীনের পা-দানের (স্টিরাপ) মত একটি হাড়ে, যার এক অংশ গিয়ে লেগেছে অন্তঃকর্ণের দরজায়। এখন, যেই কর্ণপটহে শুরু হ'ল শব্দের স্পন্দন, সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল হাতুড়ি। সে স্পন্দনকে পাঠিয়ে দিল নেহাইএর কাছে। সে আবার পাঠাল জীনের পা-দানের কাছে। এই ছোট্ট হাড়টি তখন স্পন্দন তুলল অন্তঃকর্ণে।

অন্তঃকর্ণের চেহারা অনেকটা শামুকের মত। শামুকের খোলার ভিতরটা একেবারে ফাঁপা, কিন্তু তার গায়ে গায়ে শ্রবণ-স্নায়ু এসে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক পিয়ানোর চাবির মত। তার ওপরে আছে জলের মত একটি জিনিস, যা অন্তঃকর্ণে স্পন্দন শুরু হ'লেই তোলে ঢেউ। সেই ঢেউ এসে সাড়া দিয়ে তোলে শ্রবণ-স্নায়ুর চাবিগুলিকে। এই চাবিগুলি বাঁধা আছে পিয়ানোর সা-রে-গা-মার মত। কাজেই, যেই ঐ জলের মত জিনিসটির স্পন্দন এসে পৌঁছল এই স্নায়ুগুলির কাছে, তক্ষুনি সেই স্পন্দনের সুরে যে সব চাবিগুলি বাঁধা আছে সেই চাবিগুলিতেও শুরু হয়ে গেল স্পন্দন। আর সেই স্পন্দন চলে এল আমাদের মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কের কাজ এবার আগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা—এটা কিসের শব্দ,—ট্রামের, না বাসের, না গানের, না চীৎকারের।

কানের সঙ্গে গলার সংযোগের জন্যও একটি নল আছে। ইংরেজিতে একে বলা হয় ইউস্টেকিয়ান টিউব। এর কাজ হ'ল কর্ণপটহের বাইরের ও ভিতরের বাতাসের চাপ সমান রাখা।

কানের মধ্যে আর একটি যন্ত্র

কানে কিন্তু আরও একটি যন্ত্র আছে। তার কাজ হ'ল শরীরের অবস্থান বা অঙ্গ-বিন্যাস সম্বন্ধে মস্তিষ্কে খবর দিয়ে শরীরের অবস্থাকে ঠিক মত রেখে দেওয়া।

এ যন্ত্রটি তৈরি হয়েছে তিনটি জলভর্তি ছোট ছোট অর্ধচন্দ্রাকৃতি নল দিয়ে। এক একটি এক এক দিকে রয়েছে, যাতে মাথা যেদিকেই ঘোরানো যাক না কেন এরা টের পাবেই। একটা আছে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, আর দু'টো আছে দু'দিকে খাড়া হয়ে—একটা অন্যের সঙ্গে সমকোণ করে। এদের ভিতরে আছে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোমের মত স্নায়ু। জল যেই নড়ে অমনি খবর পায় এই স্নায়ুরা, আর তক্ষুনি তারা খবর পাঠায় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক তখন সর্বাঙ্গে খবর পাঠায়—আমাদের সর্ব অঙ্গের অবস্থানের খবর।

এদের সঙ্গে আবার আছে দু'টি ছোট ছোট যন্ত্র ;—তাদের নাম ইউট্রিক্‌ল্ ও স্যাকুল। এদের ভিতরে নার্ভতন্তু তো আছেই, তা ছাড়া আছে ক্যালসিয়াম কারবনেটের স্ফটিকের মত ছোট ছোট বস্তু। আমাদের মাথার অবস্থান এবং সমস্ত শরীরের কি অবস্থান তা জানানোই হচ্ছে এদের কাজ। ঐ স্ফটিকের মত বস্তুগুলি নড়ে গিয়ে নার্ভতন্ত্রে তোলে স্পন্দন, আর আমাদের গতি—যেমন হাঁটা, বসা ইত্যাদির খবর জানায় ঐ তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি নল।



সংস্কৃত সাহিত্যের কথা

সংস্কৃত সাহিত্য ও কবি কালিদাস

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাটদের সময়ে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ঐ যুগের মধ্যমণি ছিলেন কবি কালিদাস। কালিদাস কোন্ সময়ের লোক ছিলেন এ নিয়ে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তিনি ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজা চন্দ্রগুপ্তের সভায় নবরত্নদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন।

তাঁর জীবনী সম্বন্ধেও গল্প-কাহিনী ছাড়া বিশেষ কিছু জানা যায় নি। প্রচলিত কাহিনী মতে ব্রাহ্মণসন্তান কালিদাস বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে এক গোয়ালার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন আকাট মূর্খ। এই সম্পর্কে গাছের ওপর এক ডালে বসে সেই ডালই কুড়ুল দিয়ে কাটার কাহিনী তাঁর মূর্খতার প্রমাণ হিসেবে প্রচলিত আছে। যাই হোক, প্রথম জীবনে অপমানিত, অবহেলিত হয়েও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং অধ্যবসায়ের গুণে তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করেন—তাঁর কাব্য-প্রতিভা অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত আলোর মত আপনা থেকে বিকশিত হয়ে ওঠে। তাঁর কাব্য পড়লেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। তিনি বিশাল প্রকৃতির প্রতিটি স্পন্দন, মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, তাদের মনের সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অনুভূতি নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তহীন বৈচিত্র্য ও বিশালতার মধ্যে অন্তর্যামীকে খুঁজে পেয়েছেন। বিভিন্ন দেশ-বিদেশ, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী—তাদের সংশ্লিষ্ট নরনারীর জীবনযাত্রা ও কাহিনী তাঁর নিপুণ কলমের আঁচড়ে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা দেখতে পাই ঋষির অন্তর্দৃষ্টি আর বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি। মধ্যভারতের বিদিশা, উজ্জয়িনী ইত্যাদি অঞ্চল সম্বন্ধেই যেন তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব। তাই থেকে মনে হয় ঐ অঞ্চলেই তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে।

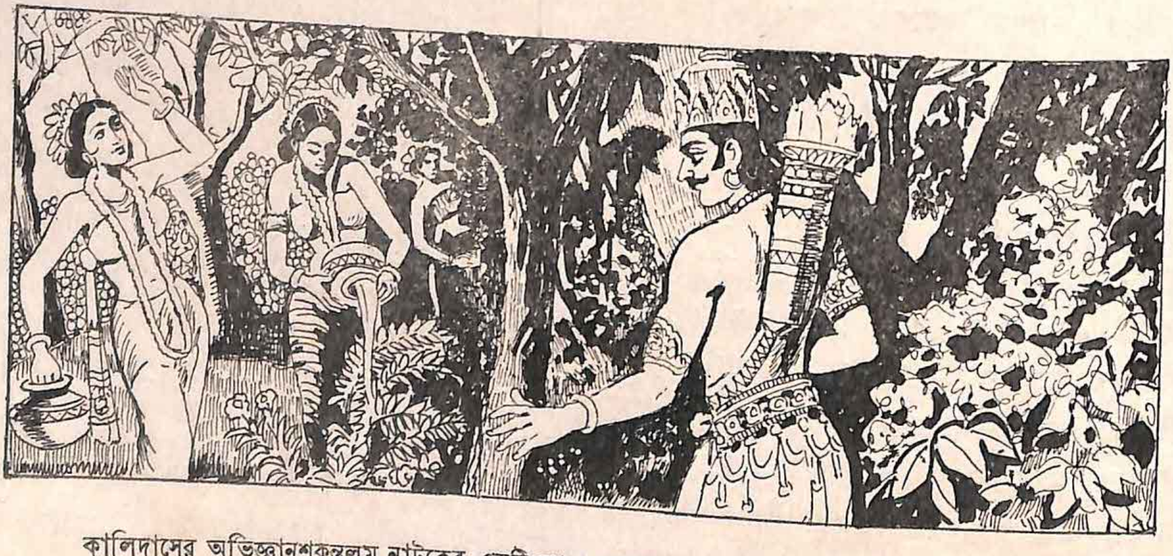
কালিদাসের কাব্যসম্ভারের মধ্যে মালবিকাগ্নিমিত্রম্ প্রথম নাটক। এর কাহিনী পূর্ববর্তী কবি ভাস-লিখিত বাসবদত্তা উদয়নের কাহিনীর মত। বিদর্ভ-রাজকুমারী মালবিকা

এবং বিদিশা-রাজ অগ্নিমিত্রকে নিয়ে রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্রের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা।

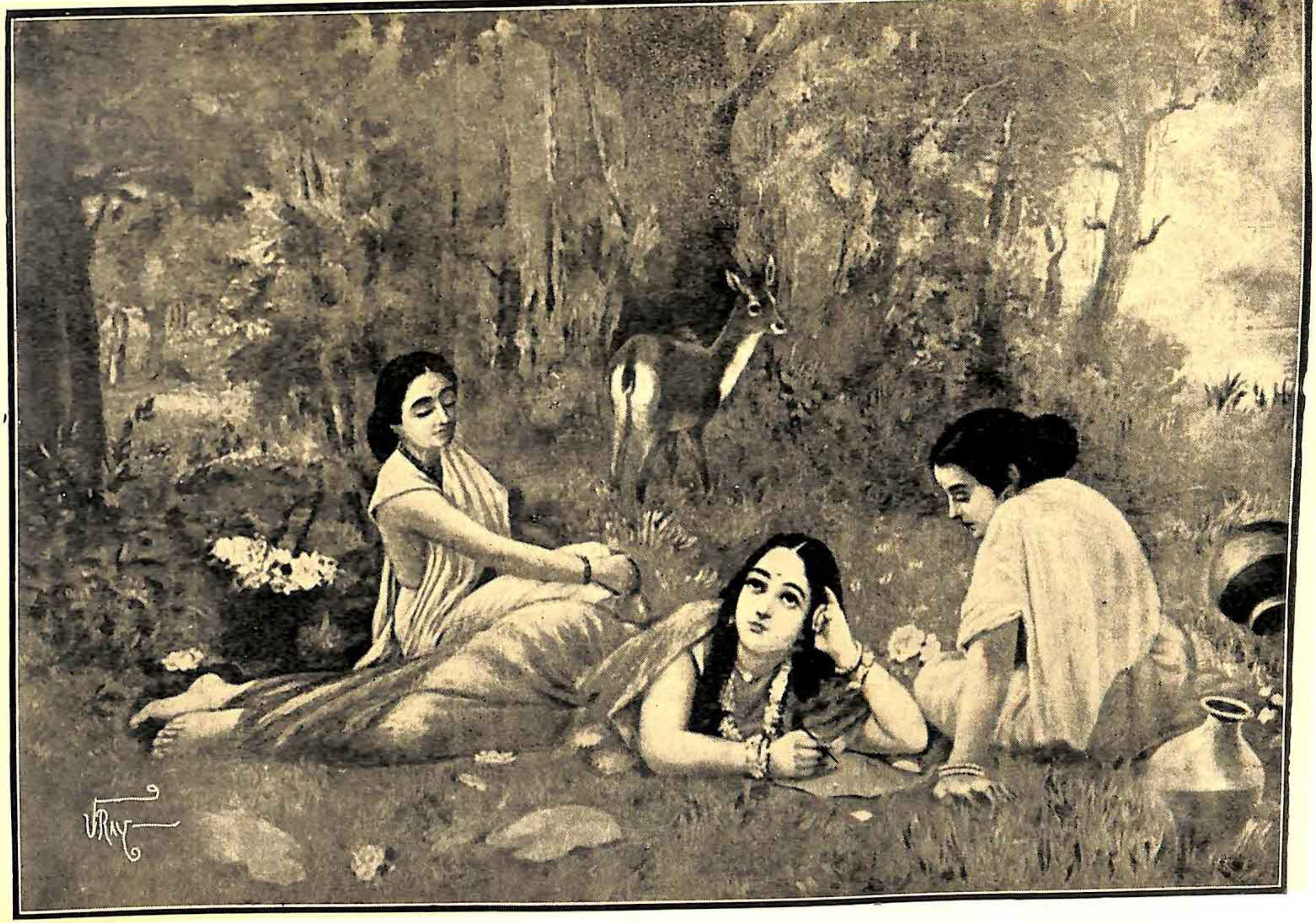
বিক্রমোর্বশীতে মহাভারতের ছোট একটি গল্পকে রূপ দেওয়া হয়েছে। স্বর্গের নর্তকী উর্বশী কৈলাস পর্বতের পথে ফেরার সময়ে দস্যুদের কবলে পড়লে রাজা পুরূরবা তাকে উদ্ধার করে তার বান্ধবীদের কাছে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু এই সময়ে দু'জনেই দু'জনের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকের অভিনয়-কালে উর্বশী রাজার চিন্তাতে এতদূর মগ্ন হয়ে ছিল যে সে তার নৃত্যছন্দ ভুল করে ফেলল এবং পুরুষোত্তম বিষ্ণুর নাম না বলে পুরূরবার নাম উচ্চারণ করল। নাট্যকার ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন তাকে পৃথিবীতে মানবী হয়ে জন্মাতে হবে। পরে সন্তান হলে তবেই মুক্তি পাবে। পৃথিবীতে জন্ম নেবার পর পুরূরবা এবং উর্বশীর মিলন হ'ল এবং কিছুকাল পরে তাঁদের একটি সন্তানও হ'ল। তখন উর্বশীরও স্বর্গে ফিরে আসার সময় হ'ল। কিন্তু উর্বশীবিহীন জীবন পুরূরবার অসহ্য—তাই পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে তিনি বনবাসী হবেন স্থির করলেন। এ সময়ে দেবতা ও অসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রের অনুরোধে দেবতাদের সাহায্য করাতে ইন্দ্র বর দিলেন উর্বশী পুরূরবার সঙ্গে মিলিত হয়ে আজীবন পৃথিবীতেই থাকতে পারবে। এই নাটকের চতুর্থ অধ্যায় আকর্ষণীয়। এতে রয়েছে এক অভিশাপের ফলে উর্বশীর লতারূপ গ্রহণ করাতে তার বিহনে বিরহী পুরূরবার মর্মস্পর্শী কাতরোক্তি। কাব্যসৌন্দর্যে এই অংশ অতুলনীয়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

কিন্তু কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি হচ্ছে অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক। রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়া করতে এসে কণ্ব মুনির তপোবনে প্রবেশ করলেন। সেখানে গাছের গোড়ায় জলসিঞ্চনরতা কণ্ব মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে



কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকের একটি দৃশ্য : তপোবনে জলসিঞ্চনরতা শকুন্তলা ও রাজা দুষ্যন্ত।



শকুন্তলা

চিত্রশিল্পী—রাজা/রবিবর্মা

দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বল্কলপরিহিতা, পুষ্পস্তবকে সজ্জিতা শকুন্তলার সহজ সরল রূপ তাঁর হৃদয় আলোড়িত করে তুলল। বাক্‌পটুতায় শকুন্তলার মন জয় করে তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন দুষ্মন্ত। বন থেকে চলে আসবার সময় রাজা তাঁর আংটি শকুন্তলাকে চিহ্নস্বরূপ রাখার জন্য দিয়ে গেলেন।

একদিন শকুন্তলা তপোবনে বসে স্বামী দুষ্মন্তের কথা চিন্তা করছেন, এমন সময় সেখানে এলেন দুর্বাসা মুনি। শকুন্তলা নিজের চিন্তায় এতই বিভোর হয়ে ছিলেন যে মুনির আবির্ভাব টের পেলেন না। এই দুর্বাসা ছিলেন ভীষণ রাগী। তিনি চটে গিয়ে শাপ দিলেন, যার কথা ভাবতে ভাবতে তুমি আমার অপমান করলে সে তোমাকে একেবারে ভুলে যাবে।

মুনির অভিশাপে রাজা শকুন্তলার কথা সব ভুলে গেলেন। কণ্ব মুনি যখন জানতে পারলেন যে শকুন্তলার সঙ্গে রাজার বিবাহ হয়েছে তখন তিনি কন্যাকে পতিগৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। পিতৃগৃহ হতে বিদায়কালে শকুন্তলার জন্য আশ্রমের বৃক্ষলতা, পশুপাখীদের মনোবেদনা কবি যে অপূর্বসুন্দর ভাব ও ভাষায় বর্ণনা করেছেন সমস্ত বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা নেই। শকুন্তলার বিরহে প্রকৃতিরও যেন অশ্রু ঝরছে। আকাশে চাঁদ ডুবে গেছে, সরোবরে পদ্ম চোখ খুলছে না। শুধু তাদের মনের পাতায় স্মৃতিটুকু রয়েছে। বাংলা করে বললে—

"মৃগের খসি' পড়ে মুখের তৃণ,
ময়ূর নাচে না যে আর,
খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে
যেন সে আঁখি-জলধার।"

কণ্ব শকুন্তলার আসন্ন বিদায়কালে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলছেন—"কি আশ্চর্য, আমি বনবাসী তপস্বী, তাও শকুন্তলার বিয়োগ-ব্যথার চিন্তায় আমার মন ভারাক্রান্ত, কণ্ঠ রুদ্ধ, দৃষ্টি অশ্রুভারে ব্যথিত। না জানি এমন অবস্থায় গৃহীদের কতই না দুঃখ হয়!" তারপরই আবার ব্যথা ঝেড়ে ফেলে কন্যার শুভচিন্তায় মঙ্গল কামনা করে বলছেন—

"মাঝে মাঝে পদ্মবনে পথ তব হোক মনোহর,
ছায়াস্নিগ্ধ তরুরাজি ঢেকে দিক তীব্র রবিকর।
হোক তব পদধূলি অতি মৃদু পুষ্পধূলিনিভ,
হোক বায়ু অনুকূল, শান্তিময় পন্থা, হোক শিব।"

আবার কন্যা পতিগৃহে গিয়ে যাতে সুগৃহিণী হতে পারে তার জন্যও সস্নেহ উপদেশ দিচ্ছেন—

"সেবা ক'রো গুরুজনে,
সপত্নীরে জেনো সখীসম,
অপরাধী পতি 'পরে
রোষভরে হয়ো না নির্মম।
পরিজনে দয়া রেখো,
সৌভাগ্যে হয়ো না আত্মহারা,
গৃহিণীর এই ধর্ম,—
কুলনাশী অন্যরূপ যারা।"

জলে স্নান করতে গিয়ে রাজার দেওয়া স্মরণচিহ্ন সেই আংটিটি গেল হারিয়ে। দুর্বাসার অভিশাপ ফলল। শকুন্তলা আসলে ছিলেন স্বর্গের অপ্সরী মেনকার কন্যা। রাজা দুষ্মন্ত রাজসভায় বসে শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না, কোন দিন দেখেছেন বলেও স্বীকার করলেন না। মর্মাহতা কন্যা এবার মা মেনকার আশ্রয় নিলেন। কিছুকাল পরে এক

জেলে মাছ ধরতে গিয়ে মাছের পেটে একটা আংটি পেল। এ সেই শকুন্তলাকে দেওয়া আংটি—মাছটা গিলে ফেলেছিল। নগরপালরা জেলের কাছে রাজার আংটি দেখে তাকে চোর বলে রাজার কাছে ধরে নিয়ে এল। এত দিন পরে সেই অভিজ্ঞান আংটিটি দেখে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরে এল, কিন্তু শকুন্তলা তখন অনেক দূরে।

কিছুদিন পরে দেবতাদের সাহায্যে যুদ্ধ করে স্বর্গ হতে ফেরার পথে মারীচ মুনির আশ্রমের কাছে একটি সুন্দর বালককে ক্রীড়ারত দেখে রাজার হৃদয় বাৎসল্যরসে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কবির ভাষাতে তাঁর মনের কথা হ'ল, 'এই অপরিচিত শিশুর স্পর্শসুখে আমার হৃদয় পুলকিত—শিহরিত হয়ে উঠছে। এ-শিশু যার সন্তান না জানি এর স্পর্শে তার কত আনন্দ হবে!' বলা বাহুল্য শিশুটি শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পুত্র, নাম ভরত। পরিশেষে কিছুদিনের মধ্যেই রাজা ও শকুন্তলার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটল।

শকুন্তলা নাটক শুধু সংস্কৃত নয়, বিশ্বসাহিত্যে অমর সৃষ্টি। এর ভাব, ভাষা, দৃশ্যমান্ সমস্ত বস্তুর উপর কবির সমদৃষ্টি, গভীর অনুভূতিপূর্ণ মানবিকতা কাব্যসাহিত্যে অতুলনীয়। তপস্যা, সংযম ও নিষ্ঠা দ্বারা পবিত্রীকৃত যে ভালোবাসা তাই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা—এই নাটকে কালিদাস তাই সুনিপুণ ভাবে দেখিয়েছেন। কালিদাস যদি আর কোনও কাব্য বা নাটক রচনা নাও করতেন তবুও এই একখানি নাটকই তাঁকে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ কবিরূপে যশোমণ্ডিত করে রাখত। সংস্কৃতে রচিত শকুন্তলার ইংরেজি অনুবাদের জার্মান অনুবাদ পড়ে অমর কবি গ্যেটে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন:

"যদি কেউ বসন্তের ফুল ও শরতের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেউ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেউ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেউ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করবার ইচ্ছা করে, তা হলে হে অভিজ্ঞানশকুন্তল, আমি তোমার নাম নির্দেশ করি এবং তা হ'লেই এক কথায় সব বলা হ'ল।"

কুমারসম্ভবম্, রঘুবংশম্ ও মেঘদূতম্

যেমন নাটকে তেমনি কাব্যরচনায়ও কালি-দাস অদ্বিতীয়। কুমারসম্ভব কাব্যে কবি একটি দুরূহ বিষয়বস্তু অদ্ভুত কুশলতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। তারকাসুরের অত্যাচারে স্বর্গ-মর্ত্য বিধ্বস্ত। দেবতারা প্রার্থনা জানালেন শিবকে এক দুর্ধর্ষ দেবসেনাপতি সৃষ্টি করে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য। দেবতাদের প্রার্থনা মহাদেব প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। ফলে হিমা-লয়ের কন্যারূপে পার্বতীর জন্ম, মহাদেবকে বর-রূপে পাবার জন্য তাঁর তপস্যা, পার্বতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ এবং মহাবীর কার্ত্তিকের জন্ম—এই হ'ল কাব্যের বিষয়বস্তু। কুমারসম্ভবের শেষাংশটি কালিদাসের নিজের রচিত কিনা এ বিষয়ে মতভেদ আছে। রুচির দিক্ দিয়ে ওটি তাঁর রচনার সঙ্গে একেবারেই বেমানান।

কালিদাসের রঘুবংশ আদিকবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ অনুসরণ করে লেখা। কবি তাই সবিনয়ে প্রথমেই ক্ষমা ভিক্ষা করে বলছেন—



কুমারসম্ভবম্ ঃ পার্বতীর তপস্যা (দু'পাশে) ও হরপার্বতীর মিলন (মাঝখানে)

"ক্ব সূর্যপ্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥
মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যামুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

অর্থাৎ কোথায় অতিবৃহৎ সূর্যবংশ আর কোথায়ই বা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি? আমি অজ্ঞানতাবশতঃ যেন ভেলার দ্বারা দুস্তর সমুদ্র পার হ'তে চাইছি। মন্দকবি কবিযশঃপ্রার্থী হ'তে গেলে তার অবস্থা কি রকম হয়?—না, যে ফল কেবল মাত্র প্রাংশু—কিনা দীর্ঘকায় ব্যক্তিই নাগাল পেতে পারেন তার জন্য যখন কোন বামন হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার চেষ্টা করে তখন সে যে ভাবে উপহাসাস্পদ হয় সেই রকম।

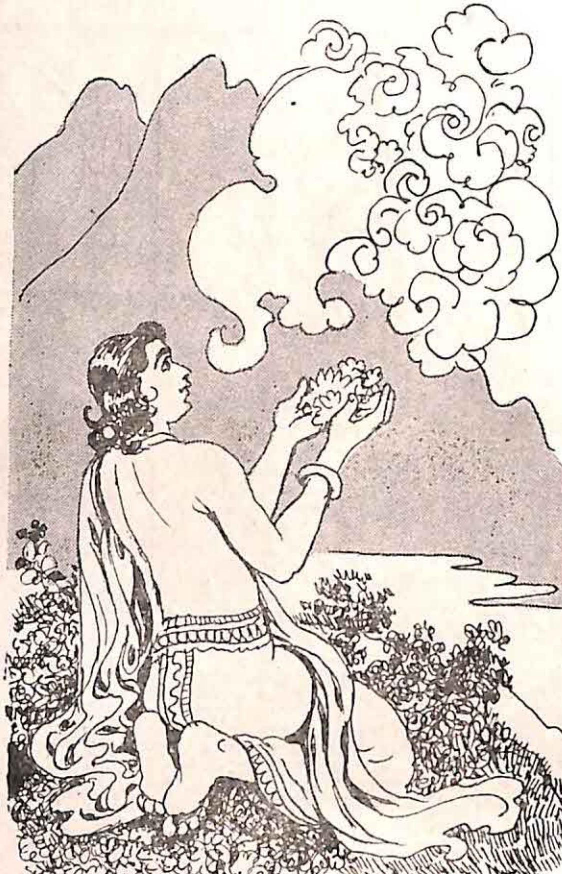
তবু কেন লিখতে গেলেন?

রামচন্দ্রের পূর্বগামী রঘুবংশীয়দের গুণ বর্ণনা করে যা বলছেন তার বাংলা হ'ল,

"আজন্ম যাঁহারা শুদ্ধ,
কর্ম যাঁরা নিয়ে যান ফলে,
সসাগর রাজ্যেশ্বর,
ধরা হতে স্বর্গরথ চলে।
যথাবিধি হোমযাগ,
যথা কাম অতিথিঅর্চিত,
যথাকালে জাগরণ,
অপরাধে দণ্ড যথোচিত।
দান হেতু ধনার্জন,
মিতভাষা সত্যের কারণ,
যশ আশে দিগ্বিজয়,
পুত্র লাগি কলত্রবরণ।
শৈশবে বিদ্যার চর্চা,
যৌবনে বিষয়-অভিলাষ,
বার্ধক্যে মুনির ব্রত,
যোগবলে অন্তে দেহ নাশ।
এ হেন বংশের কীর্তি
বর্ণিবারে নাহি বাক্যবল,
অতুল সে গুণরাশি
কর্ণে আসি করিল চঞ্চল।"

রঘুবংশ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট মহাকাব্য। এতে সূর্যবংশীয় নরপতিদের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। এই কাব্যকে একটি বিরাট মঞ্চের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কালিদাস রাজা দিলীপ থেকে মঞ্চ গেঁথে দশরথ পর্যন্ত উঁচু করে তুলেছেন এবং তার ওপর রামচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠিত করে সেই মঞ্চের সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেছেন। পরে রামের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই মঞ্চের গাঁথনি ক্রমে খসতে এবং ভাঙ্গতে শুরু করল এবং পরিশেষে অগ্নিবর্ণকে নিয়ে তা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এরূপ আকাশচুম্বী এবং সর্বব্যাপী কল্পনা কাব্য-সাহিত্যে আর কোথাও কখনও দেখা যায় নি। চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য, রচনার সরসতা ও লালিত্য, ভাব ও ভাষার মাধুর্য এবং লোক-শিক্ষার জ্বলন্ত নিদর্শন হিসেবে এই কাব্যের তুলনা নেই।

মেঘদূত কালিদাসের কল্পনাশক্তির অপর এক অপূর্ব বিকাশ। অলকাপতি কুবেরের ভৃত্য যক্ষ ছিল ভীষণ স্ত্রৈণ। ফলে নিজের কর্তব্য কাজে অবহেলা করাতে প্রভুর অভিশাপে রামগিরি পর্বতে সে নির্বাসিত হ'ল। সেই নির্জন জায়গায় গিয়ে সে প্রিয়তমা পত্নীর বিরহে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ল। অবশেষে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে পর্বতের সানুদেশে একখণ্ড মেঘকে দেখে তাকে দূত করে তার স্ত্রীর কাছে নিজের কুশলবার্তা পাঠাবে বলে স্থির করল। কুর্চি ফুলে অর্ঘ্য রচনা করে সে মেঘকে অর্চনা করল। তারপর করুণ আকুতিতে বলে চলল রামগিরি থেকে অলকাপুরী যেতে মেঘকে যে সব পথ অতিক্রম করতে হবে তারই বর্ণনা,—পথে যেতে যত দেশ, নদনদী, গিরি-বন-উপবন, পথ, রাজ-



মেঘদূতম্ কাব্যের একটি দৃশ্য : নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে অর্চনা করল।

ধানী পার হয়ে যেতে হবে তাদের সৌন্দর্য এবং শোভা। যে সব নরনারীর দেখা মিলবে তাদের বৈশিষ্ট্য অনুপম ভাষায় বর্ণনা করল সে। কোন্ পথে মেঘ তার দৌত্যবার্তা নিয়ে যাবে, কোথায় বিশ্রাম করবে এবং কোথায় ঝরে পড়বার পর আবার নতুন করে জলসম্ভার নিয়ে কি ভাবে অলকাপুরীর প্রাসাদে যক্ষবধূর ঘরে জানালা দিয়ে প্রবেশ করে নিজের কুশলবার্তা পৌঁছে দেবে তাও বলে দিল। এই বর্ণনার অপূর্ব ভাব, ভাষা এবং কল্পনা-প্রভাবে মন মুগ্ধ হয়ে পড়ে—মনে হয় এ রকম কাব্যরস আর কোথাও পাওয়া যায় না।

যক্ষবধূর বর্ণনা দিতে গিয়ে যক্ষ বলছে—

লতার লতিয়ে যাওয়ায় তার দেহসুষমা, চমকিত হরিণীর দৃষ্টিতে তার আঁখিপাত, ময়ূরের রঙবাহারী পাখায় তার শাড়ীর আঁচল, আর নদীর ছলছল তরঙ্গভঙ্গে তার কপট ভ্রূভঙ্গিমা। কিন্তু এমন কিছু নেই যার একটি দিয়ে তার তুলনা করা যায়।



যক্ষবধূ স্বামীর অপেক্ষায় দিন গুণছে। (মেঘদূতম্)

আবার আর এক জায়গায় ঃ

"তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী,
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।"

(তন্বী, শ্যামা, ইঁদুরের বা পাহাড়ের সূচাল চূড়ার মত দাঁত, পাকা তেলাকুচোর মত ঠোঁট, কোমর সরু, চকিতহরিণীর মত চাহনী, নাভিদেশ গভীর ইত্যাদি।)

মেঘদূতের পূর্বমেঘ রামগিরি থেকে অলকাপুরী যেতে পথের বর্ণনা আর উত্তরমেঘে গন্তব্যস্থল অলকাপুরী আর সেখানে বিরহব্যথাতুরা যক্ষবধূর বর্ণনা—এই হ'ল মেঘদূতের বিষয়বস্তু। পূর্বমেঘে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে উত্তরমেঘে অলকাপুরীতে নিত্যসৌন্দর্যের মধ্যে মেঘ তার যাত্রার পরিণতি পাবে। শকুন্তলাতে যেমন, মেঘদূতেও ঠিক তেমনি। মিলনের আগের চঞ্চলতা মিলনের পরে চিরস্থায়ী, আনন্দময় এবং শান্তিপূর্ণতা লাভ করেছে।

আর একটি কথা, কালিদাসের রচনায় যে অসম্ভব সুন্দর সুন্দর উপমা দেওয়া আছে বিশ্বসাহিত্যে তাও প্রায় দুর্লভ। এজন্য কথায় বলে "উপমা কালিদাসস্য"।

কালিদাসের আগের যুগে সংস্কৃত সাহিত্য

কালিদাসের কাব্যসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর পূর্বেকার কয়েকজন কবি ও সাহিত্যিকের অবদানও সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রভূতরূপে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে। খৃষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন নাট্যকার ভাস। তাঁর রচনা-কৌশল, ঘটনা-বিন্যাস এবং ভাবের উৎকর্ষতার জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত ১৩খানি নাটকের মধ্যে প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধ্যরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তা, চারুদত্ত, বালচরিত ও উরুভঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধ্যরায়ণ নাটকে আছে রাজা উদয়ন হাতী শিকার করবার জন্য গভীর বনে গেলেন। হাতে তাঁর বীণা। তাঁর বাজানো বীণার সুরে বনের বাঘ পর্যন্ত বশীভূত হয়। হাতী শিকারও তাঁর নেশা। এই নেশার সুযোগ নিয়ে উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোৎ কৌশলে তাঁকে বন্দী করে নিয়ে এলেন আপন রাজ্যে। বন্দী উদয়নের পরিচয় গোপন করে তাঁকে রাজা নিজকন্যা বাসবদত্তাকে অন্তরালে রেখে বীণাবাদন শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করলেন। কিন্তু আড়ালে রাখলে কি হবে, দু'জনের মধ্যে গড়ে উঠল একটি

মধুর সম্পর্ক। উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধ্যরায়ণের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত রাজা প্রদ্যোৎ নিজেই উদয়নের হাতে কন্যা বাসবদত্তাকে সম্প্রদান করে তাঁকে তাঁর রাজ্যে পাঠিয়ে দিলেন।

স্বপ্নবাসবদত্তা রচিত হয়েছে এর পরের ঘটনা নিয়ে। মন্ত্রী যৌগন্ধ্যরায়ণ রাজা উদয়নের এবং তাঁর রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কুশল চান। কিন্তু রাজা যদি শুধু বাসবদত্তাকে নিয়েই পড়ে থাকেন তবে রাজ্যের মঙ্গল কি করে হয়? রাজশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তিনি উদয়নের সঙ্গে মগধ-রাজকুমারী পদ্মাবতীরও বিবাহ দিতে চান, যাতে মগধরাজ উদয়নের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সহায়তা করেন। কিন্তু বাসবদত্তা ছাড়া উদয়নের কোনও দিকেই নজর নেই। পরিশেষে বাসবদত্তা নিজেই আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে মন্ত্রীর সহায়তায় অন্য প্রকার নাটকীয় পরিস্থিতির পর পদ্মাবতীর সঙ্গেও উদয়নের বিবাহ ঘটান।

কালিদাস-পূর্বযুগে অপর একজন বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন শূদ্রক। তাঁর জীবিতকাল খৃঃ পূঃ ১ম অথবা ২য় শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। তাঁর রচিত মৃচ্ছকটিক বিখ্যাত নাটক। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং নর্তকী বসন্তসেনার কাহিনী এর উপজীব্য। এই নাটকে গতানুগতিক রাজা-রাজড়ার কাহিনী ছেড়ে সমাজের মধ্যবিত্ত নরনারীর জীবনের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এদিক্ দিয়ে এটি একটি নতুন রকমের উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেছিল বলা যায়। চারুদত্ত নর্তকী বসন্তসেনার অনুরাগী, কিন্তু তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল রাজার শ্যালক। তারই ষড়যন্ত্রের ফলে চারুদত্তকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হ'ল এবং তার প্রাণদণ্ডাদেশ হ'ল। শেষটায় আর্যক নামে চারুদত্তের এক অনুরাগী বন্ধুর সহায়তায় তার মুক্তি হ'ল এবং বসন্তসেনাকেও সে ফিরে পেল। মৃচ্ছকটিক কথাটির মানে মাটির তৈরি গাড়ী।

রাজাদের সংস্কৃতচর্চা

সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকজন রাজার অবদানও অসামান্য। মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা শূদ্রক উজ্জয়িনীর রাজা হয়েছিলেন। গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত ভাবুক কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। সপ্তম খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ হর্ষবর্ধন-রচিত রত্নাবলী, নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা বিখ্যাত নাটক।

মুদ্রারাক্ষস-রচয়িতা বিশাখদত্তও ছিলেন রাজপুত্র। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে রচিত এই নাটকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব দেখা যায়। রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চাণক্য এবং নন্দ রাজার মন্ত্রী রাক্ষসের রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং কুশলতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতার কথা নিয়ে নাটকটি লেখা। এর কাহিনী আমরা আগেই পরিবেশন করেছি —দেশ-বিদেশের সেরা বই বিভাগে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮১-৪৮৬)। রাজনৈতিক জটিলতাকে বিষয়বস্তু করে সাহিত্যরচনা—সে যুগে এ একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চা

বাংলাদেশের রাজা আদিশূরের আমন্ত্রণে কনৌজ থেকে যে ক'জন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভট্টনারায়ণ। ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বেণীসংহার রচনা করেন। এটি একটি বীর-রসাত্মক নাটক। কৌরবসভায় দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করে তাঁকে লাঞ্ছিত করলে ভীম প্রতিজ্ঞা

করলেন দুঃশাসনের রক্তে হাত রাঙ্গা করে সেই হাতে তিনি দ্রৌপদীর বেণী বন্ধন করে দেবেন। এই কাহিনী নিয়েই নাটকটি রচিত। এই নাটকে রয়েছে সূতপুত্র কর্ণের একটি বিখ্যাত উক্তি—যার বাংলা অনুবাদ হচ্ছে :

"যেমন তেমন হোক মোর জাত,
হই ডোম আমি, হই চামার,
জন্মের কুল সেটা দৈবাৎ,
পৌরুষ সেটা সবই আমার।"

বাংলা দেশের অপর দুই বিখ্যাত কবি ছিলেন গোবর্ধন এবং জয়দেব। এঁরা দু'জনেই ছিলেন একাদশ শতাব্দীতে সেনরাজা লক্ষ্মণ-সেনের সভাকবি। গোবর্ধনের রচনা আর্যাসপ্ত-



জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ কাব্যে রাধা ও কৃষ্ণ

শতী একখানি সুন্দর কাব্য। আর জয়দেবের লেখা গীতিকাব্য—গীতগোবিন্দ তো পৃথিবী-বিখ্যাত। রাধাকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমকাহিনী নিয়ে এটি রচিত। ভাবে, ভাষায় এবং ছন্দমাধুর্যে এই কাব্যের তুলনা মেলে না। এই কাব্যের মধ্যেই আছে বিখ্যাত দশাবতার-স্তোত্র যা প্রতিদিন ভক্তেরা ঘরে ঘরে আবৃত্তি করেন :

"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে।"
ইত্যাদি।

কালিদাসের পরের যুগের অন্যান্য কবিরা

কালিদাসের পরবর্তী যুগে বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন ভবভূতি, রাজশেখর, ভারবি, কুমারদাস, মাঘ এবং দণ্ডী প্রভৃতি। এ যুগের কাব্যের বিশেষত্ব এই যে এগুলিতে বর্ণনীয় বিষয়ের চেয়ে বর্ণনার রীতি, দেহগঠনের চেয়ে দেহসজ্জার প্রতিই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। গভীর অনুভূতি বা ভাবসমৃদ্ধির চেয়ে বর্ণনা-বৈচিত্র্য, অলঙ্কার-পারিপাট্য এবং ছন্দের চকমকিই বেশি নজরে পড়ে। ভবভূতি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁর রচিত মহাবীর-চরিত এবং উত্তররাম-চরিত নতুন ধরনের সৃষ্টি। প্রকৃতির ভয়ঙ্কর এবং মনোহর রূপ, মানুষের মানসিক বৃত্তিগুলির সূক্ষ্ম বর্ণনা এই নাটক দু'টির বৈশিষ্ট্য। যদিও এই গ্রন্থে রামায়ণের রামচরিত্রই বর্ণিত হয়েছে তবু সেই ঘটনাগুলোকেই এক নতুন রূপ দিয়ে সাজানো হয়েছে। তাঁর অপর নাটক মালতীমাধব গতানুগতিক ভালোবাসার কাহিনী নিয়ে রচিত।

রাজশেখর ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় কবি। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে রচিত তাঁর বালরামায়ণ, বালভারত, কর্পূরমঞ্জরী বিখ্যাত গ্রন্থ।

ভারবি ছিলেন ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি যুগের লোক। তাঁর কাব্যকে টীকাকার মল্লীনাথ



অর্জুন ও কিরাতরূপী শিব ঃ কিরাতার্জুনীয়ম্ কাব্যের একটি দৃশ্য

ঐ সময়ে কাব্যের মধ্যে দিয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এই ভট্টিকাব্যটি রচনা করেন।

অষ্টম শতকের কবি মাঘ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে শিশুপালবধ বিখ্যাত। কৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নিধনের কাহিনী নিয়ে এটি লেখা।

মাঘের মৃত্যু সম্বন্ধে চলিত কাহিনীটি কিন্তু বড়ই করুণ। নিদারুণ দারিদ্র্যনিপীড়িত কবির ঘরে সব সময়েই অন্নাভাব। তাই একটি শ্লোক লিখে তিনি গৃহিণীকে রাজ-দরবারে পাঠালেন, যদি কিছু অর্থ-সাহায্য পাওয়া যায়। কবি-গৃহিণী প্রাপ্ত সাহায্য নিয়ে আসার পথে কয়েকটি ক্ষুধাতুর ভিক্ষুককে দেখে সব অর্থ বিলিয়ে দিয়ে শূন্য হাতে ঘরে ফিরে এলেন। তখনও কয়েকটি ভিক্ষুক আকুল প্রত্যাশায় তাঁকে অনুসরণ করে আসছে। কবি এই দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে দারিদ্র্যের ব্যথা বর্ণনা করে কয়েকটি শ্লোক রচনা করেন এবং ক্ষুধার্ত, পীড়িত অবস্থাতেই মৃত্যুকে বরণ করেন। মাঘ যে শুধু কবি ছিলেন তাই নয়, জ্যোতিষ, পুরাণ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। মাঘের জনপ্রিয়তার নিদর্শন নীচের শ্লোকটি থেকে পাওয়া যায় ঃ

"উপমা কালিদাসস্য, ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং, মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥"

অর্থাৎ কালিদাসের কৃতিত্ব উপমায়, ভারবির অর্থগৌরবে এবং দণ্ডীর কৃতিত্ব তাঁর পদ-

নারকেলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বাইরের সাজসজ্জা ও রুক্ষতা অতিক্রম করে এঁর কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করলে অপরূপ মাধুর্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারবির রচিত কিরাতার্জুনীয়ম্ অর্জুন এবং কিরাতরূপী শিবের সংঘর্ষ এবং অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেবের তাঁকে পাশুপত অস্ত্র প্রদানকাহিনী নিয়ে লেখা।

ভর্তৃহরি ভারবির প্রায় সমসাময়িক। তাঁর রচিত ভট্টিকাব্য ২২টি সর্গে বিভক্ত বিশাল কাব্য। এতে রামের জন্ম থেকে সীতা উদ্ধার এবং পরে বনবাসের পর রাজ্যলাভ-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ভট্টিকাব্য ব্যাকরণভারে পীড়িত। এর কারণ সম্বন্ধেও একটা কাহিনী প্রচলিত। একদিন কবি তাঁর শিষ্যদের ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার সময় সেই পথে একটি হাতী তাঁদের সম্মুখ দিয়ে চলে যায়। এই ব্যাপারকে দুর্লক্ষণ মনে করে এক বছরের জন্য তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখেন। কিন্তু ব্যাকরণ না শিখলেই বা কি করে চলে? তাই

লালিত্যে। কিন্তু মাঘের রচনায় এই তিনটি গুণই আছে।

গদ্য সাহিত্য

কালিদাসের পরের যুগে গদ্য সাহিত্যের দিক্‌পাল ছিলেন দণ্ডী, সুবন্ধু এবং বাণ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দণ্ডী জীবিত ছিলেন। কাঞ্চীর রাজসভাতে তিনি ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দশকুমারচরিতম্' দশটি চরিত্রের সাধারণ জীবনকাহিনী। তাঁর রচনা সরল, প্রাঞ্জল। চরিত্র-চিত্রণেও তিনি সফল হয়েছিলেন। গদ্য-রচনাতে তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

সুবন্ধু লিখিত বাসবদত্তা একটি ভালোবাসার কাহিনী নিয়ে লেখা।

রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণ বা বাণভট্ট লিখিত দু'টি গদ্যকাব্য হর্ষচরিত ও কাদম্বরী বিশেষ প্রসিদ্ধ। হর্ষচরিতে বাণ রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজপদে অভিষিক্ত হবার পূর্বে মালবরাজ কর্তৃক তাঁর বোন রাজ্যশ্রীকে অপহরণ, তাঁর আত্মহত্যার চেষ্টা, এক বৌদ্ধ ভিক্ষু কর্তৃক তাঁর প্রাণরক্ষা এবং শেষে ভাই ও বোনের মিলন বর্ণনা করেছেন। বাণের শ্রেষ্ঠ রচনা কাদম্বরী। কাদম্বরী শব্দের অর্থ সুরা বা মদ। সুরাপানে মানুষ যেমন আত্মহারা হয় এই কাব্য পাঠ করলেও তাই হাওয়ার কথা। এজন্যই বোধ হয় ঐ নামকরণ হয়েছিল। যদিও উপন্যাসটির নায়িকার নামও কাদম্বরী। কাদম্বরী যদিও প্রাচীন সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যের নিদর্শন, তবু দুরূহ সমাসবদ্ধ অতিদীর্ঘ বাক্য এই গ্রন্থটিকে অনেক জায়গায় ভারাক্রান্ত করে



সংস্কৃত উপন্যাস কাদম্বরীর একটি দৃশ্য : রাজা শূদ্রক ও শুকপাখী

তুলেছে। ক্রিয়াপদ নিয়ে বাক্য আরম্ভ হ'লে কর্তৃপদের নাগাল পাওয়া যায় বহু পরে, একেবারে বাক্যের শেষ দিকে। তাতে লেখকের রচনাকৌশল এবং উপমা প্রয়োগের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেলেও মূল আখ্যান প্রায় ভুলে যেতে হয়। উজ্জয়িনীর চন্দ্রাপীড় এবং গন্ধর্ব-রাজকুমারী কাদম্বরীকে নিয়ে এই গদ্যকাব্য বা উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল।

অনেকার্থ কাব্য

কালিদাসের পরবর্তী যুগে অনেকার্থ কাব্যের প্রচুর চলন হয়। একই শ্লোকের দুই বা ততোধিক অর্থের চমৎকারিত্বে এক নতুন রকম কাব্যের সৃষ্টি হয়। কোন কোন কবি আবার দুই বা ততোধিক অর্থেও সন্তুষ্ট না হয়ে পূর্ণ কাব্যে দুই বা ততোধিক নায়কের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যেমন বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপাল-চরিত কাব্যকাহিনীতে ভগবান্ রামচন্দ্রের কাহিনী এবং একই যোগে রাজা রামপালের জীবনীও বর্ণনা করেছেন। কবি

চিদম্বর রাঘবপাণ্ডবীয় যাদবীয়তে রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের কথা বলেছেন। এ ধরনের রচনাও একটি আশ্চর্য প্রতিভার নিদর্শন সন্দেহ নেই।

চম্পূকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে একটি নতুন ধরনের সৃষ্টি। গদ্যকাব্যের সঙ্গে মাঝে মাঝে ছন্দ মিশিয়ে একটু বৈচিত্র্যের দোলা এনে এই চম্পূকাব্য রচনার প্রচলন হয়েছিল। দশম শতাব্দীতে রচিত ত্রিবিক্রমের নলচম্পূ এই শ্রেণীর প্রাচীনতম কাব্য। সোমদেবের যশস্তিলক চম্পূ, হরিশচন্দ্রের জীবন্ধরচম্পূ এবং রাজা ভোজের রচিত রামায়ণচম্পূ বিখ্যাত।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

ভারতীয় চিন্তাধারা ধর্মভিত্তিক হওয়াতে প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রচনার দিকে আশানুরূপ নজর দেওয়া হয় নি। বৈদিক সাহিত্যে এবং পুরাণের আখ্যায়িকা থেকে সমসাময়িক রাজা, রাজবংশ এবং সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করা যায়, কিন্তু সেগুলি প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত বাণভট্টের হর্ষচরিতই প্রথম গ্রন্থ। একাদশ শতাব্দীতে রচিত বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কদেব-চরিত অপর একটি ঐতিহাসিক কাব্য। কাশ্মীর, চালুক্য এবং চোল রাজবংশের অনেক বিবরণ এতে পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত কহ্লনের রাজতরঙ্গিণী ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা পেয়েছে। কাশ্মীর রাজবংশের একটি ঐতিহাসিক চিত্র এবং তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে এই কাব্যে নিরপেক্ষ তথ্য পাওয়া যায়।

সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষার অন্যান্য দিক্

সংস্কৃত সাহিত্য শুধু কাব্য বা নাটক দিয়েই সমৃদ্ধ হয় নি ; অলঙ্কার, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, দর্শন এ-সবও সংস্কৃত ভাষাতে সাহিত্যের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছিল।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যাকরণের স্থান ছিল অতি উঁচুতে। বেদকে পুরুষ কল্পনা করে ব্যাকরণকে তার মুখ বলা হয়েছে। পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী সংস্কৃত ব্যাকরণ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকেই বিখ্যাত ছিল। পাণিনির প্রায় দু'শ' বছর পর কাত্যায়ন পাণিনির ব্যাকরণের টীকা রচনা করে তা সাধারণের বোধগম্য করেন। অপর বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন পতঞ্জলি—তিনি পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। এঁরা সকলেই খৃঃ পূঃ তৃতীয় এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। পরবর্তী যুগে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত বোপদেবের মুগ্ধবোধ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা ভট্টোজি দীক্ষিতের সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রসিদ্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থ।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রাচীন ভারত অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ করেছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন ভেষজবিদ্গণ কর্তৃক লিখিত গ্রন্থে। এঁরা নানা রকমের বৃক্ষলতা, গুল্মের ভেষজ শক্তি নির্ণয় করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সমৃদ্ধ করেছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চরক সম্রাট্ কণিষ্কের সভায় রাজচিকিৎসক ছিলেন। তাঁর চরক-সংহিতা বিশ্ববিখ্যাত। চরক-সংহিতার সর্বপ্রথম বাণী—"শুধু অর্থের জন্য চিকিৎসা নয়, সর্বজনের হিতকামনা হবে চিকিৎসার আদর্শ"—ভারতীয় সভ্যতার উৎকর্ষতা প্রমাণ করে।

চরক সংহিতার মত সুশ্রুতের (সম্ভবত ৪র্থ খৃঃ) গ্রন্থটিও বিখ্যাত। চিকিৎসা-গ্রন্থের মত সুলিখিত অভিধান বা শব্দার্থকোষও লেখা হয়েছে সংস্কৃতে। ৫ম শতাব্দীতে রচিত অমর-কোষ এ রকম একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এগুলি ঠিক সাহিত্যের মধ্যে না পড়লেও সংস্কৃত ভাষার বহুমুখী রূপের পরিচয় দেয়।

সংস্কৃত রচনার উৎকর্ষসাধনের উপায় নিরূপণের জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা হ'ত। এই শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ ভরতের নাট্য-শাস্ত্র খৃঃ পূঃ ২য় অথবা ৩য় শতকে রচিত। এই প্রসঙ্গে ৭ম খৃষ্টাব্দে রচিত ভামহের কাব্যালঙ্কার, অষ্টম শতাব্দীতে উদ্‌ভট-রচিত অলঙ্কার-সংগ্রহ এবং কাব্যসৃষ্টিতে ধ্বনির প্রাধান্য স্বীকার করে লেখা আনন্দবর্ধন এবং অভিনবগুপ্তের (খৃঃ ৯ম-১০ম শতক) গ্রন্থগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই রকম জ্যোতিষশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে সূর্যসিদ্ধান্ত, যা ৫ম খৃষ্টাব্দের শেষদিকে আর্যভট্ট কর্তৃক রচিত হয়েছিল। তিনি পৃথিবীর কক্ষ পরিভ্রমণ এবং সূর্য ও চন্দ্র-গ্রহণের বৃত্তান্ত বলে গিয়েছেন। আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জ্যোতিষ এবং বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্রন্থ হচ্ছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহিরের বরাহ-সংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্ত, ৭ম শতাব্দীতে ব্রহ্ম-গুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি।

সংস্কৃত দর্শন সাহিত্য

ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃত দর্শন সাহিত্যে। একেও আমরা সত্যিকার সাহিত্য বলতে পারি। ভারতীয় দর্শনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যে সব দর্শন বেদের প্রাধান্য এবং পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে তাদের বলা হয় আস্তিক দর্শন। যেমন মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস না করলেও বেদের প্রাধান্যে বিশ্বাসী। তাই এদেরকেও আস্তিক দর্শনের মধ্যে ধরা হয়। বেদের প্রাধান্য যে সব দর্শন স্বীকার করে না তাদের বলা হয় নাস্তিক দর্শন। যেমন, চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন। কিন্তু আস্তিক বা নাস্তিক উভয় দর্শনেরই চরম লক্ষ্য হ'ল জন্ম ও মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি।

ভারতীয় দর্শন বিভিন্ন মত ও পথকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে কিন্তু কোন দার্শনিক সম্প্রদায়ই বিরোধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ বা প্রকাশ করেন নি,—যুক্তিতর্ক দিয়ে শুধু বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় দর্শন নৈরাশ্যবাদী নয়—আশাবাদী। তাদের মতে মানুষের দুঃখ আছে, তার কারণ আছে। কিন্তু তার থেকে নিষ্কৃতি লাভেরও উপায় আছে। তাই দেখা যায় কাব্যপ্রতিভার মত ভারতীয় দার্শনিকদের প্রতিভাও একটি সুস্থ বলিষ্ঠ বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আস্তিক ষড়দর্শনের মধ্যে মহর্ষি গৌতমের ন্যায় দর্শন যুক্তি ও তর্কবিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কণাদ ছিলেন সন্ন্যাসী,—ক্ষেত থেকে শস্যকণা আহরণ করে জীবনধারণ করতেন। সাংখ্য দর্শনের প্রবর্তক কপিল মুনি এবং মীমাংসা দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা জৈমিনী ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন নি। যোগ দর্শন প্রতিষ্ঠা করেন

পতঞ্জলি। বেদান্ত দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় বাদরায়ণ কর্তৃক। উপনিষদের শিক্ষাবলীকে রূপদান করে তিনি এই দর্শনের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং পরে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্য রচনা করে সেটিকে সহজবোধ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

চার্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় নি বা বেদের প্রাধান্যও স্বীকার করে নি। মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধের জীবনদর্শন এবং উপদেশাবলীকে ভিত্তি করে জৈন এবং বৌদ্ধ দর্শনের জন্ম হয়েছে। জৈন দর্শনের মূলমন্ত্র সর্বজীবে অহিংসা আর বৌদ্ধদর্শনের প্রধান লক্ষ্য লোক-কল্যাণ।

চার্বাক-দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। এটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড়বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ—অনুমান, শাস্ত্রবাক্য ইত্যাদি নয়। অবোধ জনসাধারণের সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ধূর্ত পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বেদের যাগযজ্ঞ, ক্রিয়া-প্রকরণের প্রবর্তন করেছে। পঞ্চভূতের সমন্বয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে,—ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক—এ সব লোক-ভুলানো কথা মাত্র। নীচে উদ্ধৃত বহুপ্রচলিত শ্লোক থেকেই এই দর্শনের সারমর্ম বোঝা যাবে—

"পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

শুধু মৃত্যুতেই মানুষের পরিপূর্ণ নিষ্কৃতি। যজ্ঞে যে পশু নিহত হয় শাস্ত্র বলে সে পশু স্বর্গে যায়। শাস্ত্রানুগামীরা যদি সে কথা বিশ্বাসই করেন তবে তাঁদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে তাঁরা যজ্ঞে বলি দেন না কেন? সুখপ্রাপ্তিই জীবের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। দরকার হলে ঋণ করে ঘি খেয়েও সুখলাভ করতে হবে। দেহ একবার ভস্মীভূত হলে আবার ফিরে আসে কেমন করে?

ভোগাসক্ত জড়বাদীদের মনে এই দর্শন খানিকটা আকর্ষণ সৃষ্টি করলেও ভারতের ধর্মজ্ঞানী অগণিত জনসাধারণ একে কখনও আমল দেয় নি।

সাধারণ জৈব সত্তাকে ছাড়িয়ে মানুষ এক অতিরিক্ত উচ্চতর মহত্তর সত্তাকে উপলব্ধি করেছে, আর তার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার জন্য তার কৌতূহলের অন্ত নেই। এই অনুভূতি এবং প্রচেষ্টা থেকেই দর্শনশাস্ত্রের উৎপত্তি।

ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী উদার, মুক্ত বিশ্বপ্রেম তার আদর্শ।

"অয়ং নিজ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্,
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

এটি আমার, ওটি তোমার—এ শুধু তারাই বলে যাদের চিত্ত লঘু প্রকৃতির। উদারচিত্ত ব্যক্তির কাছে সমস্ত পৃথিবীর লোকই আত্মীয়।

ঋগ্বেদের শ্লোকেও এই ভাবেরই প্রকাশ দেখা যায়ঃ—

"সমানো ব আকুতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো বঃ সুখবাসতি।"

আমাদের আর্তি এক হোক, এক হোক আমাদের হৃদয়-মন; তবেই আমরা সুচারুভাবে একত্র বাস করতে পারব।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভক্তিরসাপ্লুত সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কথাও মনে পড়ছে। যেমন কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দ-লীলামৃত, রূপ, সনাতন এবং শ্রীজীবের রচিত অমূল্য গ্রন্থগুলি।

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র

প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের পীঠ-স্থান ছিল বারাণসী, মথুরা, নালন্দা, তক্ষশীলা, নবদ্বীপ। এ সব শিক্ষাকেন্দ্রে ভারতবর্ষের এবং বাইরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রতীদের সমাবেশ হ'ত। ফলে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং সাধনার একটি ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট্‌দের সময়কার নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জগদ্বিখ্যাত। আধুনিক কালের অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ বা হার্ভার্ড্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উচ্চতর ছিল বলে শোনা যায়। শুধু স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার জন্যই এর শিক্ষাক্রম নির্দিষ্ট ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আগত প্রায় দশ হাজার ছাত্র আবাসিক ভাবে থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। ১৮০টি গ্রামের উপস্বত্ব থেকে এই শিক্ষায়তনের ব্যয় নির্বাহ হ'ত। হিউ-এন-সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায় তাঁর সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিত শীলভদ্র ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের তুলনা নেই

এই হ'ল মোটামুটি সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। ভারতবর্ষে হিন্দুরা সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলেন—পূজা-পার্বণ, সন্ধ্যা-আরতিতে পবিত্রবোধে এই ভাষাই আজও ব্যবহার করেন। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্য ভাষার একটি। হাজার বছর ধরে ভারতবাসী এই ভাষাতে কথা বলেছে, এর মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য-নাটক প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে। সন্ধি, সমাস, পদসাধন, প্রত্যয়-যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে এই ভাষাবিদ্‌ বৈয়াকরণেরা নতুন নতুন শব্দ এবং বাক্য তৈরি করবার অভিনব পন্থা নির্ধারণ করে গেছেন। মানুষের সকল রকম বক্তব্য—তা সরল, বাঁকা, মধুর, কর্কশ, লালিত্যপূর্ণ বা উদ্ধত —যেমনই হোক্‌ না কেন,—সংস্কৃত ভাষাতে তা সবই অতি নিপুণ এবং সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়। বৈদিক যুগ থেকে মুসলমান অধিকারের কাল পর্যন্ত এই ভাষার চর্চা পূর্ণ গৌরবে বর্তমান ছিল। মুসলমান যুগে এর চর্চা খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, বৃটিশ শাসনের আরম্ভ থেকে আবার এই ভাষা এবং তার সাহিত্যের সমাদর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। জার্মেনী, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের বড় বড় পণ্ডিতেরাও এই ভাষা নিয়ে গবেষণা করছেন। স্বাধীন ভারতেও এর অনুশীলন ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে বলেই আমরা আশা করব। সংস্কৃত না জানলে সত্যিকার ভারতবর্ষকে জানা যায় না।



গাছপালার কথা

নীচুস্তরের গাছপালা

এর আগে আমরা যে সব গাছপালার গল্প বলেছি সেগুলি সবই প্রায় উদ্ভিদ্-জগতের কুলীন বা বনেদী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। তারা শিকড় দিয়ে মাটি থেকে খাবার টেনে নেয়, তার পর তাই দিয়ে নিজেদের শরীরপুষ্টির বিভিন্ন সরঞ্জাম নিজেরাই তৈরি করে নেয়। যেমন নাইট্রোজেন দিয়ে তৈরি করে প্রোটিন। আবার পাতার সাহায্যে, সূর্যের আলোয় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে তৈরি করে শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট। এ-সব গাছে মুকুল ফলে, তার পর দেখা দেয় ফুল, এবং ফুল থেকে ফল। সেই ফলের মধ্যে যে বীজ থাকে তাই থেকেই আবার নতুন গাছের জন্ম হয়— যাকে আমরা বলি বংশবিস্তার। এগুলিকে বাংলায় বলা হয় সপুষ্পক কিংবা বীজজ গাছ (স্পারমেটোফাইট)। এদের কথা আমরা আগেই বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭)। এদেরকেই আমরা বেশির ভাগ আশে-পাশে দেখতে পাই।

কিন্তু সব গাছই যে ও-রকম নয় সে কথাও বলেছি। উদ্ভিদ্-জগতে সবচেয়ে নিম্নস্তরের যারা তাদের বলা হয় জীবাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়া।

জীবাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়া

জীবাণু বা ব্যাক্‌টিরিয়াকে সাধারণত অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না—এত ছোট এগুলি। আগেকার দিনের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে এই জীবাণুগুলি আসলে ক্ষুদ্রতম প্রাণী, অনেকটা প্রোটোজোয়া জাতীয়। কিন্তু এখনকার প্রায় সব বিজ্ঞানীদেরই মত এই যে ওরা আসলে প্রাণী নয়,—উদ্ভিদ্‌ই, এবং ক্ষুদ্রতম উদ্ভিদ্। তবে উদ্ভিদ্ হ'লেও এদের রঙ কিন্তু সবুজ নয়। অর্থাৎ বেশির ভাগ উদ্ভিদের যে বৈশিষ্ট্য সবুজ কণিকা বা ক্লোরোফিল তা এদের মধ্যে নেই।

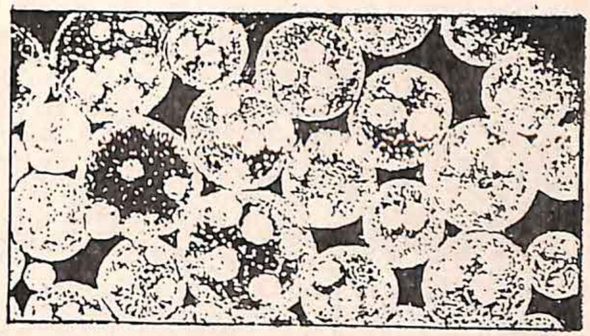
উদ্ভিদ্-জগতে ছত্রাক বা ফাঙ্গাস্ নামে যে আর একজাতের নীচুস্তরের গাছ আছে,

জীবাণুদের সঙ্গে তাদের কিন্তু প্রচুর মিল দেখা যায়। কোন কোন জীবাণুর কোষ-প্রাচীরে সেলুলোজের সঙ্গে চিটিন নামে একরকম রাসায়নিক পদার্থ দেখা যায় যা কোন কোন ফাঙ্গাসেও আছে। এখানে বলা যেতে পারে যে এই কোষ-প্রাচীর জিনিসটা উদ্ভিদেরই বৈশিষ্ট্য—প্রাণীদের নয়। আবার জীবাণুদের মত বহু ফাঙ্গাস্‌ও আছে যারা আকারে খুব ছোট—অণুবীক্ষণ ছাড়া তাদের দেখা যায় না। খাবার সংগ্রহের ধরনটাও কারও কারও একই রকমের।

তবে শ্যাওলাদের সঙ্গেও জীবাণুদের কিছু কিছু মিল দেখা যায়—বিশেষ করে নীচু জাতের শ্যাওলা অ্যাল্‌গীদের সঙ্গে। এই অ্যাল্‌গীরা কোনটা নীলচে সবুজ, কোনটা বর্ণহীন। জীবাণুগুলোও তাই। বংশবিস্তারের প্রক্রিয়াও তু'টির প্রায় একই রকমের। কাজেই জীবাণুরা উদ্ভিদ্‌রাজ্যে সঠিক কোন্ পর্যায়ে পড়ে তার কোন সাদামাঠা নিয়ম আছে বলে মনে হয় না।

সমুদ্রে ডায়াটম্ বলে আর এক রকম পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। অনেকে এদেরকে বলেন সমুদ্রের ধুলো। আসলে এগুলি কিন্তু অতিক্ষুদ্র সামুদ্রিক উদ্ভিদের দেহাবশেষ—বেশির ভাগই এককোষী, অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়।

বেশির ভাগ জীবাণুও এককোষী—অর্থাৎ আমাদের যেখানে লক্ষ লক্ষ কোষ দিয়ে শরীর গড়ে উঠেছে সেখানে ওদের সম্বল ঐ মাত্র সবে-ধন একটি কোষ। ঐ একটি কোষ দিয়েই ওদের জীবনধারণের যাবতীয় কাজ সেরে নিতে হয়,



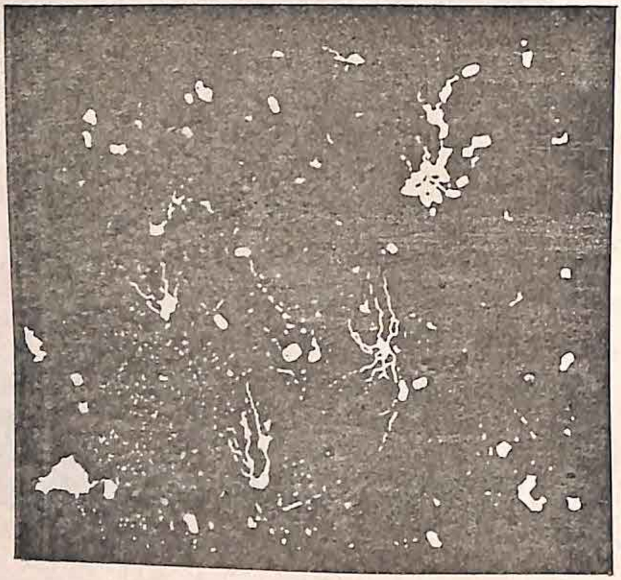
ডায়াটম্ উপনিবেশ—সমুদ্রের অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদের দেহাবশেষ (অণুবীক্ষণের সাহায্যে বড় করে দেখানো হয়েছে)

আবার ভাবী সন্তানদেরকেও জন্মাবার ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

জীবাণুরা খুব ছোট বলছি, কিন্তু কত ছোট? যেগুলো একটু বড় আকারের সেগুলোও এক ইঞ্চির পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগের চাইতে বড় হবে না। কোন কোনটা এক ইঞ্চির দেড় লক্ষ ভাগেরও একভাগ হতে দেখা গেছে, কিংবা তার চেয়েও ছোট। চেহারাও নানা রকম। কোনটা বলের মত গোল, কোনটা কাঠির মত লম্বা, কোনটার বা স্ক্রুর মত প্যাঁচানো শরীর। আবার কোন কোনটার গা থেকে সুতোর মত আঁশ বেরুতেও দেখা যায়। খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে জীবাণুর কোষের মধ্যে অন্যান্য গাছের কোষে যেমন থাকে তেমনি খানিকটা করে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ও রয়েছে। এই প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌ই হচ্ছে প্রাণের আসল উপাদান।

জীবাণু কেমন করে বাড়ে

জীবাণুদের বংশ-বিস্তারটা ভারি মজার। প্রায় সব রকম জীবাণুই বংশবিস্তার করে একটা কোষকে চিরে তু'টো করে নিয়ে। অর্থাৎ



টাইফয়েড জ্বরের জন্য যে জীবাণু দায়ী

মা'র শরীর দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে নতুন সন্তানের জন্ম হয়; জন্মের পর আর বোঝবার উপায় নেই কে মা আর কে মেয়ে। কিন্তু ঐখানেই শেষ নয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে নবজাত জীবাণু-কন্যাটিও আবার নিজের শরীরকে দু'ভাগ করে আর একটি সন্তান সৃষ্টি করেছেন। সুযোগসুবিধা পেলে এই সৃষ্টি-কার্য ১৫।২০ মিনিট পর পরই চলতে পারে। এইভাবে চলতে দিলে কি ঘটতে পারে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কলেরা রোগ যে জীবাণুর সাহায্যেই ঘটে এ কথা হয়তো জান। এই কলেরা-জীবাণু খুব দ্রুত ভাগ হয়ে নতুন সন্তান সৃষ্টি করতে পারে। যদি অনুকূল পরিবেশ পায় তা হলে ২৪ ঘণ্টায় ৪৭-এর পেছনে ২০টি শূন্য বসালে যত হয় ততগুলি জীবাণু তৈরি করাও ওদের পক্ষে সম্ভব,—যার ওজন কম করে প্রায় ২১ লক্ষ কে. জি.। তবে শেষ পর্যন্ত সত্যিই এতগুলি জীবাণু তৈরি হয় না। কারণ, আগেই বলেছি, ওর জন্য দরকার অনুকূল পরিবেশ। অনুকূল পরিবেশ বলতে প্রয়োজনীয় জল, খাদ্য, থাকবার জায়গা—সবই ধরতে হবে।

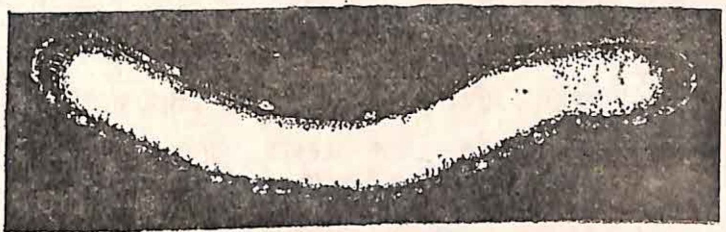
অবশ্য জীবাণুর বংশবিস্তার সময় সময় অন্য ভাবেও হতে দেখা যায়। কখনও কখনও প্রতিকূল পরিবেশে পড়ে কোন কোন জীবাণু, বংশবিস্তার করা দূরে থাক, নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে তার ভিতরকার প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ শুকিয়ে নিয়ে নিজেকে একটা সূক্ষ্ম ডিমের আকৃতির স্পোর বা রেণুতে পরিণত করে নেয় এবং ঐ অবস্থায় অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা কিছুই এর ক্ষতি করতে পারে না। বছরের পর বছর এই অবস্থায়,—যাকে কতকটা ঘুমন্ত অবস্থাই বলা যায়,—কাটিয়ে শেষে অনুকূল পরিবেশ পেলে তখন সেই স্পোর থেকেই আবার সৃষ্টি হয় নতুন জীবাণুর। তবে এ ব্যাপারটা কখনও-সখনও সম্ভব,—সব সময় নয়। আর, একটি জীবাণু থেকে একটি মাত্র স্পোরই হয় এবং সেই স্পোর থেকেও একটি মাত্র জীবাণুই জন্মায়। আর একটা আশ্বাসের কথা, সাধারণত বেশির ভাগ কঠিন রোগের জীবাণুগুলোর এ ভাবে স্পোর তৈরি করবার ক্ষমতা নেই।

জীবাণুরা কি খায়

জীবাণুরা সবুজ গাছেদের মত নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করতে পারে না, এজন্য তাদের নির্ভর করতে হয় অপরের ওপর। গাছ-

পালা বা জীবজন্তু মরে গেলে তাদের শরীর পচে যায়। ঐ পচা মানে আর কিছু নয়, জীবাণুরাই ওদের শরীর থেকে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য বার করে নেয় আর ঐখানেই চলে তাদের বংশবৃদ্ধি। কোন কোন জীবাণু আবার জ্যান্ত গাছপালা বা জ্যান্ত জীবজন্তুর দেহ আশ্রয় করে সেখান থেকেই তাদের খাবার টেনে নেয়, আর সেখানেই সংখ্যায় বাড়তে থাকে। এদের দু'দলই পরভোজী। বিজ্ঞানের ভাষায় প্রথমটিকে বলা হয় স্যাপ্রোফাইট, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় প্যারাসাইট।

কি খায় জীবাণুরা? কারও কারও খাবারের তেমন বাছবিচার নেই—যে কোন জৈব পদার্থই



যক্ষ্মা রোগের জীবাণু

খেয়ে নেয় ওরা; কিন্তু কেউ কেউ এ বিষয়ে খুব রুচিবাগীশ। কারও চিনি ছাড়া আর কিছু রোচে না, কেউ খায় শুধু প্রোটিন, কেউ সেলুলোজ পেলেই খুশি। কিন্তু যারা অন্য গাছের বা অন্য প্রাণীর শরীর আশ্রয় করে থাকে তারা বড় ভয়াবহ। কেউ শুষে নেয় রক্ত, কেউ কুরে কুরে খায় শরীরের জ্যান্ত টিস্যু। এই সব জীবাণুই আমাদের শরীরের নানা রকম রোগের প্রধান কারণ। এরা মানুষেরও ঘোরতর শত্রু বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। যক্ষ্মা, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, ধনুষ্টঙ্কার, মেনিন্‌জাইটিস, কলেরা, ডিপ্‌থেরিয়া, ক্যান্‌সার, কুষ্ঠ—সমস্ত দুরন্ত রোগেরই মূল এরা। একবার কারো শরীরের মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধতে পারলে তাকে আর সহজে রেহাই দেবে না।

শুধু মানুষ বা অন্য প্রাণীই নয়, গাছপালা, ফল-শস্য ধ্বংস করতেও এদের যুড়ি নেই। কৃষি-বিজ্ঞানীরা তাই এদের হাত থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষা করতে নানান্ রকম উপায় উদ্ভাবন করছেন।

জীবাণু আমাদের উপকারও করে

তবে জীবাণুরা যে সব সময়ে আমাদের কেবল অপকারই করে এ কথা মনে ক'র না। উপকারী জীবাণুও আছে নানা রকমের। কেউ আমাদের খাবার তৈরি করে দেয়। দুধকে দই করে দেয়, পনীর তৈরি করে, ভিনিগার তৈরি করে, পেটের ভিতর এনজাইম তৈরি করে খাবার হজম করতে সাহায্য করে; এমন কি কোন কোন জাতের ভিটামিনও গড়তে পারে এরা। এই সব অতিপ্রয়োজনীয় ভিটামিন—যেমন ভিটামিন-কে বা ভিটামিন-বি-১২ শরীরের পুষ্টির জন্য বিশেষ দরকার।

আজকালকার বিজ্ঞানীরা জীবাণুর সাহায্যে নানারকম ওষুধবিষুধও তৈরি করছেন। সেই যে একটা কথা আছে—বিষে বিষক্ষয়, জীবাণুর সাহায্যে জীবাণুকে ঘায়েল করা তার একটা চমৎকার উদাহরণ। আজকালকার ডাক্তারেরা কঠিন অসুখ হলেই অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে রোগ সারিয়ে দেন। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন এই রকম একটা আশ্চর্য ওষুধ যা নাকি মাটির

ভিতরকার জীবাণু থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। যক্ষ্মা রোগে এই ওষুধ প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। ঐ রকম টাইফয়েডে যে ক্লোরোমাইসিটিন দেওয়া হচ্ছে তাও তৈরি করা হচ্ছে জীবাণু থেকেই।

জীবাণুরা পরোক্ষভাবেও আমাদের কাজ করে দিচ্ছে। জীবাণুরা না থাকলে পৃথিবীর যাবতীয় জঞ্জাল জমে গিয়ে পৃথিবী নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়াত। জীবাণুরাই গাছ বা প্রাণী মরে গেলে তাদের দেহাবশেষ কিংবা জীবিতাবস্থায় তাদের পরিত্যক্ত ময়লা প্রথমে ইউরিয়া এবং তারপর অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত করে দেয়। জীবাণুর সাহায্যেই তা থেকে মাটিতে নাইট্রোজেন-লবণ তৈরি হয়। গাছেরা ফের তা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে শুষে নিয়ে তৈরি করে নেয় প্রোটিন।

আমাদের চারদিকে রয়েছে বাতাস। বাতাসের মধ্যে পাঁচ ভাগের চার ভাগই নাইট্রোজেন। কিন্তু অধিকাংশ গাছই বাতাস থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন টেনে নিতে পারে না,—নাইট্রোজেনের চাহিদা তাকে মেটাতে হয় মাটি থেকে নাইট্রোজেন-লবণ টেনে নিয়ে। কিন্তু ছোলা, মটর প্রভৃতি কতকগুলি গাছ,—যাদের শুঁটি হয়,—তারা জীবাণুর সাহায্যে বাতাস থেকেই নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে তাদের নাইট্রোজেন-চাহিদা মেটাতে পারে। এই সব গাছের শিকড়ে ঐ সব জীবাণু গুটি বেঁধে বাস করে, আর তারাই আসলে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন টেনে নিয়ে গাছকে তার দরকারের সময় তা যুগিয়ে দেয়। এর বদলে তারা নিজেরাও পায় ঐ গাছের দেহে তৈরি শ্বেতসার আর চিনি। অর্থাৎ ওরা পরস্পরকে সাহায্য করে। বিজ্ঞানের ভাষায় এ ধরনের ব্যাপারকে বলা হয় 'সিম্‌বায়োসিস্'।

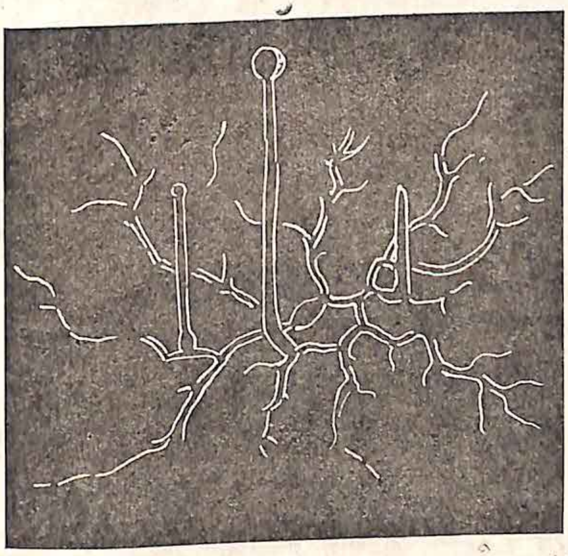
ফাঙ্গাস্ বা ছত্রাক

জীবাণুদের কথা বলবার সময়ে ফাঙ্গাস্ নামে আর এক ধরনের নীচুস্তরের উদ্ভিদের কথা বলেছিলাম। একটির,—অর্থাৎ একবচনে বললেই বলা হয় ফাঙ্গাস্, বেশি হ'লে, অর্থাৎ বহুবচনে—ফাঙ্গি। বাংলায় ওদের বলা হয় ছত্রাক। চলতি কথায় আমরা বলি ছাতা।

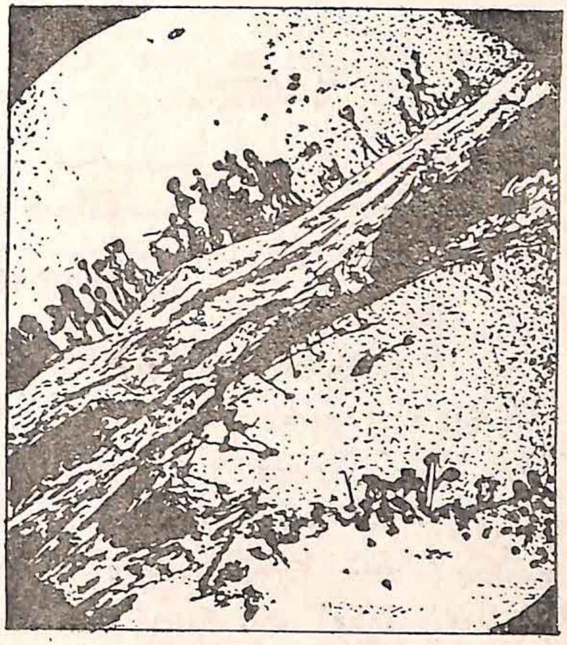
এই ছাতার সঙ্গে আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু পরিচয় আছে। পাঁউরুটি ২।৩ দিন বাসি হ'লে তার গায়ে ছাতা পড়ে যায়, বর্ষার দিনে কাটা বাঁশের গায়ে, গাছের ডালে বা এদিকে-সেদিকে ব্যাঙের ছাতা রাতারাতি গজাতে দেখেছি সবাই। নামে ব্যাঙের ছাতা হ'লেও সত্যি যে ব্যাঙেরা ওর তলায় বসে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করে না এ তোমরা সবাই জান। দেখতে অনেকটা খুদে মাথার ছাতার মত বলেই ঐ নাম। ছাতা আরও নানা জায়গায় দেখা যায়। এমন কি ভিজে জুতো ফেলে রাখলেও কয়েক দিন পরে হয়তো দেখবে এক রকম সবুজ ছাতা তার গায়ে জমে রয়েছে। এরা সকলেই ফাঙ্গাস্ জাতের মধ্যে পড়ে।

ফাঙ্গাস্ এত তাড়াতাড়ি কি করে গজিয়ে ওঠে ভেবে নিশ্চয়ই অবাক্ হচ্ছ। আসলে এদের রেণু বা স্পোর বাতাসের সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে, সুযোগ পেলেই তা থেকে এখানে ওখানে ছাতা গজিয়ে ওঠে। তবে সব ফাঙ্গাস্ বা ছত্রাকই কিন্তু এক জাতের নয়, এদের মধ্যেও বহু বৈচিত্র্য আছে। জীবাণুর মত ছোট্ট ফাঙ্গাস্ও যেমন

আছে, তেমনই বেশ বড় জাতের ফাঙ্গাস্‌ও দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন থ্যালো-ফাইট অর্থাৎ থ্যালাস্‌ দিয়ে গড়া গাছ। থ্যালাস্‌ বলতে এমন একটা গাছের অংশ বোঝায় যার না আছে শিকড়, না আছে কাণ্ড, না আছে পাতা, ফুল বা বীজ। অনেক সময় এককোষী অর্থাৎ মাত্র একটা কোষ দিয়ে তৈরি ফাঙ্গাস্‌ও দেখা যায়। ওদের বাদ দিলে সব ছত্রাকই একরকম মিহি সুতোর মত জিনিস দিয়ে গড়া, যাকে বলা হয় হাইফি। সবগুলো হাইফিকে একত্র করে বলা হয় মাইসেলিয়াম। যেমন ধর, বাসি পাঁউরুটির গায়ে যে ছাতা দেখা যায় সেটা আসলে ঐ ছত্রাকের মাইসেলিয়াম—যা নাকি রুটির গা ভেদ করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ছাতাকে পুষ্ট করবার কাজ হাইফির। সে হয়তো রয়েছে রুটির ভিতরে



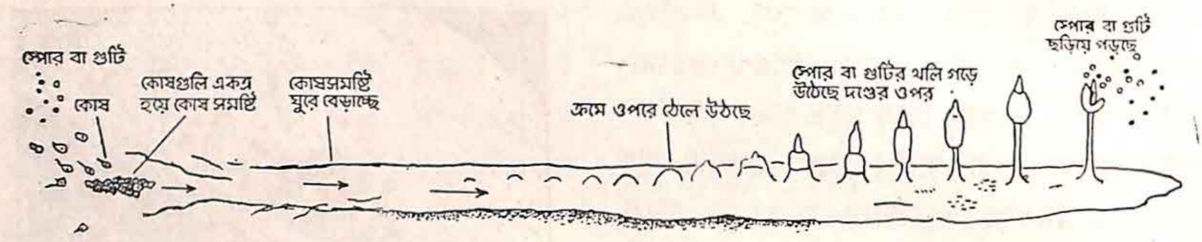
রুটির গায়ে গজানো ছাতা। সুতোর মত হাইফি ছড়িয়ে গেছে চারদিকে—যাকে একত্র করে বলা হয় মাইসেলিয়াম।



কালো রুটির ছাতা বা ব্ল্যাক্‌-ব্রেড-মোল্ড। কালো স্পোরের থলি ঠেলে উঠেছে ওপরে।

কিংবা, বড় জোর, লেপ্টে আছে তার গায়ে। এই ছাতাগুলো প্রথম দিকে দেখতে সাদা, পরে স্পোরের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে ওগুলোও তত কালো হ'তে থাকে। এজন্য ইংরেজিতে এগুলিকে বলা হয় ব্ল্যাক-ব্রেড-মোল্ড অর্থাৎ কালো রুটির ছাতা। অবশ্য রুটি ছাড়াও কাটা তরকারির গায়েও এ রকম ছাতা অনেক সময় জমতে দেখা যায়।

এই মোল্ড বা ছাতাগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে ওদের মাথার ওপর একরাশ গোল গোল বলের মত দেখা যাচ্ছে। ওর নাম স্পোরাঞ্জিয়া, ওগুলিই হচ্ছে স্পোর বা রেণুর থলি। থলি ফেটে রেণুগুলি বেরিয়ে বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর সুযোগ পেলেই নতুন মাইসেলিয়ামের সৃষ্টি করে।



মিক্সোমাইসেটিস ছাতার বংশবিস্তার

বিভিন্ন জাতের ফাঙ্গাস্

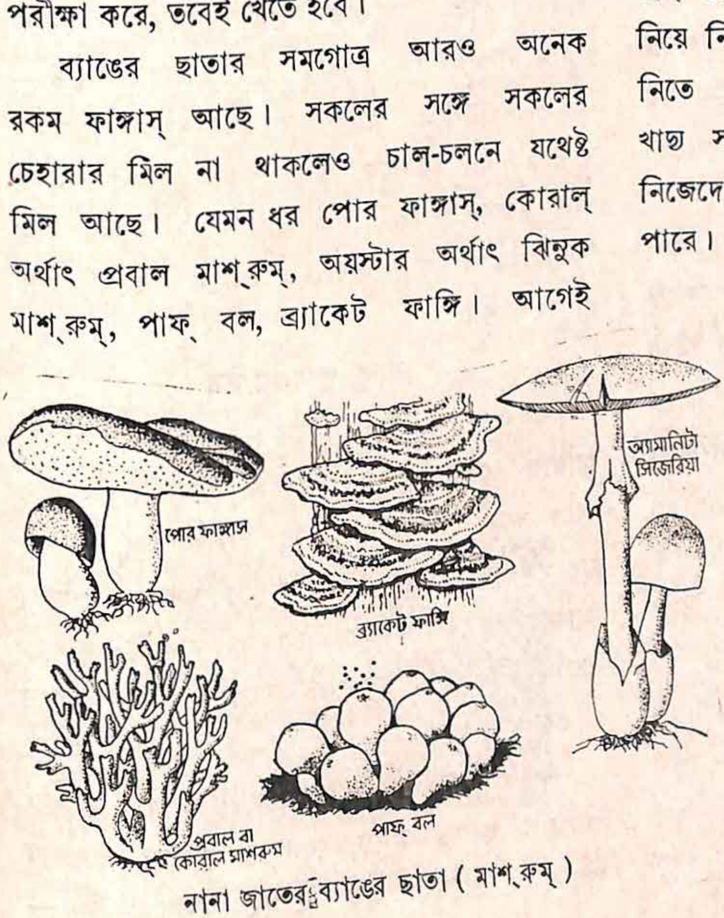
ফাঙ্গাস্ নানা জাতের হ'তে পারে সে কথা আগেই বলেছি। এখানে ২।১টির কথা বলি। চটচটে আঠালো ছাতা দেখেছ কখন? এর বৈজ্ঞানিক নাম মিক্সোমাইসেটিস। সাধারণত পচা কাঠ, কাঠের গুঁড়ি কিংবা মাটিতে-মিশে-যাওয়া মরা জীবজন্তুর গলিত দেহের ওপর এই ছাতা গজাতে দেখা যায়। কি ভাবে এই ছাতা বেড়ে ওঠে ওপরের ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। প্রথমে কতকগুলি স্পোর বা গুটি থেকে কোষ বেরিয়ে এসে কোষসমষ্টি তৈরি করে। কোষগুলি অনেকটা এককোষী অ্যামিবার মত। তারপর সেই কোষসমষ্টি এদিক্ সেদিক্ ঘুরে বেড়ায়—ঠিক অ্যামিবারা যেমন ক্ষণে ক্ষণে দেহের গঠন পরিবর্তন করে এদিক্ ওদিক্ নড়াচড়া করে অনেকটা সেই ভাবে। কিন্তু এই ছাতা অ্যামিবার মত প্রাণী-দের দলে পড়ে না—পড়ে গাছপালা অর্থাৎ ছত্রাক গাছপালার দলে। ঘুরতে ঘুরতে একই প্রজাতির অন্য কোন কোষের কাছে এসে পড়লে পরস্পর একত্র মিশে গিয়ে তৈরি করে নতুন ছাতা। তারপর সেই ছাতা সাদা, হলদে, কমলা, লাল ইত্যাদি নানা রঙের টিবির মত ওপরে ঠেলে উঠতে আরম্ভ করে আর দেখতে দেখতে সেইখানে গজিয়ে ওঠে একটা করে ডাঁটি আর তার মাথার ওপর একটা করে থলি। এটিই হচ্ছে এই জাতের ছাতার স্পোরাঞ্জিয়া—যার মধ্যে জমা থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন স্পোর বা গুটি। থলি ফেটে গেলেই তার ভিতরকার সমস্ত স্পোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর বাতাসের সঙ্গে দিগ্বিদিকে উড়ে চলে নতুন সৃষ্টির নেশায়।

ব্যাঙের ছাতাকে অনেকে বলেন মাশ্‌রুম্। ওটা ইংরেজি শব্দ। খুব তাড়াতাড়ি হঠাৎ কিছু গজিয়ে ওঠাকে তাই বলা হয় মাশ্‌রুম্ গ্রোথ—অর্থাৎ কিনা মাশ্‌রুমের মত বেড়ে ওঠা। ওর বৈজ্ঞানিক নাম অ্যাগারিকাস। তবে অ্যাগারিকাস্ জাতের ছাতাগুলি কিন্তু সবই গুণে এক রকম নয়, রূপেও নয়। অনেক সময় এদের মধ্যে নানা রকম রঙের বাহারও দেখা যায়।

এই মাশ্‌রুম্ বা ব্যাঙের ছাতার কোন কোনটা কিন্তু খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। চীন, আমেরিকা, এমন কি ইয়োরোপেও কোন কোন জায়গায় দস্তুরমত এদের চাষ করা হয়। আমাদের দেশেও বর্ধমান, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতা খাওয়ার রেওয়াজ আছে। যাঁরা খান তাঁরা বলেন ভারি নাকি সুস্বাদু।

তা হবেও হয়তো, কারণ অনেক রাজা-বাদশাহ্‌রও এ জিনিসটির ওপর লোভ ছিল বলে শোনা গেছে। রোমের সম্রাট্ নীরো এক জাতের গাঢ় হলদে-কমলা রঙের ব্যাঙের ছাতা খেতে ভালোবাসতেন। এই জাতের ব্যাঙের ছাতাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন অ্যামানিটা সিজেরিয়া। ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম এড-ওয়ার্ডেরও এটি একটি অতি প্রিয় খাদ্য ছিল। তবে সব ব্যাঙের ছাতাই কিন্তু খাওয়া যায় না। কোন কোনটা বেশ বিষাক্ত। তাদের কোন কোনটার মধ্যে এত তীব্র বিষ আছে যে খেলে পরে মৃত্যুও ঘটতে পারে। কাজেই ব্যাঙের ছাতা খেতে হ'লে ভালো করে জেনে-চিনে, পরীক্ষা করে, তবেই খেতে হবে।

ব্যাঙের ছাতার সমগোত্র আরও অনেক রকম ফাঙ্গাস্ আছে। সকলের সঙ্গে সকলের চেহারার মিল না থাকলেও চাল-চলনে যথেষ্ট মিল আছে। যেমন ধর পোর ফাঙ্গাস্, কোরাল্ অর্থাৎ প্রবাল মাশ্‌রুম্, অয়স্টার অর্থাৎ ঝিনুক মাশ্‌রুম্, পাফ্ বল, ব্র্যাকেট ফাঙ্গি। আগেই বলেছি ফাঙ্গি হচ্ছে ফাঙ্গাসের বহুবচন। অনেকগুলো একত্র জট বেঁধে গজায় বলে এদের এই নাম।



নানা জাতের ব্যাঙের ছাতা (মাশ্‌রুম্)

মস্

পুরোনো পাঁচিলের ওপর, স্যাঁৎসেঁতে ছাদের কার্নিশে এবং তা ছাড়াও যত্রতত্র সবুজ নরম মখমলের মত যে গাছগুলো ছেয়ে থাকে চলতি কথায় ওকে শ্যাওলা বললেও আসলে ওগুলিই হচ্ছে মস্। মস্‌ও নীচুতলার গাছ, তবে ফাঙ্গাস্ বা ছাতাদের তুলনায় এরা অনেক বনেদী। ওদের ঐ সবুজ রঙ দেখেই বোঝা যায় ওগুলির মধ্যে আছে পাতার সবুজ কণিকা ক্লোরোফিল, যা দিয়ে ওরা বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে এনে সূর্যালোকের সাহায্য নিয়ে নিজেদের খাবার শ্বেতসার বা স্টার্চ বানিয়ে নিতে পারে। অর্থাৎ ফাঙ্গাস্‌দের মত ওরা খাদ্য সংগ্রহে পরের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারে।

মস্‌ও কিন্তু জন্ম নেয় স্পোর বা গুটি থেকে,—ফুল, ফল, বীজ এ সবের কোন কারবার নেই ওদের। স্পোর থেকেই তৈরি হয় আঁশের মত একরকম ডালপালা-ছড়ানো জিনিস, যাকে বলা হয় প্রোটোনেমা। যথাকালে এই প্রোটোনেমাতেই কুঁড়ি দেখা দেয়, সেই কুঁড়ি থেকে সরু সরু পাতার মত বেরিয়ে এসে চারদিক্ ছেয়ে ফেলে। একেই আমরা বলি মস্।

মসের কিন্তু তথাকথিত বনেদী

গাছদের মত শিকড় নেই। ঐ পাতা বা কাণ্ড থেকেই সরু সরু সুতোর মত ঝুলতে থাকে এবং শেষে মাটিতে গিয়ে জল আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্য টেনে নেয়। শিকড়ের বদলে শিকড়ের-কাজ-করা এই সুতোগুলোকে বলা হয় রাইজয়েড। মসের জীবনকাহিনী কিন্তু বেশ মজার।

বারে বারে রূপ বদলানো

মস্ যখন "সাবালক" হয়, অর্থাৎ ঠিকমত পরিপুষ্ট হয়, তখন তার কাণ্ডের ওপর দু'রকম দুটি প্রত্যঙ্গ গজিয়ে ওঠে। একটি দেখতে গোল কিংবা ডিমের মত, অপরটি ফাঁপা গেলাসের মত। প্রথমটিকে বলা হয় অ্যান্থেরিডিয়াম, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় আর্কেগোনিয়াম। পরে এই আর্কেগোনিয়ামের তলা থেকে মুখ পর্যন্ত একটা নল তৈরি হয়ে ওঠে। অ্যান্থেরিডিয়ামের মধ্যে থাকে পুং-রেণু বা পরাগ, আর আর্কেগোনিয়ামে থাকে স্ত্রী-ডিম্বকোষ।

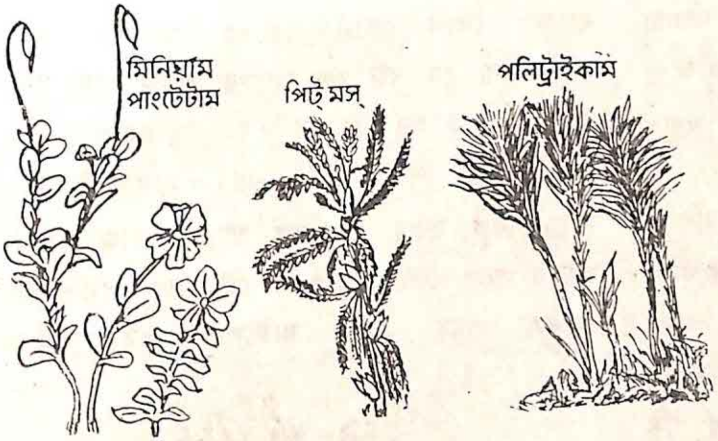
পরাগ-মিলন ঘটে জলের মধ্যে। বৃষ্টির জল কিংবা শিশিরের সাহায্যেও অ্যান্থেরিডিয়াম ভিজে গেলে তার থেকে কতকগুলি পুং-রেণু বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ জলে নড়েচড়ে আর্কেগোনিয়ামের কাছে চলে আসে। এই নড়াচড়ার জন্য ওদের ফ্লাজেলা নামে একরকম প্রত্যঙ্গ থাকে। কয়েকটি পুংরেণু আর্কেগোনিয়ামের নলের মুখ দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং তার মধ্যে থেকে একটি রেণু ডিম্বকোষের সঙ্গে মিশে যায়।

এর পরেই ঘটে এক অভিনব ব্যাপার। পুরোনো নলের ডগায় একেবারে সম্পূর্ণ নতুন এক রকম গাছ গজিয়ে ওঠে। একে বলা হয় স্পোরোফাইট অর্থাৎ স্পোর গাছ। লম্বা ডাঁটি পুরোনো মসের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, মাথায় থাকে একটা ক্যাপসিউল বা থলিভর্তি স্পোর। স্পোরোফাইটের কিন্তু খাদ্যসংগ্রহের জন্য মাথা-ব্যথা নেই, পুরোনো গাছ থেকেই সে তা যোগাড় করে নেয়। তারপর ওপরের থলি বা ক্যাপসিউলও পেকে উঠলেই ফেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের সমস্ত স্পোর চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে, কতক বাতাসের সঙ্গে উড়ে চলে। এর পর আবার প্রত্যেকটি স্পোর থেকে নতুন করে এক একটি মস্ গাছ,—যাকে বলা হয় গ্যামেটোফাইট,—গজাতে শুরু করে। অর্থাৎ প্রথমে গ্যামেটোফাইট থেকে স্পোরোফাইট, তার পর আবার স্পোরোফাইট থেকে গ্যামেটোফাইট। একবার এটি, একবার ওটি—এইভাবে চলতে থাকে বারে বার। বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাপারটাকে বলা হয় "অল্টারনেশন্ অব্ জেনারেশনস্"। বাংলায় ওকে বলা হয় "জন্তুঃক্রম"। জন্তু কথাটার মানে হচ্ছে জন্ম বা উৎপত্তি।

নানা জাতের মস্

মস্ও নানা জাতের হয়। খুব ছোট ছোট, আবার একটু বড়ও। কোন কোনটা আবার প্রায় স্বচ্ছ, কিংবা স্বচ্ছ না হলেও ঘষা কাচের মত দেখতে। ওর ওপর সূর্যের আলো পড়লে ঝক্‌ঝক্ করে। সবুজ ছাড়াও বাদামী, লালচে এমন কি প্রায় কালো রঙের মস্ও দেখতে পাওয়া যায়।

মস্ কিছুটা অন্ধকারেও দিব্যি জন্মাতে পারে। জলের নীচে, যেখানে সূর্যের আলোর পাঁচশ' ভাগের এক ভাগও পৌঁছয় না,—

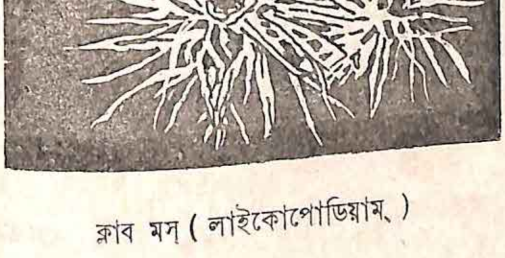


নানা জাতের মস্

নয়, বরঞ্চ চালচলনে ফার্নের সঙ্গেই কতকটা মিল আছে এদের। ফার্নের ও পাইনের কথায় আমরা একটু পরেই আসছি। লাইকোপোডিয়াম্ খুব আদ্যিকালের বিরাট গাছের বংশধর। এদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই এখন লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু এরা এখনও দিব্যি টিকে আছে।

সেখানেও মস্ দেখা গেছে। সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনেভা হ্রদে জলের তলায় ১৮০ ফুট গভীরেও ওদের দেখা পাওয়া গেছে। কোন কোনটা আবার নিজেরাই গা থেকে আলো বার করে। গভীর জঙ্গলে এ রকম আলো-ছড়ানো মস্ অনেক শিকারীরা তো দেখেছেনই, বিজ্ঞানীরাও দেখেছেন।

মসের কথা বলতে গেলে আর এক জাতের নীচুস্তরের গাছের কথা মনে পড়ে,—লাইকো-পোডিয়াম্। দেখতে এরা বড় জাতের মসের মত, তাই এদেরকে ক্লাব মস্ও বলা হয়। কেউ কেউ এদেরকে লতানে পাইন বলেও ভুল করেন। কিন্তু এরা মোটেই সে জাতের গাছ



ক্লাব মস্ (লাইকোপোডিয়াম্)

শ্যাওলার কথা

আমাদের বাড়ীর কলতলাটা প্রায়ই ভয়ানক পিছল হয়ে থাকে। সেদিন তো এক কাণ্ড! ও-বাড়ীর 'রোগা বৌদি' (বিয়ের সময়েই যাঁর ওজন ছিল প্রায় দু'মণের কাছাকাছি,—এখন আরও বেড়েছে) কলতলায় পা-টা ধুয়ে ওপরে আসবেন, হঠাৎ দড়াম্ করে এক আওয়াজ। তার পরেই হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। জল আন রে, পাখা আন রে! অর্থাৎ রোগা বৌদি কলতলায় পা পিছলে পড়ে গেছেন, আর এই ব্যাপারে নাটের গুরু হচ্ছে ওখানে গজিয়ে-ওঠা শ্যাওলা।

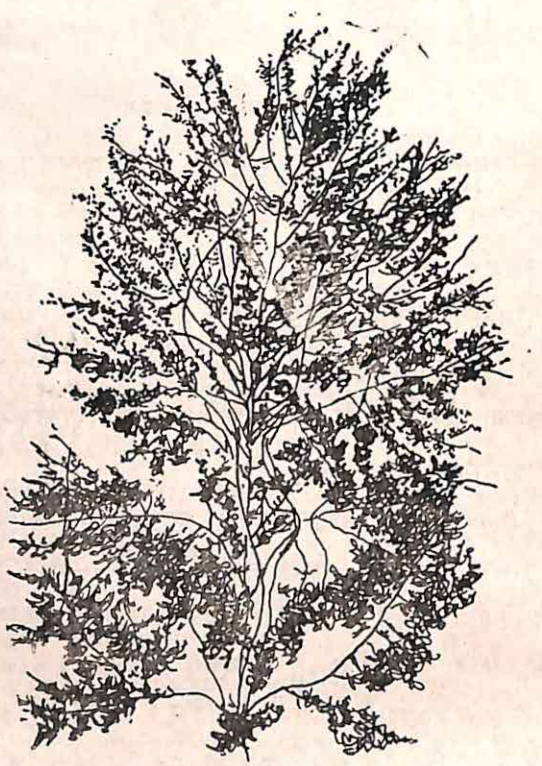
এই শ্যাওলা জিনিসটাও যে এক রকম উদ্ভিদ্ তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না। নইলে কোনও জড়পদার্থ তো আপনা আপনি জন্মাতে বা বাড়তে পারে না! আর উদ্ভিদের যা একটি প্রধান উপকরণ সেই সবুজ রঙের কণা বা ক্লোরোফিলও ওদের শরীরে নিশ্চয়ই রয়েছে। তা না হলে অত সবুজ হবে কেন? আর ক্লোরোফিল যদি থাকে তা হ'লে ওরাও যে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে নিজেদের খাবার তৈরি করে নিতে পারে সে

বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অন্যান্য গাছপালার মত ওদের ডালপালা, ফুল, ফল, বীজ—কিছুই দেখতে পাবে না। তার মানে, ওরাও নিশ্চয়ই খুব নীচু-মহলের উদ্ভিদ্।

সত্যিই তাই। শুধু নীচু-মহলের উদ্ভিদ্ই নয়, শ্যাওলা বোধ হয় আদিমতম উদ্ভিদেরও একটি। লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি বছর আগে আদ্যিকালের সেই পৃথিবীতে যখন এ যুগের বড় বড় গাছপালার কোনটাই দেখা দেয় নি তখন ওদেরই ছিল রাজত্ব। অত্যন্ত সাদাসিধে গড়ন এদের শরীরের, কোষ বা সেলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এমন কি এককোষী শ্যাওলাও অনেক আছে—যাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায় না।

শ্যাওলাদের মধ্যে অ্যাল্‌গা (বহুবচনে অ্যাল্‌গী) জাতীয় শ্যাওলার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। তবে বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত তিরিশ হাজারেরও বেশি জাতের শ্যাওলার সন্ধান পেয়েছেন। ছোট ছোট শ্যাওলারা অনেক সময় একটার গায়ে একটা যুড়ে গিয়ে শ্যাওলার উপনিবেশও তৈরি করে। ওদের বেশির ভাগেরই গা দিয়ে এক রকম আঠালো রস বেরোয়। শরীরের ভিতরকার জল আটকানো আর আত্মরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা। আবার ওরই সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ওরা একত্রিত হয়। এই আঠালো রসের জন্যই শ্যাওলারা অত পিছল, আর 'রোগা বৌদিদের' পতনের কারণও ওদের এই পিচ্ছিলতা।

সমুদ্রেও প্রচুর শ্যাওলা দেখতে পাওয়া যায়। ওদের কোন কোনটার গায়ে সবুজ ছাড়া লালচে, বাদামী, হলদে ইত্যাদি রঙও থাকে। কোন কোন সমুদ্রের শ্যাওলা এত মোটা হয় যে বড় বড় গাছের গুঁড়ি বলে ভুল হবে। আর শুধু কি মোটা? লম্বায়ও শত শত ফুট হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। ম্যাক্রোসিস্‌টিস্ নামে এক রকম সামুদ্রিক শ্যাওলা হাজার ফুট লম্বাও হতে দেখা গেছে। এই সব অতিকায় শ্যাওলা সময় সময় মাইলের পর মাইল



সমুদ্রের লালচে অ্যালগী

জায়গা যুড়ে সমুদ্রে ভেসে থাকে। তখন বড় বড় জাহাজও তাদের ঠেলে এগুতে পারে না। শ্যাওলাকে ভালো বাংলায় শৈবাল বলা হয় তা নিশ্চয়ই জান।

শ্যাওলারা কিন্তু শুধু আছাড়ই খাওয়ায় না, নানা উপকারও করে। প্রথমত, অনেক ছোট-বড় জলজীবের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে শ্যাওলা।

শুধু খাদ্য হিসেবেই নয়, অন্য ভাবেও ওরা জলজীবের উপকারী বন্ধু। নিজেদের খাবার তৈরি করবার সময় ওরা জলে গোলা কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে সেখানে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন,—যা নাকি জলজীবেরা শ্বাস-গ্রহণের কাজে ব্যবহার করতে পারে।

শুধু জলজীবদের কেন, মানুষের খাদ্য হিসেবেও শ্যাওলার চলন আছে। অ্যাগার অ্যাগারও (যার চলতি নাম চাইনীজ্ গ্রাস বা চীনে ঘাস) আসলে এক জাতের সামুদ্রিক শ্যাওলা। এগুলি দিয়ে দুধ জমিয়ে রকমারি খাবার তৈরি করা যায়; জীবাণু পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটারীতে, হাসপাতালেও এগুলির চাহিদা প্রচণ্ড। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে ঠিকমত শ্যাওলার চাষ করতে পারলে পৃথিবী থেকে নিরামিষভোজী পশু-খাদ্যের অভাব একেবারে দূর করা যেতে পারে। এমন কি ওদের শরীর থেকে ভিটামিনে টইটুম্বুর মানুষের খাবারও তৈরি করা অসম্ভব নয়। সে চেষ্টাও চলছে। এর চেয়েও বড় কথা, মহাকাশ-যাত্রায়ও শ্যাওলার সাহায্য নেবার কথা ভাবা হচ্ছে। মহাকাশ-যাত্রীদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে-আসা কার্বন ডাই-অক্সাইড মহাকাশ-জাহাজে জমতে না দিয়ে এই সব শ্যাওলার সাহায্যে তাকে টেনে নিতে পারলে ঐ শ্যাওলারাই উল্টে তাদের জন্য কিছুটা অক্সিজেন ছেড়ে দিতে পারে। ক্লোরেলা নামে এক জাতের শ্যাওলা আছে যারা অন্য সব শ্যাওলার তুলনায় খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে চলে। আবার, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মহাকাশে গিয়েও ওদের বাড়বাড়ন্ত কিছুমাত্র কমে না। সুতরাং ভবিষ্যতে এই ক্লোরেলাই হয়তো দূর মহাকাশযাত্রায় একটা বড় রকম ভূমিকা নিতে পারবে।

লাইকেন

গাছের গায়ে, পাথরের ফাটলে বা ভাঁজে এক জাতের উদ্ভিদ্ দেখা যায় যারা হচ্ছে শ্যাওলা আর ছাতার সংমিশ্রণ—লাইকেন। ছাতার সরু সরু সুতোর সঙ্গে শ্যাওলার সবুজ কোষ মিলে এই লাইকেন গড়ে ওঠে। সবুজ-কোষ অর্থাৎ শ্যাওলা অংশটির কাজ হচ্ছে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নিয়ে শ্বেতসার তৈরি করা। ছাতা অংশটি সে খাবারের ভাগ পায়। আবার তারাও উল্টে শ্যাওলা অংশটাকে সাহায্য করে সজীব আর সরস থাকতে—কারণ জল সংগ্রহ করার কাজটা তাদেরই। আগেই বলেছি বিজ্ঞানের ভাষায় এই ভাবে একে অপরের সাহায্য নিয়ে জীবনযাপন করাকে বলা হয় সিম্‌বায়োসিস্। লাইকেনও এর চমৎকার একটি উদাহরণ।

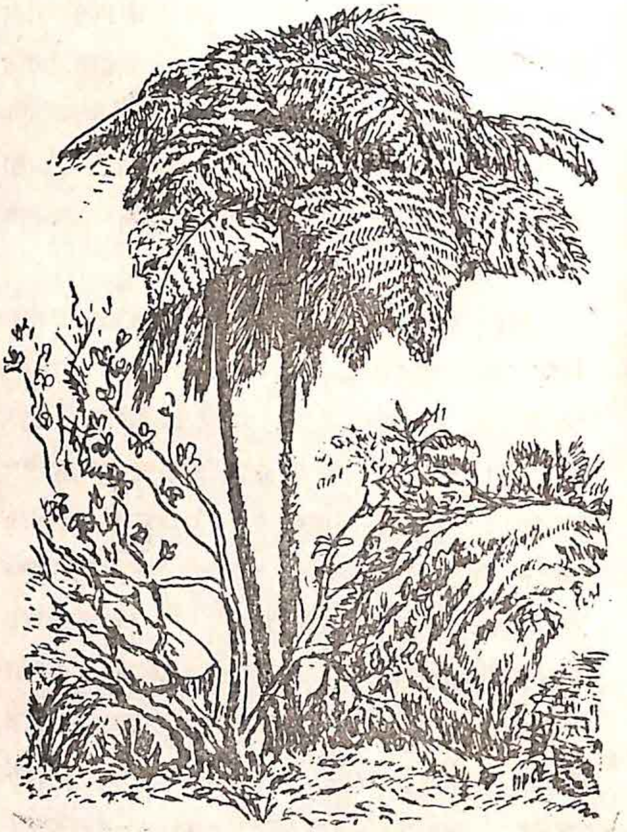
লাইকেন পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সাইবেরিয়ার কোন কোন অঞ্চল এত তুষারাচ্ছন্ন যে সেখানে এই লাইকেন ছাড়া অন্য কোনও উদ্ভিদ্ জন্মাতে পারে না। সে দেশের বল্‌গা হরিণরা শুধু এই লাইকেন খেয়েই বেঁচে থাকে।

ফার্নের কাহিনী

ফার্ন্ হচ্ছে টেরিডোফাইটা দলের গাছ। ফুল দেয় না, ফল দেয় না, কাজেই বীজও হয় না। অর্থাৎ যাকে আমরা উন্নত ধরনের সপুষ্পক গাছ বলি ফার্ন্ তাদের দলে পড়ে না। কিন্তু

অপুষ্পক গাছের মধ্যে সব চেয়ে উন্নত বলা যায় ফার্ন্‌কে। শুধু উন্নত নয়, বনেদী বলতেও দোষ নেই। বনেদী বলছি এই জন্য যে মানুষের বেলা যেমন খুব প্রাচীন বড় বংশের ছেলে-মেয়েদের আমরা বলি খুব বনেদী পরিবারের লোক, তেমনি এখনকার ফার্ন্ গাছরাও আদ্যিকালের খুব বনেদী গাছেরই বংশধর। পৃথিবীতে এমন একদিনও গেছে যেদিন বড় জাতের গাছ বলতে এই ফার্ন্‌কেই বোঝাত। তবে সে অনেক—অনেক দিনের কথা। প্রায় ১৫ কোটি বছর আগে, পৃথিবীটায় যখন ছিল অতিকায় সরীসৃপদের যুগ, তখন বড় বড় জঙ্গলে এই সব ফার্ন্ গাছেরই ছিল আধিপত্য। আর, বেশির ভাগ এই ফার্ন্ গাছেরাই পরবর্তী যুগে মাটির নীচে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের দেশের রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া প্রভৃতি কয়লাখনির অঞ্চল প্রধানত এই সব ফার্ন্‌দের দেহ থেকেই তৈরি। এখনও কয়লার গায়ে মাঝে মাঝে ওদের পাতার ছাপ দেখা যায়। পণ্ডিতেরা সেগুলিকে বলেন ফসিল ফার্ন্।

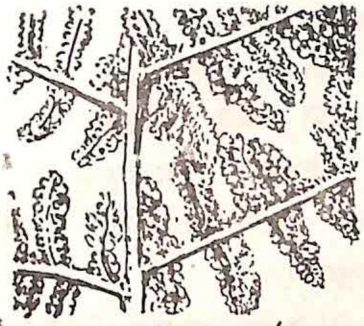
সে যুগের ফার্ন্‌রা ছিল মহীরুহের মতই বিশাল। উঁচুতে এ যুগের তাল-নারকেল গাছকেও হার মানাত। এখনকার ফার্ন্ অবশ্য সে তুলনায় বেশির ভাগই খুব ছোট। খুব বড় জাতের গুলোও সাধারণতঃ ৮৷১০ ফুটের বেশি উঁচু হয় না। তবে এখনও পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে—যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড বা হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে এক রকম বড় জাতের ফার্ন্, দেখতে পাওয়া যায় যাদেরকে বলা হয় ট্রী-ফার্ন্ বা বৃক্ষ-ফার্ন্। এগুলির



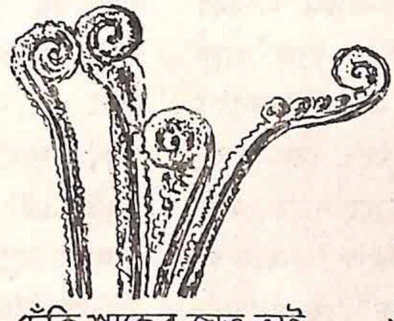
নিউজিল্যাণ্ড অঞ্চলের অতিকায় ফার্ন্—ট্রী-ফার্ন্

কোন কোনটাকে এখনও ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে দেখা গেছে।

এখনকার অনেক উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী বলেন, টেরিডোফাইটা দলের অন্যান্য গাছের চাইতে ফার্নের সাদৃশ্যটা যেন কনিফার এবং ফল-ফুল দেওয়া গাছের সঙ্গেই বেশি। কনিফার হচ্ছে পাইন জাতের গাছ—যাদের বীজ হয় কিন্তু সে বীজ ফলের মধ্যে থাকে না। তবে মস্ জাতীয় গাছের মত ফার্নের মধ্যেও "জন্মঃক্রম" দেখা যায় —যাকে ইংরেজিতে বলা হয় "অল্‌টারনেশন্ অব্ জেনারেশন্‌স্"। এ সম্বন্ধে আমরা আগেও বলেছি। এদের পাতার পেছন দিকে থাকে গোল গোল পুঁটলি। বিজ্ঞানের ভাষায় এই



এক জাতের শীল্ড ফার্নের পাতা



ঢেঁকি শাকের জাত ভাই ক্রিস্‌মাস ফার্ন



ব্র্যাকেন জাতীয় ফার্নের পাতা

নানা জাতের ফার্ন্ ঃ বাঁ-দিকে শীল্ড ফার্নের পাতার পেছন দিকে রেণুর পুঁটলি দেখা যাচ্ছে। মাঝখানে ক্রিস্‌মাস্ ফার্ন্ (ঢেঁকি শাকের জাতভাই)। এদের পাতার ডগাটা কুণ্ডলী পাকানো। ডানদিকে ব্র্যাকেন ফার্নের পাতা। বেশির ভাগ ফার্নের পাতাই দেখতে এই রকম সুন্দর বলে ফুলের তোড়া বাঁধতে প্রচুর ব্যবহার করা হয়।

পুঁটলিকে বলে সোরাস্ (বহুবচনে সোরি বা সোরাই)। প্রত্যেকটি সোরাসের মধ্যে থাকে রেণুর কৌটো, যাকে বলা হয় স্পোরাঞ্জিয়া,—সূক্ষ্ম রেণুতে ভর্তি। স্পোরাঞ্জিয়া পাকলে অর্থাৎ শুকিয়ে এলেই রেণুগুলো চারদিকে ছিটিয়ে পড়ে, তার পর ধুলোর মত বাতাসে ভাসতে ভাসতে দূরে ছড়িয়ে যায়। ধুলোর মতই অত্যন্ত হাল্কা, কিন্তু প্রত্যেকটি রেণুর ওপর বেশ একটা শক্ত খোলস আঁটা। এক একটা ফার্ন্‌গাছ থেকে লক্ষ লক্ষ রেণু বেরিয়ে আসে, তবে তার সবগুলি থেকেই কিছু নতুন ফার্ন্ গাছ গজায় না। যেগুলো থেকে গজায় সেগুলি প্রথমে তৈরি করে অনেকটা হরতনের মত চেহারার একটা জিনিস—যার বৈজ্ঞানিক নাম প্রোথ্যালাস্। প্রোথ্যালাসের নীচে শিকড়ের বদলে সুতোর মত আঁশ (রাইজয়েড) দেখা দেয়। প্রোথ্যালাসের নীচেই থাকে ফার্নের সেই সব অঙ্গ যা জল পেলে তাই থেকেই তৈরি হয় নতুন ফার্নের ভ্রূণ। এরাই ক্রমে আবার নতুন একটি ফার্ন্ গাছে রূপান্তরিত হয়।

পৃথিবীর সর্বত্রই অল্পবিস্তর ফার্ন্ গাছ দেখতে পাওয়া যায়, তবে গরম দেশেই এদের প্রাচুর্য খুব বেশি। প্রায় সব জঙ্গলেই মাটির কাছাকাছি অসংখ্য ফার্ন্ দেখতে পাওয়া যাবে—বিশেষ করে পাহাড়ী জঙ্গলে। তবে একটু ছায়া-ছায়া জায়গাই যেন এদের বেশি পছন্দ। এদের শিকড়, কাণ্ড, পাতা সবই দেখতে প্রায় সাধারণ সপুষ্পক গাছের মত। তাদেরই মত এরা শিকড় দিয়ে মাটি থেকে রস টেনে নেয়, সবুজ পাতার মধ্যে সূর্যালোকের সাহায্যে খাবার তৈরি করে। তবে বেশির ভাগ ফার্নেরই কাণ্ডটা থাকে মাটির নীচে। অবশ্য কারো কারো কাণ্ড ওপরের দিকেও ঠেলে ওঠে।

ফার্ন্ গাছের পাতা দেখতে ভারি চমৎকার। লক্ষ করলেই দেখবে প্রায়ই ফুলের তোড়ার সঙ্গে ফার্নের পাতাও বেঁধে দেওয়া হয়। ওতে তোড়ার বাহার আরও খোলে। এ পর্যন্ত আট হাজারেরও বেশি জাতের ফার্ন্ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন—তার মধ্যে কিছু কিছু দুষ্প্রাপ্য ফার্ন্‌ও আছে। এই সব ফার্নের চাষ

ইয়োরোপ-আমেরিকার ধনী লোকদের একটা শখ বলা যেতে পারে। এ জন্য তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয় করতেও পিছপা হন না। ইংল্যাণ্ডের জলবায়ুতে ফার্ন্ ভালো হয় না বলে সেখানে হট্ হাউস তৈরি করে কৃত্রিম আবহাওয়ার মধ্যে ফার্নের চাষ করার রেওয়াজ হয়েছে। আমেরিকায় তো একটা কথা চলতিই আছে—ছাদের কোণে টবে লাগানো ফার্নের একটা ভাঙ্গা ডাল দেখলেও নাকি সুদূর রকি পর্বত-মালার কথা মনে পড়ে যায়!

শুধু সৌন্দর্যের খাতিরেই নয়, ফার্নের আদর আরও নানান্ গুণের জন্য। নিউজিল্যাণ্ডের লোকেরা কোন কোন জাতের ফার্ন্ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। আমাদের দেশেও ঢেঁকি শাক একটা উপাদেয় খাদ্য। ঢেঁকি শাক কিন্তু এক জাতের ফার্ন্ ছাড়া আর কিছু নয়। কোনও জাতের ফার্ন্ থেকে পাওয়া যায় মূল্যবান্ ওষুধ, কোন কোনটা ব্যবহার করা হয় ঘরের চাল ছাওয়ার কাজে। হাওয়াই দ্বীপের ট্রী-ফার্ন্ থেকে এক রকম আঁশ পাওয়া যায় যা নাকি রেশমের মতই নরম। ওদেশে তা দিয়ে তোষক-গদী—এ সব হামেশাই তৈরি করা হয়।

পাইন

পাইন গাছ তোমরা সকলেই বোধ হয় দেখেছ। দার্জিলিং, শিলং, কাশ্মীর প্রভৃতি সমস্ত পাহাড়ী অঞ্চলেই এই জাতের গাছের ছড়াছড়ি। দেখতেও ভারি সুন্দর। নীচের দিক্‌টা চওড়া, তারপর সরু হ'তে হ'তে ওপরের দিকে প্রায় ছুঁচলো হয়ে গেছে—একটা বন্ধ ছাতা উল্টো করে ধরলে যেমন দেখায়। বাংলাতে বলে 'শঙ্কু', ইংরেজিতে ঐ আকারকে বলা হয় 'কোন্'; এদেরকে কনিফার জাতের গাছও বলা হয়। সাধারণ পাইন ছাড়া কাশ্মীরের চীর গাছ, বিলিতী ঝাউ, ক্রিপ্‌টোমেরিয়া, থুজা, জুনিপার ইত্যাদি অনেক জাতের গাছই এই দলে পড়ে। বিজ্ঞানীরা এদেরকে বলেন 'জিম্‌নোস্পার্ম্'।

কথাটার মানে হচ্ছে আ-ঢাকা বীজওয়ালা গাছ। সাধারণ বীজওয়ালা গাছের সঙ্গে এদের পার্থক্য এই যে এ সব গাছের বীজ (এর নামও কোন্) ফলের মধ্যে থাকে না, থাকে বাইরে। পাইন বা ঝাউ গাছের এ রকম বীজ তোমরা হয়তো দেখেছ। ঠিক যেন একটি খুদে খেলনার আনারস,—আকারে বড় জোর একটা কুলের মত। নতুন গাছের জন্ম হয় এই বীজের সাহায্যে। এদের পাতাগুলোও সাধারণ গাছের মত নয়, প্রায়ই সরু সরু লম্বা সূচের মত কিংবা আঁশের মত।

ফার্নের মত পাইন জাতের গাছদেরকেও আদ্যিকালের বনেদী গাছ বলা চলে। এক সময়ে গোটা পৃথিবী যুড়ে এরা বাস করত, এখন ওদের অনেকগুলিই লোপ পেয়ে গেছে। তবে ঐ সব লোপ-পাওয়া গাছের একটির আসল বংশধর এখনও টিকে আছে। এদেরকে বলা হয় জিঙ্কগো বাইলোবা। চীন ও জাপানে এ ধরনের গাছ এখনও কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা এদেরকে বলেন জীবন্ত ফসিল। খুব দুষ্প্রাপ্য গাছ কিনা! দার্জিলিংএর বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে এই গাছের একটি নমুনা দেখতে পাবে।

পাইন জাতের গাছ আমাদের নানা কাজে লাগে। প্লাইউড তক্তা এদের কোন কোনটা

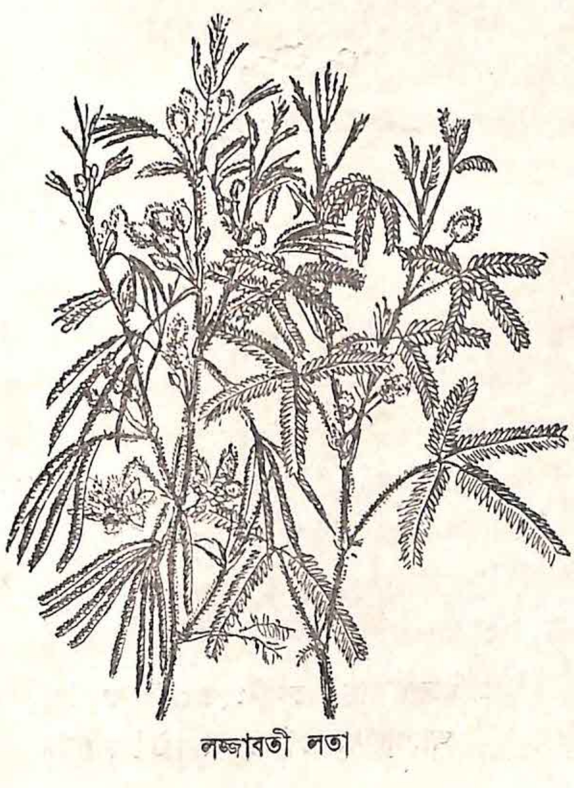
থেকেই তৈরি হয়। এদেরই কোন কোনটার ভিতরকার রস শুকিয়ে তৈরি হয় ধুনো। পাইনের ডালপালা বন্ধ-করা পাত্রে রেখে ডিস্টিল করেই (বাংলায় যাকে বলে পাতন-ক্রিয়া) পাওয়া যায় তার্পিন তেল বা টার্পেন-টাইন অয়েল।

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু আর সবচেয়ে দীর্ঘায়ু গাছ রেড্‌উড্‌রাও এই কনিফার জাতের মধ্যেই পড়ে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০)।

কয়েকটি অদ্ভুত গাছ

সব শেষে কয়েকটি অদ্ভুত রকমের গাছের কথা বলে আমরা গাছপালার গল্প শেষ করব।

প্রথমেই ধরা যাক লজ্জাবতী লতার কথা। বড় গাছ নয়, নেহাৎই ছোট্ট লতাগাছ; কিন্তু আশ্চর্য স্পর্শকাতর এই লতা। দিব্যি পাতা ছড়িয়ে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আঙুল



লজ্জাবতী লতা



কাঁদুনে গাছ বা উইপীং ট্রী

দিয়ে একটু ছোঁও, অমনি পাতাগুলি শির শির করে দুমড়ে ভাঁজ হয়ে নুয়ে পড়বে। দেখতে ভারি মজা লাগে। আবার কিছুক্ষণ গেলেই দেখবে নুয়ে-পড়া পাতাগুলি ভাঁজ খুলে ফেলে আবার সতেজ হয়ে ছড়িয়ে আছে।

লজ্জাবতীর মত কাঁদুনে গাছও আছে। তবে এরা লতা নয়, আকারে খুব বড়। এর কোন কোনটা জলা জায়গায় জন্মায় আর প্রচুর জল সংগ্রহ করে রাখে দেহের মধ্যে। তারপর সময় হ'লে বৃষ্টিধারার মত সে জল ঝরতে থাকে। লোকে বলে গাছ কাঁদছে, তাই ওর নাম দেওয়া হয়েছে কাঁদুনে গাছ বা "উইপিং ট্রী"। পান্থ-পাদপ বলে এক রকম গাছ আমাদের দেশেও হয়। এ গাছও তার শাঁসাল ডগার দিকে প্রচুর জল সঞ্চয় করে রাখে। তৃষ্ণার্ত পথিক সে জল পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে।

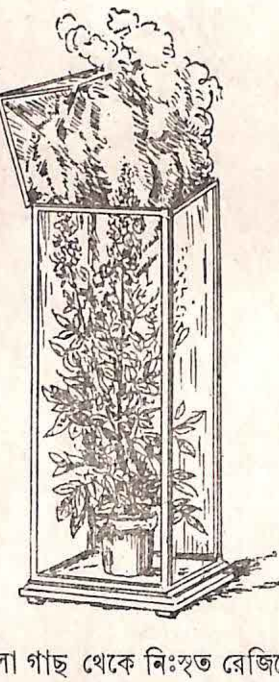
কাগজকে ইংরেজিতে পেপার বলে। এই নামটা কেমন করে হ'ল জান তো? মিশর



মিশর দেশের প্যাপায়রাস্ গাছ—যা থেকে
কাগজের নাম হয়েছে পেপার

দেশে প্যাপায়রাস্ নামে এক জাতের নলখাগড়া জাতীয় গাছ জলা জায়গায় প্রচুর জন্মাত। এই গাছের ছাল ছাড়িয়ে ওদেরই আঠায় যোড়া লাগিয়ে লাগিয়ে প্রাচীন মিশরীয়রা তার ওপর লিখত। বহু প্রাচীন পুঁথিপত্তর তারা এইভাবে প্যাপায়রাস্ গাছের ছালের ওপর লিখে রেখে গেছে। প্যাপায়রাস্ থেকেই পেপার কথাটির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে নানা রকম গাছের ছালে বা পাতায় পুঁথিপত্র লেখা হ'ত এবং তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'ত। ভূর্জপাতায় লেখা চিঠির কথা কবি কালিদাসের কাব্যের অনেক জায়গাতেই আছে। আর তালপাতায় লেখা সেকেলে পুঁথি তো এখনও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন গ্রন্থাগারে। তোমরাও হয়তো দেখেছ।

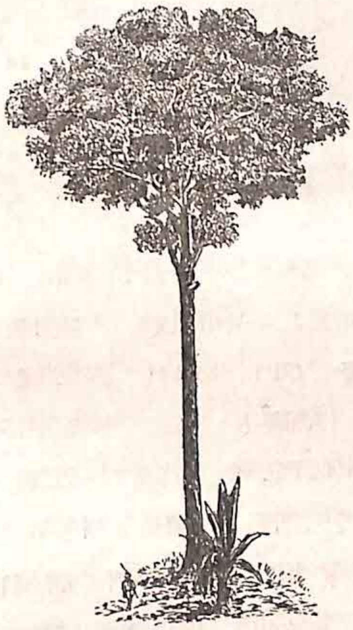
পাইন জাতীয় গাছের রস জমিয়ে ধুনো পাওয়া যায় সে কথা আগে বলেছি। ধুনো হচ্ছে 'রেজিন' জাতীয় পদার্থ। রেজিন এবং ঐ গাছের কাঠ থেকে পাওয়া তার্পিন তেল—এগুলি সবই দাহ্য পদার্থ। কোন কোন গাছের এই রেজিন জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়ে আপনিই বাষ্পাকারে পাতার ওপর থেকে বেরিয়ে আসে, আর সে বাষ্প গাছটিকে ঘিরে রাখে। ঐ গাছের কাছে কোন আলো আনলে, আলোর সেই সামান্য তাপেই বাষ্পগুলি জ্বলতে শুরু করে দেয় আর সমস্ত গাছটা সেই জ্বলন্ত গ্যাসের মধ্যে ঝলমল করতে থাকে। ফ্রাক্সিনেলা নামে এই জাতীয় এক রকম গাছ বিলেতের অনেক জায়গায় শখের বাগানে চাষ করা হয়। ছোট ছোট গাছ, টবে পুঁতে কাচের কেসের মধ্যে পুরে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়। ঢাকনা খুলে দিয়ে সামনে মোমবাতি ধরলেই গাছের ওপরকার বাষ্প দপ্ করে জ্বলে ওঠে আর



ফ্রাক্সিনেলা গাছ থেকে নিঃসৃত রেজিনের বাষ্প
আলোর সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠেছে।

সমস্ত গাছটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার পর এই দৃশ্য দেখতে অদ্ভুত লাগে।

শুধু রেজিন—ধূপ, ধুনো, রজন, তার্পিন তেলই নয়, গাছ থেকে আমরা এমন আরও



কর্পূর গাছ

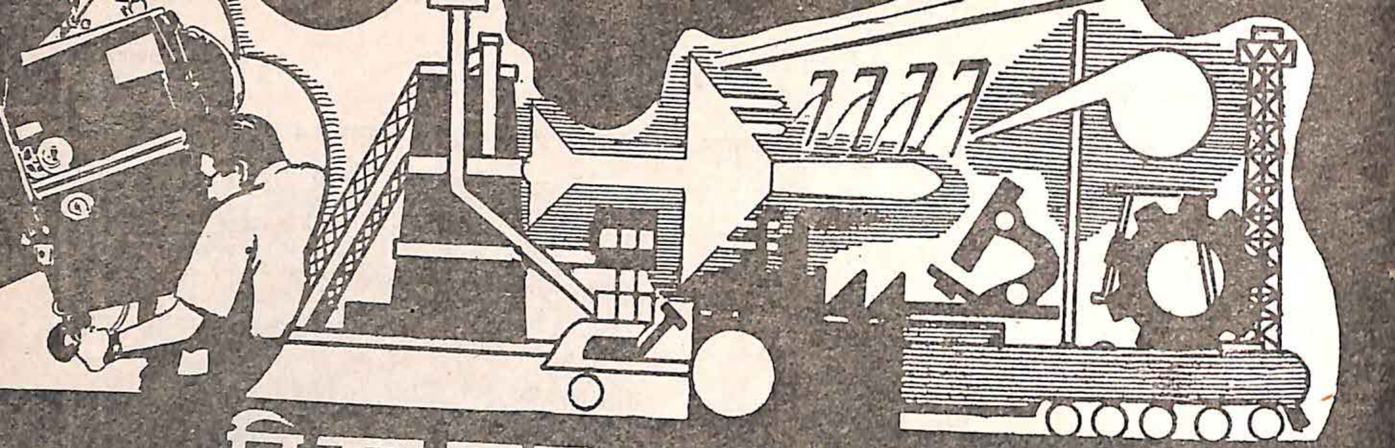
হরেক রকম জিনিস পাই যা সাধারণ লোকে হয়তো খবরই রাখে না। যেমন ধর, কর্পূরগাছ। এই গাছের মধ্যে—ডালে, মুকুলে, পাতায় এক রকম তেল জমা হয়—তাই হচ্ছে কর্পূর বা ক্যাম্ফর। ঐ রকম কোন গাছ থেকে পাওয়া যায় খয়ের, কোন গাছ থেকে পাওয়া যায় রবার। এগুলি সবই গাছের ভিতরকার বিশেষ ধরনের রস। আবার, সিঙ্কোনা গাছ থেকে পাওয়া যায় কুইনিন, কুচিলা গাছ থেকে পাওয়া যায় স্ট্রিক্নিন—নাক্সভমিকা, চা-গাছ থেকে পাওয়া যায় কেফিন, হরতুকি, মাজু, বহেরা, বাবলা—এদের ভিতর থেকে পাওয়া যায় ট্যানিন ইত্যাদি। এদের অনেকগুলিই ব্যবহার করা হয় ওষুধপত্রে। নানা রাসায়নিক শিল্পেও এদের চাহিদা আছে। আয়ুর্বেদের বেশির ভাগ ওষুধই তো গাছগাছড়া থেকে সংগ্রহ করা হয়। যেমন সর্পগন্ধা থেকে রক্তচাপের ওষুধ, অর্জুন গাছ থেকে হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখার ওষুধ।

বাংলা দেশে পাটের চাষের কথা কে না জানে? পাটগাছের ছাল ছাড়িয়ে, জলে ভিজিয়ে, শুকিয়ে যে পাট পাওয়া যায় তা থেকে তৈরি হয় চট, দড়ি। তেমনি তুলো গাছের বীজের আঁশ থেকে পাওয়া যায় তুলো। আখ থেকে চিনি। চা, কোকো, কফি—এ সবও গাছেরই অবদান, ফল-শস্যের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এক কথায়, আমাদের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে গাছপালার ওপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছি।



সিঙ্কোনা গাছের ডাল ও পাতা—যা থেকে কুইনিন তৈরি হয়।



বিজ্ঞানের জয়যাত্রা

রেডিওর কথা

একবার একজন বড় বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—"এ যুগের সাতটি বড় বড় আবিষ্কারের মধ্যে কোন্‌টিকে আপনি সবচেয়ে গুরুত্ব দেন?" বিজ্ঞানী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন,—"রেডিও"। কথাটা হয়তো সকলে মানতে না চাইলেও রেডিও যে এ যুগের সাতটি বড় বড় আবিষ্কারের মধ্যে একটি এ বিষয়ে বোধ হয় কারো মতের অমিল নেই। কেন না রেডিও শুধু যে গান-বাজনা, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি আনন্দই পরিবেশন করে তাই নয়, আরও কত ভাবে যে সে আজকের পৃথিবীতে তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করেছে তার যেন শেষ নেই। খবরের কাগজের ভূমিকা নিয়েছে রেডিও। পৃথিবীর কোথায় কি ঘটল মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দিচ্ছে আমাদের। কখন কোথায় কি বিপদ্ আসছে,—তা সে প্রাকৃতিক বিপদ্ ঝড়-বৃষ্টিই হোক আর যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমণে মানুষের-হাত-দিয়ে-আসা বিপদ্ই হোক,—সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে। বড় বড় লোকের বক্তৃতা থেকে শুরু করে খেলার মাঠে টিকেট-না-পাওয়া লোকদের ঘরে বসে খেলার ধারা-বিবরণী শোনাচ্ছে রেডিও। মাষ্টার মশাইদের অনেক কাজও করে দিচ্ছে সে। ছাত্ররা রেডিওর মাধ্যমে কত কি শিখছে! খবর পরিবেশনের মত বিজ্ঞাপন পরিবেশনের ভারও নিয়েছে রেডিও। তা ছাড়া পুলিশের কাজেও সাহায্য করছে। সমুদ্রে জাহাজ চালাবার নির্দেশ দেওয়া কিংবা এরোপ্লেনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের কাজও এখন অনেকখানিই রেডিওর। এমন কি মহাশূন্যে রকেট পাঠিয়ে কিংবা চাঁদের পিঠে অভিযাত্রী নামিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার ভারও খানিকটা পড়েছে রেডিওর ওপর। রেডিও ছাড়া বর্তমান দুনিয়ার কথা যেন আমরা ভাবতেই পারি না।

রেডিও চলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে—যার অপর নাম বেতার-তরঙ্গ বা রেডিও-তরঙ্গ। আরও খাঁটি বৈজ্ঞানিক ভাষায় বললে বলতে হয় "ইলেক্‌ট্রো-ম্যাগ্‌নেটিক ওয়েভ"। আমরা জানি, আলো মহাশূন্যে ঢেউ বা তরঙ্গের আকারে ছুটে চলে। বিদ্যুৎ-শক্তিও যে ঐ ভাবে মহাশূন্যে তরঙ্গের আকারে ছুটে যেতে পারে এ তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী

ম্যাক্সওয়েল। তিনি অবশ্য হাতে-নাতে প্রমাণ করেন নি, বলেছিলেন অঙ্ক কষে। হাতে-নাতে প্রথম ব্যাপারটা প্রমাণ করেন হার্ৎজ্। এর পর আরও অনেকে ঐ নিয়ে কাজ করে গেছেন। আমাদের জগদীশচন্দ্র বসুও এ নিয়ে আশ্চর্য আশ্চর্য পরীক্ষা করেছিলেন ; এমন কি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সাহায্যে এক ঘর থেকে দূরের অন্য ঘরে একটি পিস্তলে আওয়াজ তুলে দেখিয়েও দিয়েছিলেন যে তারের মাধ্যম ছাড়াও বেতার-তরঙ্গে শব্দ পাঠানো চলে। তবে এ নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন ইটালির মার্কনি। ১৮৯৬ সালে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে তিনি ইংলিশ চ্যানেলের এপারে ওপারে শব্দ পাঠিয়ে সবাইকার তাক লাগিয়ে দেন।

রেডিওর ক্রমোন্নতি

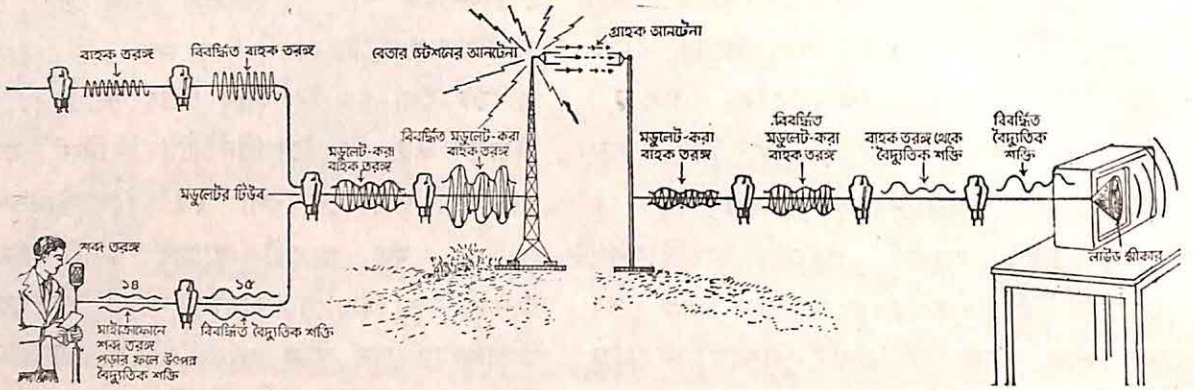
অবশ্য প্রথম দিক্‌কার বেতারে এখনকার মত সরাসরি কথাবার্তা বলা যেত না। টেলিগ্রাফে যেমন ডট্ আর ড্যাশের সাহায্যে সাংকেতিক ভাষায় শব্দ পাঠানো হয় মার্কনির রেডিও-ও ছিল প্রায় সেই রকম। তবু তাঁকেই রেডিও বা বেতারের আবিষ্কর্তা বললে ভুল হবে না, এবং তা মেনেও নেওয়া হয়েছে।

এর পর বিজ্ঞানীরা বেতার নিয়ে সমানে গবেষণা চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই চেষ্টায় বেতারে সরাসরি কথাবার্তা পাঠাবার আর তা দূরে বসে শুনবার ব্যবস্থা হ'ল ইলেক্‌ট্রন টিউবের আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে। এই টিউবের কাজ হচ্ছে ইলেক্‌ট্রন নিয়ন্ত্রণ করা—কারণ এই ইলেক্‌ট্রনের ছুটোছুটির ফলেই বেতার-তরঙ্গ বা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরি হয় এবং আকাশপথে ছুটে চলে। সে জন্য এই টিউব-গুলিকে বলা হয় ইলেক্‌ট্রন টিউব আর যে সব বিজ্ঞানে এই সব ইলেকট্রন টিউব নিয়ে কাজ করা হয় তাদেরকে বলা হয় ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্। রেডিওর মত পরবর্তী কালের টেলিভিশনও ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে। বেতারের আবিষ্কারের পর আজ পর্যন্ত এ রকম হাজারো রকমের ইলেক্‌ট্রনিক টিউব তৈরি হয়েছে—এখনও হচ্ছে।

ইলেক্‌ট্রন সম্বন্ধে এর আগে আমরা 'সাধারণ বিজ্ঞানের কথা' বিভাগে একাধিক বার আলোচনা করেছি। আবার একটু মনে করিয়ে দিই। প্রতিটি পদার্থের মধ্যে রয়েছে অ্যাটম্ বা পরমাণু। কোনও মৌলিক পদার্থের অ্যাটম্ বা পরমাণুগুলো সব একই রকমের ; যৌগিক পদার্থ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের অ্যাটম্ আছে। আবার সব অ্যাটম্‌ই তৈরি হয়েছে আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকা দিয়ে—যার কোনটা পজিটিভ বিদ্যুৎযুক্ত, কোনটা নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত, আর কোনটা বিদ্যুৎহীন। নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত এই কণিকা-গুলোকেই বলা হয় ইলেকট্রন আর এরাই হচ্ছে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের বা রেডিও-তরঙ্গের আসল নিয়ন্তা। ইলেকট্রন যে ভাবে ছুটবে বিদ্যুৎ-তরঙ্গও সেই ভাবেই তৈরি হবে।

ব্রড্‌কাস্টিং

রেডিওতে শব্দ পাঠানোকে বলা হয় 'ব্রড্-কাস্ট' করা। কথাটা হয়তো তোমাদের অপরিচিত নয়। সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে গেলে সে এক সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়ে দাঁড়াবে,



রেডিওর শব্দ কি ভাবে ব্রড্কাস্ট করা হয়

তাই সংক্ষেপে তোমাদের ব্রড্কাস্টিং ব্যাপারটার কথা বলছি।

যেখান থেকে অর্থাৎ যে রেডিও স্টেশন থেকে ব্রড্কাস্ট করা হয় তাকে বলা হয় ট্রান্স্মিটার। এই ব্রড্কাস্টিং ব্যাপারটা ওপরের ছবিতে বেশ ভালো করে বোঝানো হয়েছে। ছবিতে প্রথমেই চোখে পড়বে বাহক তরঙ্গ—যাকে ইংরেজিতে বলে ক্যারিয়ার ওয়েভ। বাহক বলা হয় এই জন্য যে এর বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রটা বেতারে প্রচারিত শব্দের ওপর নির্ভর করে,—সেই অনুযায়ী বাড়ে-কমে। অর্থাৎ ওর কাজ হচ্ছে শব্দটাকে বক্তার কাছ থেকে শ্রোতার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া। বাহক তরঙ্গ তৈরি করা হয় অসিলেটর নামে এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে। এই বাহক তরঙ্গ চলবার সময় আরও জোরালো করে দেওয়া হয়। ইংরেজিতে ওকে বলা হয় অ্যাম্প্লিফাই করা—যার বাংলা হচ্ছে বিবর্দ্ধিত করা।

ছবিতে আরও দেখ, বক্তা অর্থাৎ বেতার-প্রচারক একটা মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছেন অর্থাৎ শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করছেন। এই শব্দ-তরঙ্গ মাইক্রোফোনে পড়ার ফলে সেখানে তৈরি হচ্ছে বৈদ্যুতিক শক্তি। এই বৈদ্যুতিক শক্তিটা তেমন জোরালো নয়, তাই ইলেক্ট্রন টিউবের (ডায়োড, ট্রায়োড ইত্যাদি) সাহায্যে এ শক্তিটাকেও জোরালো করে দিয়ে পাঠানো হচ্ছে মডুলেটর টিউবে—যা বাহক তরঙ্গের সঙ্গে মিশে দু'টি মিলে আরও জোরালো বা, ভালো বাংলায়, বিবর্দ্ধিত হয়ে গিয়ে পড়ছে বেতার স্টেশনের উঁচু অ্যান্টেনায়, যেখান থেকে তা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে। ছড়িয়ে পড়ছে বললাম বটে, কিন্তু সে তরঙ্গ কিন্তু সেখানেই থেকে যাচ্ছে না। যেহেতু আলোক-তরঙ্গ আর বিদ্যুৎ-তরঙ্গের গতিবেগ একই, তাই তা প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলবে, এবং চলছেও তাই—সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল বা ২৯৯৩২৪ কিলোমিটার বেগে।

এই বেগে ছুটতে ছুটতে বেতার বা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ এসে ঘা মারল গ্রাহক স্টেশনের উঁচু অ্যান্টেনায়—যার নাম রিসিভার। রিসিভারে এসে পড়বার পর তা আবার ঠিক অনুরূপ বেতার-তরঙ্গের অর্থাৎ মডুলেট করা বাহক

তরঙ্গের সৃষ্টি করবে এবং তারপর আগের মত ইলেকট্রন টিউবের সাহায্যে আবার তা জোরালো হয়ে যাবে। এই হচ্ছে দ্বিতীয় বার বিবর্দ্ধিত মডুলেট করা বাহক তরঙ্গ। এর পর বাহক তরঙ্গ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলাদা করে ফেলার পালা। এটাও সম্ভব ঐ রকম বিভিন্ন টিউবের সাহায্যেই। বাহক তরঙ্গ থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি বেরিয়ে এলে পর তাকে আবার অ্যাম্প্লিফায়ার যন্ত্রে জোরালো করে নিয়ে যাওয়া হবে লাউড স্পীকারে—যেটা নাকি বসানো আছে রেডিও সেটে। ঐ লাউড স্পীকার থেকেই বেরিয়ে আসবে অবিকল ঠিক সেই রকম শব্দ যা নাকি ওদিক্‌কার মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বক্তা বলে যাচ্ছিলেন।

তোমাদের নিশ্চয়ই মনে খটকা লাগছে—বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র তো কত রকম মাপের বেতার-তরঙ্গ আকাশে ছেড়ে দিচ্ছেন আর তা অনবরত ছুটে চলেছে রিসিভার অ্যাণ্টেনার দিকে—সবগুলি একসঙ্গে আছড়েও পড়ছে তার ওপর। সবগুলিই যদি শব্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয় তা হ'লে তো সে এক মহা হট্টগোল বেধে যাবে! কিন্তু তা হয় না। ঐ সব তরঙ্গ থেকে কেবল একটি মাত্র নির্দিষ্ট মাপের তরঙ্গ বেছে নেওয়া হয় টিউনারের সাহায্যে। কাজেই যত রকম মাপের বেতার-তরঙ্গই আসুক না কেন, —বিভিন্ন স্টেশন থেকে বা একই স্টেশন থেকে, —তার একটিকে মাত্র বেছে নেওয়া সম্ভব। যারা রেডিও চালাতে অভ্যস্ত তারা নিশ্চয়ই জান কি করে 'নব্' ঘুরিয়ে ইচ্ছেমত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ রেডিওতে ধরা যায়।

বেতারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য

একটা কথা মনে রাখতে হবে, বেতার-তরঙ্গ হয় সাধারণত তিন মাপের—লং অর্থাৎ লম্বা, মিডিয়াম অর্থাৎ মাঝারি আর শর্ট্ অর্থাৎ ছোট। ছোট হ'লেও আলোক-তরঙ্গের তুলনায় এগুলোও বেশ বড়। লং ওয়েভ বা লম্বা আকারের তরঙ্গগুলো এক একটা এক হাজার থেকে তিন হাজার মিটার পর্যন্ত হ'তে পারে। আর শর্ট্ ওয়েভ বা ছোট আকারের তরঙ্গগুলো এক একটা হয় ১৪ থেকে ৫০ মিটারের মত। মিডিয়াম মানে এদের মাঝামাঝি। ইলেক্‌ট্রনদের নাড়াচাড়াকে বলা হয় অসিলেশন। একটা পুরো অসিলেশন বলতে বোঝায় একটা ইলেকট্রনের একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে যাতায়াত। আর এই রকম একটা অসিলেশনে একটি তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে যতটা পথ এগিয়ে যায় তাকেই বলা হয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য, তা সে আলোক-তরঙ্গই হোক বা বিদ্যুৎ-তরঙ্গ কিংবা বেতার-তরঙ্গই হোক। প্রতি সেকেণ্ডে যতগুলি তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পনাঙ্ক। আবার একটি পূর্ণ তরঙ্গকে বলা হয় সাইকেল। এক হাজার সাইকেল হ'লে সেটা হবে কিলো সাইকেল, দশ লক্ষ সাইকেল হলে সেটা হবে মেগা সাইকেল।

ট্রানজিস্টার

আজকাল রেডিও সেটের চাইতে ট্রানজিস্টার সেটের কদর বেশি। একটা কারণ, ট্রানজিস্টার আকারে খুবই ছোট হতে পারে আর যেখানে সেখানে নিয়ে ঘোরা যায়। টর্চের মত ব্যাটারি দিয়েই এগুলো চালানো যায়। যেখানে বিজলী বা ইলেক্‌ট্রিসিটির

ব্যবস্থা নেই সেখানেও এগুলো চালাতে কোন বাধা নেই। লোকে সব কিছুই সহজ করে নিতে চায়। যেমন, আগে রেডিও চালাতে হ'লে বাড়ীর ছাদে উঁচু উঁচু এরিয়েলের তার খাটাতে হ'ত। তার পর ঘরের মধ্যে তা ছোট করে এনে ইন্‌ডোর এরিয়েলের ব্যবস্থা হ'ল। এখন আর বাইরে বা ঘরের ভিতর এরিয়েল খাটাবার বড় একটা দরকার হয় না, রেডিওর বাক্স বা ক্যাবিনেটের মধ্যেই অ্যান্টেনা বা এরিয়েলের সব ব্যবস্থা করে দেওয়া থাকে।

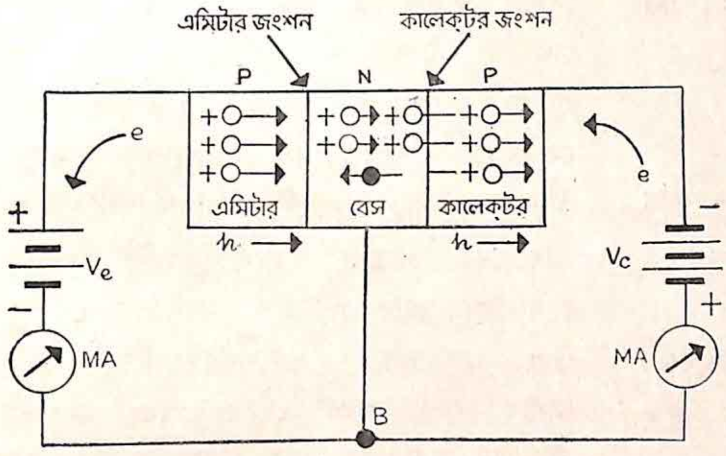
ট্রানজিস্টারের ভিতরকার ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সহজ আর রেডিও সেটটাকেই ট্রানজিস্টার বলে লোক বললেও আসলে ভিতরের প্রয়োজনীয় অংশটুকুই হচ্ছে ট্রানজিস্টার—সমস্ত রেডিও সেটটা নয়। তফাৎ বোঝাবার জন্য 'ট্রানজিস্টার সেট' বলা মন্দ নয়। কিন্তু এই ট্রানজিস্টার জিনিসটা কি ?

বিজ্ঞানীর স্যাণ্ডউইচ

স্যাণ্ডউইচ খেতে আমাদের সকলেরই ভালো লাগে। চিকেন্, মটন্, চীজ্, ভেজিটেবল ইত্যাদি সব রকমের স্যাণ্ডউইচ-ই বেশ উপাদেয় খাদ্য। আসলে দু' টুকরো পাঁউরুটির মধ্যে সামান্য পরিমাণ অন্য কিছু খাদ্য পুরে দিয়ে রুচির একটু পরিবর্তন করা হয়। ট্রানজিস্টারকেও বিজ্ঞানী-দের তৈরি এক রকমের স্যাণ্ডউইচ বলা চলে। ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্-এর এই বিশেষ স্যাণ্ডউইচ তৈরি করা হয় বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম্ অথবা সিলিকনের স্ফটিকে সামান্য খাদ মিশিয়ে।

১৯৪৭ সালে আমেরিকার বেল গবেষণা-গারের দুই বিজ্ঞানী উলিইয়াম শক্‌লে ও জন বারডেন দু'টি অতি সূক্ষ্ম ধাতব তারের মুখ একটি জারমেনিয়াম তলের ওপরে রাখেন। একটি ধাতব তারকে অপরটির তুলনায় পজিটিভ করা হয়, জারমেনিয়াম তলের তুলনায় অপর তারটিকে করা হয় নেগেটিভ। তার দু'টি এবং জার-মেনিয়াম তলটি ভিন্ন ভাবে বিদ্যুতের সঙ্গে সংযোগ করে দেওয়া হয়। তাঁরা লক্ষ করেন যে পজিটিভ বা এমিটার তারটিতে বিদ্যুতের মানের সামান্য তারতম্য হলেই নেগেটিভ বা কলেক্টার তারটিতে বিদ্যুতের মান বহুলাংশে বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে পয়েন্ট কন্‌ট্যাক্ট ট্রান্‌জিস্টারের জন্ম হয়। ক্রমে আরও এক রকম ট্রানজিস্টার আবিষ্কৃত হয়—যার নাম 'জংশন' ট্রান্‌জিস্টার। আধুনিক অধিকাংশ ট্রানজিস্টারই জংশন ট্রানজিস্টার।

যখন জারমেনিয়াম স্ফটিকের সঙ্গে অতি সামান্য পরিমাণে আর্সেনিক অথবা অ্যান্টিমনি মৌল মেশানো হয় তখন জারমেনিয়াম অণুর গঠনগত প্রকৃতির কিছু পার্থক্য দেখা দেয়। আসলে জারমেনিয়াম অণুতে ইলেকট্রনের মাত্রা বেড়ে যায়। এই অবস্থাকে n-টাইপ বলা হয়। আবার যদি একই জারমেনিয়ামের সঙ্গে ইণ্ডিয়াম বা গ্যালিয়াম মেশানো হয় তখন জারমেনিয়ামের অণুতে ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়। এই ধরনের পদার্থকে p-টাইপ বলা হয়। ইলেক্‌ট্রনের এই ঘাটতিকে পজিটিভ "হোল্"-এর সঙ্গেও তুলনা করা যেতে পারে। পজিটিভ হোল বলতে বোঝায় পজিটিভ বা ধনাত্মক বিদ্যুৎযুক্ত কোন গর্ত অর্থাৎ ফাঁকা জায়গা।



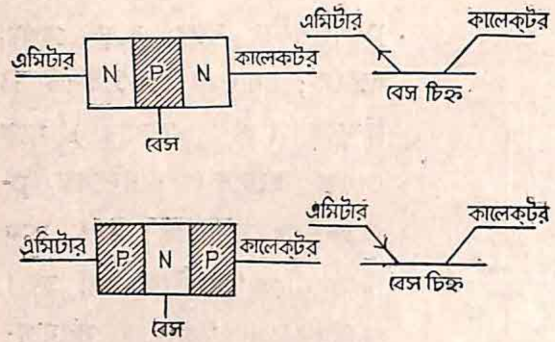
P-N-P জংশন ট্রানজিস্টার

ট্রানজিস্টারের আরও খুঁটিনাটি

দু'টি p-টাইপ জারমেনিয়ামের মাঝখানে একটি n-টাইপ দিয়ে p-n-p এবং দু'টি n-টাইপের মাঝে একটি p-টাইপ জারমেনিয়াম্ দিয়ে n-p-n 'জংশন' ট্রানজিস্টার তৈরি করা হয়। এই ধরনের জংশন ট্রানজিস্টারের গঠনপ্রণালী অনেকটা আমাদের প্রিয় খাদ্য দু'টি পাঁউরুটির মাঝে অন্য কোনও খাদ্য দিয়ে তৈরি স্যাণ্ডউইচের মত। p-টাইপ এবং n-টাইপ জারমেনিয়ামের সমন্বয়ে যে বৈজ্ঞানিক স্যাণ্ডউইচ তৈরি হয় তার ক্ষমতা বা শক্তি নির্ভর করে স্যাণ্ডউইচটির আকারের ওপর। ওপরে p-n-p জংশন ট্রানজিস্টারের একটা ছবি দেওয়া হ'ল।

দু'টি p-টাইপ জারমেনিয়াম একটি n-টাইপ জারমেনিয়ামের সঙ্গে বিশেষ উপায়ে যুড়ে দেওয়া হয়েছে। Ve এবং Vc দুটি ব্যাটারী। MA বিদ্যুৎপ্রবাহের মান মাপার যন্ত্র বা এ্যাম্মীটার। Vc ব্যাটারীর নেগেটিভ টারমিনাল ডানদিকের p-টাইপ-এর সঙ্গে আর Ve ব্যাটারীর পজিটিভ টারমিনাল বাঁ দিকের p-টাইপটির সঙ্গে যুড়ে দেওয়া হয়েছে; মাঝের n-টাইপটি B বিন্দুতে (ছবি অনুযায়ী) যুড়ে দেওয়া হয়েছে। বাঁ-দিকের p-টাইপটিকে 'এমিটার' এবং ডান দিকের-টিকে 'কলেক্টার' বলা হয়। 'এমিটার' ও 'বেস'-এর সংযোগ-স্থলকে বলা হয় 'এমিটার জংশন' এবং 'বেস' ও 'কলেক্টারের'-এর সংযোগস্থলকে বলা হয় 'কলেক্টার জংশন'।

আমরা জানি যে p-টাইপ জারমেনিয়ামে পজিটিভ হোল এবং n-টাইপ-এ নেগেটিভ ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে। হোল এবং Vea পজিটিভ টারমিনাল একই নেগেটিভ প্রকৃতির হওয়ার জন্য হোল্‌গুলি বেস্-এর দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ধাক্কা খায়। সেই ধাক্কার জোরে বেশির ভাগ হোলই বেস-এর ইলেকট্রনের সঙ্গে না মিলে গিয়ে কলেক্টারে চলে আসে। অবশ্য সামান্য কিছু-সংখ্যক হোল্ বেস-এর ইলেকট্রনের সঙ্গে মিশে যায়। Vc ব্যাটারীর নেগেটিভ টারমিনাল কলেক্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য পজিটিভ হোলগুলি অনায়াসে কালেক্টার পার হয়ে যায়। কলেক্টার থেকে প্রতিটি হোলের জন্য Vc থেকে একটি করে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসে এবং হোলের সঙ্গে মিলিত হয়। এই সংযোগের ফলে এমিটার থেকে একটি ইলেকট্রন Ve ব্যাটারীর পজিটিভ টারমিনালে চলে যায়। এমিটারএ আবার একটি পজিটিভ হোলের সৃষ্টি হয় এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। এইভাবে



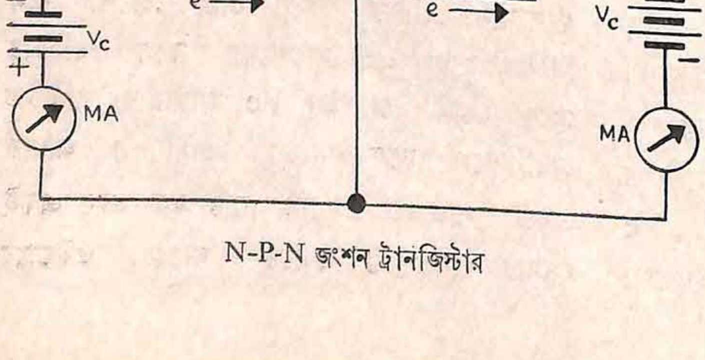
ওপরে N-P-N ট্রানজিস্টার, নীচে P-N-P ট্রানজিস্টার

হোলের গতির জন্যই p-n-p টাইপ জংশন ট্রানজিস্টারে বিদ্যুৎপ্রবাহের উৎপত্তি হয়। ওপরকার ছবিতে (নীচের অংশে) একটি p-n-p টাইপ জংশন ট্রানজিস্টার দেখানো হ'ল।

আরও দু'-এক রকম

নীচের ছবিতে n-p-n জংশন ট্রানজিস্টার দেখানো হয়েছে। দু'টি n-টাইপ জারমেনিয়ামের মধ্যে একটি p-টাইপ জারমেনিয়াম বিশেষ উপায়ে যুড়ে n-p-n ট্রানজিস্টার তৈরি হয়েছে।

১৫১১ পৃষ্ঠার ছবির তুলনায় এই ছবির ব্যাটারী টারমিনালের সংযোগের পার্থক্য লক্ষণীয়। Vc ব্যাটারীর পজিটিভ টারমিনাল কলেক্টারের সঙ্গে এবং Ve ব্যাটারীর নেগেটিভ টারমিনাল এমিটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আমরা জানি n-টাইপ জারমেনিয়ামে ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে। Ve ব্যাটারীর নেগেটিভ টারমিনাল-এর জন্য এমিটারের বাড়তি ইলেকট্রনগুলি p-টাইপ বেস পার হয়ে n-টাইপ কলেক্টারে পৌঁছোয় এবং সেখানকার ইলেকট্রনগুলিকে এগিয়ে যাবার জন্য ধাক্কা দেয়। Vc ব্যাটারীর পজিটিভ টারমিনাল সেই নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলিকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। তখন আবার Ve ব্যাটারীর নেগেটিভ টারমিনাল থেকে একটি নেগেটিভ ইলেকট্রন জন্মগ্রহণ করে ও এমিটারে প্রবেশ করে। এইভাবে ইলেকট্রনের গতির সাহায্যে n-p-n ট্রানজিস্টারে বিদ্যুতের গতি উৎপন্ন হয়। n-p-n জংশন ট্রানজিস্টার ওপরের ছবিতে (ওপরের অংশ) দেখানো হ'ল।



N-P-N জংশন ট্রানজিস্টার

টেপ রেকর্ডার

সাবেকি আমলের গ্রামোফোনের অনেক ঝক্কি। একই রেকর্ড বারে বারে প্রায়ই শুনতে ভালো লাগে না আর, পুরোনো হয়ে গেলে, সে রেকর্ড অন্য কোন কাজেও লাগে না। টেপ রেকর্ডারে এ সমস্ত ঝামেলা নেই। যা-ই শুনতে ইচ্ছে করুক না কেন, ম্যাগনেটিক টেপ বা চৌম্বক ফিতেয় যন্ত্রস্থ করে নেওয়া যায়, আবার ইচ্ছেমত সেই রেকর্ডিং মুছে ফেলে অন্য কিছু রেকর্ড করাও সম্ভব। টেপ রেকর্ডার যন্ত্রটির কার্যকলাপ যদিও অত্যন্ত জটিল, তবে ব্যবহারে

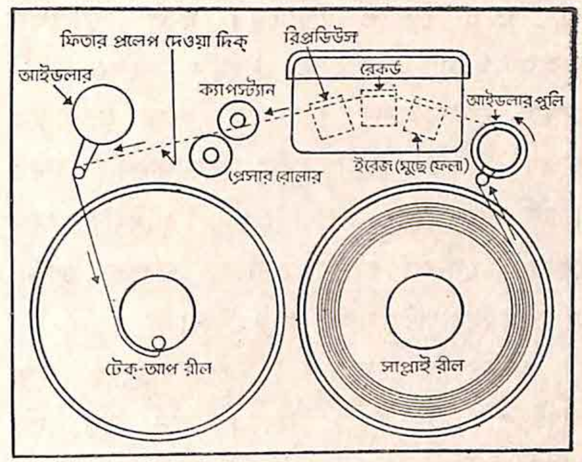
জিনিসটা অনেকটা পাঠশালার পড়ুয়াদের স্লেট পেনসিলের মত। অঙ্ক কষার পর পণ্ডিত মশাই যদি বলেন আগের অঙ্ক মুছে অন্য অঙ্ক করতে, তবে তাও যেমন সম্ভব, তেমনি যদি বলেন ছ'দিন পরে সেই অঙ্কটা দেখাতে, তবে তাও সম্ভব। তবে ঐ সময়টা ওই স্লেটটিকে যত্ন করে তুলে রাখতে হবে এবং আরও অঙ্ক কষার জন্য অন্য কোনও স্লেট ব্যবহার করতে হবে।

ব্যবহারে টেপ রেকর্ডারের চৌম্বক ফিতে অনেকটা স্লেটেরই মত। প্রায় $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি চওড়া আর $\frac{১}{৫০০}$ ইঞ্চি পুরু একটি প্লাস্টিকের ফিতের (প্রায় ১০০০ গজ লম্বা) ওপর লোহার একটি যৌগিক রাসায়নিক পদার্থের (সাধারণত ফেরিক অক্সাইড বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইড অথবা ছ'টির মিশ্রণ) প্রলেপ দিয়ে এই চৌম্বক ফিতের কার্যকরী তলটি তৈরি করা হয়। এই চৌম্বক ফিতেটি একটি গোলাকৃতি বৈদ্যুতিক চুম্বকের চৌম্বক আবেশের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। যে শব্দ রেকর্ড করা হবে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আবেশ সেই শব্দের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে।

গোলাকৃতি চুম্বক এবং চৌম্বক ফিতের আবেশও আবার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।



টেপ রেকর্ডিংএর কার্যপদ্ধতি



টেপ রেকর্ডার কি ভাবে কাজ করে

এরই ফলে টেপ রেকর্ডারের কাছে একটা মাইক্রোফোন রেখে কথা বললে টেপ রেকর্ডারের ফিতেয় সে শব্দ গাঁথা হয়ে যায়। তার পর যত বার খুশি গ্রামোফোনের রেকর্ডের মত সে শব্দ বার করে করে শোনাও চলে। আবার, ইচ্ছে করলে, ফিতে উল্টো দিকে চালিয়ে সে শব্দকে বেমালুম ফিতের গা থেকে মুছে ফেলতেও কোন অসুবিধে নেই। আজকাল রেডিওতে প্রায় সমস্ত প্রোগ্রামই আগে এইভাবে টেপ রেকর্ড করে নিয়ে পরে তা শ্রোতাদের শোনানো হয়। বড় বড় লোকের বক্তৃতাও এ-ভাবে ধরে রাখা যায়। গোয়েন্দাগিরির কাজেও এ যন্ত্র আজকাল খুব কাজে লাগছে।

পাশের ছবিতে একটি টেপ রেকর্ডিংএর কার্যপদ্ধতি এবং ওপরের ছবিতে টেপ রেকর্ডার কি ভাবে কাজ করে তার নমুনা দেখানো হয়েছে।

কলিযুগের সঞ্জয়

মহাভারতে আমরা পড়েছি যে ত্রিকালজ্ঞ সঞ্জয় ব্যাসদেবের আশীর্বাদে "অদৃষ্টদর্শী" হয়েছিলেন,—অর্থাৎ যা চোখের সামনে ঘটছে

না, তাও দেখতে পেতেন। ফলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঘটনা যুদ্ধক্ষেত্রের বহুদূরে বসেও তিনি দেখতে পেয়েছিলেন এবং অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের প্রতিটি ঘটনার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর মতই একই সঙ্গে দিয়ে গিয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্য কোনও পৌরাণিক কাহিনীতে, যতদূর জানি, এ রকম দিব্যদৃষ্টির নজির আর নেই।

আমাদেরও অনেক সময় সঞ্জয়ের মত অদৃষ্টদর্শী হতে ইচ্ছে করে। মনে হয় বহু দূরের ঘটনা, সেখানে উপস্থিত না থেকেও, এখানে বসে বসেই যদি দেখা সম্ভবপর হ'ত তা হলে কি মজাটাই না হ'ত! আমাদের মত অনেক মানুষই হয়তো এইরকম স্বপ্ন দেখেছেন। আবার কেউ কেউ সে স্বপ্নকে সফল করার চেষ্টা করতেও ছাড়েন নি। এঁদেরই সে চেষ্টার ফল শেষ পর্যন্ত সফলও হয়েছে, আর তাইতেই আমরা আজ টেলিভিশনে সেই আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। তাই টেলিভিশনকে "কলিযুগের সঞ্জয়" বলা যেতে পারে।

নিপকো, বেয়ার্ড, জেনকিন্‌স্

এ বিষয়ে সব-প্রথম যাঁর চেষ্টার কথা মনে পড়ছে তিনি একজন জার্মান,—পি. নিপকো। এঁর যন্ত্রটির ইংরেজি নাম "নিপকো'জ ডিস্‌ক্"। টেলিস্কোপ বা দূরবীনের সঙ্গে এর তফাৎ এই যে দূরবীন বা টেলিস্কোপ যন্ত্র কেবল যে-সমস্ত বস্তু আমাদের দৃষ্টিকোণের মধ্যে থাকে তাদেরকেই বড় করে দেখাতে পারে, কিন্তু নিপকো'জ ডিস্‌কের সাহায্যে চোখের আড়ালের কোনও বস্তুর ছবিও দূরের পর্দায় একই সময়ে ফেলা সম্ভব। এ হচ্ছে ১৮৮৪ সালের কথা। তারপর ১৯২৩ সালে ইংল্যাণ্ডের জে. এল. বেয়ার্ড এবং আমেরিকার সি. এফ্. জেনকিন্স্ ঐ যন্ত্রটির কিছু উন্নতিসাধন করেন। ১৯২৫ সালে তাঁরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্যুতের সাহায্যে প্রথম চলচ্চিত্র দূরের পর্দায় পাঠাতে সমর্থ হন। ঘটনাটিকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার একটা নতুন পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয় "টেলিভিশন" অর্থাৎ দূর থেকে দেখা।

১৯৩৬ সালে লণ্ডনের বি. বি. সি. প্রথম টেলিভিশনকে সিনেমার মতই প্রমোদের উপযোগী করে পরিবেশন করার উদ্যম শুরু করে। তার পর ধীরে ধীরে আরও উন্নত ধরনের টেলিভিশন তৈরি হ'তে থাকে; রেডিওর মত মানুষের ঘরে ঘরে এর চলন হতে থাকে। এখন তো এর সাহায্যে পৃথিবীর বাইরের ঘটনাও আমাদের চোখে ধরা পড়ছে! এমন কি চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপও পৃথিবীতে বসেই আমরা দেখতে পেয়েছি।

টেলিভিশনের বাংলা নাম প্রথমে দেওয়া হয়েছিল 'দূরেক্ষণ'। ঈক্ষণ মানে দেখা। পরে আরও সহজ নাম হয়েছে দূরদর্শন। কিন্তু নাম যাই দেওয়া হোক, শেষ পর্যন্ত লোকে টেলিভিশন নামটাই ব্যবহার করছে—আরও সংক্ষেপে যাকে বলা হয় টি. ভি.।

টেলিভিশন নির্ভর করে আমাদের দু'টি দৃষ্টিভ্রমের ওপর

সঞ্জয় কি ভাবে অদৃষ্টদর্শন করেছিলেন তা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু আধুনিক টেলিভিশন কাজ করে মূলত মানুষের দু'টি দৃষ্টিভ্রমের ওপর নির্ভর করে। আমাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে আলোর উৎস সরিয়ে নেবার ১/১০ সেকেণ্ড

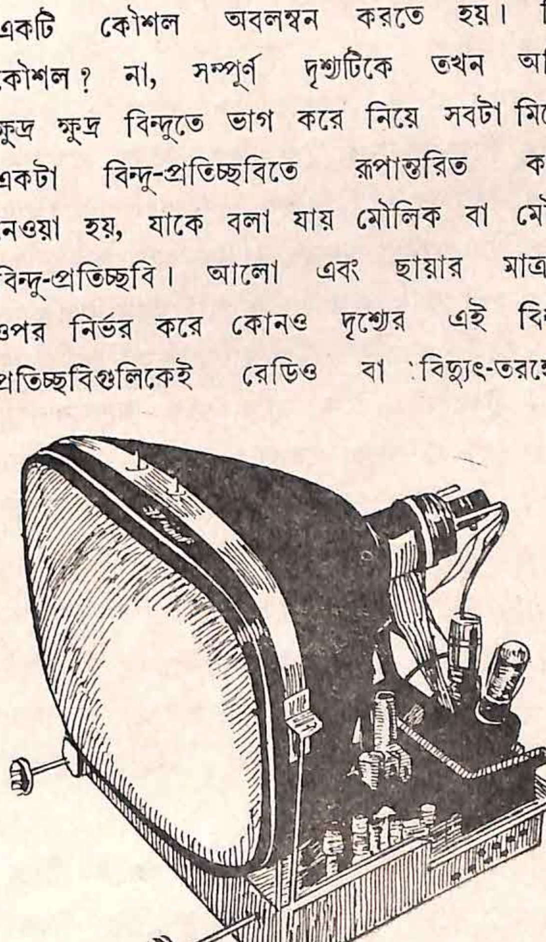
পর্যন্ত সেই আলোর প্রতিচ্ছবি আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে যায়। চোখে প্রতিচ্ছবি থেকে যাবার এই ব্যাপারটির জন্যই আমরা অনেক সময় ভুল করে কোনও প্রতিচ্ছবিকে মনে করতে পারি সচল,—বস্তুত যখন সেটি অচল। আমাদের দৃষ্টিশক্তির এই ধাঁধাকে কাজে লাগিয়ে কি করে চলচ্চিত্র বা সিনেমাও দেখানো হয় সে কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২২৫-২৬)। কোনও একটা ছবির বিভিন্ন অবস্থানের দৃশ্য যদি এক সেকেণ্ডের ২৩ ভাগের মধ্যে ক্রমান্বয়ে চোখের সামনে দিয়ে চলে যায়, তা হ'লে আর আমরা বুঝতে পারি না যে আমাদের আসলে কিছুসংখ্যক স্থিরচিত্রই অতি দ্রুত দেখানো হচ্ছে এবং আমরা চোখের ভুলে মনে করছি যে ছবিটাই নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। এই চোখের ধাঁধাকে টেলিভিশনেও কাজে লাগানো হয়েছে। অবশ্য এক্ষেত্রে কোনও চলমান বস্তু বা দৃশ্যকে একই সময়ে বহুদূরের পর্দায় চলমান অবস্থাতেই দেখানো হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভ্রমটা এই রকমঃ যদি পাশাপাশি খুব ঘনসন্নিবিষ্ট কতকগুলি বিন্দু একটু দূর থেকে দেখা যায় তা হ'লে সেগুলিকে বিন্দু মনে না হয়ে আমাদের চোখে একটানা রেখা বলে মনে হয়। হাফটোন ছবি তৈরির সময় এই ব্যাপারটাকে কি করে কাজে লাগানো হয়েছে তা আমরা ছাপার ব্লক্ তৈরির কথা বলবার সময়ে বলেছি (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৪৫-৪৬)। টেলিভিশনেও চোখের এই ভুলকে কাজে লাগানো হয়েছে।

এখন দেখা যাক, কি করে এটা সম্ভবপর হতে পারে।

কি করে সম্ভব

আমরা যখন সামনাসামনি কোনও দৃশ্য দেখি তখন বিভিন্ন তারতম্যের আলো এবং ছায়া সেই দৃশ্যটি থেকে একই সঙ্গে আমাদের চোখে এসে পড়ে। কিন্তু সেই একই দৃশ্য যদি আমরা সামনাসাম্‌নি না দেখে অনেক দূরে, দৃশ্যটির আড়ালে বসে, দেখতে চাই তা হ'লে সেটিকে কোনও মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে না পাঠিয়ে অন্য একটি কৌশল অবলম্বন করতে হয়। কি কৌশল? না, সম্পূর্ণ দৃশ্যটিকে তখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে ভাগ করে নিয়ে সবটা মিলে একটা বিন্দু-প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত করে নেওয়া হয়, যাকে বলা যায় মৌলিক বা মৌল বিন্দু-প্রতিচ্ছবি। আলো এবং ছায়ার মাত্রার ওপর নির্ভর করে কোনও দৃশ্যের এই বিন্দু-প্রতিচ্ছবিগুলিকেই রেডিও বা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের



টেলিভিশন সেটের জন্য নতুন ধরনের পর্দা—যার গায়ে পরিষ্কার ছবি ফুটে উঠতে পারে।

মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে পাঠানো হ'তে থাকে। তারপর এই মৌলিক বিন্দু-প্রতিচ্ছবিগুলিকে আবার দূরে অবস্থিত দর্শকের কাছে একই ক্রম অনুসারে যুড়ে দিয়ে পর্দার গায়ে ফেলা হয়। ফলে আসল ছবির হুবহু প্রতিচ্ছবিই দূরের দর্শকও একই সঙ্গে দেখতে পারে। দূরের দর্শকের কাছে কোনও দৃশ্যের হুবহু প্রতিচ্ছবি পৌঁছবার জন্য অবশ্যই যথেষ্ট সংখ্যক মৌল বিন্দু-প্রতিচ্ছবি পাঠানো দরকার। এই যে একটা ছবিকে অসংখ্য বিন্দুতে বিভক্ত করা একে বলা হয় "স্ক্যানিং"। টেলিভিশনে সাধারণত প্রতি সেকেণ্ডে ২০ লক্ষেরও বেশি মৌল বিন্দু-প্রতিচ্ছবি বৈদ্যুতিক উপায়ে পাঠানো হয়। তারপর রিসিভার যন্ত্রের সাহায্যে সেগুলিকে আবার সাধারণ প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত করে দর্শকের সামনে পর্দায় পরিবেশন করা হয়। এ যেন অনেকটা 'জিগ্ শ পাজ্ল্'-এর ছোট ছোট টুকরো ছবিকে যুড়ে যুড়ে নতুন করে পুরো ছবিটা গড়ে তোলা। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আরও জটিল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়েই তা হাসিল করা হয়। প্রথম যুগের টেলিভিশনে যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে হ'ত এখন আর তা করা হয় না। তখন সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যেই কাজটা হাসিল করা হ'ত, কাজেই তা সব সময়ে নিখুঁত হ'ত না। এখনকার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি।

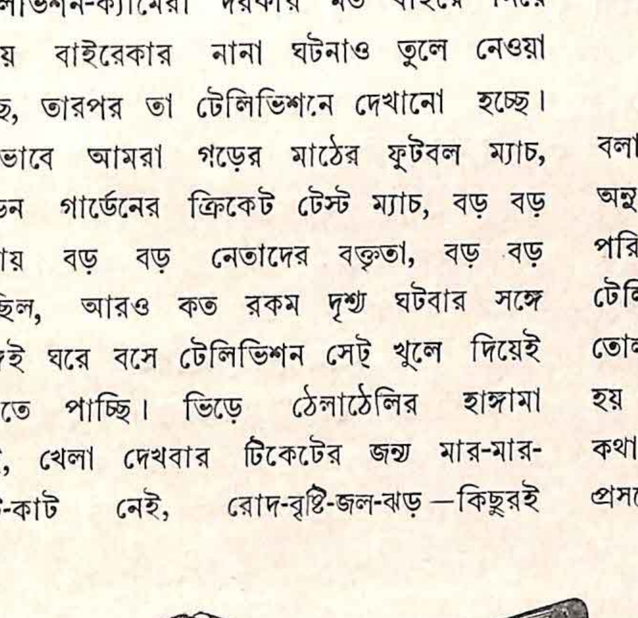
সিনেমা আর টকির রহস্য বলতে গিয়ে আমরা কয়েকটি যন্ত্র ও পদ্ধতির কথা বলেছিলাম, কি করে আলোক-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করে আবার সেটিকে হুবহু আগের আলোক-তরঙ্গে ফিরিয়ে আনা যায়, কি করে শব্দ-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করে ফের সেটিকে হুবহু আগের শব্দ-তরঙ্গে ফিরিয়ে আনা যায়, কি করে আলো আর শব্দকে জোরালো করা যায় ইত্যাদি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩০-১২৩২)। রেডিও প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েও একটু আগে (পৃঃ ১৫০৮) এ সম্বন্ধে কিছুটা বলা হয়েছে।

টেলিভিশন সেট্

টেলিভিশনকে এক কথায় একসঙ্গে রেডিও আর সিনেমা বলা যেতে পারে। টেলিভিশন সেট্ দেখতেও অনেকটা বড় বেতারযন্ত্র বা রেডিও সেটের মতই। তবে, তার গায়ে লাগানো থাকে একটা বড় চৌকো বা ঐ ধরনের পর্দা—যাকে বলা হয় স্ক্রীন এবং যে জিনিসটা রেডিও সেটে দেখতে পাবে না। রেডিও খুলে দিলে আমরা যন্ত্র থেকে নানা রকম শব্দ—গান, বাজনা, বক্তৃতা, আলোচনা, নাট্যাভিনয়, খেলা-ধূলা বা কোন ঘটনার ধারা-বিবরণী—এই সবই শুধু শুনতে পাই। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কে গাইছে, কে বক্তৃতা দিচ্ছে, কে আলোচনা করছে, কিংবা নাট্যাভিনয় বা খেলাধূলার কোনও দৃশ্য—এ সবের কিছুই ওর মধ্যে থেকে পাওয়া যায় না। কিন্তু টেলিভিশনে ঐ সব শব্দ তো শোনা যায়ই, সঙ্গে সঙ্গে ঐ পর্দা বা স্ক্রীনের গায়ে গায়ক বা বক্তার জীবন্ত ছবিও ভেসে ওঠে। নাটকের অভিনয়-দৃশ্য, খেলাধূলার শুধু বর্ণনা নয়,—ঠিক যেমনটি খেলার মাঠে ঘটছে তারই সজীব চলন্ত ছবি ফুটে উঠবে পর্দার গায়ে, ঠিক যেমনটা সবাক্ চলচ্চিত্র বা টকিতে দেখতে পাওয়া যায়। এই জন্যই রেডিওর তুলনায়

টেলিভিশন ক্রমেই বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ইয়োরোপ-আমেরিকায় তো বহুদিন থেকেই ওর চলন হয়েছে, ভারতেরও অনেক বড় বড় শহরে টেলিভিশন স্টুডিও বসেছে। কলকাতায়ও এসেছে—বেশ কয়েক বছর আগেই।

সব অনুষ্ঠানই যে টেলিভিশন স্টুডিওর ভিতরে বসে হচ্ছে তা মনে ক'র না। টেলিভিশন-ক্যামেরা দরকার মত বাইরে নিয়ে গিয়ে বাইরেকার নানা ঘটনাও তুলে নেওয়া হচ্ছে, তারপর তা টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে। এইভাবে আমরা গড়ের মাঠের ফুটবল ম্যাচ, ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ, বড় বড় সভায় বড় বড় নেতাদের বক্তৃতা, বড় বড় মিছিল, আরও কত রকম দৃশ্য ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে বসে টেলিভিশন সেট্ খুলে দিয়েই দেখতে পাচ্ছি। ভিড়ে ঠেলাঠেলির হাঙ্গামা নেই, খেলা দেখবার টিকেটের জন্য মার-মার-কাট-কাট নেই, রোদ-বৃষ্টি-জল-ঝড়—কিছুরই তোয়াক্কা করবার নেই। টেলিভিশন-স্টুডিওর কর্তাব্যক্তিরা সব সময় চেষ্টা করছেন কি করে ভালো ভালো প্রোগ্রাম দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা যায়। শুধু মনোরঞ্জনই বা বলি কেন, অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ও টেলিভিশনের মারফৎ পরিবেশন করা যেতে পারে এবং তা করা হচ্ছেও।

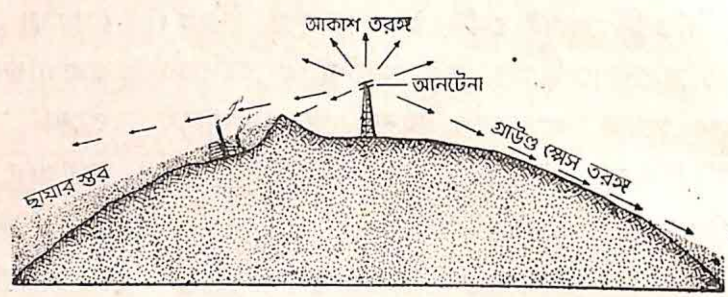


বাইরে গিয়ে ছবি তুলবার টেলিভিশন-ক্যামেরা। এর সাহায্যে কাছের, মাঝামাঝি জায়গার এবং দূরের দৃশ্যের ছবি—সবই তোলা যায় লেন্সটাকে একটু এদিক্ ওদিক্ করে।

টেলিকাস্টিং

রেডিওতে কোন কিছু পরিবেশন করাকে বলা হয় ব্রড্‌কাস্ট করা। তেমনি, রেডিওর অনুকরণে, টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি একত্র পরিবেশন করাকে বলা হয় টেলিকাস্ট করা বা টেলিকাস্টিং। কি ভাবে টেলিভিশনের ছবি তোলা হয় আর কি ভাবে তা পরিবেশন করা হয় তার কয়েক রকম পদ্ধতি আছে। একটির কথা এখানে উল্লেখ করছি। সবাক্ চিত্রের প্রসঙ্গে ফোটোইলেক্‌ট্রিক সেলের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে—যার কাজ হচ্ছে আলোক-তরঙ্গকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করা—যা থেকে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় ইলেক্‌ট্রনের ছুটোছুটি থেকে, আর সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ নির্ভর করে আলোর উজ্জ্বলতা অনুযায়ী। টেলিকাস্টিং-এর সময় যে দৃশ্য টেলিভিশনে দেখানো হবে সেখান থেকে ঠিকরে-আসা আলোকে প্রথমে এনে ফেলা হ'ল ফোটোইলেক্‌ট্রিক সেলের ওপর স্ক্যানিং করে। অর্থাৎ ছবিটাকে অসংখ্য বিন্দুতে বিভক্ত

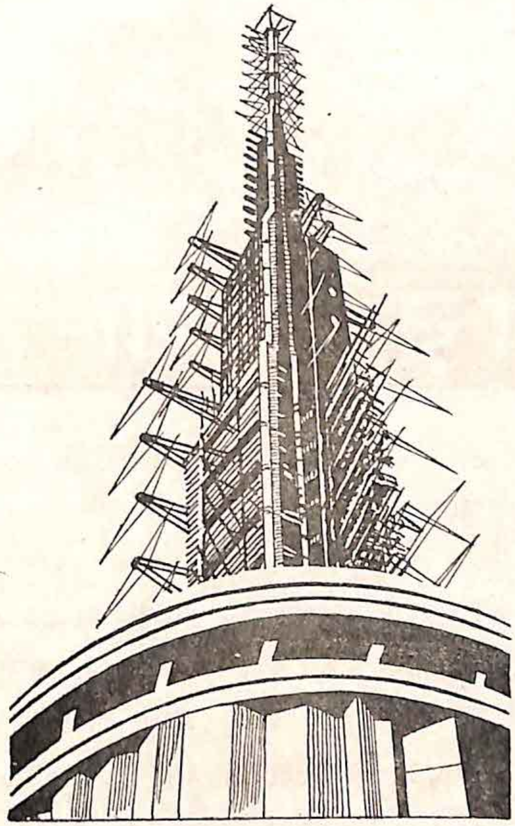
করে তার প্রতি বিন্দু থেকে ঠিকরে-আসা আলো এনে ফেলা হ'ল ফোটোইলেক্‌ট্রিক সেলের ওপর। অমনি তা থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরি হতে লাগল—উজ্জ্বল আলোর জায়গা থেকে জোরালো তরঙ্গ আর কম আলোর জায়গা থেকে কম-জোরালো তরঙ্গ। এর পর নিওন ল্যাম্প যন্ত্রের সাহায্যে (আর এক নাম এয়োলাইট),—যার কথাও চলচ্চিত্র ও সবাক্ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৩১), ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে ফের আলোক-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হ'ল—কম-বেশি বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনুযায়ী এখানেও কম-বেশি আলোক-তরঙ্গ আসতে লাগল। কারণ, নিওন ল্যাম্প যন্ত্রটিকে ঠিক ফোটোইলেক্‌ট্রিক সেলের উল্‌টো বলতে পার। অবশ্য তার আগে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে আরও জোরালো করে নেওয়া হ'ল ভালো ছবি ফুটিয়ে তুলবার জন্য। ছবিটা এল বিন্দু-প্রতিচ্ছবির সাহায্যে। সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর মত পাশাপাশি শব্দ-তরঙ্গকেও বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করে ফের সেটাকে টেলিভিশনের পর্দায় ফেলবার আগে শব্দ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হ'তে লাগল। দু'টো ব্যাপার চলতে লাগল একই সঙ্গে। ফলে আমরা কি দেখতে পেলাম? না, শুধু অজ্ঞাত জায়গার দৃশ্যই নয়, সেখানকার শব্দও, এবং ঐ একই সঙ্গে। যে মুহূর্তে ঐ দৃশ্য সামনা-সামনি দেখা যেত, সামনা-সামনি শোনা যেত, প্রায় সেই মুহূর্তেই তা টেলিভিশনেও দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। কারণ আলোক-তরঙ্গ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ—এদের গতিবেগ কি প্রচণ্ড তা তো সকলেই জান।



টেলিকাস্টিংএর জন্য যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তা ছোটে সরল রেখা ধরে। যেগুলো ওপরে উঠে যায় সেগুলো আর নীচে ঠিকরে পড়তে পারে না। কেবলমাত্র অ্যান্টেনা আর ছায়ার স্তরের মধ্যে যে সব টি. ভি. রিসিভার থাকে তারাই সরাসরি অ্যান্টেনা থেকে টেলিভিশন সিগন্যালগুলি ধরতে পারে।

আলট্রা-শর্ট্ ওয়েভ

রেডিওতে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তা সাধারণত তিন রকমের—লং-ওয়েভ বা বড় মাপের তরঙ্গ, মিডিয়াম ওয়েভ বা মাঝা-মাঝি মাপের তরঙ্গ আর শর্ট্ ওয়েভ বা ছোট মাপের তরঙ্গ। লং ওয়েভ নীচু দিয়ে মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় বলে খানিক গিয়েই ধাক্কা খেতে খেতে ওর জোর কমে আসে। এজন্য লং ওয়েভ খুব বেশি দূর যেতে পারে না। লোকাল সেট রেডিওতেই ওর ব্যবহার সীমাবদ্ধ। কিন্তু শর্ট্ ওয়েভ অনেক উঁচু দিয়ে যায় বলে বহু দূরে—হাজার হাজার কিলোমিটার পার হয়ে যেতে পারে। এজন্যই দূরদেশে বেতার প্রোগ্রাম পাঠাতে হলে শর্ট্ ওয়েভের মাধ্যমেই তা পাঠাতে হয়। অবশ্য উঁচু দিয়ে গেলেও একটা সীমায় পৌঁছে এই তরঙ্গগুলো আবার ঠিকরে নীচে নেমে আসে, কাজেই দূরে গেলেও



নিউইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু বাড়ী এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংএর চূড়ায় বসানো টেলিভিশন অ্যাণ্টেনা

সেগুলো হারিয়ে যায় না। টেলিভিশনে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় তার মাপ আরও ছোট, তাই তাদেরকে বলা হয় আলট্রা-শর্ট ওয়েভ। এগুলোও অনেক উঁচু দিয়ে যায় কিন্তু শর্ট ওয়েভের মত ঠিকরে নেমে আসে না। এজন্য সাধারণ ভাবে একে খুব দূরে পাঠানো যায় না। তবে দিনে দিনে এর আরও উন্নতি হচ্ছে। খুব উঁচু এরিয়েল (যাকে বলা হয় অ্যাণ্টেনা) বসিয়ে এখন সাধারণ টেলিভিশনও অনেক দূরে বসে দেখা যাচ্ছে। যেমন নিউইয়র্কের সবচেয়ে উঁচু বাড়ী এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংএর চূড়ায়ও বসানো হয়েছে টেলিভিশন অ্যাণ্টেনা। আবার মাঝপথে স্টেশন বসিয়ে বসিয়ে তাকে আবার নতুন করে আকাশে ছুটিয়ে দেওয়া যায়—যাকে বলে রিলে করে পাঠানো। এ ছাড়াও নানা উন্নত উপায় নিত্যই আবিষ্কৃত হচ্ছে—যার ফলে চাঁদের বুকে বা মঙ্গল গ্রহের বুকে টেলিভিশন-ক্যামেরা পাঠিয়ে তার সচল ছবিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে পৃথিবীর সামনে স্বাভাবিক ভাবে ফুটে উঠছে। শুধু সাদা-কালো ছবিই নয়,—রঙিন ছবিও। তবে আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সাদা-কালো ছবিই টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে। শীগ্‌গিরই রঙিন ছবিও দেখানো শুরু হবে। মহাভারতের সঞ্জয়কে হিংসে করবার আর কারণ নেই।



রিলে পদ্ধতিতে বহুদূর অঞ্চলে কেমন করে টেলিকাস্ট করা যেতে পারে



দেশ বিদেশের কথা

আমাদের দেশ ভারত

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের দেশ ভারত সম্বন্ধেও কিছু কিছু জানবার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এত বড় আমাদের দেশ যে ভালো করে বলতে গেলে ছোটদের বিশ্বকোষের মত কয়েক খণ্ড বইতেও হয়তো তা কুলোবে না। তাই, খুব সংক্ষেপে যতটুকু বলা যায় তাই-ই বলব।

দেশ তো নয়,—উপমহাদেশ। পৃথিবীর মহাদেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে এশিয়া। ভারত তারই একটি অংশ, তাই তাকে দেশ বলা হয়; নইলে আকারে, বৈচিত্র্যে, লোক-সংখ্যায় পৃথিবীর অনেক স্বাধীন দেশের চেয়ে ভারত অনেক—অনেক বড়। ষাট কোটির ওপর লোক বাস করে এই দেশে, যা নাকি পৃথিবীর জনসংখ্যার ছ'ভাগের এক ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি ছ'জন লোকের মধ্যে একজন ভারতীয়। এক মহাচীন ছাড়া এত লোক আর কোনও দেশে নেই। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৩২১৮ কিলোমিটার। তেমনি পশ্চিম গুজরাত থেকে আসাম পর্যন্ত যদি এর প্রস্থ ধরা যায় তা হ'লে তাও হবে প্রায় ঐ ৩২১৮ কিলোমিটার।

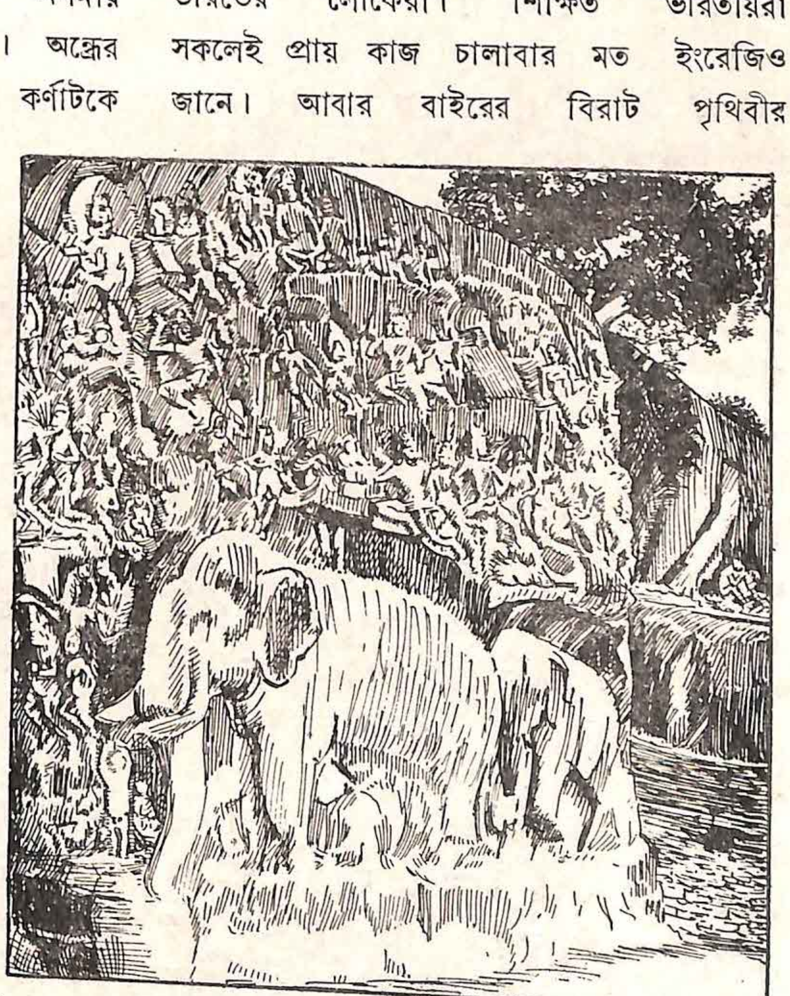
বহু বৈচিত্র্য

এই বিরাট দেশের এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের লোক বাস করে। এই অঞ্চলগুলিকে মোটামুটি ভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে ছোট ছোট অঞ্চলে—বাসিন্দাদের ভাষা, চালচলন এবং সেই সঙ্গে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক ভিত্তিতে। আগে এই অঞ্চলগুলিকে বলা হ'ত প্রদেশ, এখন বলা হয় রাজ্য বা অঙ্গরাজ্য। এদের সংখ্যা থেকে থেকে বাড়ছে। এখন আছে ২২টি। এই সব বিভিন্ন রাজ্যে যারা বাস করে তাদের অনেকেরই চেহারায় যেমন মিল নেই, তেমনি মিল নেই পোশাকে-পরিচ্ছদে, চালচলনে, খাওয়াদাওয়ায় আর ভাষায়। বাঙ্গালীরা ভাত খায়, মাছও তাদের অনেকেরই নিত্যকার আহার্যের একটি। দক্ষিণ ভারতের—অর্থাৎ মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু), অন্ধ্র, মহীশূর (কর্ণাটক) প্রভৃতি দেশের লোকেরাও ভাত খায় কিন্তু তাদের প্রায় সকলেই নিরামিষাশী। রান্নার ধরনও আলাদা। বাঙ্গালীরা ভালোবাসে মিষ্টি—সন্দেশ, রসগোল্লা

তাদের প্রিয় খাদ্য, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতীয়রা ভালোবাসে ঝাল আর টক—তা ছাড়া খেতেই পারে না। মিষ্টি একদম নয়। আবার উত্তর ভারতে, পশ্চিম ভারতে ভাতের চলই নেই। সেখানকার আসল খাদ্য হচ্ছে গম—গমের রুটি। তাদেরও রান্নার ধরনধারণ আলাদা।

বাঙ্গালীদের সঙ্গে অসমীয়, ওড়িয়া অর্থাৎ আসাম ও উড়িষ্যাবাসীদের চেহারায় চাল-চলনে এবং খাওয়াদাওয়ার অভ্যাসে খানিকটা মিল থাকলেও প্রত্যেকের ভাষা আলাদা। একদল কথা বলে বাংলায়, একদল অসমীয় ভাষায়, আর একদল ওড়িয়া ভাষায়। অন্ধ্রের ভাষা তেলেগু, মাদ্রাজের তামিল, কর্ণাটকে কান্নাড়ী, কেরলে মালয়ালম্—এই রকম প্রায় সব রাজ্যেরই একটা করে নিজেদের ভাষা আছে। উত্তর ভারতে এবং মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতেরও কিছু কিছু জায়গায় মোটামুটি হিন্দী ভাষারই চল—যদিও এক রাজ্যের হিন্দীর সঙ্গে অন্য রাজ্যের হিন্দীর বেশ কিছুটা তফাৎও আছে। আবার ওদিক্‌কার মুসলমানেরা প্রায় সবাই কথা বলে উর্দুতে—যা নাকি ফার্সী হরফ আর কতকটা হিন্দী ব্যাকরণ মিলিয়ে, আর ছ'টোর ভাষা থেকেই শব্দসম্ভার আহরণ করে মুসলমান রাজাদের আমলে তৈরি করা হয়েছিল। পাঞ্জাবীদের ভাষা পাঞ্জাবী বা গুরুমুখী হলেও সেখানকার অনেক হিন্দু আর শিখও উর্দুতে কথা বলে।

গোটা ভারতে এখন হিন্দীভাষীর সংখ্যা অন্যান্য ভাষাভাষীর তুলনায় সামান্য বেশি হওয়ায় স্বাধীন হবার পর হিন্দীকেই ইংরেজির সঙ্গে বিকল্প রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে। তা ছাড়া ভাঙ্গা হিন্দী,—যার অপর নাম হিন্দুস্থানী, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের লোকেরাই—বুঝতে ও বলতে পারে, পারে না শুধু দক্ষিণ ভারতের লোকেরা। শিক্ষিত ভারতীয়রা সকলেই প্রায় কাজ চালাবার মত ইংরেজিও জানে। আবার বাইরের বিরাট পৃথিবীর



মহাবলীপুরমের গঙ্গাবতরণ দৃশ্য

অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও ইংরেজি শিখতেই হয়। তাই ইংরেজিকেও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে রাখা হয়েছে। অঙ্গরাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক ভাষাগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হ'লেও মোট ১৪টি বহুলপ্রচলিত ভাষাকেও সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। এ ছাড়াও প্রায় ২০০টি উপভাষার চল আছে এই বিরাট দেশে। প্রচলিত লিপির সংখ্যাও অসংখ্য।

পোশাকের দিক্ দিয়েও দেখ না! শহরাঞ্চলে অনেকেই—বিশেষ করে তরুণ সমাজ এখন বিলিতী (বা আন্তর্জাতিক?) কায়দায় প্যান্ট পরতে শুরু করলেও গ্রামে গিয়ে দেখলে দেখবে এখনও গ্রামের বাঙ্গালী বা গ্রামের ওড়িয়াদের পরনে সেই পুরোনো যুগের ধুতিই রয়ে গেছে। আর ভারতের বেশির ভাগ লোকই তো থাকে গ্রামে। দক্ষিণ ভারতেও তাই, তবে সে ধুতি পরবার ধরণ সম্পূর্ণ আলাদা। এরা পরে কাছা-কোঁচা দিয়ে, ওরা পরে লুঙির মত করে। উত্তর ভারতের বিহারেও ধুতির চল, উত্তর প্রদেশের খানিকটাতেও তাই, কিন্তু আর একটু পশ্চিমে এগিয়ে গেলে দেখবে ধুতি কখন বদলে গিয়ে পায়জামায় রূপান্তরিত হয়েছে। এমন কি মেয়েরাও শাড়ী ছেড়ে ধরেছে ঘাঘরা বা শালোয়ার। তবে শাড়ীর ব্যবহার দিনে দিনে ওসব অঞ্চলেও বাড়ছে এবং তা পরবার ধরনও প্রায় একই রকম। দক্ষিণ ভারতের মেয়েরাও বরাবর শাড়ীই পরে আসছে, কিন্তু আগে যে ভাবে পরত এখন আর সে ভাবে পরে না। তবে গ্রামের দিকে পুরোনো প্রথা এখনও চালু আছে। বাঙ্গালী, ওড়িয়া বা মাদ্রাজীদের মাথায় টুপি দেখবে না—যদিও সামান্য কিছু মুসলমানধর্মীরা এখানেও অনেকে টুপি পরে, মাদ্রাজেও কেউ কেউ পাগড়ী বাঁধে। কিন্তু বিহার এবং বিশেষ করে বিহারের পর থেকে খালি মাথা (ওদের ভাষায় 'নাঙ্গা শির') আর দেখা যাবে না। হয় টুপি, নয়তো পাগড়ী। পাঞ্জাবে, রাজস্থানে পাগড়ীর চলটাই বেশি। পূব ও উত্তর ভারতের মেয়েরা (বিশেষ করে যারা বিবাহিতা) অনেকেই মাথায় কাপড় দেবে—যাকে আমরা বলি ঘোমটা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে মাথায় কাপড় দেবার বালাই নেই একদম—এক সামান্য কিছু বিধবাদের ছাড়া।

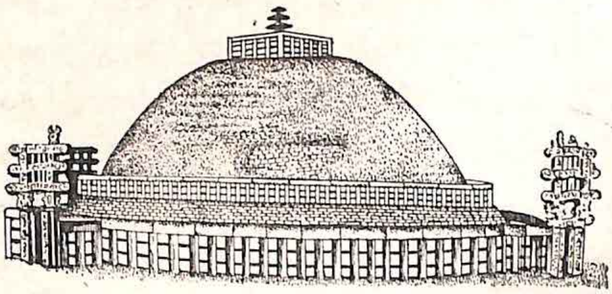
তার পর ধর চেহারা। পশ্চিমের দিকের লোকেরা বেশির ভাগই বেশ লম্বা, তাগড়াই চেহারা তাদের। কিন্তু দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতে তেমনটা নয়। দক্ষিণ-দেশীদের গায়ের রঙ বেশির ভাগই ফরসা নয়, পূব ও উত্তর ভারতে ফরসা, কালো দুই-ই দেখা যায়। আবার কাশ্মীরে যাও, দেখবে প্রায় সব্বাই ফুটফুটে ফরসা। আসামের কোনও কোন জায়গায়, এবং ত্রিপুরা অঞ্চলেও মুখের গড়নে দেখবে কেমন একটু চীনে চীনে ভাব–যাকে বলা হয় মঙ্গোলিয়ান মুখ।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব

তবু, এত রকম বৈচিত্র্য নিয়েও, ভারতবর্ষ এক। বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য বাঁধনে যেন সমস্ত দেশটা বাঁধা রয়েছে। আমরা সবাই তাই নিজেদের গোষ্ঠী বোঝাবার জন্য বাঙালী, ওড়িয়া, বিহারী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাতী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার

করলেও আসলে আমরা সকলেই ভারতীয়, আর সেইখানেই আমাদের গৌরব—আমাদের গর্ব। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত—যা আমাদের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাতেই লিখে গিয়েছিলেন অনেক আগে,—তা আজ সমস্ত ভারতবাসীরই জাতীয় দঙ্গীত—তা সে যে রাজ্যের যে ভাষা-ভাষী লোকই হোক না কেন। এই জাতীয় সঙ্গীতের ছ'টি ছত্রের মধ্যেই এই বিপুলা ভারতমাতার সন্তানদের ভিতর একত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়—

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।"



সাঁচীর স্তূপ

সব ক'টি রাজ্যের নাম উল্লেখ না থাকলেও (কারণ গানটি যখন লেখা হয় তখন তো তা জাতীয় সঙ্গীত হবে বলে লেখা হয় নি!) এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়ে কবি যেন সমস্ত ভারতের একত্বের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। শুধু নানা অঙ্গরাজ্যই নয়, নানা ধর্মের সমাবেশ এখানে—যা বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনও দেশে নেই। সবাই পাশাপাশি বাস করছে এখানে, সমান মর্যাদা নিয়ে! ঐ জাতীয় সঙ্গীত গানটিরই অন্য অংশে তার উল্লেখ আছে:

"অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত
শুনি তব উদার বাণী,
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক
মুসলমান খৃষ্টানী।"

যুগে যুগে পৃথিবীর কত দেশের কত ধর্মের লোক এসে এখানে এক হয়ে গেছে। ঐ কবিরই ভাষায়:

"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন,
শক হূণ দল, পাঠান মোগল
এক দেহে হ'ল লীন।"

সত্যি এদেশের তুলনা নেই।

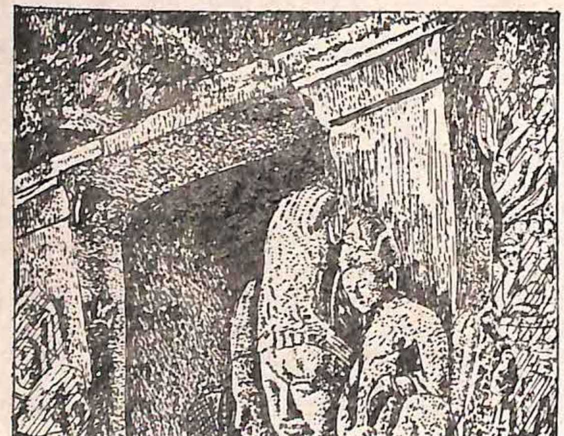
ভারতের জন্ম

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর একটি বিখ্যাত গানে ভারতবর্ষের জন্মকাহিনী কবিজনোচিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সে গান আমার মত তোমাদের অনেকেরই হয়তো মুখস্থ। 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ'—সেই গানটির কথাই বলছি। তার এক জায়গায় আছে: "শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর-উর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা।" মাথার ওপর হিমালয়ের সাদা মুকুট, হাঁটু ঘিরে খেলা করছে সাগরের ঢেউ। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা কবি ন'ন, কল্পনারও ধার ধারেন না তাঁরা। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গবেষণা করে তাঁরা ভারতবর্ষের জন্ম সম্বন্ধে যে চিত্র দিয়েছেন তার সঙ্গে ওর মিল নেই। তাঁরা বলেছেন ভারতবর্ষ এক সময় আরো বিরাট এক মহাদেশের অংশমাত্র ছিল—যা নাকি নীচে অর্থাৎ দক্ষিণে অস্ট্রেলিয়া

আর পশ্চিমে আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিল। তার নাম দিয়েছেন তাঁরা গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। আর ভারতের শুধু দাক্ষিণাত্য মালভূমিটাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীন। উত্তর ভারত তৈরি হয়েছে অনেক পরে। ভারতবর্ষের জন্মের সময় হিমালয় পাহাড়টারও কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেখানেও ছিল এক বিরাট সমুদ্র—যার নাম তাঁরা দিয়েছেন টেথিস সাগর। পঞ্চসিন্ধু, যমুনা-গঙ্গাও এসেছে অনেক পরে। এ সব কাহিনী 'পৃথিবীর কথায়' ভালো করে বলা হয়েছে (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড)।

ভারত নাম হ'ল কি করে

ভারত নামটাও কিন্তু একটু সংক্ষেপে করে বলা—পুরো নামটা হচ্ছে ভারতবর্ষ। কি করে



এলিফ্যাণ্টা দ্বীপের গুহায় অতিকায় ত্রিমূর্তি

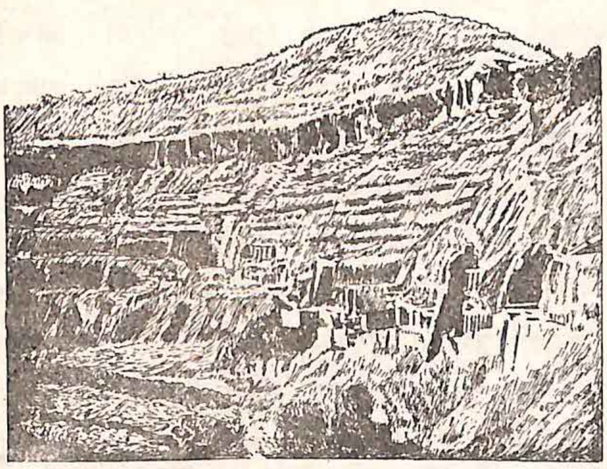
এ নাম হ'ল? সে কথা জানতে হ'লে আমাদের চলে আসতে হবে পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে। পৌরাণিক ভূবৃত্তান্ত অনুসারে পৃথিবী সাতটি দ্বীপে বিভক্ত। এগুলির নাম জম্বূদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপ, শাল্মলিদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ আর পুষ্করদ্বীপ। সাতটি সাগর (সপ্তসিন্ধু) এই দ্বীপগুলিকে ঘিরে রেখেছে। এই সাতটি দ্বীপ আবার কয়েকটি করে ভাগ বা অঞ্চলে বিভক্ত। এই অঞ্চল বা ভাগগুলির নাম বর্ষ। এর মধ্যে জম্বূদ্বীপে আছে নয়টি বর্ষ বা ভাগ। তারই একটির নাম ভারতবর্ষ। 'ভারত' হ'ল কেন? ভরতের নাম থেকে ভারত। এই ভরত কে তা নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন মত রয়েছে। একটি পুরাণের মতে অগ্নীধ্র রাজের ন'টি ছেলের ওপর এই ন'টি বর্ষের ভার দেওয়া হয়েছিল। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলে নাভি, তাঁরই পৌত্র হচ্ছেন ভরত। এই ভরত রাজার নাম থেকেই ভারতবর্ষ নামটি এসেছে। আবার আর এক পুরাণের মতে ভরত হচ্ছে মনুর আর এক নাম। প্রজাদের 'ভরণ' করতেন বলে তাঁকে বলা হ'ত ভরত। আর এই ভরত যে বর্ষের প্রজাদের পালন করতেন তারই নাম হ'ল ভারতবর্ষ। আবার শকুন্তলা আর দুষ্মন্ত রাজার ছেলের নামও ছিল ভরত। এই ভরত ছিলেন অসমসাহসী। যখন খুব ছোট তখনই সিংহের মুখ ফাঁক করে তার ক'টা দাঁত গুণে দেখতেন। কারও কারও মতে এই দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ছেলে ভরতের নাম থেকেই ভারত ও ভারতবর্ষ নামের উৎপত্তি।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ সবগুলির মধ্যেই ভারতবর্ষের সীমানার একটা

নির্দেশ দেওয়া আছে—যা এ যুগের ভারতবর্ষের সঙ্গে মোটামুটি মিলে যায়। যেমন, এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র ইত্যাদি। এদেশের লোকদেরও নাম দেওয়া হয়েছিল ভারতী। এখন বলা হয় ভারতীয়।

ভারতের অন্যান্য নাম : হিন্দুস্থান, ইণ্ডিয়া

আরও কয়েকটি নাম আছে ভারতের। যেমন হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান, ইংরেজিতে ইণ্ডিয়া। এ সব নামেরও একটু ইতিহাস আছে। প্রাচীন আর্যেরা প্রথমে এদেশে এসে সিন্ধুনদের ধারেই বসতি স্থাপন করেন। তাই থেকে ওকে বলা হ'ত সিন্ধুতীরের দেশ। পারস্য দেশের লোকেরা সিন্ধুকে উচ্চারণ করত হিন্দু। তাই তারা এ দেশের নাম দিল হিন্দুস্তান অর্থাৎ হিন্দুর দেশ। 'স্তান' সংস্কৃতে হ'ল 'স্থান', তাই হিন্দুস্তানকে এদেশের লোকেরাও হিন্দুস্থান বলতে লাগল। তারপর গ্রীকরাও ঐ ভাবে বলত হিন্দোস, কখনও বা ইন্দিকো। তাই থেকেই বোধ হয় বিশেষণে ইন্দো কথাটি উৎপত্তি, আর ইংরেজিতে ইন্দিকো হয়ে দাঁড়িয়েছে ইণ্ডিয়া। ইয়োরোপের কোন কোন জায়গায় এ দেশকে ইণ্ডিয়েন বা ইন্দিয়েনও বলা হয়। দীর্ঘকাল ইংরেজ-শাসনে থাকায় হিন্দুস্থান বা ভারত ইণ্ডিয়া বলেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে পরিচিত। দেশ স্বাধীন হবার পর 'ভারত'-এর পাশাপাশি ইংরেজি 'ইণ্ডিয়া' নামটিও একই সঙ্গে চলছে।



অজন্তা পাহাড়ের দৃশ্য : পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা গুহার দেয়ালে আঁকা আছে আশ্চর্য সব ছবি।

অবিরাম জনস্রোত

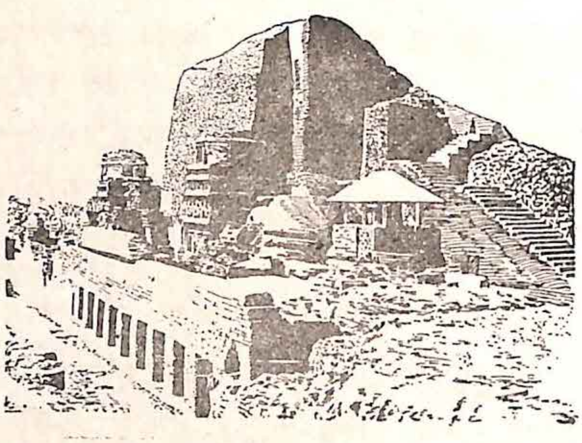
প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর বিভিন্ন সময়কে কয়েকটি যুগে ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন, পুরোনো প্রস্তরযুগ—যখন মানুষ সবে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছে। নতুন প্রস্তরযুগ—যখন মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করলেও তা ছিল আরও অনেক নিখুঁত। তার পর একে একে এল তাম্রযুগ বা ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এই সব বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষেরা ভারতে বসবাস করে গেছে। যেমন, পুরোনো প্রস্তরযুগে এখানে থাকত নিগ্রোবটু জাতের লোকেরা। লম্বায় খাটো, ছোট মাথা, থ্যাবড়া নাক, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়া চুল আর মিশ্‌কালো গায়ের রঙ ছিল এদের চেহারার বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য অত্যন্ত আদিম জাতের মানুষ এরা। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এদের কিছু কিছু বংশধর এখনও টিকে আছে, তবে ক্রমেই এদের সংখ্যা লোপ পেয়ে আসছে। ভারতেরও কোন কোন অঞ্চলে এদের স্বগোত্রীয় লোক সামান্য কিছু দেখতে পাওয়া যায়—পার্বত্য বা অরণ্যসঙ্কুল জায়গায়।

তারপর নতুন প্রস্তরযুগে আর এক জাতের

মানুষ এসে দেখা দিল ভারতে—যাদের বলা হয় অস্ট্রোলয়েড। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য খুব বেশি। পণ্ডিতেরা মনে করেন এখনকার কিছু কিছু খণ্ডজাতি,—যেমন হো, মুণ্ডা, কোল, ভীল, কোরকু, খাড়িয়া প্রভৃতি জাতের মানুষেরা এদেরই বংশধর। চেহারায়ও এরা নিগ্রোবটুদের মত নয়, যদিও এরাও লম্বায় খাটো এবং এদেরও গায়ের রঙ বেশ কালো। কিন্তু এদের চুল, কপাল অন্য রকম। তা ছাড়া এদের ভাষাও আলাদা। সে ভাষা নিগ্রোবটুদের মত আদিম ভাষাও নয়, আবার দ্রাবিড় বা আর্যদের কোন ভাষার মতও নয়।

এর পর এল তাম্রযুগ। এ সময়কার ভারতে যে আর এক নতুন ধরনের মানুষের চিহ্ন পাওয়া যায় তাদের সঙ্গে আইবেরিয় (ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের) মানুষের সাদৃশ্য খুব বেশি। এদেশে এদেরকে বলা হয় দ্রাবিড় জাতি। এদের বংশধরেরা এখনও দক্ষিণ ভারতেই বাস করে। তাদের কারো ভাষা তামিল, কারও তেলেগু, কারও কান্নাড়ী, কারও বা মালয়ালাম্। এদের চেহারাও আগের দু'টি জাত থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা। গায়ের রঙ আরও পরিষ্কার। ফরসা নয়, ঈষৎ শ্যাম বা হাল্‌কা বাদামী রংএর। নাক আরও উঁচু এবং চুলের গড়নও অন্য রকম। এরা অনেক সভ্য জাত। এদেরই কিছু কিছু সম্ভবত সিন্ধু-উপত্যকায়ও ছড়িয়ে পড়ে। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেকার যে সিন্ধুসভ্যতা নিয়ে আমরা গর্ব করি তা এদেরই সৃষ্টি।

লৌহযুগে ভারতে যে মানুষেরা প্রতিষ্ঠা



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

অর্জন করে তারাই হ'ল আর্য জাতি। নৃতত্ত্ব-বিদ্‌দের মতে এরা ককেশিয় গোষ্ঠীর লোক। লম্বা, ফরসা, খাড়া নাক, সুগঠিত শরীর আর্যদের বৈশিষ্ট্য। এরা যে ভাষায় কথা বলত তাই থেকেই সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হয় এবং কালে সেই সংস্কৃত থেকেই প্রাকৃত, এবং শেষে হিন্দী, বাংলা, ওড়িয়া, মারাঠী প্রভৃতি নানা দেশীয় ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই আর্যেরা ক্রমে ক্রমে সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ায় সমস্ত উত্তর ভারতটারই নাম হয়ে যায় আর্যাবর্ত। যারা আর্য নয় তাদের এরা বলত অনার্য। দক্ষিণ ভারতে আর্যদের প্রভাব অনেকদিন তেমন পড়ে নি, তাই সেদিক্‌টা দাক্ষিণাত্য নামেই পরিচিত থেকে যায় এবং সেখানে বহুদিন ধরেই দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাব টিকে থাকে। সভ্যতায় প্রায় সমান হলেও আর্যরা ওদেরকেও অনার্য বলেই অভিহিত করত।

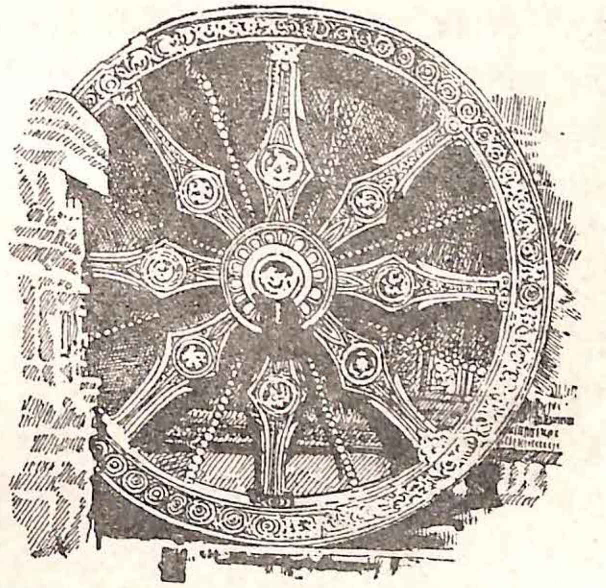
এ ছাড়া ভারতের কোন কোন জায়গায় মঙ্গোলীয় জাতের লোকদেরকেও দেখা যায়, আরো ভালো করে বললে যাদের বলা যায় চীনে-তিব্বতী বা তিব্বতী-ব্রহ্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ।

আমরা এদের সবাইকে বলি পীত জাতি,—রঙ একটু ফ্যাকাসে হলদে কিনা! এরা তেমন লম্বা না হ'লেও বেশ বলিষ্ঠ। নাকটা একটু চাপা, চোখ দু'টো ভারী ভারী, গালের হাড় একটু উঁচু। তা ছাড়া দাড়ি-গোঁফও এদের খুব কম। ত্রিপুরী, ভুটিয়া, নেপালী, কুকি, অহোম প্রভৃতি জাতের লোকেরা এই শ্রেণীর। সাধারণত উত্তর-পূর্ব আর পূর্বভারতেই এদের সংখ্যা বেশি। এরা আর্যদের পরে এদেশে এসেছে বলেই পণ্ডিতদের ধারণা।

অবশ্য সত্যি কথা বলতে গেলে এদের কোনটিকেই খাঁটি একজাতীয় মানুষ মনে করলে ভুল হবে। যুগে যুগে নানান্ জায়গা থেকে নানান্ জাতের লোক এসে এখানকার লোকের সঙ্গে মিশে গেছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদিও হয়েছে। কাজেই এখন ভারতীয়দের কাউকেই বিশুদ্ধ আর্য বা বিশুদ্ধ দ্রাবিড় বা বিশুদ্ধ মঙ্গোলীয় বলা চলে না। সবাই এরা এখন ভারতীয় হিসেবে পাশাপাশি বাস করছে। এমন কি ইয়োরোপ থেকে অল্প-কয়েকশ'-বছর-আগে-আসা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ (ডাচ্), ফরাসী, ইংরেজরাও বাদ যায় নি। সমস্ত ধর্মের লোক আছে এখানে সে কথা তো আগেই বলেছি; তবে হিন্দুই বেশি, কারণ হিন্দু বলে তো ঠিক আলাদা কোন ধর্ম নেই—শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, আর্যসমাজী এরা সকলেই হিন্দু। এমন কি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না তারাও হিন্দু। সম্প্রতি কিছু কিছু আমেরিকনাও এসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। এখানকার শিখ, জৈন ও বৌদ্ধরাও হিন্দুদের সঙ্গে অনেকটা এক হয়ে গেছে। ঐ সব ক'টি ধর্মেরই জন্ম তো এদেশেরই মাটিতে!

ভারতের সভ্যতা

অতি প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর যে ক'টি অঞ্চল সভ্যতার মুখ দেখেছিল ভারত তাদেরই একটি। ভারতীয় সভ্যতার কথা উঠলেই



কোনারক মন্দিরের কারুকার্য-মণ্ডিত রথের চাকা

প্রথমে মনে পড়ে সিন্ধুসভ্যতার কথা। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধুনদের উপত্যকায় এই সভ্যতা গড়ে ওঠে, কিন্তু এদের কথা আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। আর্য সভ্যতাকেই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা ব'লে মনে করা হ'ত। কিন্তু বছর ষাটেক আগে সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদাড়ো এবং সেখান থেকে চারশ' মাইল দূরে পাঞ্জাবের হরপ্পায় মাটি খুঁড়ে যে আশ্চর্য সব জিনিস পাওয়া গেছে তা থেকে সমস্ত ধারণা ওলটপালট হয়ে গেছে।

মহেঞ্জোদড়োয় পর পর সাতটি স্তরে সাতটি শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে। সবচেয়ে নীচের স্তরের শহরটি যীশুখৃষ্টের জন্মেরও তিন হাজার বছর আগেকার বলে মনে করা হচ্ছে। চওড়া বাঁধানো রাস্তাঘাট, ইটের তৈরি ভাঙ্গা বাড়ী, পাকা নর্দমা, স্নানাগার, শস্যাগার ইত্যাদি মিলে সমস্ত শহরটিকে যেন আধুনিক যুগের কোনও শহর বলে ভুল হ'তে পারে। এই আশ্চর্য শহর যারা গড়ে তুলেছিল তারা যে সভ্যতায় কতদূর এগিয়ে গিয়েছিল তা ভাবলেও অবাক্ লাগে। শুধু তাই নয়, এখানে পাওয়া নানা মূর্তি, অলঙ্কার, খেলনা এবং পোড়া মাটির সীলমোহর,—যার গায়ে লেখা অদ্ভুত লিপি আজও পণ্ডিতেরা ঠিক মত পড়ে উঠতে পারেন নি,—দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়। এ সম্বন্ধে "ইতিহাসের কথায়" (ছোটদের বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬৩-৫৬৫) আরও বিশদ করে লেখা আছে।

এর পর এল আর্যেরা, শুরু হ'ল আর্য-সভ্যতার সেই গৌরবময় যুগ। লেখা হ'ল বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত—আরও কত কী! বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা নেই। আজ এত শতাব্দী পরেও তার প্রভাব সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তার পর একে একে এলেন জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ। রাজসিংহাসনের মায়া হেলায় তুচ্ছ করে তরুণ সন্ন্যাসী জগৎকে বলে গেলেন মুক্তি কোন্ পথে—কিসে মঙ্গল হবে সারা জগতের। বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে ভেসে গেল ভারতবর্ষ। রাজা অশোক নিলেন সেই ধর্মপ্রচারের ভার। দেখতে দেখতে ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল সেই ধর্ম—তিব্বতে, চীনে, শ্যামে, ব্রহ্মদেশে, ইন্দোচীনে, এমন কি সুদূর জাপান পর্যন্ত। গ্রীক, শক, হূণ—কত বিদেশী রাজা এসে এই ধর্মের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। তার পর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবও ভারত থেকে কমে গেল প্রধানত শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবে। ক্রমে একে একে এলেন আরও কত সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী মহাপুরুষ—যাঁদের জন্য আধ্যাত্মিক জগতে আজও ভারত সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিচ্ছে।

তার পর একদিন হিন্দু রাজাকে হঠিয়ে দিয়ে রাজধানী দিল্লীর মস্‌নদ দখল করে বসলেন ভারতের বাইরে-থেকে-আসা পাঠান মহম্মদ ঘোরী। তিনি তাঁর প্রতিনিধি (ক্রীতদাস) কুতবউদ্দীনকে এখানকার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। শুরু হ'ল পাঠান রাজত্ব। সে রাজত্বও গেল মোগলদের হাতে। নতুন এক ইস্‌লামী সভ্যতা ভিৎ গেঁথে বসল ভারতের মাটিতে। তাদেরও অবদান নেহাৎ কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দুই সভ্যতার সহাবস্থানও দেখা যেতে লাগল। তার পর একদিন মোগল সাম্রাজ্যও লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়। মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, পাঞ্জাবে আবার হিন্দু ও শিখশক্তি জেগে উঠল। তারই মাঝখানে এল ইয়োরোপীয় বণিকের দল। প্রথমে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, তারপর ফরাসী আর ইংরেজ। তারপর ইংরেজই ছলে-কৌশলে পলাশীর মাঠে বাংলার মস্‌নদই শুধু কেড়ে নিল না, প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য ইয়োরোপীয় শক্তিগুলিকেও ধীরে ধীরে সরিয়ে দিল। দেখতে দেখতে গোটা ভারতের হর্তাকর্তা হয়ে

বসল ইংরেজ। ইংল্যাণ্ডের রাণী হলেন ভারতের মহারাণী—সম্রাজ্ঞী।

এই সব বিদেশী শক্তি বাণিজ্যের নামে ভারতে এসে দেশ দখল করে নিলেও আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল এক নতুন সভ্যতার —যাকে এক কথায় বলা যায় আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা। ওরা সব দিক্ দিয়েই



মহীশূরের হয়সাল রাজাদের আমলে তৈরি চেন্নাকেশব মন্দিরের নায়িকা-মূর্তি, বেলুড়

এগিয়ে চলছিল। ওদের সংস্পর্শে এসে আমরাও সে সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হলাম। একটু একটু করে এদেশেও সে সভ্যতার প্রভাব বাড়তে লাগল।

কিন্তু এই অধীনতার মধ্যেও ভারতীয় সভ্যতার বিলোপ ঘটে নি। যুগে যুগে এসেছেন নানা মনীষী—সাহিত্যে, শিল্পে, দর্শনে, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে আশ্চর্য সব কীর্তি ছড়িয়ে রেখে গেছেন তাঁরা সারা ভারত যুড়ে। তার পরে? পর পর দু'টি বিশ্ব-মহাযুদ্ধ পৃথিবীর চেহারা অনেকখানি পালটে দিল। শেষ পর্যন্ত মানে মানে পাততাড়ি গোটাতে হ'ল ইংরেজ প্রভুদের। ভারত হ'ল স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ্

বিশাল ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্য যেমন বৈচিত্র্যময়, প্রাকৃতিক সম্পদ্ও তেমনি কম নয়। কবি কি সাধে বলেছেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি"?

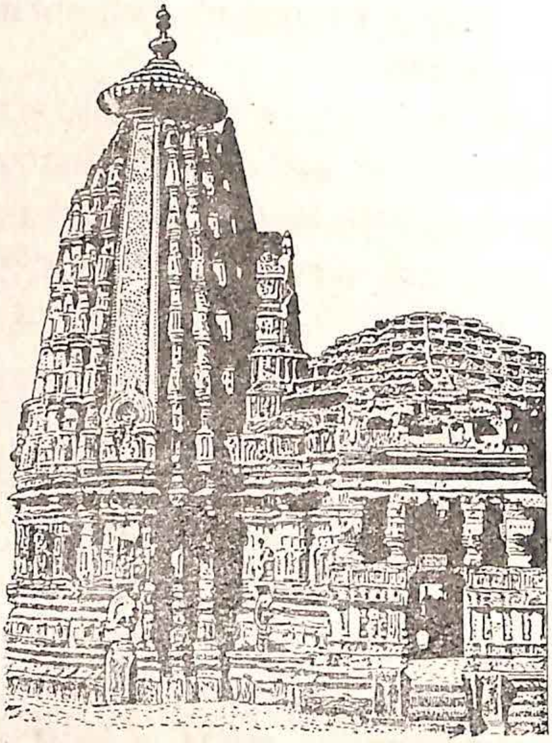
উত্তরে হিমালয়ের বুকে রয়েছে অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য। শুধু বরফ-ঢাকা পাহাড়ই নয়, শ্যামল অরণ্য, সুবিশাল উপত্যকা,—কী নেই? কাশ্মীরকে বলা হয় ভূ-স্বর্গ—এত সুন্দর তার প্রাকৃতিক দৃশ্য। যাঁরা সুইট্জারল্যাণ্ড দেখে মুগ্ধ হয়ে এসেছেন তাঁরা কাশ্মীর দেখে আরও মুগ্ধ হন। দুর্গম পাহাড়ী রাস্তা পেরিয়ে কেদার-নাথ আর বদ্রীনাথের মন্দিরে যেতে হ'লে দু'পাশে যে অপরূপ শোভা দেখা যায় পৃথিবীতে বোধ হয় তার তুলনা নেই। পাহাড়ের গা বেয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে অলকনন্দা নদী, হরিদ্বারের কাছে এসে সমতলভূমিতে পড়ে তাই গঙ্গা নাম নিয়ে বয়ে চলেছে। সারা উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাংলা পার হয়ে শেষে গঙ্গা-সাগরের কাছে এসে মিশে যাচ্ছে সমুদ্রের সঙ্গে। গাড়োয়াল প্রদেশের দুর্গম গঙ্গোত্রী গঙ্গার

অবতরণ-স্থান। দুর্গম, কিন্তু কী অপরূপ তার সৌন্দর্য! আবার পাঞ্জাবের কাছে রয়েছে সিন্ধুনদ। পাঁচটি উপনদী—ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, শতদ্রু, বিপাসা, বিতস্তা এসে একত্র মিলে গড়ে তুলেছে পঞ্চসিন্ধু। পূব দিকেও রয়েছে বিরাট ব্রহ্মপুত্র নদ। আসলে তার সৌন্দর্যও যেমন, দাপটও তেমন। "দুই তীরে তার পাহাড় উঁচু, ব্রহ্মপুত্র চলেছে সাদা"—দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া নীল যমুনাও কম নয়! দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন হয়ে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) এসে যুক্ত হয়েছে গঙ্গার সঙ্গে—নাম তাই যুক্তবেণী। সেই বেণী আবার মুক্ত হয়েছে বাংলায় ত্রিবেণীতে—সেখানে সে মুক্তবেণী। ত্রিবেণী বলতে তিনটি নদী। আর একটি হচ্ছে সরস্বতী। এক সময় সেও ছিল বিরাট। এখন শুকিয়ে গিয়ে তার লুপ্ত দশা।

দাক্ষিণাত্যেও রয়েছে বড় বড় নদী—গোদাবরী, নর্মদা, কৃষ্ণা, কাবেরী। শ্বেতপাথরের পাহাড়ের গা ধুয়ে ধুয়ে ছুটে চলেছে নর্মদা—সে দৃশ্যও যে একবার দেখেছে সে আর ভুলতে পারবে না।

শুধু কি নদী? নীল সমুদ্র ছড়িয়ে রয়েছে সারা ভারতের তিনদিক্ যুড়ে। তার ধারে ধারে রমণীয় শহর—বোম্বাই, ত্রিবান্দ্রাম্, মাদ্রাজ। তেমনি রয়েছে সুবিশাল গাঙ্গেয় উপত্যকা, সিন্ধু উপত্যকা। সবুজের শ্যামলিমা-মাখা সমভূমি দেখে দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

বিরাট্ বিরাট্ বনভূমিরও অভাব নেই ভারতে। যাকে বলা চলে মহারণ্য। এ রকম মহারণ্য আছে মধ্য প্রদেশে, গুজরাতে, উত্তর প্রদেশের ওপরের দিকে, আসামে, দার্জিলিংএর নীচে উত্তর বঙ্গের তরাই অঞ্চলে, বাংলার নীচে



চন্দেল্ল রাজাদের তৈরি একটি মন্দির, খাজুরাহো

সুন্দরবন অঞ্চলে। নানা রকম বিচিত্র প্রাণীর সমারোহ সেখানে। হাতি, গণ্ডার, ভালুক, চিতা, সুন্দরবনের অতিকায় কেঁদো বাঘ—রয়াল টাইগার, সম্বর হরিণ, ময়াল সাপ, অজস্র পাখি। গির জঙ্গলে আছে সিংহ। এক একটি অরণ্য যেন এক একটা জীবন্ত পশুশালা। ভারতের বনসম্পদ্‌ও বড় কম নয়।

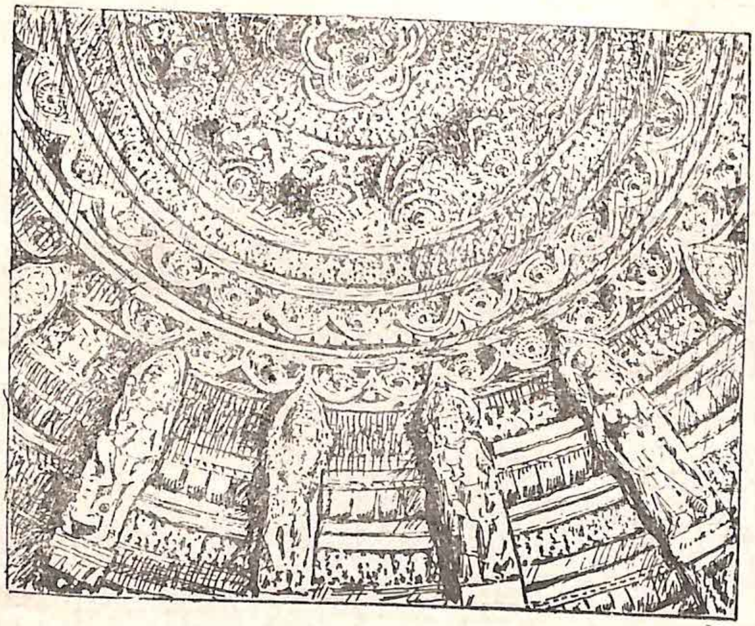
কথায় বলে ভারতের মাটিতে সোনা ফলে। সত্যি, এমন ফসল কমই আছে যা এখানে জন্মায় না। আবার মাটির নীচে রয়েছে অগণিত খনিজ সম্পদ্। লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, সোনা, রূপো প্রভৃতি ধাতুর রাসায়নিক আকর। আছে অভ্র, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, এমন কি হীরে-জহরৎ পর্যন্ত। দক্ষিণ ভারতের তুঁতকড়ি মুক্তোর জন্য বিখ্যাত। মুক্তো পাওয়া যায় সমুদ্রের

জলে ঝিনুকের মধ্যে; কুড়িয়ে নিতে জানলেই হ'ল। ইংরেজ রাজত্বের সময় সরকার খনিজ সম্পদ্গুলির দিকে তেমন বেশি নজর দেওয়া দরকার বোধ করেন নি, কিন্তু স্বাধীন ভারত সরকার এগুলো খুঁজে বার করবার ভার নিয়েছেন, খুঁজে বার করেছেনও অনেক কিছু। এমন কি তেজস্ক্রিয় ধাতুর আকর পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে কোন কোন জায়গায়।

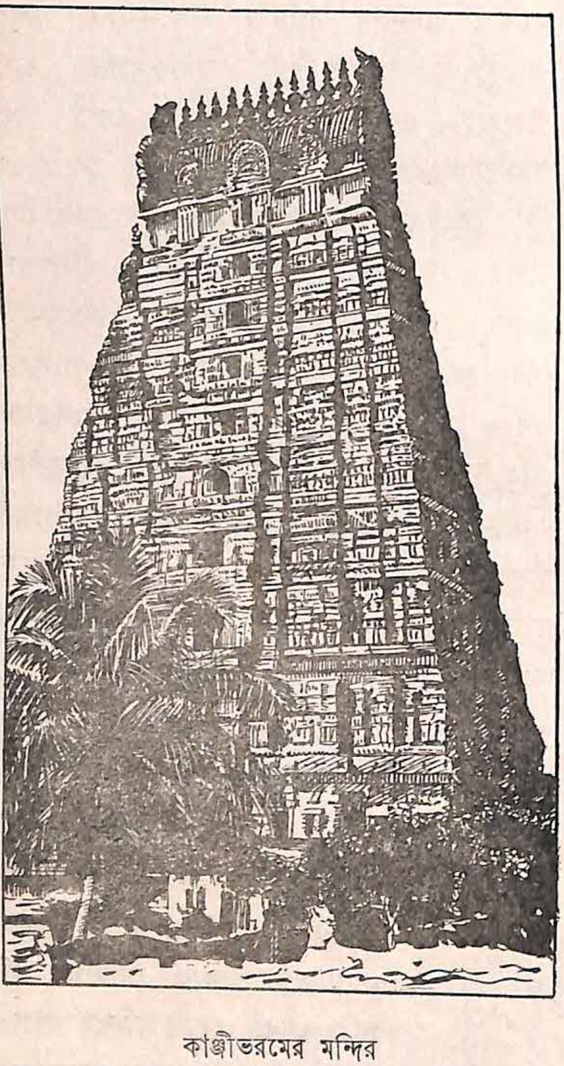
ভারতে উৎপন্ন পাট, চা, কফি, রবার, চিনির আদর এখন পৃথিবীর সর্বত্র।

ভারতের স্থাপত্য ও শিল্প

ভারতের স্থাপত্য ও শিল্প দেখলে অবাক্ হ'তে হয়। যুগে যুগে এই শিল্পকলার রীতির পরিবর্তন ঘটেছে আর তা ছড়িয়ে আছে সারা ভারতের বুক যুড়ে। কত আর নাম করব? বৌদ্ধযুগের সারনাথ, সাঁচীর স্তূপ, ভাজা চৈত্য, কারলি চৈত্য, বুদ্ধগয়ার বোধগয়া মন্দির, নালন্দার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, মথুরায় গুপ্তযুগের স্থাপত্যশিল্প, কুষাণ-যুগের ভাস্কর্য, অজন্তার গুহাচিত্র, ইলোরায় একটি আস্ত পাহাড়ের একদিকে ২৮০ ফুট অন্য দিকে ১৬০ ফুট কেটে-বের-করে-আনা বিরাট কৈলাসনাথ-মন্দির। ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বর ও লিঙ্গরাজ-মন্দির, কোনারকের আশ্চর্য কারুকার্যমণ্ডিত রথের আকারের সূর্যমন্দির, কাশ্মীরের পাহাড়ের ওপর মাটান বা মার্তণ্ড-মন্দির, রাজস্থানের আবু পর্বতের দিলওয়ারা মন্দির, বোম্বাইয়ের অনতিদূরে সমুদ্রের মাঝখানে এলিফ্যান্টা দ্বীপের গুহায় অতিকায় ত্রিমূর্তি, মাদ্রাজের কাছে মহাবলীপুরমের সমুদ্রোপকূলের আশ্চর্য মন্দিরগুলি দেখলে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করবে না। তেমনি মহীশূরের হয়সাল রাজাদের আমলের তৈরি বেলুড়ের চেন্নাকেশব-মন্দির, আর হ্যালেবিডের হয়সালেশ্বর-মন্দির, সোমনাথপুরার মন্দির আজও এত নিখুঁত ভাবে রয়েছে যে দেখলে মনে হবে পাথরে খোদাই মূর্তি-গুলি জীবন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে সেতুবন্ধ রামেশ্বরমের বিখ্যাত রামেশ্বর-মন্দিরের হাজার স্তম্ভযুক্ত অলিন্দের কথাও বলতে হয়, বলতে হয় মাদুরার মীনাক্ষী-মন্দিরের কথা,—যার চার পাশের চারটি সুউচ্চ গোপুরম্ বা প্রবেশ-দ্বার দেখলেই মাথা আপনা থেকে নীচু হয়ে আসে। একটা মন্দিরের চত্বর যে এত বড় হতে পারে, এতখানি জায়গা যুড়ে যে একটি



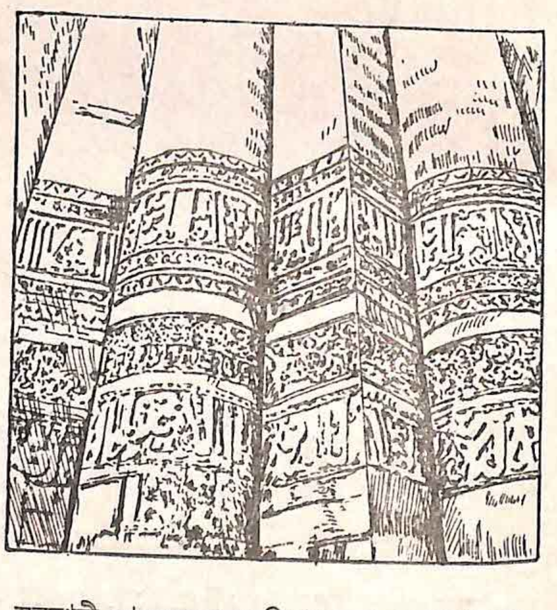
আবু পর্বতে দিলওয়ারা মন্দিরের ছাদের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য



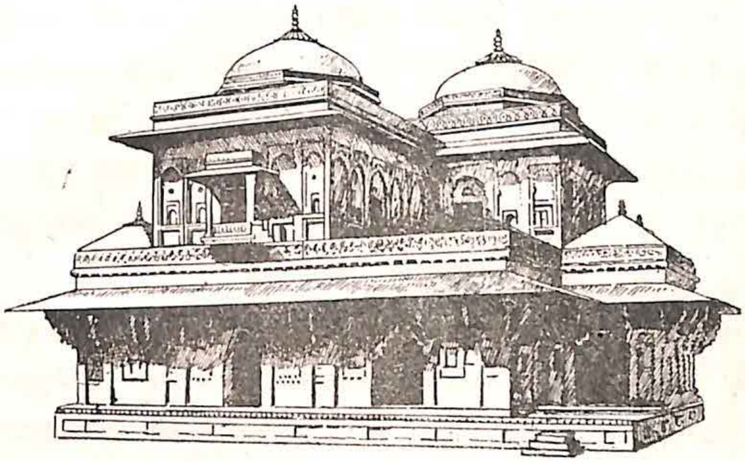
কাঞ্জীভরমের মন্দির

মন্দির গড়ে তোলা যায় তা না দেখলে বিশ্বাসই করা যায় না। কাছাকাছি তাঞ্জোর, কাঞ্জীভরম্ প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো গ্রামে চন্দেল্ল রাজাদের তৈরি মন্দিরগুলি ভারতীয় স্থাপত্যের আর এক আশ্চর্য নিদর্শন। প্রায় আশিটি মন্দিরের মধ্যে এখন ২৫।৩০টি মাত্র চোখে পড়ে।

এ সব হ'ল হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগের স্থাপত্য শিল্প। মুসলমান রাজত্বের সময়েও ভারতে আর এক ধরনের আশ্চর্য স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে দিল্লীর সুউচ্চ কুতব মিনার আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই আছে হিন্দুযুগের শেষ রাজা রায় পিথোরার মন্দির আর সেই আশ্চর্য লৌহস্তম্ভ যা হাজার বছর পরেও একটুও মরচে না মেখে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। আগ্রার কেল্লা আর তার নিকটবর্তী ফতেপুর সিক্রীর কেল্লা—যেখানে আকবর বাদশাহ্ তাঁর রাজধানী নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু জলের অভাবে যা ফেলে রেখে আসতে হয়েছিল। লাল পাথরের তৈরি এই বিরাট দুর্গের প্রবেশদ্বার বুলন্দ দরওয়াজার নীচে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়—এত উঁচু সেই ফটক। এর ভিতরকার নানা মহল—বিশেষ করে আগাগোড়া খোলা পাঁচতলা, পাঁচমহল, বাদশাহের সভাগৃহ আর তাঁর নবরত্ন সভার হাস্যরসিক বীরবলের বাড়িটিও এখানেই অক্ষত দেহে দাঁড়িয়ে আছে।



সুলতানী আমলের কুতব মিনারের গায়ে অলংকরণ



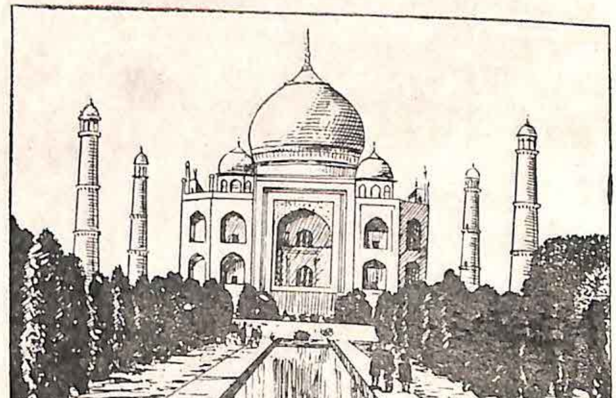
হাস্যরসিক রাজা বীরবলের বাড়ি, ফতেপুর সিক্রী

কিন্তু সবের ওপর টেক্কা দিয়েছে আগ্রার তাজমহল, কবির ভাষায় যাকে বলা হয় বাদশাহ্ শাহ্জাহানের 'মর্মরস্বপ্ন'। তাঁর প্রিয় পত্নী মুম্‌তাজমহলের সমাধিমন্দির এটি। পরে শাহ্জাহানের মৃত্যুর পর তাঁকেও এখানে এনে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। আগাগোড়া শ্বেত-পাথরের তৈরি এই অপরূপ সমাধি-মন্দিরটি শুধু ভারতের নয়, পৃথিবীর একটি আশ্চর্য স্থাপত্যশিল্প হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। দেশ-বিদেশ থেকে কত সৌখীন পর্যটক শুধু এই তাজমহল দেখবার জন্যই ভারতে বেড়াতে আসেন। এখানকার শ্বেতপাথরের গায়ে যে জালির কাজ রয়েছে তা এক কথায় অনন্য।

আগ্রা কেল্লার কথা বলতে গেলে দিল্লীর লাল কেল্লার কথাও না বললে চলে না। এখানেই ছিল সম্রাট শাহ্জাহানের দেওয়ানী খাস বা মন্ত্রীদের নিয়ে বসবার ঘর, যার মাঝখানে পাতা থাকত ময়ূর সিংহাসন। দেয়ালে আজও ফারসী হরফে লেখা আছে—"অগর ফিরদৌস বররুয়ে জামিনস্ত—ইয়া হামিনস্ত ইয়া হামিনস্ত ইয়া হামিনস্ত।" অর্থাৎ পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে তবে তা এখানেই, তা এখানেই, তা এখানেই।

এ ছাড়া আছে গিরিদুর্গ। গোয়ালিয়রে, মহারাষ্ট্রে, আরও এদিকে ওদিকে কয়েকটা জায়গায়। দুর্ভেদ্য সেই সব দুর্গ খাড়া পাহাড়ের গায়ে উঠে গেছে শত্রুর আক্রমণ তুচ্ছ করতে।

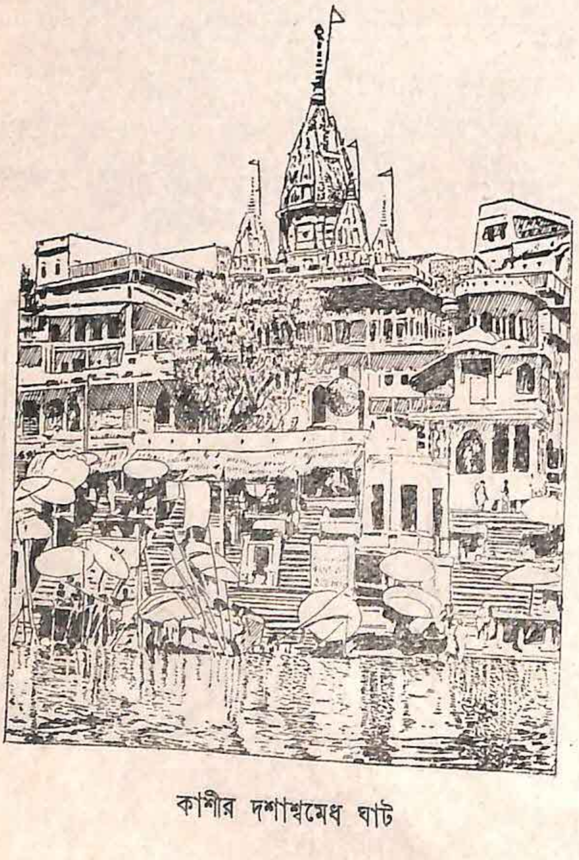
ইংরেজ আমলেও নতুন ধরনের স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছে। দিল্লীর পার্লামেণ্ট গৃহ—এখন যাকে বলা হয় লোকসভা, ভাইস্‌রয়ের বাড়ি—এখন যা রাষ্ট্রপতিভবন, আর বড় বড় শহরে সাম্প্রতিক কালের আকাশছোঁয়া সব বাড়ি,—ইংরেজিতে যাদেরকে বলা হয় স্কাইস্ক্রেপার—উদাহরণ স্বরূপ এদের উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা দেশের স্থাপত্যশিল্পের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই একটা পৃথক্ বৈশিষ্ট্য।



আগ্রার তাজমহল

তীর্থভূমি ভারতবর্ষ

ভারতকে তীর্থের দেশ বললেও ভুল বলা হবে না। পাহাড়ের চূড়ায়, সমুদ্রের ধারে, নদীর কোলে কত যে তীর্থ ছড়িয়ে রয়েছে কে তার হিসেব রাখে? দুর্গম হিমালয়ে কেদার-বদরীর কথা তো আগেই বলেছি। তেমনি দুর্গম কাশ্মীরের অমরনাথ। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, জ্বালামুখী, কুরুক্ষেত্র, প্রয়াগ, গয়া, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, নাসিক, তিরুপতি, কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম্, কাঞ্চীভরম্, মাদুরা, কামাখ্যা, বিন্ধ্যাচল, পুরী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষী-গোপাল, বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, তারকেশ্বর—অসংখ্য তীর্থ! যেখানে সুন্দরের লীলা সেখানেই মন্দির। বৃন্দাবনের প্রতিটি ধূলিকণা বৈষ্ণব-



কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট

দের কাছে পবিত্র। তেমনি পবিত্র কাশীর অগণিত ঘাট। এর একটি হচ্ছে দশাশ্বমেধ ঘাট। গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী, ধনুকের মত বেঁকে সারা কাশী শহরটাকে যেন জড়িয়ে ধরে আছে। হিন্দুরা বলেন, বিশ্বনাথের রাজ্য কাশী, পাশেই আছেন মা অন্নপূর্ণা।

শুধু হিন্দুতীর্থই নয়,—বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, খৃষ্টান, শিখ—সব ধর্মের তীর্থক্ষেত্রই ছড়িয়ে আছে সারা ভারতে। আছে সারনাথে, বুদ্ধগয়ায়, কুশীনগরে, অমৃতসরে, পরেশনাথে, রাজগীরে, আজমীরে, গোয়ায়—আরও কত জায়গায়!

১৯৪৭-এর পরে

ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটল ১৯৪৭ সালে। ধীরে ধীরে ভারত পরিবর্তিত হ'ল প্রজাতন্ত্রে। মাথার ওপর একজন প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতি থাকলেও এখন আসল ক্ষমতা হচ্ছে প্রধান মন্ত্রীর। তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করেন। লোক-সভার (পার্লামেণ্ট) সদস্যেরা এতে নিজের নিজের দলের শক্তি অনুযায়ী অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর দেশের প্রাপ্ত-বয়স্ক সমস্ত নারীপুরুষের ভোট নিয়ে লোক-সভার নির্বাচন হয়। যে দল জিতে সংখ্যায় বেশি হন সেই দলেরই নেতা হন প্রধান মন্ত্রী। অবশ্য লোকসভা ছাড়া একটি রাজ্যসভাও আছে। তার সদস্যদেরও কিছু কিছু ক্ষমতা আছে, তবে লোকসভার সদস্যদের মত নয়। এ ছাড়া প্রতিটি রাজ্যে আছে একটি করে বিধানসভা। সেখানেও প্রধান মন্ত্রীর মত যে

দল জেতেন সে দলের নেতা হন মুখ্যমন্ত্রী এবং সে রাজ্যের সরকার চালাবার কর্তৃত্ব তাঁরই ওপর। তিনিও কেন্দ্রীয় সরকারের মত মন্ত্রি-সভার সাহায্যে সরকার পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতির মত এখানেও, অর্থাৎ প্রতি রাজ্যে একজন করে গভর্নর বা রাজ্যপাল মাথার ওপর থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই আসল ক্ষমতা। রাজ্যগুলি নিজেদের রাজ্যের ব্যাপারে মোটামুটি স্বয়ংশাসিত হ'লেও কতকগুলি বিভাগ—যেমন সৈন্যবাহিনী বা প্রতিরক্ষা, আয়কর, রেলওয়ে ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তা ছাড়া প্রধান মন্ত্রী ও লোকসভা বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিধানসভার ওপরেও কিছুটা কর্তৃত্ব করতে পারেন। লোকসভার মত বিধানসভাগুলির সদস্যেরাও প্রতি পাঁচ বছর পর পর প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হন। লোকসভা এবং বিধানসভার সভাপতিকে বলা হয় স্পীকার। যে সব দলের সদস্যেরা নির্বাচিত হয়েও সংখ্যায় কম থাকেন তাঁরা হন বিরোধী পক্ষ।

ভারত স্বাধীন হবার পর প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তাঁর মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঐ পদে বসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁরও মৃত্যু হ'লে জওহরলালের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঐ পদে নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ এগারো বছর ধরে প্রধান মন্ত্রিত্ব করেন। এঁরা সবাই ছিলেন কংগ্রেস দলের—যে দল ভারত স্বাধীন করার আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এখনকার কংগ্রেস আর ইংরেজ আমলের কংগ্রেসকে ঠিক এক চোখে দেখলে ভুল হবে, যদিও তখনকার কংগ্রেসের অনেক নেতা এখনও এর মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু এরই মধ্যে একবার লোকসভার নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে পরাজিত করে জনতা পার্টি নামে একটি পাঁচমিশেলী দল লোকসভায় সবচেয়ে বেশি আসন দখল করে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছিল। শ্রীমোরারজী দেশাই এঁদের নেতা হিসেবে হয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রী। কিন্তু পাঁচ বছর পূর্ণ হবার অনেক আগেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির ফলে এই পাঁচমিশেলী দল ভেঙ্গে যায়, নতুন করে নির্বাচন হয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দল আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। শ্রীমতী গান্ধীই আবার হন প্রধান মন্ত্রী।

রাষ্ট্রপতির পদে পর পর নির্বাচিত হয়েছেন ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ডঃ রাধাকৃষ্ণন, ডঃ জাকির হোসেন, শ্রীভেঙ্কট গিরি বরাহ গিরি এবং ফকরুদ্দীন সাহেব। ফকরুদ্দীনের অকস্মাৎ মৃত্যুতে উপরাষ্ট্রপতি শ্রীজাত্তি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। পরে এ পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি। সম্প্রতি নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীজৈল সিং। লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধান সভা সব ক'টিতেই ছোটবড় অনেকগুলি রাজনীতিক দল আছে।

আধুনিক ভারত

ভারত শুধু তার প্রাচীন গৌরব নিয়েই থাকতে পারে না, পৃথিবীর সামনে তাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে। শিল্পে, বাণিজ্যে আজ সে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে চায় এবং দিচ্ছেও। ভারতের নানা প্রান্তে তৈরি হচ্ছে বড় বড় কারখানা। টাটানগর, বার্নপুর, দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা, ভিলাই, ভদ্রাবতী, বোকারোয় তৈরি হচ্ছে লোহা আর ইস্পাত। চিত্তরঞ্জনে তৈরি হচ্ছে রেলওয়ে এঞ্জিন,

মাদ্রাজের পেরাম্বুরে রেলওয়ে কোচ্, বাঙ্গালোরে এরোপ্লেন, উত্তরপাড়ার কাছে বসেছে মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা। ডিগ্‌বয়ে রয়েছে পেট্রোলিয়াম খনি। যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন, কলকব্জা, এমন কি নানারকম আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র—সবই তৈরি হচ্ছে ভারতে। ট্রম্বেতে বসেছে আধুনিক নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক গবেষণা-কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত দেখিয়ে দিয়েছে যে সেও আজ পরমাণুশক্তির অধিকারী, যদিও এই পরমাণু-বিস্ফোরণ শান্তির কাজেই সে ব্যবহার করবে, মারণাস্ত্র হিসেবে নয়। মহাকাশেও ভারত একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়েছে, গবেষণা-কেন্দ্র বসিয়েছে শ্রীহরিকোটায়।

কাগজের কল, কাপড়ের কল, রেশমের কল, পশমের কল, চামড়ার কল, জুতোর কল, চিনির কল, নকল রেশমের কারখানা, রাসায়নিক তন্তুর কারখানা, প্লাস্টিকের কারখানা, ওষুধপত্র ও নানা রাসায়নিক মশলা তৈরির কারখানা, ঘড়ি, থার্মোমিটার ও নানান্ রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা—সবই দেখতে পাওয়া যাবে ভারতে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তার রপ্তানী সামগ্রীর পরিমাণও বড় কম নয়। যে ইংল্যাণ্ড এক সময়ে তাকে কাপড় চালান দিয়ে ঠুঁটো করে রেখেছিল এখন সেই ইংল্যাণ্ডই ভারতে-তৈরি কাপড় কিনে নিচ্ছে নিজের প্রয়োজন মেটাতে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রণালীর চাষ-আবাদ, সেচের ব্যবস্থা—এ সবের দিকেও মন দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বড় বড় বাঁধ তৈরি করে জলবিদ্যুৎ তৈরি করা হচ্ছে নানা জায়গায়। বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে রাসায়নিক সার। আধুনিক পথ-ঘাট—ন্যাশনাল হাইওয়ে এখন ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। কলকাতায় মাটির নীচে টিউব রেল বা পাতাল-রেল তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে দ্রুত চলাচলের জন্য।

শিক্ষাদীক্ষার দিকেও নজর দিচ্ছেন সরকার। অল্পদিনের ব্যবধানেই বহু নতুন নতুন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে দেশের নানা অঞ্চলে। তৈরি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র, বড় বড় গ্রন্থাগার। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞানী রামন্ সাহিত্যে ও পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়ে আগেই দেশের মুখোজ্জ্বল করেছিলেন। আরও একজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী খোরানা আসলে ভারতীয়ই ছিলেন, কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই তিনি আমেরিকার নাগরিকত্ব নিয়েছেন। আবার এদিকে মাদার টেরিজা (টেরেসা) পেয়েছেন শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার। বিদেশিনী হ'লেও বহুদিন আগেই তিনি ভারতের নাগরিকত্ব নিয়ে আমাদেরই একজন হয়ে গেছেন।

ভারতের সীমানা

যুগে যুগে ভারতের সীমানার পরিবর্তন হয়েছে। এক সময় ছিল যখন সারা ভারত যুড়ে ছিল অসংখ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও হ'ত মাঝে মাঝে। সম্রাট্ অশোকের সময়ে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ যুড়ে ছিল তাঁর সাম্রাজ্য। শুধু ভারতবর্ষ কেন, আফগানিস্থানের কান্দাহারও (গান্ধার) ছিল তাঁর সাম্রাজ্যের ভিতর। তার পর গুপ্ত যুগে, কুষাণ যুগেও আমরা দেখেছি বিশাল

সাম্রাজ্য। ধর্মপালের সাম্রাজ্যও নেহাৎ ছোট ছিল না। মোগল যুগেও তো ভারতের অনেকটা অংশেরই সম্রাট্ বনে গিয়েছিলেন দিল্লীর বাদশাহ্‌রা, তবে দক্ষিণ ভারতের বেশ খানিকটা জায়গা তাঁরা গ্রাস করতে পারেন নি। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর আবার খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় ভারতবর্ষ। ইংরেজরা এসে আবার তা এক করল। শুধু তাই নয়, ব্রহ্মদেশ জয় করে সেটাও তারা যুড়ে ছিল ভারতের সঙ্গে। তারপর চলে যাবার সময় তারাই আবার করে দিয়ে গেল ভারতের অঙ্গচ্ছেদ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই ব্রহ্মদেশ ইংরেজদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল; তার পর ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তারাও পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। ওদিকে পশ্চিম ভারতে পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ কেটে নিয়ে তার সঙ্গে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ ইত্যাদি যুড়ে তৈরি হ'ল নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান। আর পূবদিকে বাংলার অর্ধেকেরও কিছু বেশি—পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গের অনেকখানি এবং আসামের খানিকটা কেটে নিয়ে যুড়ে দেওয়া হ'ল পাকিস্তানের সঙ্গে। সেটার নাম হ'ল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলার যেটুকু ভারতের সঙ্গে যুক্ত রইল সেটার নাম হ'ল পশ্চিম বঙ্গ।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের ওপর বেশি মাতব্বরী করতে গিয়ে তাকে কি করে প্রায় নিজেদের উপনিবেশ করে ফেলেছিল, কি করে পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং ভারতের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে কি করে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গড়ে তুলল আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র আর তার নাম দিল বাংলাদেশ—সে কাহিনী তো আগেই বলা হয়েছে। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, ১৪০৪-০৫)।

তবু আমরা আজও বাংলাদেশ বলতে গোটা পূর্ব আর পশ্চিম বাংলাকেই বুঝি, ভারতের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে পাকিস্তানের ইতিহাসকেও সঙ্গে টেনে নিই। আর সবটা মিলিয়ে বলি এ তো দেশ নয়—উপমহাদেশ।

আমাদের বাংলা

সবশেষে আসা যাক আমাদের বাংলার কথায়। বাংলাদেশ বললেই ঠিক বলা হ'ত, কিন্তু সম্প্রতি, পাকিস্তানের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে, পূর্বপাকিস্তান যে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তারই সরকারী নাম ঘোষণা করা হয়েছে 'বাংলাদেশ'। যে অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত তাকে বলা হয় পশ্চিমবঙ্গ,—যদিও এখনও বাংলাদেশ বলতে আমরা গোটা পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ—সবটাকেই বুঝি। কারণ একই ভাষা এবং আত্মীয়তার বাঁধনে এই সমস্ত রাজ্যটি আজও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত আছে। ধর্মের দিক্ দিয়ে পূর্ববঙ্গ বা তথাকথিত বাংলাদেশ মুসলিমপ্রধান অঞ্চল হ'লেও এখনও প্রচুর হিন্দু এবং কিছু বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মের লোক সেখানে বাস করেন; তেমনি পশ্চিমবঙ্গ প্রধানত হিন্দুপ্রধান অঞ্চল হ'লেও এখানেও প্রচুর মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক আছেন, অন্য ধর্মের লোকেরও অভাব নেই—যদিও সংখ্যায় তাঁরা কম। ১৯৪৭ সালে

প্রধানত ধর্মের ভিত্তিতেই ভারতকে বিভক্ত করে গিয়েছিলেন ইংরেজ সরকার, কিন্তু সেটা পুরোপুরি সম্ভব হয় নি। পশ্চিম পাকিস্তানে কতকটা হ'লেও পূর্ব পাকিস্তানে একেবারেই হয় নি। আর ভারতের প্রায় ৯ কোটি মুসলমান তো ভারতকেই তাঁদের মাতৃভূমি বলে মেনে নিয়ে এখানেই থেকে গেছেন। এই প্রগতির যুগে মধ্যযুগীয় ধর্মের ভিত্তিতে যে কোন দেশকে পৃথক্ করা যায় না তার প্রমাণ ভারত। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠতাও বড় কম নয়। ভাষা এক, চালচলনেও প্রচুর মিল রয়ে গেছে। দু'দেশের লোকই নিজেদের বাংলাভাষা-ভাষী আর বাঙ্গালী বলে গর্ববোধ করে।

ভারতের শেষ বয়সের মেয়ে

ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে অবশ্য বাংলা ভারতের শেষ বয়সের মেয়ে। কি করে বাংলা বা বাংলাদেশ গাঙ্গেয় উপত্যকার পলিমাটি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সে কথা ছোটদের বিশ্বকোষের এই খণ্ডেই বলা হয়েছে—'পৃথিবীর কথায়' (পৃঃ ১৪৬৬)। কিন্তু ভূতাত্ত্বিক যুগ আর ঐতিহাসিক যুগ তো এক নয়! লক্ষ লক্ষ বছর ভূতাত্ত্বিকদের কাছে কিছুই না। কাজেই ভূতত্ত্বের দিক্ দিয়ে বাংলা তেমন প্রাচীন না হ'লেও ইতিহাসের দিক্ দিয়ে কিন্তু একে অতি প্রাচীন দেশ বলতে বাধা নেই। পুরোনো প্রস্তর যুগ, নতুন প্রস্তর যুগ, তাম্রযুগ—সর্বযুগের নানা স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া গেছে এখানে—বিশেষ করে সে সব যুগের নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র। এ থেকেই বোঝা যায় কত প্রাচীন যুগ থেকে এখানে মানুষের বসতি শুরু হয়েছিল।

নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাও বলেন,—আর্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গোলিয়ান এবং আল্পাইন—বিশেষ করে এই চার জাতের লোকই এখানে এসে একত্র মিশে গিয়ে বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করেছে। অবশ্য আর্যেরা এদেশে ছড়িয়ে পড়ার আগে দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতিরাই এখানে বাস করত ; তারাই হচ্ছে এদেশের আদিম অধিবাসী। এরা নিষাদ জাতি নামেও পরিচিত।

এই নিষাদ জাতিরা সম্ভবত নতুন প্রস্তর যুগ থেকেই এদেশে বসবাস করছিল। নিষাদ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি ব্যাধ বা শিকারী। মনে হয় শিকার-করা পশুমাংসই ছিল এদের প্রধান খাদ্য। তবে এরা কিছু কিছু চাষবাসও করত এবং ক্রমে ক্রমে প্রথমে তামা এবং শেষে লোহারও ব্যবহার শিখে গিয়েছিল। সে যুগগুলিকে অবশ্য আর নতুন প্রস্তর যুগ বলা যায় না—বলা হয় তাম্রযুগ এবং লৌহযুগ।

আর্যেরা উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও বাংলাদেশে তারা বোধ হয় এসেছিল বেশ কিছুটা পরে, যদিও ঋগ্বেদের পরে ঐতরেয়, আরণ্যক ইত্যাদি উপনিষদে এবং রামায়ণ-মহাভারতেও বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। নানা পুরাণেও আছে ওর কথা। মহাকবি কালিদাস তাঁর বিখ্যাত কাব্য রঘুবংশে রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রঘুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে সে সময় বাংলাদেশের রাজারা যুদ্ধজাহাজ নিয়ে তাঁকে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস ভারতে এসেছিলেন যীশুখ্রীষ্টের জন্মেরও অনেক আগে—খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতকে। তিনি তাঁর সময়কার ভারতবর্ষের যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে পাটলিপুত্রের (এখন-

কার পাটনার পাশে (পূর্বদিকে গঙ্গা নদীর অপর তীরে গঙ্গারিডি নামে খুব শক্তিশালী একটি রাজ্য ছিল—যেখানকার রাজারা প্রচুর হাতি নিয়ে যুদ্ধ করতেন। পরবর্তী ইতিহাসকারদের ধারণা এই গঙ্গারিডি আসলে গঙ্গারাঢ় বা রাঢ় দেশ—যেটাকে এখন প্রধানত বর্ধমান বিভাগ বলা যেতে পারে।

বঙ্গদেশ ঃ নাম কি করে হ'ল

মহাভারতের যুগেও বঙ্গদেশ ও বাংলার প্রতাপ বড় কম ছিল না। ঐ বইতেই দেখা যায় যে সে সময়ে উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রক নামে এক রাজা ছিলেন যিনি নাকি ছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী। ঐ মহাভারতেই 'বঙ্গ' নামটি কেমন করে হ'ল তার কাহিনী লেখা আছে। বলি নামে একজন খুব ধার্মিক রাজা ছিলেন—যিনি ছিলেন রাজা যযাতির বংশধর। এঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুদেষ্ণা। দীর্ঘতমা নামে এক মস্ত ঋষির বরে এই রাজার পাঁচটি বীর পুত্র হয়। তাদের নাম রাখা হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও



দাখিল দরওয়াজা, গৌড়

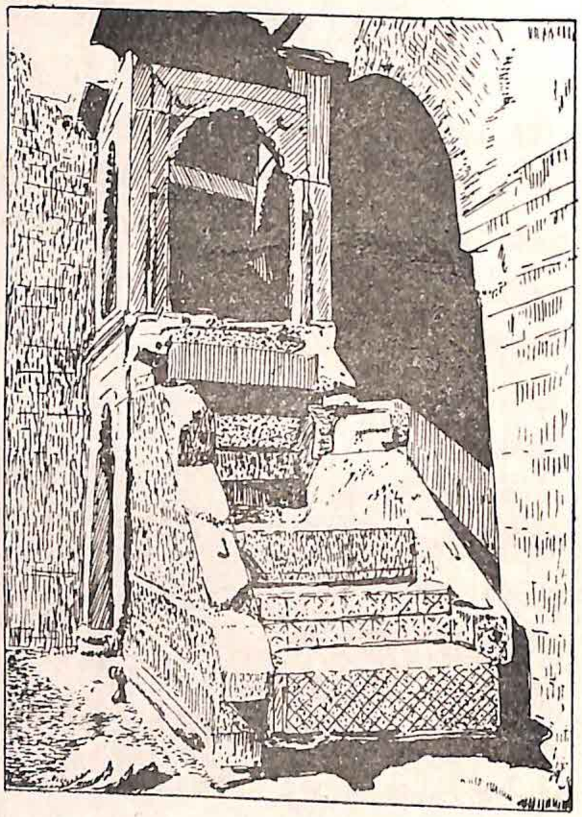
পুণ্ড্র, এবং তাঁদেরই নাম দিয়ে তাঁদের পাঁচটি রাজ্যেরও নাম রাখা হয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। কোথায় ছিল এই রাজ্যগুলি? পরের যুগের ঐতিহাসিকেরা সেগুলির স্থান নির্ণয় করেছেন। অঙ্গ রাজ্য ছিল বর্তমান ভাগলপুর অঞ্চলে, বঙ্গ ছিল এখনকার পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগ যুড়ে, কলিঙ্গ ছিল উড়িষ্যার দক্ষিণ দিক্‌টায়, সুহ্ম ছিল রাঢ় দেশ অর্থাৎ এখনকার বর্ধমান বিভাগে আর পুণ্ড্র ছিল এখনকার উত্তর বাংলায়। এই রাঢ়দেশের কথা সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থেও দেখতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ গ্রন্থ বৌধায়ন সূত্রেও বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে, তবে তা খুব প্রশংসাসূচক নয়। সে যুগের বাঙ্গালীরা নাকি ছিলেন খুব উগ্রস্বভাবের, তাঁদের সংস্পর্শে এলে আর্যদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। এমন কি জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরও নাকি বাঙ্গালীদের কাছে মোটেই ভালো ব্যবহার পান নি! এক কথায় মহাভারতে যে "পাণ্ডববিবর্জিত দেশের" উল্লেখ আছে তখনকার বঙ্গদেশ ছিল তাই, যদিও স্বয়ং অর্জুন বঙ্গদেশের সংলগ্ন মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিলেন।

প্রথম বাঙ্গালী সম্রাট্ শশাঙ্ক

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পূর্ব ভারতের অনেকখানি অংশ দখল করে নেন তাঁর সাম্রাজ্যে, তার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। এবং, তাঁর পরেও, শ'দুই বছর বাংলাদেশের বেশ খানিকটা জায়গা তাঁর বংশধরেরাই শাসন করে গেছেন। তারপর সপ্তম

শতাব্দীতে এই বাংলারই মাটিতে দেখা দেন এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা—ইতিহাসে যিনি রাজা শশাঙ্ক নামে পরিচিত। সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের প্রবল বিরোধের কথা তোমরা ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছ। শশাঙ্ক ছিলেন কর্ণসুবর্ণের রাজা, কিন্তু বঙ্গরাজ্যেরও অনেকখানি জায়গা তিনি বাহুবলে উদ্ধার করে নেন। শুধু তাই নয়, শশাঙ্ক তাঁর রাজ্যকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। এগুলি হচ্ছে কর্ণসুবর্ণ, সমতট, তাম্রলিপ্তি, পুণ্ড্রবর্ধন এবং কামরূপ। কর্ণসুবর্ণ ছিল এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলায়। এখানে বলা যেতে পারে, এখন আমরা যে জায়গাটাকে বাংলা বা বঙ্গদেশ বলি আগেকার দিনে সে জায়গাটার সে রকম একটা কোন বিশেষ নাম ছিল না—এক একটা অংশ এক এক নামে পরিচিত ছিল। পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রদেশ উত্তরবঙ্গে ছিল সে কথা তো আগেই বলেছি। এ জায়গার আর এক নাম বরেন্দ্রভূমি। ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে ছিল সুহ্ম বা রাঢ় দেশ। তাম্রলিপ্তি এখনকার তমলুক অঞ্চলের প্রাচীন নাম, যা শশাঙ্কের আমলে ছিল সমুদ্রের তীরে। সমুদ্র পরে অনেক সরে গেছে। কামরূপ হচ্ছে আসামের কামাখ্যা অঞ্চল। শশাঙ্কের সময়েই চীন দেশের বিখ্যাত পর্যটক ইউ এন চোয়াঙ (হিউএন্থ সাঙ) ঐ সব অঞ্চলে এসেছিলেন এবং তিনিই এই সব বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। তাম্রলিপ্তি থেকেই তিনি সমুদ্রপথে সিংহলের দিকে রওনা হন। শশাঙ্কের সাম্রাজ্য একদিকে কামরূপ থেকে বারাণসী পর্যন্ত, আর দক্ষিণে গঞ্জাম জেলা (কলিঙ্গের অংশ) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মাঝখানের মগধও



গৌড়ের কাছে আদিনা মসজিদের বেদী

তিনি জয় করে নিয়েছিলেন। তবে তখন বা তার আগের থেকেই পূর্ববঙ্গ ছাড়া বাংলার প্রায় অধিকাংশ জায়গাকেই বলা হ'ত গৌড় দেশ। যদিও গৌড় শহরটি ছিল বর্তমান মালদহের পাশে।

বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়। নানা দেশ থেকে রাজারা এসে এর নানা অংশ দখল করে নেন। এর পর শুরু হয় একটা অন্ধকার যুগ। একশ' বছর কাটলে দেশের লোকেরাই শেষে নিজেদের মধ্যে থেকে একজন উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করে তাঁকে সিংহাসনে বসান। ইনিই পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল। গোপাল ছিলেন বৌদ্ধ।

গোপালের ছেলে ধর্মপাল পাল রাজ্যকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। বাংলাদেশ থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত তিনি জয় করে নেন। এদিকে উত্তরে কেদার থেকে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত চলে তাঁর বিজয়-অভিযান। তাঁর রাণী ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কন্যা রণ্ণাদেবী। ধর্মপালের উপাধি ছিল বিক্রমশীল এবং বিক্রমশীলা বিহারটিও নাকি তাঁরই তৈরি। বিক্রমশীলা বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয় খ্যাতিতে সে যুগে তক্ষশিলা বা নালন্দার চাইতে কম ছিল না।

ধর্মপালের পর তাঁর ছেলে দেবপাল হলেন রাজা। ইনি পাল সাম্রাজ্যকে আরও বড় করে তুললেন। উড়িষ্যা জয় করে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত তাঁর বিজয়বাহিনী এগিয়ে গিয়েছিল। শুধু দেশ জয়ই নয়, ধর্মজয়েও বাঙ্গালী অংশগ্রহণ করল এই পাল যুগেই। রাজা নয়পালের সময়েই বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিত অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তিব্বতের লোকেরা তাঁকে দেবতার মতই ভক্তি করত। এই দীপঙ্করের বাড়ি, যতদূর জানা যায়,—ছিল ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে।

ইতিহাসের একটুকরো

নয়পালের পৌত্র দ্বিতীয় মহীপালের আমলে বাংলাদেশে একটি ঐতিহাসিক বিদ্রোহ ঘটে—যাকে বলা হয় কৈবর্তবিদ্রোহ। কৈবর্তজাতীয় দিব্যোক দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সে রাজ্য খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এর পর উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যেতে পারে সেন বংশের বাংলার সিংহাসন অধিকার। এই বংশের বল্লালসেন সমাজসংস্কার বা সামাজিক পরিবর্তন এবং অন্যান্য কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন, আবার এই বংশের শেষ রাজা বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের সময়েই গৌড় রাজ্য হিন্দু রাজাদের হাত থেকে পাঠান রাজাদের হাতে চলে যায়।

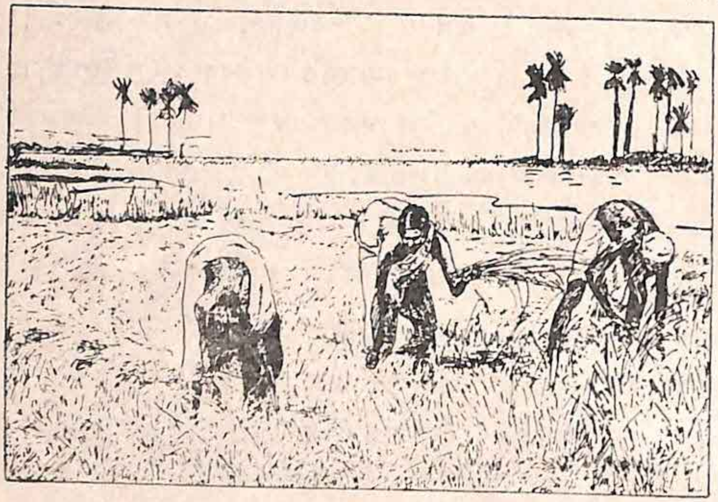
কিন্তু বাংলাদেশের বিস্তৃত ইতিহাস আলোচনার জায়গা এটা নয়, এখানে শুধু প্রাচীন বাংলার একটু পরিচয় দেবার জন্য খানিকটা উল্লেখ করা হ'ল।

বাংলার রাজধানী এর পর আরও অনেকবার স্থানান্তরিত হয়েছে। কখনও জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা), কখনও মুর্শিদাবাদে, এমন কি মীর কাশেমের আমলে মুঙ্গেরেও। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা পুরোপুরি এ দেশ দখল করে রাজধানী বসালেন কলকাতায়। শুধু বাংলার নয়, গোটা ভারতের রাজধানী হ'ল কলকাতা। তার পর ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী উঠিয়ে নেওয়া হ'ল দিল্লীতে, কলকাতা রইল শুধু বাংলার রাজধানী। ভারত বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের (তখন পূর্বপাকিস্তান) রাজধানী চলে গেল ঢাকায়। এখন সেটা বাংলাদেশের রাজধানী।

পশ্চিম বাংলা

ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করে যাবার সময় কি ভাবে দেশটাকে দু'ভাগ করে দিয়ে গেল সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে। খাঁড়াটা পড়ল প্রধানত পাঞ্জাব আর বাংলার ওপর। ১৯০৫ সালে একবার বড়লাট লর্ড কার্জন অন্য মতলব নিয়ে, বাঙ্গালীকে শক্তিহীন করার জন্যই হয়তো, বাংলাকে দু'ভাগ করে ওর খানিকটা আসামের সঙ্গে যুড়ে দিয়েছিলেন, কেননা সে যুগে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরাই প্রথম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বাঙ্গালীরা কিন্তু তখন

সে ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজী হয় নি, শুরু হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলন—যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর অনবদ্য স্বদেশী গানগুলি রচনা করে দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। সেই অমর দেশপ্রেমের গানগুলি আমাদের সাহিত্যে আজও জ্বল্ জ্বল্ করছে। সেই আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ভাঙ্গা বাংলাকে আবার যুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।



বাংলার চাষী মাঠে ধান কাটছে।

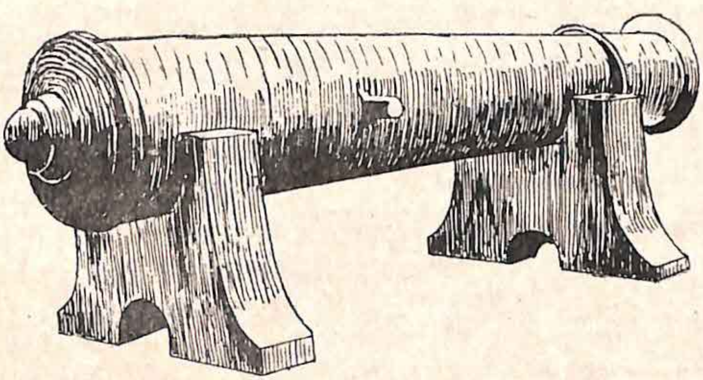
কিন্তু এবার ঘটল উল্টো ব্যাপার। সেই যে সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—"সর্বনাশা সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"—সর্বনাশ বুঝলে পণ্ডিত ব্যক্তি অর্ধেকটা ত্যাগ করেও আত্মরক্ষা করেন, তাই করা হ'ল। গোটা বাংলাকে পাকিস্তানে যেতে না দিয়ে হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবঙ্গকে আলাদা করে নিয়ে ভারতের সঙ্গে আটকে রাখা হ'ল। হিন্দুরা, যাঁরা পূর্ববঙ্গে ছিলেন, তাঁদের অনেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে এলেন, আবার এদিক্ থেকেও পূর্বপাকিস্তানে যাবার হিড়িক উঠল। তবে সেটা বাঙ্গালীদের মধ্যে ততটা নয়, হিড়িকটা উঠল বিহারী মুসলিম-দের মধ্যে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে-চলে-আসা মানুষের তুলনায় তা খুবই কম। কম করে প্রায় এক কোটি হিন্দু চলে এলেন পূর্ব থেকে পশ্চিম বাংলায়। যাঁরা অবস্থাপন্ন তাঁরা কিছুটা গুছিয়ে নিলেও বেশির ভাগ গরীব আগন্তুকরা ছিন্নমূল তরুর মতই ভেসে বেড়াতে লাগলেন। তাঁদের নাম হ'ল 'উদ্বাস্তু' বা 'বাস্তুহারা'। এত লোককে নতুন করে আশ্রয় দেওয়া,—যাকে বলা হয় 'পুনর্বাসন',—খুব সহজ কথা নয়। আজও তা সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। এই সব দুঃখী উদ্বাস্তু এবং পরবর্তী কালে তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখনও এ রাজ্যের এক মস্ত সমস্যা হয়ে রয়েছে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করা হয়েছে ষোলটি জেলায়। এগুলি আবার ভাগ করা হয়েছে তিনটি বড় বড় বিভাগে। এর একটি প্রেসিডেন্সী বিভাগ—চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ আর কলকাতাকে নিয়ে। আর একটিতে আছে বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর আর পুরুলিয়া জেলা। তৃতীয়টির মধ্যে রয়েছে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর মালদহ আর দার্জিলিং জেলা। এ ছাড়া পুরোনো বাংলায় যে সব জেলা ছিল তার সবই এখন চলে গেছে পূর্ববঙ্গে—যার সরকারী নাম "বাংলাদেশ"।

পশ্চিম বাংলা গ্রামপ্রধান হ'লেও এর মধ্যে শহরের সংখ্যা প্রায় ছ'শ'র কাছাকাছি। তার মধ্যে এগারোটি শহরের লোকসংখ্যা লাখেরও ওপরে। অবশ্য সবচেয়ে বড় শহর কলকাতা। ষাট লক্ষেরও বেশি লোক নিয়ে এখনও সে গোটা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর। পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা ১৯৬১ সালে ছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি, দশ বছর পরে তা দাঁড়ায় প্রায় চার কোটিতে। ১৯৮১ সালে সে জনসংখ্যা আরও বেড়ে গেছে। এদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে সামান্য বেশি। পশ্চিমবঙ্গ খুব ঘনবসতিপূর্ণ জায়গা। এর প্রতি এক মাইল লম্বা এক মাইল চওড়া জায়গার মধ্যে গড়পরতা এক হাজারেরও কিছু বেশি লোক বাস করে।

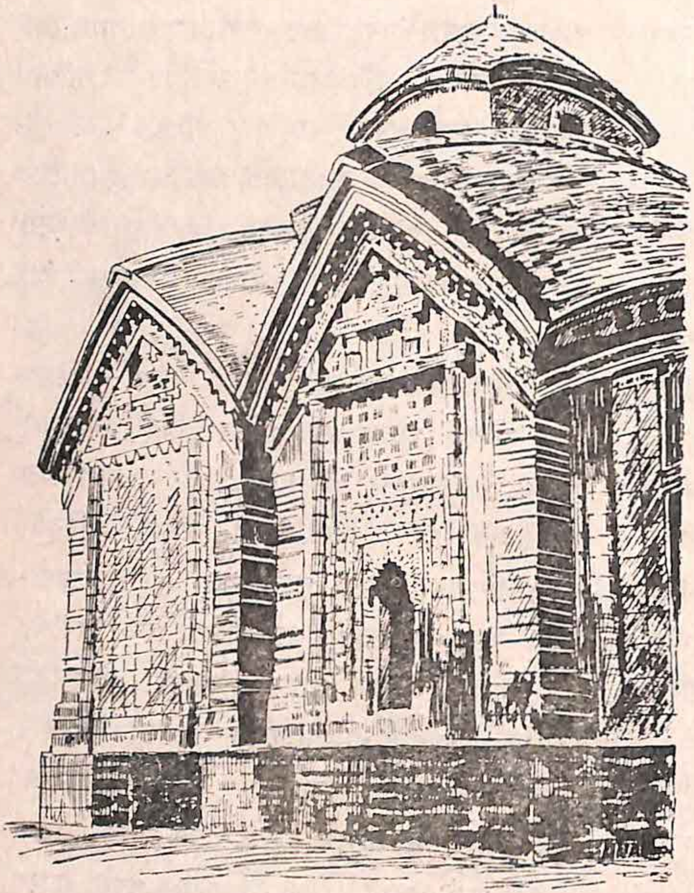
ভৌগোলিক তথ্য

পশ্চিমবঙ্গের মাথার ওপর অর্থাৎ উত্তরে রয়েছে সিকিম আর ভুটান, ঠিক হিমালয়ের ওপরেই এ দু'টি রাজ্য। এর মধ্যে সিকিম কিছু দিন আগে ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে যোগ দিয়েছে। ভুটানও ঠিক পুরোপুরি স্বাধীন রাজ্য নয়, তবে অনেক ব্যাপারেই সে নিজেই নিজের কর্তা। পশ্চিমবঙ্গের পায়ের তলে অর্থাৎ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পূর্বদিকে বাংলাদেশ, আর আসামের খানিকটা। পশ্চিমে বিহার আর উড়িষ্যা রাজ্য। ওপরের দিকে নেপালও রয়েছে গা ঘেঁষে।



দলমাদল বা দলমর্দন কামান, বিষ্ণুপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

পশ্চিমবঙ্গের অনেকখানি অংশ,—বিশেষ করে দক্ষিণে গঙ্গার পূর্ব-পশ্চিম দিক্ সমতল। পশ্চিম দিনাজপুরও ঐ রকম, তবে মালদহের পূর্ব দিক্‌টা বেশ উঁচু। তার মানে এদিক্‌টা দক্ষিণ দিকের চাইতে পুরোনো। এটি বরেন্দ্র-ভূমির মধ্যে পড়েছে। তবে বরেন্দ্র-ভূমির বেশির ভাগ অংশই,—যেমন পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী ইত্যাদি এখন বাংলাদেশের ভাগে। গঙ্গার পশ্চিম দিকে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলাগুলিও অপেক্ষাকৃত উঁচু, ইতস্তত ছড়ানো ছোট ছোট টিলা, পাহাড় খুবই চোখে পড়ে। তবে সত্যিকার পাহাড় দেখতে গেলে আসতে হবে দার্জিলিং জেলায়। একেবারে হিমালয়ের ওপরে। দার্জিলিং শহরটাই তো সমুদ্র থেকে সাত হাজার ফুটেরও বেশি উঁচুতে, একেবারে মেঘের রাজ্যে বসানো। আসলে এ জায়গাটা এক সময়ে নেপালের মধ্যেই ছিল, পরে ইংরেজদের হাতে আসে। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষাও নেপালী। ওর নীচেই বিখ্যাত তরাই জঙ্গল,—নানা রকম ভয়াবহ জন্তুর আড্ডা। দল বেঁধে ঘোরে বুনো হাতির



পাশাপাশি যোড়া দু'টি বাংলা আকারে তৈরি বিখ্যাত জোড়া-বাংলা মন্দির, বিষ্ণুপুর

পাল। চিতা, বাইসন, ভালুক—কী নেই ?

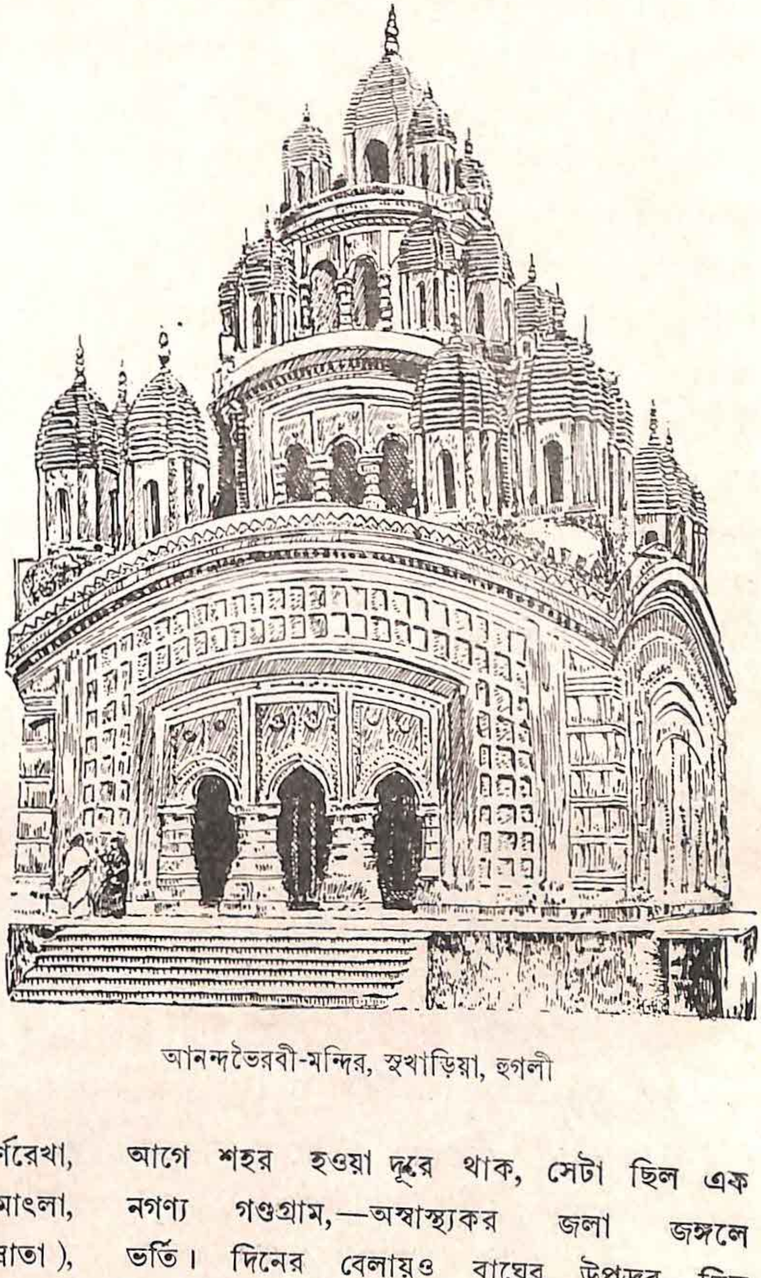
পশ্চিম বাংলার নামকরা জঙ্গল অবশ্য সুন্দরবন, যদিও সুন্দরবনেরও অনেকখানি অংশ পড়েছে বাংলাদেশের ভাগে। গভীর অরণ্য বলতে যা বোঝায় সুন্দরবন তাই। এখানকার অতিকায় ডোরাকাটা বাঘ—রয়াল বেঙ্গল টাইগার পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জন্তুগুলির অন্যতম। শুধু বাঘ কেন, অতিকায় কুমীর, অজগর প্রভৃতি ভয়াবহ জন্তুদেরও বাস এখানে। তা ছাড়া আছে নানা জাতের হরিণ, বুনো শূয়োর, বানর, নানা জাতের পাখি, আরও কত কি! এক সময়ে নাকি কিছু সিংহও ছিল, কিন্তু ঐ রয়াল টাইগারের হাতেই তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হয়েছে। গাছের মধ্যে সুন্দরী বা সুঁদরি গাছের সংখ্যা খুব বেশি। অনেকের ধারণা, ঐ জন্যই বনটির নাম হয়েছে সুন্দরবন। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অসংখ্য নদী-নালা বয়ে চলেছে—লক্ষ্য সমুদ্রের দিকে। জঙ্গলে প্রচুর মধু এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ্ থাকায় ঐ সব ব্যবসায়ীদের কাছে জায়গাটি লোভনীয়। মাছের জন্য যায় জেলেরা। কিন্তু বিপদ্‌ও কম নেই। মাঝ-নদীতে নৌকো নোঙর করে শুয়ে থাকলেও মানুষখেকো বাঘ সাঁতরে এসে নৌকো থেকে মানুষ টেনে নিয়ে যায়। কুমীর এসে ঠ্যাং কেটে নেয়।

দক্ষিণ দিক্‌টা, যাকে বলা হয় নিম্নবঙ্গ,—সবটাই এই সুন্দরবনের মধ্যে পড়ে। এক সময় কলকাতা শহরটাও তো এর মধ্যেই ছিল! বেশি দিনের কথা নয়, ইংরেজরা আসবার অল্প আগেও। গঙ্গা নদী এই সুন্দরবনের কাছে এসে সমুদ্রে মিশেছে।

সাগর আর গঙ্গার মিলনস্থলকে বলা হয় গঙ্গাসাগর বা সাগর-সঙ্গম, আর সেইখানটার দ্বীপাকৃতি অংশকে বলা হয় সাগরদ্বীপ। মহাভারতে যে গল্প আছে, কপিল মুনির শাপে তাঁর চোখের আগুনে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল—সে নাকি এখানেই

ঘটেছিল। কপিল মুনির একটি মন্দিরও আছে এখানে। প্রতি বছর মাঘ মাসের শেষে, মকরসংক্রান্তির দিনে এখানে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী এসে জড় হন ভারতের নানা প্রান্ত থেকে—ঐ দিনে সাগরসঙ্গমে স্নান করলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হবে এই বিশ্বাসে।

পূর্ব বাংলার মত অতটা না হলেও পশ্চিম বাংলাও নদীমাতৃক দেশ। গঙ্গা তো এরই ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। পশ্চিম বাংলার পশ্চিমে পৌঁছবার পরেই সে গঙ্গা ভাগ হয়ে গেছে পদ্মা আর ভাগীরথী দুই নাম নিয়ে। হুগলীর কাছাকাছি থেকে ভাগীরথীর নাম হয়ে গেছে হুগলী নদী। নামটা অবশ্য বিদেশী বণিক্‌দের দেওয়া। আমরা গঙ্গা বলেই ওকে জানি ও সেই নামেই বলি।



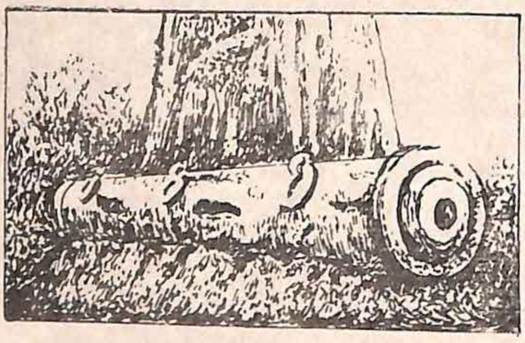
আনন্দভৈরবী-মন্দির, সুখাড়িয়া, হুগলী

গঙ্গা ছাড়া আরও অনেক নদী এখানে। এগুলির কোন কোনটা গঙ্গার শাখা, কোন কোনটা গঙ্গার উপনদী। কোন কোনটা তাও নয়। এদের মধ্যে দামোদর, অজয়, সুবর্ণরেখা, কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী, জলাঙ্গী, ইছামতী, মাৎলা, রূপনারায়ণ, মহানন্দা, তিস্তা (ত্রিস্রোতা), তোরসা, আত্রেয়ী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

কলকাতার কথা

আজ যে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে বড় শহর এবং সারা এশিয়ায় টোকিওর পরই দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী বলে পরিচিত, মাত্র তিনশ' বছর আগে শহর হওয়া দূরে থাক, সেটা ছিল এক নগণ্য গণ্ডগ্রাম,—অস্বাস্থ্যকর জলা জঙ্গলে ভর্তি। দিনের বেলায়ও বাঘের উপদ্রব ছিল সেখানে। পুরোনো পরিচয়ের মধ্যে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল (১৪৯৫ খৃঃ), টোডর মলের আইন-ই-আকবরী (১৬শ শতাব্দী) এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দ-রাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলে (১৬শ শতাব্দী) এর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কলকাতা শহরকে গড়ে তুলেছে ইংরেজরা। ১৭শ শতাব্দীর

মাঝামাঝি বাংলার শাসনকর্তা শাহ্ সুজার কাছ থেকে বাণিজ্য করার অনুমতি নিয়ে ইংরেজদের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলীতে একটা কুঠি তৈরি করে—যেমন করেছিল পর্তুগীজ আর ওলন্দাজরা। কিন্তু হুগলীর ফৌজদারদের সঙ্গে ঝগড়া বাধলে ওদের এজেন্ট জব চার্নক পালিয়ে এসে দক্ষিণে সূতানুটি গ্রামে গা-ঢাকা দেন। বাণিজ্যকুঠি হিসেবে সূতানুটিকেই কিন্তু তাঁর হুগলীর চাইতে বেশি সুবিধাজনক মনে হ'ল। এর পর তিনি হুগলীতে ফিরে যান বটে কিন্তু হুগলীর মোগল কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর তেমন বনিবনাও হচ্ছিল না। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে তাই তিনি সূতানুটিতে এসে পাকাপাকি

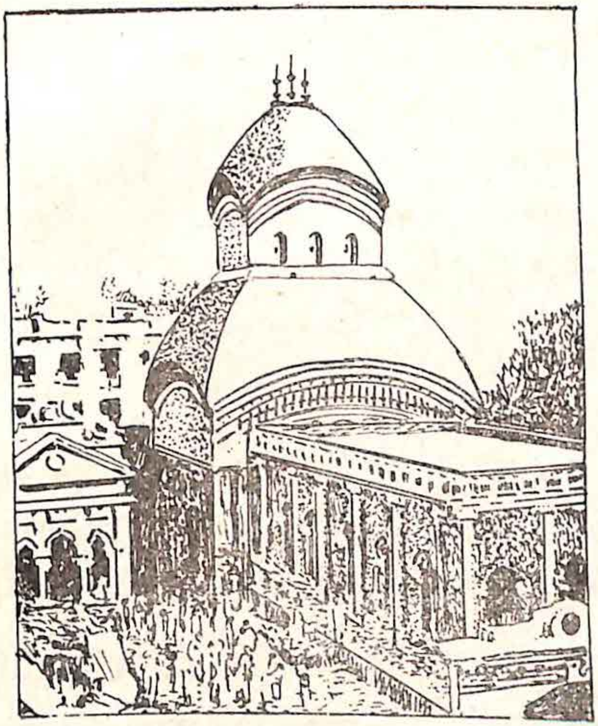


জাহানকোষা কামান, মুর্শিদাবাদ

থাকবার ব্যবস্থা করলেন। ঐখানেই বসানো হ'ল কোম্পানীর নতুন বাণিজ্যকুঠি। এখন যেখানে বাগবাজার খাল আছে সেখান থেকে শুরু করে নিমতলা পর্যন্ত জায়গাটাকেই তখন বলা হ'ত সূতানুটি। তার পাশে নিমতলা থেকে চাঁদপাল ঘাট পর্যন্ত অংশটা ছিল আর একটা গ্রাম কলকাতা, আর তারও দক্ষিণে আদি-গঙ্গা পর্যন্ত জায়গাটার নাম ছিল গোবিন্দপুর। জব চার্নক ঔরংজীবের পৌত্র আজিম উস্-শানের কাছে ১৬,০০০ টাকা নজর দিয়ে ঐ তিনটি গ্রাম কিনবার অনুমতি পান এবং মাত্র ১৩০০ টাকায় ঐ তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনে নেন। তিনটি গ্রাম নিয়ে জমিদারী হ'লেও তখন থেকেই সমস্ত জায়গাটিকেই কলকাতা (কলিকাতা) বলে পরিচয় দেওয়া শুরু হ'ল। ক্রমে আর দু'টি গ্রামের নাম আর কেউ উল্লেখ করত না।

সেই কলকাতাই ক্রমে দেখতে দেখতে অতিকায় শহর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবাবী আমলেই আত্মরক্ষার জন্য ওখানে কোম্পানী একটি দুর্গ তৈরির অনুমতি পান। সে দুর্গটি অবশ্য ছিল এখন যেখানে রাইটার্স বিল্ডিংস্ তারই প্রায় পাশে। একবার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানীর ঝগড়া বাধায় নবাব ঐ দুর্গটি দখল করে নেন—প্রায় বিনা যুদ্ধেই। কোম্পানীর ইংরেজরা ফলতায় পালিয়ে গিয়ে সেখানে একটা ছোট মতন দুর্গ তৈরি করে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু পরের বছরই নবাবের সঙ্গে একটা সন্ধি হয়ে যায়, নবাব কলকাতা ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। ইংরেজরা তখন পুরোনো দুর্গ ছেড়ে গড়ের মাঠের আরও সুরক্ষিত নতুন দুর্গটি তৈরি করেন আর ইংল্যাণ্ডের সে সময়কার রাজা ৪র্থ উইলিয়ামের নাম অনুযায়ী দুর্গের নাম দেন ফোর্ট উইলিয়াম্। সেই নাম এখনও চলে আসছে।

জব চার্নক ১৬৯২ খৃষ্টাব্দেই মারা যান। তার আগে তিনি একটি তরুণী হিন্দু বিধবাকে সতী-দাহ থেকে উদ্ধার করে নিজে বিয়ে করেছিলেন। জব চার্নক আর তাঁর সেই বাঙ্গালী স্ত্রীর সমাধি-



কালীমন্দির, কালীঘাট

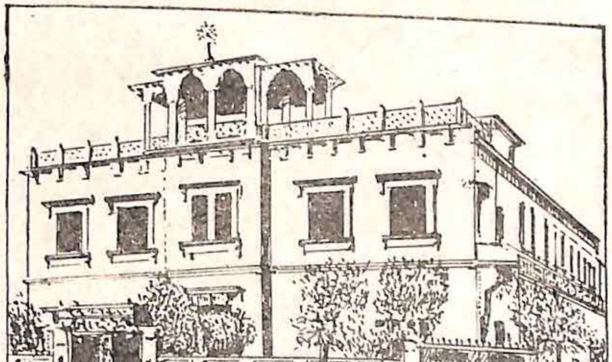
সৌধ এখনও কলকাতার সেণ্ট জন্ গীর্জার ভিতর (চার্চ লেনের পাশে) দেখা যায়। এটাই কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো স্মৃতি-সৌধ।

তারপর পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটল। বাংলার কর্তৃত্ব ধরতে গেলে ইংরেজদের হাতেই চলে এল। প্রথমে তাঁরা বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে নবাব সাজিয়ে নিজেরা ভিতর থেকে যা কিছু কলকাঠি নাড়তেন। শেষে মীরজাফরকে সরিয়ে তাঁর জামাই মীর কাশেমকে ঐ পদ দেওয়া হ'ল। মীরকাশেম মুঙ্গেরে রাজধানী সরিয়ে নিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হ'ল। ফলে মীর কাশেমেরও ঘটল পতন এবং ইংরেজ কোম্পানীর নামে পুরোপুরি দেশের রাজা হয়ে বসল।

তারপর ধীরে ধীরে কলকাতা কি করে গড়ে উঠল সে ইতিহাস তো সকলকারই মোটামুটি জানা।

কলকাতায় দেখবার কি কি আছে

নতুন শহর কলকাতায় পুরোনো ঐতিহাসিক কিছু খুঁজতে গেলে ভুল করা হবে,—এক কলকাতার উপকণ্ঠে মহাতীর্থ কালীঘাট ছাড়া। কালীঘাটের আদি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায়। কিন্তু এখনকার মন্দিরটি অত পুরোনো নয়। এটি ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বরিষার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় তৈরি করিয়েছিলেন। কালীঘাট হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ। পুরাণের মতে দক্ষযজ্ঞের পর সতীর মৃত্যু ঘটলে, মহাদেব যখন পাগলের মত সতীদেহ কাঁধে করে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁকে থামাবার জন্য বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর দেহ একান্নটি ভাগে ছিন্নভিন্ন করে দেন। যে যে জায়গায় ঐ ছিন্ন অংশগুলি পড়ে সে সে জায়গাগুলি মহাতীর্থ



বসু বিজ্ঞান-মন্দির, কলকাতা

বলে পরিচিত হয়। তাদেরকে বলা হয় একান্ন পীঠস্থান। কালীঘাটে নাকি সতীর পায়ের কড়ে আঙ্গুল পড়েছিল, তাই কালীঘাটও হ'ল মহাতীর্থ। এখানকার সুবিশাল কালীপ্রতিমাকে অত্যন্ত জাগ্রত দেবী বলে মনে করা হয়। এমন কি প্রথম যুগে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও, এখানে ষোড়শোপচারে পূজো দিয়েছেন।

অন্যান্য ধর্মীয় স্থানের মধ্যে কলকাতার অনতিদূরে বেলুড় মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির,



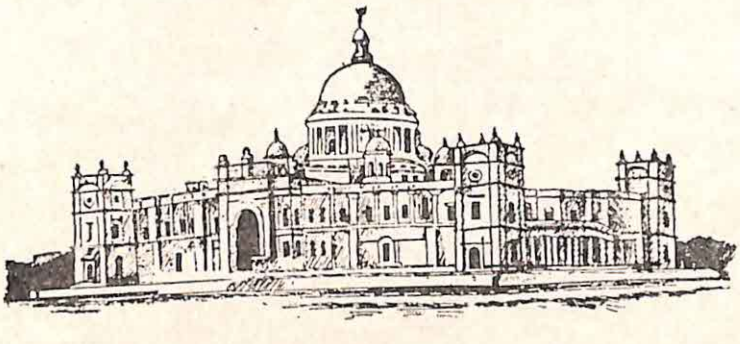
বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

রামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির, খৃষ্টানদের সেণ্ট পল্‌স্‌ গীর্জা, মুসলমানদের নাখোদা মসজিদ, জৈনদের পরেশনাথ-মন্দির, কালীঘাটে শিখ গুরুদ্বার, বালীগঞ্জে জাপানীদের বুদ্ধ-মন্দির উল্লেখযোগ্য। কলকাতার সুবিশাল ময়দান—যা গড়ের মাঠ বলে পরিচিত,—তাও একটা দেখবার জিনিস। ঐ মাঠের একধারেই আছে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, বিড়লা তারামণ্ডল (প্লানেটেরিয়াম্) ইত্যাদি। কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম বা যাদুঘর ভারতের একটি বিখ্যাত সংগ্রহশালা। আলিপুরের চিড়িয়াখানাও তেমনি বহু জীবন্ত দুষ্প্রাপ্য জানোয়ারের সংগ্রহশালা। আবার শিবপুরের গঙ্গাতীরে উদ্ভিদ্-উদ্যান বা বোটানিক্যাল গার্ডেনও বহু দুষ্প্রাপ্য গাছের সংগ্রহশালা। এখানে একটি অতিকায় বটগাছ আছে যা নাকি ২০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। তেমনি গঙ্গার কাছে ইডেন গার্ডেন, ঢাকুরিয়ার রবীন্দ্র-সরোবর, সল্ট লেকের বিধান শিশু-উদ্যান ইত্যাদিও রমণীয় ভ্রমণস্থান।

বড় বড় অট্টালিকার মধ্যে নাম করতে হয় রাজভবনের, যা এক সময়ে প্রথমে ইংরেজ বড়লাটের এবং পরে লাট সাহেবের বাসভবন ছিল। এখন সেখানে থাকেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। তারই অদূরে রয়েছে লালদীঘি (বর্তমান নাম বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ)—যাকে আগে বলা হ'ত ডালহৌসী স্কোয়ার। তার পরেই রাইটার্স বিল্ডিংস বা সরকারী প্রশাসন-ভবন। নতুন সেক্রেটারিয়েট, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, হাইকোর্ট, আকাশবাণী ভবন ইত্যাদিও কাছাকাছি দেখা যাবে। লোকে বলে আপিস-পাড়া। সম্প্রতি কলকাতায় আকাশছোঁয়া বাড়িও তৈরি হচ্ছে অগুণ্‌তি। দশতলা, বারো-তলা, কুড়িতলা কিংবা আরও উঁচু উঁচু সব বাড়ি!

গড়ের মাঠের শহীদ মিনার ১৫২ ফুট উঁচু স্তম্ভ—যার চূড়ায় উঠবার জন্য ভিতরে সিঁড়ি আছে। আসলে এটি ছিল নেপালযুদ্ধ-জয়ী স্যার ডেভিড অক্টোরলনির স্মৃতিস্তম্ভ। ইংরেজ আমলের লেফটেনাণ্ট গভর্নর বা ছোটলাট

(পরে ভাইস্রয়ের) বাড়িটি (বেলভেডিয়ার প্যালেস) এখন ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিরাট এই গ্রন্থাগার এখনও কলকাতার বিদ্বান্ ব্যক্তিদের একটি তীর্থস্থান। আগে এটির নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, তখন এটি ছিল এস্প্লানেডের উত্তরে একটি অট্টালিকায়। এখানেই এক সময়ে গ্রন্থাগারিক ছিলেন হরিনাথ দে—৩০টি ভাষায় বিশেষজ্ঞ বলে যাঁর খ্যাতি ছিল।



ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, কলকাতা

কলকাতাকে সংস্কৃতি ও শিক্ষার একটি পীঠস্থান বললেও ভুল হবে না। তিন তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে এই শহরে। সবচেয়ে পুরোনো এবং ভারতের মধ্যে সম্ভবত সর্ববৃহৎ হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—এক সময়ে যার এলাকা ছিল সুদূর লাহোর থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত। ভারতের বহু মনীষী এখান থেকে বেরিয়েছেন। একাধিক জায়গায় পৃথক্ পৃথক্ অট্টালিকায় এটি প্রতিষ্ঠিত। মূল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ স্ট্রীটের ওপর গোলদীঘির পাশে। তবে সেই বিখ্যাত সেনেট হল্ এখন আর নেই, সেটি ভেঙ্গে একটি বহুতল প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। তার পাশে দ্বারভাঙ্গা-গৃহ ও আশুতোষ-গৃহ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের

কতকগুলি বিভাগ উত্তর কলকাতায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডে, কতক দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে। এ ছাড়া এদিক্ ওদিক্ ছড়িয়ে আছে এর আরও নানা বিভাগ।

যাদবপুরের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকখানি জায়গা জুড়ে একই এলাকায় (ক্যাম্পাস্) বসানো হয়েছে। তার পাশেই আছে কাল্টি-ভেশন অব্ সায়ান্স গবেষণা-কেন্দ্র, সিরেমিক্স্ ইন্স্টিটিউট, বায়োকেমিক্যাল গবেষণাগার, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণাগার ইত্যাদি।

কবি রবীন্দ্রনাথের ভবনের পাশে আছে আর একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় রবীন্দ্রভারতী। সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় ইত্যাদির সঙ্গে সাধারণ বিষয়গুলিও পড়ানো হয় এখানে। সম্প্রতি এর কিছু কিছু অংশ বরাহনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অসংখ্য নামী কলেজ, স্কুল কলকাতার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এখানকার বসু বিজ্ঞান-মন্দির, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউট, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদেও চলছে নানান্ কাজ, নানান্ গবেষণা। একবার এক বিদেশী পণ্ডিত ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান দেখে সবশেষে কলকাতায় এসে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এই জায়গায়ই আমার আসা উচিত ছিল সকলের আগে। সংস্কৃতির এমন চর্চা আমি ভারতের আর কোন শহরে দেখি নি।

জওহর শিশু-ভবন, শিশুদের বিধান-উদ্যান, অবনমহল প্রভৃতি জায়গায় ছোটদের শিক্ষা ও

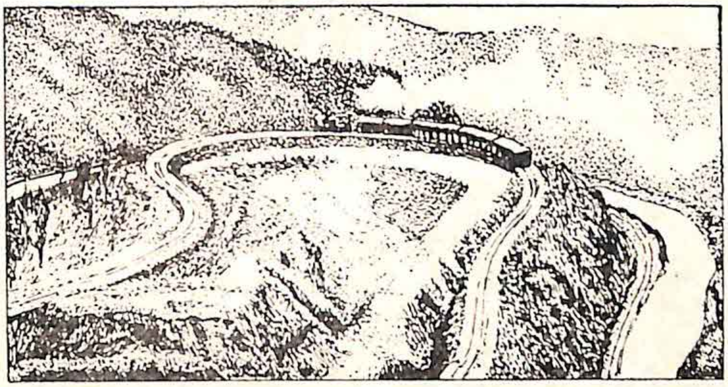
আনন্দের ব্যবস্থা হয়েছে। এমন কি যাঁরা শিশুসাহিত্য রচনা করেন তাঁদেরও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শিশুসাহিত্য পরিষদ্ নামে। অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্ট্স্, রবীন্দ্রসদন, বিড়লা বিজ্ঞানসংগ্রহশালা ইত্যাদি অনেক কিছুর নাম করা যেতে পারে। এ ছাড়া কলকাতায় কত মনীষী জন্মগ্রহণ করে গেছেন, তাঁদের জন্মস্থান, বাসগৃহ, কর্মস্থান এবং স্মৃতিস্তম্ভ বা প্রতিমূর্তি ছড়িয়ে রয়েছে সারা শহরে।

কলকাতার বাইরে

অনেকের ধারণা, পশ্চিম বাংলায় দেখবার তেমন কিছু নেই। এ ধারণাটিও একেবারেই ভুল। আসল কথা, যে দেখছে তার মানসিক অনুভূতির ওপর নির্ভর করে কোন্‌টা দেখবার জিনিস, কোন্‌টা নয়। মনে পড়ে একবার গোরখপুর থেকে লুম্বিনী (নেপাল রাজ্যে) দেখতে যাচ্ছিলাম। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী, আজও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে রাজা অশোকের লিপি-খোদাই-করা একটি অশোকস্তম্ভ। গোরখপুরের স্থানীয় লোকেরা বাধা দিয়ে বলল, কিচ্ছু দেখবার নেই। ওখানে আছে শুধু কিছু ভাঙ্গা পাথরের ঘরবাড়ি আর একটা থাম। ঐ দেখতে এত কষ্ট করবেন! শুনে অবাক্ লেগেছিল, হাসিও পেয়েছিল। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ তথাগত প্রথম পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করেছিলেন সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়াতে পারলে মনে যে আশ্চর্য অনুভূতি জাগে তা ঐ সব মূর্খ সুখী ব্যক্তিদের কি করে বোঝাব? পশ্চিম বাংলাকেও সেই চোখ নিয়েই দেখতে হবে। তবু দেখবার জিনিসও কি কম আছে? কয়েকটির নাম মাত্র এখানে উল্লেখ করলেই হবে।

মালদহের কাছে আছে বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষ। ফিরোজ মিনার, দাখিল দরওয়াজা, আদিনা মসজিদের দিকে তাকালে এখনও স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছিল মল্লরাজাদের রাজধানী। সেখানকার যোড়া-বাংলা-মন্দিরের অপূর্ব পোড়ামাটির কাজ, রাস-মঞ্চ, মদনমোহন-মন্দির, লালবাঈ-এর বাঁধ (যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক আশ্চর্য কাহিনী), ভাঙ্গা দুর্গ এবং দলমাদল বা দল-মর্দন নামের বিরাট কামান,—যা দিয়ে একদিন বর্গীদের হাত থেকে রাজধানী রক্ষা করা হয়েছিল,—আজও দেখলে অবাক্ লাগে। গল্প আছে, শহর রক্ষার জন্য মদনমোহন-মন্দির থেকে স্বয়ং মদনমোহন এসে এই কামান ছুঁড়ে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। গল্প হয়তো গল্পই, কিন্তু ইতিহাসের দিক্ থেকেও ওর মূল্য কম নয়। অমনিধারা আর একটি কামান দেখতে পাওয়া যাবে মুর্শিদাবাদের নবাববাড়ির সামনে—জাহান-কোষা। বিরাট কামান। সে যুগের হিন্দু কর্মকারের হাতে তৈরি। গায়ে আজও কারিগরের নাম খোদাই করা আছে—জনার্দন কর্মকার। মুর্শিদাবাদে গেলে নবাববাড়ি ও নবাবী আমলের বহু স্মৃতিচিহ্নও চোখে পড়বে।

এ ছাড়া ছোট-বড় দেউল, মন্দির, মসজিদ তো অফুরন্ত! ছড়িয়ে আছে সারা রাজ্য যুড়ে। হুগলী জেলার সুখাড়িয়ার আনন্দভৈরবী মন্দির, সেখানকার মন্দিরের ছাদে সূক্ষ্ম



দার্জিলিংএর পথে ঃ পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে আঁকাবাঁকা, পাক-খাওয়া রেল লাইন।

পশ্চিম বাংলার সম্পদ্

কিন্তু শুধু চোখের আনন্দই সব নয়, পশ্চিম বাংলার সম্পদ্ও নেহাৎ তাচ্ছিল্যের নয়। বর্ধমান ছাড়ালেই চোখে পড়বে একটির পর একটি কয়লা-খানি। ডুয়ার্স বা দার্জিলিংএর চায়ের আদর সারা পৃথিবীতে। তেমনি আদর পশ্চিম বাংলার পাটশিল্পের, রেশমের। গড়ে উঠছে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন নতুন কলকারখানা। দুর্গাপুরে তৈরি হচ্ছে ইস্পাত, সিন্দরীতে রাসায়নিক সার। কলকাতার আশেপাশে রয়েছে কাপড়ের কল, কাগজের কল, নানা রাসায়নিক দ্রব্য, পলিথিন, টেরিলিন, বনস্পতি, ওষুধবিষুধ, মায় মোটর গাড়ি তৈরির কারখানা। কুটীরশিল্পের দিক্ দিয়েও এ রাজ্য কম যায় না। খাগড়ার, বিষ্ণুপুরের কাঁসার বাসন, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের শিল্প, ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল। ফর্দ দিতে গেলে পাতার পর পাতা ভরে যাবে।

কিন্তু শুধু এই সবই নয়, সম্পদ্ বলতে এখানকার লোকসংস্কৃতির কথাও বলতে হয়। কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, কবিগান, শ্যামা-সঙ্গীত, টুসু, ভাদু, কথকতা, গাজনের সং, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ, বীরভূমের রায়বেঁশে নাচ, ঝুমুর নাচ, শ্রীপঞ্চমী, দীপালী, দোল, জন্মাষ্টমী, নবান্ন, বুদ্ধপূর্ণিমা, রাখীবন্ধন, ইদ, মহরম, বড়দিন, গুডফ্রাইডে—এ সবের নামও করতে হয়। আর সবার ওপর এ রাজ্যের দুর্গোৎসব—সারা ভারতে যার সমকক্ষ উৎসব কমই আছে।

পোড়া ইটের (টেরাকোটা) কাজ, কাঁচড়াপাড়ার বিরাট রাধাকৃষ্ণ মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির, শান্তিনিকেতন, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মায়াপুর, ফুলিয়া—কত জায়গায় কত কি যে ছড়িয়ে আছে কে তার হিসেব দেবে?

প্রাকৃতিক দৃশ্যই কি কম? রেলগাড়িতে চড়ে দার্জিলিংএ যাবার আঁকাবাঁকা, পাক-খাওয়া লুপ লাইন, দু'পাশের শ্যাম অরণ্যানী, মেঘের ওপরে উঠে পায়ের নীচে বৃষ্টি ঝরতে দেখা, ভোরের প্রথম-আলোয়-রাঙ্গা কাঞ্চনজঙ্ঘা, এভারেস্ট—সে দৃশ্যের তুলনা হয় না। কালিম্পং যাবার পথে স্ক্রুর মত ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠবার সময় পাশে খরস্রোতা তিস্তাকে যখন জল-প্রপাতের মত বয়ে যেতে দেখা যায় তখন মনে হয় কোথায় লাগে এর কাছে ভূস্বর্গ? দীঘার ঝাউকুঞ্জের আড়ালে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ঢেউ যেমন ভালো লাগে তেমনি ভালো লাগে সুদূরবিস্তৃত সবুজ ধানক্ষেত। কবির ভাষায়ঃ

"অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধুলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়
ছোট ছোট গ্রামগুলি।"



বিশ্বসাহিত্যের কথা

ভারতের কয়েকজন সাধক কবি

মধ্যযুগে আমাদের দেশে কয়েকজন সাধক কবি জন্মেছিলেন। তাঁরা জপতপ, পূজা-অর্চনা নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে তাঁরা উপদেশ দিতেন মুখে মুখে কবিতা রচনা করে। ভগবানের মাহাত্ম্য তাঁরা কীর্তন করতেন গান গেয়ে। সে গান তাঁদেরই রচনা।

এঁদের মধ্যে প্রথমে কবীরের কথাই বলি।

বারাণসীর কাছে লাগক গ্রামের নীরু জোলা একদিন গাঁয়ের লহর তালাও নামে এক পুকুরপাড়ে এক শিশুকে কুড়িয়ে পান। নীরু ছেলেটিকে মানুষ করেন। নাম রাখেন কবীর।

জোলা কাপড় বুনতেন। কবীরও কাপড় বুনতে শিখলেন। দিনে দু'খানি করে কাপড় বুনতেন। একটি কাপড় বেচে যা লাভ হ'ত নিজের জন্য খরচ করতেন, আর একটির লাভের টাকা ভিখারীদের দান করতেন।

দক্ষিণ ভারতের মহাপণ্ডিত রামানুজ; তাঁর প্রধান শিষ্য রামানন্দ স্বামী এসেছিলেন কাশীতে। তাঁর মুখে ধর্মকথা শুনে কবীর তাঁর শিষ্য হ'তে চাইলেন। রামানন্দ বললেন,—আমি ব্রাহ্মণ ছাড়া কাউকে শিষ্য করি না।

কবীর কিন্তু দমলেন না, শেষ রাতে শুয়ে রইলেন গঙ্গার ঘাটে। রামানন্দ ব্রাহ্মমুহূর্তে স্নান করতে এসে অন্ধকারে কবীরের দেহে হোঁচট খেলেন; বলে উঠলেন,—রাম কহ! রাম কহ!

কবির রামানন্দের পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন,—এই আমার দীক্ষা হয়ে গেল।

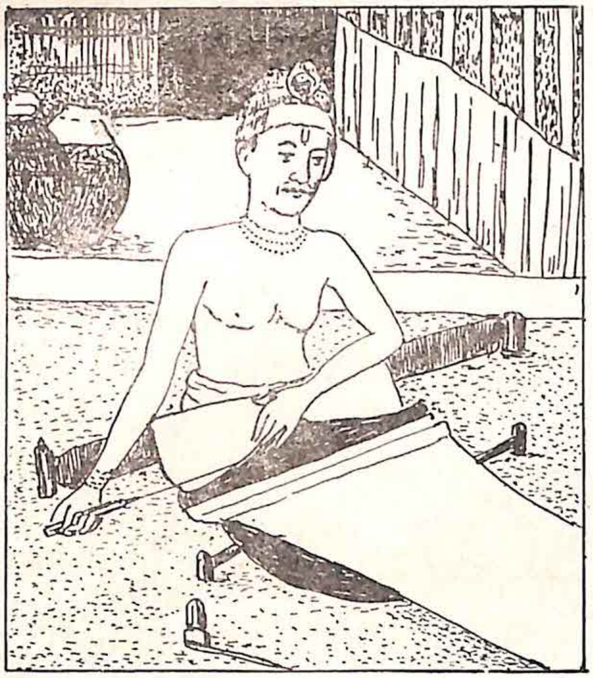
সেই থেকে শুরু হ'ল সাধনভজন।

মুসলমান জোলার ছেলে রাম নাম জপবে এটা হিন্দুদের ভালো লাগল না, মুসলমানদেরও না। তারা বাদশাহ্ সেকন্দর লোদীর কাছে নালিশ করল।

রাজপুরুষেরা কবীরকে ধরে নিয়ে গেল। সম্রাট্ হুকুম দিলেন,—একে হাতির পায়ের নীচে ফেলে দাও।

হাতির পায়ের তলায় কবীরকে ফেলে দেওয়া হ'ল। হাতি কিন্তু কিছুই করল না। সম্রাট্ অবাক্ হলেন, বললেন,—তুমি মুসলমান হয়ে হিন্দুধর্ম প্রচার কর কেন?

কবীর বললেন,—সাধুর কাছে ধর্ম বা সম্প্রদায় বলে কিছু নেই। ভগবানের চিন্তাই তার কাছে সব।



কবীর

বাদশাহ্ কবীরকে ছেড়ে দিলেন।

কবীর লুই নামে একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে ছিল—কামাল ও কামালা।

কবীরের বহু শিষ্য হয়েছিল। গোরক্ষপুরের কাছে কবীর দেহরক্ষা করেন। গল্প আছে, হিন্দু শিষ্যরা বলে,—শব দাহ করা হোক, মুসলমান শিষ্যরা বলে,—শব কবর দেওয়া হোক। গোলযোগ বাধে। ইতিমধ্যে চাদর তুলে দেখা যায় শব নেই, পড়ে আছে একরাশ ফুল। সেই ফুল নিয়ে অর্ধেক দাহ করা হয়, আর অর্ধেক নিয়ে দেওয়া হয় কবর। আজও গোরখপুরের কাছে মগহর গ্রামে একই দেয়ালের ভিতর পাশাপাশি কবীরের চিতাভস্মের ওপর হিন্দু সমাধিমন্দির (মঠ) এবং তাঁর কবরের ওপর মুসলিম সমাধিমন্দির (মসজিদ) দাঁড়িয়ে আছে।

কবীর ধর্মকথা প্রচার করতেন কবিতায়। সেই কবিতার সঞ্চয়ন আছে একখানি বইয়ে—নাম 'বীজক'।

কবীরের জন্মমৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না। তবে সম্ভবত তিনি ১৫০৫ সালে দেহরক্ষা করেন।

কবীরের একটি উপদেশ ঃ

"সাঁচ বরোবর তপ নহিঁ, ঝুট বরোবর পাপ।
যাকে ভিতর সাঁচ হৈ, তাকে ভিতর আপ॥"

অর্থাৎ সত্যের মত পুণ্য আর মিথ্যার মত পাপ নেই। যিনি সত্যকে অবলম্বন করে থাকেন তাঁর অন্তরে স্বয়ং ভগবান্ বাস করেন।

দাদূ

আকবর বাদশাহের কানে খবর গেল এক সাধক গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানে নামকীর্তন করে ঘুরছেন। মানুষটিকে দেখবার জন্য বাদশা'র কৌতূহল হ'ল, তিনি লোক পাঠালেন সাধুর কাছে। সাধু কিন্তু এলেন না। বললেন,—বাদশা'র সঙ্গে আমার দরকার কি?

—বাদশাহ্ আপনার কাছে সাধন-ভজনের কথা শুনতে চান।

—দিল্লী তো মস্ত শহর, মিথ্যার আড়ম্বরে ভরা। বাদশা'র চারপাশে যত ভদ্রবেশী লুণ্ঠক ও ডাকাতেরা মিথ্যার জাল বুনছে। সেখানে সাধন-ভজনের কথায় কি হবে?

আকবর তখন ফতেপুর সিক্রীতে সাধকের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। পর পর চল্লিশ দিন ধরে সাধকের সঙ্গে বাদশা'র ধর্মকথা

হ'ল। কথায় কথায় সাধক বলেন দোঁহা, তু'পংক্তি-চারপংক্তির কবিতা, কখনও বা রচনা করেন ভজন। মানুষটি লেখাপড়া জানেন না, কিন্তু ভাষা ও ছন্দের অমিল হয় না।

সাধক কবি বাদশা'কে সোজা কথায় বললেন—

"বাদশাহ্ মরতী সময়, সব ঠাড়ে কিয় লায়।
বৈদ শূর ধন লোগ কুল, সবহি দেখতে জায়॥"

অর্থাৎ বাদশাহ্ যখন মরেন তখন যত বৈদ্য, যত সৈন্য, যত সম্পদ্, যত লোকজনই সামনে থাকুক না কেন, সবই দেখতে দেখতে সম্রাট্‌কে চলে যেতে হয়। মৃত্যুর শাসনের কাছে সবই ব্যর্থ হয়ে যায়।

সাধনভজনের পথ সম্পর্কে সাধক কবি বাদশাহ্‌কে বললেন—

"হিংতু মারগ কহেঁ হমারা, তুরুক কহেঁ মেরী।
কহঁ পংথ হৈ কাহো অলেখ কা তুম তো
ঐসী হেরী॥
দাদূ তুহুঁ্য ভরম হৈ হিংতু তুরুক গঁবার।
জে তুহুঁর থৈঁ রহিত হৈঁ সো গহি
তত্ব বিচার॥
খংড খংড করি ব্রহ্ম ঝোঁ পখি পখি লিয়া
বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম ত্যজি বংধে ভরম কী গাঁঠি॥"

অর্থাৎ হিন্দু বলে আমার ধর্মই পথ, মুসলমান বলে আমার ধর্মই রাস্তা। কিন্তু বল তো, ভগবানের পথ আছে কোথায়, তুমি তো এমনই দেখছ! হে দাদূ, হিন্দু মুসলমান তুইই ভ্রান্ত, তুইই গোঁয়ার। যে পথ এই তুয়েরই অতীত সেই তত্ত্ব গ্রহণ কর। ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নিজ অংশ ভাগ করে নিয়েছে। হে দাদূ, ব্রহ্মকে ত্যাগ করে সবাই নিজেকে ভ্রমের মাঝে বেঁধেছে।

সাধকের সঙ্গে কথা বলার পর বাদশা'র মন বদলে গেল, নিজের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করা বাতিল করে তিনি ভগবানের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করার ব্যবস্থা করলেন।

এই সাধক মানুষটি সাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন দাদূ—আমাদের দাদা বলে। এর আসল নাম দাউদ। জাতে গুজরাতী ধুনুরী। যখন হাতে কাজ থাকত না তখন বসে বসে চামড়ার জলপাত্র মশক সেলাই করতেন। লেখাপড়া জানতেন না। কবীরের ছেলে কামালের ইনি শিষ্য হন। শুরু করেন সাধন-ভজন। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মমত বিরোধকে মিটিয়ে দিয়ে তিনি সত্যের সন্ধান দেন এবং এই সত্যকে তিনি প্রচার করেন মুখে মুখে ছড়ায় ও কবিতায়। তিনি ছিলেন স্বভাব-কবি। লেখাপড়া না জানলেও তাঁর মুখে ছন্দ ও মিল আটকাত না। হিন্দীতে তাঁর যত দোঁহা। তাঁর শিষ্যেরা পরে এই সব দোঁহা সংগ্রহ করেন। দোঁহার সংখ্যা কুড়ি হাজারের ওপর। সে কালটাই ছিল ধর্ম-আলোচনার কাল, তাই ধর্ম নিয়েই দাদূর যত দোঁহা।—

"সব হম দেখা সোঠি করি, তুজা নাঁহি থান।
সব ঘট একৈ আত্মা ক্যা হিন্দু মুসলমান॥"

অর্থাৎ আমি সন্ধান করে দেখলাম, পর কাউকে পেলাম না। সকল ঘটেই এক আত্মা, কি হিন্দু কি মুসলমান।

"অলহ রাম ছুটি ভরম মোরা।
হিংতু তুরক্ ভেদ কুছ নাঁহি, দেখৌ
দর্শন তোরা॥"

অর্থাৎ আল্লা ও রামের ভ্রম আমার ছুটেছে, হিন্দু মুসলমান ভেদ আমার কিছু নেই। সর্বত্র দেখছি তোমার স্বরূপ।

দাদূ বেঁচেছিলেন উনষাট বছর, নারাণা গ্রামে দেহত্যাগ করেন। সেখানে 'দাদূ-দ্বারা' আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে সাধক কবিকে স্মরণ করে সেখানে মস্ত মেলা বসে বছরে বছরে।

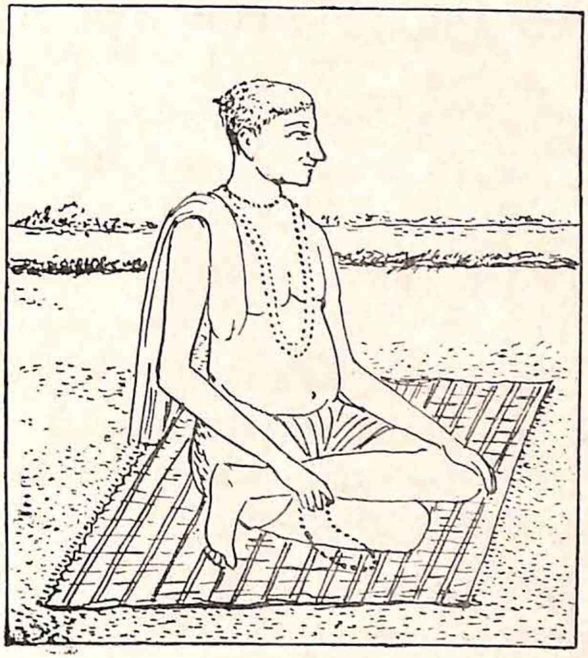
তুলসীদাস

আকবরের আমলে আর একজন সাধক কবি ভারতজোড়া খ্যাতিলাভ করেন। আজও তাঁর সেই খ্যাতি অক্ষুণ্ণ আছে। তিনি ভক্ত কবি তুলসীদাস।

বারাণসীর ভাদানীতে গঙ্গাতীরে এক পর্ণকুটিরে রামচন্দ্রের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তুলসীদাস সাধনভজন করতেন আর বাল্মীকির রামায়ণের হিন্দী অনুবাদ করতেন। কাশীর ব্রাহ্মণেরা এই ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বলেছিলেন,—দেবভাষায় লেখা ধর্মগ্রন্থ, একে ভাষান্তরিত করা মহাপাপ। তুলসীদাস বলেছিলেন,—দেবতার মাহাত্ম্য যে ভাষাতেই থাক, তার মাহাত্ম্য সমান। আমি ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বপ্নাদেশে এ কাজ করছি।

তবু ব্রাহ্মণেরা সহজে ছাড়ে নি। শেষে এক অলৌকিক ঘটনায় তাদের মুখ বন্ধ হয়। একদিন প্রত্যূষে তুলসীদাস গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। একটি মেয়ে এসে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। তুলসীদাস আশীর্বাদ করলেন—শাঁখা সিঁদুর অক্ষয় হোক্, দীর্ঘজীবী হও।

মেয়েটির সঙ্গে লোক ছিল, তারা বলল,—ঠাকুর, খানিক আগে ওর স্বামী মারা গেছে, এ



তুলসীদাস

সহমরণে যাচ্ছে। আপনি এ কী আশীর্বাদ করলেন!

তুলসীদাস কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন,—একটু অপেক্ষা কর, আমি আশ্রম থেকে আসছি।

আশ্রম থেকে তুলসীদাস চরণামৃত নিয়ে এলেন, মেয়েটির মৃত স্বামীর দেহে চরণামৃত ছিটিয়ে দিলেন। মৃত স্বামী চোখ মেলল।

এই অলৌকিক ঘটনায় ব্রাহ্মণেরা চমকে গেল। কবিকে তারা সাধক বলে মেনে নিল।

খবরটা পৌঁছল আকবরের দরবারে। বাদশাহ্ তুলসীদাসকে ডেকে পাঠালেন। বললেন,—তুমি নাকি মরা বাঁচাতে পার?

তুলসীদাস বললেন,—আমি কিছুই পারি না। রাম নাম করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি।

বাদশাহ্ এ কথা শুনে সন্তুষ্ট হলেন না, তুলসীদাসকে কারাগারে পাঠালেন।

এদিকে দিল্লীতে হঠাৎ বাঁদরের উৎপাত শুরু হ'ল। বাঁদর সব তচ্‌নচ্‌ করছে; সিপাহী, পাহারাদার কেউ তাদের সঙ্গে পেরে উঠছে না। শেষে রাজা টোডরমল বললেন,—রামচন্দ্রের সেবককে ধরে রেখেছেন বলেই এই বাঁদরের উৎপাত শুরু হয়েছে। ওঁকে ছেড়ে দিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাদশাহ্‌ তুলসীদাসকে মুক্তি দিলেন। বাঁদররাও দিল্লী থেকে অদৃশ্য হ'ল। তুলসীদাস সম্বন্ধে এ রকম অনেক অলৌকিক ঘটনার গল্প আছে। বিশ্বাসীরা তা অবিশ্বাস করেন না।

তুলসীদাস নব্বই বছর বেঁচেছিলেন। তুলসীদাসী রামায়ণ—যার আসল নাম 'রামচরিতমানস' তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ। আজও উত্তর ভারতের ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ পাঠ করা হয়। তুলসীদাসের ভজন আজ ভারতের কোনও মানুষের কাছে অজানা নয়।—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম,
পতিতপাবন সীতারাম।
মঙ্গল-পরশন রাজারাম,
পতিতপাবন সীতারাম॥"

তুলসীদাস জন্মেছিলেন চিত্রকূট পাহাড়ের প্রান্তে রাজপুর গ্রামে এক কনৌজী ব্রাহ্মণের ঘরে। পিতা আত্মারাম দুবে। মানুষ হন সন্ন্যাসী নৃসিংহদাসের আশ্রমে। নৃসিংহদাস ছিলেন রামভক্ত, তাঁর কাছেই তুলসীদাস দীক্ষা নেন। বারো বছর কাশীতে ইনি শাস্ত্রপাঠ করেন এবং কাশীর গঙ্গাতীরেই সারাজীবন কাটান। এঁর আশ্রম যেখানে ছিল সেখানে এখন রামচন্দ্রের মন্দির হয়েছে। নিত্য সেখানে পূজা-অর্চনা হয়।

তুকারাম

শিবাজী মহারাজের গুরু তুকারাম ছিলেন একজন সাধক ও গীতকার। হাজার হাজার ভজন গান তিনি রচনা করে গেছেন। মারাঠী ভাষায় ভজন গানকে বলে অভঙ্গ।

তুকারাম ছিলেন মারাঠী। মুদীর ছেলে। লেখাপড়া জানতেন না। হাটে গিয়ে লঙ্কা বেচতেন। দুর্ভিক্ষের দিনে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র অনাহারে মারা যায়, তিনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন।

সারাদিন বসে বসে তিনি নারায়ণের নাম জপ করতেন। লোকে বলত,—পাগল। তুকারাম বলতেন—

"হাথী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুজনকে দুর্ভাব নেই যব নিন্দে সংসার॥"

অর্থাৎ হাতি বাজারের পথে চলে, চারপাশে কুকুর ডাকে। হাতি ভ্রূক্ষেপ করে না, নিজের পথেই চলে। সাধুরাও সেই রকম। লোকে তাঁদের যতই নিন্দে করুক, তাঁরা নিজেদের পথেই চলেন।

তুকারাম স্বপ্নে নারায়ণের আদেশ পান ভজন লিখতে। লেখাপড়া জানেন না, পঁচিশ বছর বয়সে তিনি বর্ণপরিচয়ের বই নিয়ে বসলেন অক্ষর চিনতে। অল্পদিনেই লেখাপড়া শেখা হ'ল, শুরু হ'ল ভজন রচনা। শ্রীবিঠ্‌ঠলের (শ্রীকৃষ্ণের) মন্দিরে বসে শুরু হ'ল ভজন গান। ব্রাহ্মণেরা অভিযোগ তুলল—এ কি, এক মুদীর ছেলে মন্দিরে বসে ভজন গাইবে! গাঁয়ের মোড়ল তুকারামকে ডেকে পাঠাল, বলল,—মন্দিরে নামগান বন্ধ কর।

তুকারাম বললেন,—আমি যে অনেক ভজন লিখে ফেলেছি!

—সে সব নদীর জলে ফেলে দাও।

তুকারাম পুঁথিগুলো ইন্দ্রায়ণী নদীতে ভাসিয়ে দিলেন।

পুঁথিগুলো কিন্তু ডুবল না, জোয়ারের জলে ফিরে এল নদীর তীরে। লোকেরা তা তুলে এনে দিল তুকারামের হাতে।

ছ'জন ব্রাহ্মণ গিয়ে নালিশ করল পুনায় রাজদরবারে। পেয়াদা এসে তুকারামকে ধরে নিয়ে গেল দরবারে। ব্রাহ্মণ দু'জন তাঁকে দেখেই পায়ের ধুলো নিল। বলল,—আমাদের অন্যায় হয়েছে। ইনি শূদ্র ন'ন, ইনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ওঁর হাতে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম।

শিবাজীর শিক্ষক কাহ্নদেব তুকারামকে ছেড়ে দিলেন।

শিবাজী পরে এই কথা শুনে তুকারামকে ডেকে পাঠালেন। তুকারাম বলে পাঠালেন—

"বস্ত্র বিনা ধূলিময় অতি কদাকার।
ক্ষীণ দেহ, করি নিত্য ফলমূলাহার॥
শুষ্ক কর-পদ, সদা বিকট মূরতি।
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি॥
বন্ধুভাবে এই আমি করি নিবেদন।
মোরে দেখিবার কথা তুল না রাজন্॥
মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে ক্ষুধা নাশ।
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস॥
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন।
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ-আবরণ॥
পর-অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে।
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে॥
সম্মান-প্রয়াসী জন রাজগৃহে যায়।
কিন্তু বল শান্তি কভু মিলে কি সেথায়॥"

তখন শিবাজী নিজেই এলেন লোহাগাঁয়ে তুকারামের কাছে। পরে শিবাজী তুকারামের শিষ্য হন।

মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে তুকারাম দেহরক্ষা করেন। ইন্দ্রায়নী নদীতীরে তিনি শিষ্যদের সামনে অদৃশ্য হন। যাবার আগে তিনি সকলের কাছে বিদায় নিয়ে যান—

"এই হ'ল শেষ দেখা সকলের সনে।
ভবের সম্বন্ধপাশ ছিন্ন এতদিনে॥
সবার চরণে আমি করি এই নতি।
দীন আমি, কৃপা সবে রেখো মোর প্রতি॥
যাই আমি বন্ধুগণ, যাই নিজধাম।
বল সবে রামকৃষ্ণ বিঠ্ঠলের নাম॥"

তুকারামের এই মৃত্যুদিন স্মরণে দিহুতে বছরে বছরে মেলা বসে। আমাদের চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের সমতুল্য সাধক কবি ছিলেন তিনি। মারাঠী কাব্যসাহিত্যে তাঁর আসন বিশেষ উচ্চে। আজ অবধি তাঁর রচিত নয় হাজার অভঙ্গ সংগৃহীত হয়েছে। তুকারামের অনেক অভঙ্গ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন যোগেন্দ্রনাথ বসু। এখানকার উদ্ধৃতিগুলি সেই অনুবাদ থেকে গৃহীত।

পারস্যের কবি

ভারত থেকে চোখ ফিরিয়ে এবারে আমরা চলে আসব সুদূর পশ্চিম এশিয়ায় পারস্য দেশের সাহিত্যে। পারস্যের অপর নাম ইরান এবং সে নামটাই এখন ওঁরা দেশের সরকারী নাম হিসেবে ব্যবহার করছেন। ইয়োরোপের লোকদের কাছে ওদেশের নাম পারসিয়া। পারস্য দেশের ভাষাকে বলা হয় ফার্সী। ফার্সী সাহিত্যের কথা বলতে গেলে অন্তত তিন-চারজন কবির নাম করতে হয় যাঁদের

সাহিত্যকীর্তি দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এঁরা হলেন শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম, রুমি আর খ্বাজা হাফিজ। এঁদের মধ্যে শেখ সাদী আবার ফার্সী এবং আরবী দু'ভাষাতেই কাব্য রচনা করতেন এবং ঐ দুই সাহিত্যেই তাঁর অবদান অতুলনীয়। তবে ফার্সী কবি হিসেবেই তিনি বেশি পরিচিত।

শেখ সাদী

শেখ সাদীর কথা দিয়েই শুরু করি, যদিও ওটা তাঁর আসল নাম নয়—কতকটা ছদ্মনাম বলা যায়। আসল নাম শেখ মুস্‌লিউদ্দীন বা, আরও সঠিক করে বললে, মুশারাফউদ্দীন। কিন্তু শেখ সাদী নামেই তিনি সাধারণের কাছে পরিচিত। সাদী-অল্‌ সিরাজী বলেও অনেকে তাঁকে জানেন।

সাদীর জন্ম হয়েছিল পারস্যের সিরাজ নগরে ১১৮৪ (মতান্তরে ১১৭৪) খৃষ্টাব্দে। প্রথম যৌবনে তিনি বাগ্‌দাদে গিয়ে লেখাপড়া শেখেন এবং নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়ে ইস্পাহানে ফিরে আসেন। কিন্তু প্রায় ঐ সময়েই সেখানকার সুলতান আতাবেগ সা'দকে গদিচ্যুত করে মোঙ্গোলরা সিংহাসন দখল করে। ঐ আতাবেগ সা'দই ছিলেন শেখ মুস্‌লিউদ্দীনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং তাঁর সম্মানেই তিনি শেখ সাদী এই নামে কাব্য রচনা করতেন।

সুলতানের এই দুর্ভাগ্যে সাদীরও মনে কেমন একটা বৈরাগ্য দেখা দিল। তিনি সিরাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন,—নানা দেশে ঘুরে বেড়ানোই হ'ল তাঁর কাজ। অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন শেখ সাদী। তার মধ্যে গজনী (আফগানিস্থান), ভারতের পাঞ্জাব, গুজরাত—এ সবও ছিল। ঐ সময়ে সোমনাথের বিখ্যাত শিবমন্দিরও তিনি দেখতে গিয়েছিলেন —যে মন্দির গজনীর সুলতান মামুদ ভেঙ্গে চুরমার করে দেন। দিল্লীতে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে সাদী হিন্দুস্থানী ভাষাটাও রপ্ত করে নিয়েছিলেন। এরপর তিনি ইয়েমেন হয়ে আবিসিনিয়া ও আফ্রিকার আর কয়েকটি দেশেও ভ্রমণ করেন এবং তীর্থযাত্রাও করে আসেন—মক্কা ও মদিনায়। সাদী সিরিয়াও যান এবং দামাস্কাস শহরে শেখ হিসেবে প্রচুর প্রতিপত্তিও হয় তাঁর। লেখার ক্ষমতা তো তাঁর বরাবরই ছিল, দামাস্কাসে এসে তিনি ধর্মীয় বক্তৃতাতেও বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং শুধু সাহিত্যিক নয়, ধর্মের একজন প্রবক্তা হিসেবেও তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ কাজও তাঁর বেশিদিন ভালো লাগল না। তিনি তখন জেরুজালেমের কাছাকাছি মরু অঞ্চলে চলে এলেন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে। ঐ মরু অঞ্চলে আপন মনে ঘুরে বেড়াতেন তিনি।

সাদীর জীবনীকাররা লিখেছেন, সাদী কিছুদিন খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াইএ সৈনিকের কাজও নিয়েছিলেন এবং ঐ সময়েই একদিন খৃষ্টানদের হাতে তিনি বন্দী হন। তাঁরা তাঁকে ত্রিপোলীতে নিয়ে এসে ক্রীতদাসের কাজে লাগিয়ে দেয়। সেখানে একটা দুর্গ তৈরি হচ্ছিল, সাদীকে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল সেই দুর্গের পরিখা খোঁড়ার কাজে। এই সময় তাঁকে প্রচণ্ড শারীরিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার ওপর ছিল মনিবদের অসহ্য অত্যাচার। শেষ

পর্যন্ত তাঁর জানা এক ধনী ব্যক্তি তাঁর হয়ে মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। অবশ্য এই উদ্ধার কাজটা নিঃশর্ত ছিল না। এর বদলে সাদীকে ঐ ধনী ব্যক্তির কন্যাটিকে বিয়ে করতে হয়। তাতে সাদীর তেমন আপত্তি ছিল না, কিন্তু তিনি জানতেন না যে ঐ মেয়েটি ভীষণ উগ্রস্বভাবের এবং কথায় কথায় ঝগড়া করায় তার যুড়ি ছিল না।

যাই হোক, স্ত্রীর সঙ্গে কিছুদিন সংসার করার পর শান্ত স্বভাবের সাদী বুঝতে পারলেন যে এমন মুখরা স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করা তেমন সহজ নয়। তাই আবার তিনি দেশভ্রমণের নাম করে বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রাজকের বেশে। তাঁর একটি কবিতায় এই দুর্ভাগ্যজনক দাম্পত্য জীবনের ছোট্ট একটি বর্ণনা দেওয়া আছে যা সেকালের এক বাঙ্গালী কবি বাংলায় তরজমা করেছিলেন ঃ

"হায় কি করিনু!
দাসত্বের বিনিময়ে মনোসাধে নিজ পায়ে
নিগড় পরিনু।"

যাই হোক, নানা জায়গায় পরিব্রাজকের জীবন কাটিয়ে প্রায় সত্তর বছর বয়সে তিনি ফিরে এলেন তাঁর জন্মভূমি সিরাজে। ইতিমধ্যে সেখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গাদচ্যুত সুলতানের পুত্র আবুবকর সা'দ আবার গদি দখল করে নিয়েছেন এবং তাঁর সুশাসনে দেশে শান্তি ফিরে এসেছে। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি সাদী সেইখানেই কাটিয়ে গেছেন। তবে মাঝে মাঝে মক্কা ঘুরে আসতেন। এ ভাবে অন্তত চৌদ্দবার তিনি মক্কায় তীর্থ করে আসেন।

শেখ সাদী খুব দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন। ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ১০৮ বছর হয়েছিল। মতান্তরে ১০৮ নয়, ১১৮ বছর। সিরাজ শহরের কাছে আজও তাঁর সমাধিতে ঐ মৃত্যু-তারিখটি লেখা আছে। ঐ সমাধিক্ষেত্র আজও সাহিত্যিক মাত্রেরই একটি দর্শনীয় স্থান। কবি রবীন্দ্রনাথ যখন পারস্যভ্রমণে যান তখন এই সমাধির পাশেই সাজানো বাগানে সেখানকার সাহিত্যিকরা তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন।

শেখ সাদী ছিলেন অত্যন্ত রসজ্ঞ কবি। গীতিকবিতা রচনায় তাঁর ছিল আশ্চর্য দক্ষতা। তাঁর বিখ্যাত দু'খানি বই—বুস্তান (অর্থাৎ ফুল-বাগান) এবং গুলিস্তান (অর্থাৎ গোলাপ-বাগান) সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে সমান ভাবে আদৃত হয়েছে তার সহজ, সরল এবং



পারস্যের সিরাজ নগরে পাহাড়ের তলায়
শেখ সাদীর সমাধি

ছন্দমধুর রচনাশৈলীর জন্য। তবে তাঁর গীতি-কবিতাগুলি,—যেগুলিকে বলা হয় 'দীওয়ান', —বোধ হয় আরও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি। তাঁর লেখা গজল এবং রুবাইয়াৎগুলিও কম আকর্ষণীয় নয়। আগেই বলেছি, তিনি ফার্সী এবং আরবী দু'ভাষাতেই কাব্য রচনা করে গেছেন। আবার, তাঁর কতকগুলি গীতিকবিতা তিনি লিখেছেন ঐ দু'টি ভাষা মিলিয়ে একত্র করে। একটি স্তবক ফারসী ভাষায় লিখে তার পরেরটি লিখেছেন আরবী ভাষায়। এই ধরনের কবিতাকে বলা হয় 'মুলাম্মাৎ'। তবে তাঁর আল্‌-খারিসাৎ কবিতা-সংগ্রহটি খুব সুরুচিপূর্ণ নয় এবং সেজন্য তাঁকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। কবি জবাব দিয়েছেন,—ওগুলো লবণ, আর কবিতা হচ্ছে মাংসের কাবাব। খানিকটা লবণ না থাকলে কি কাবাবের স্বাদ বাড়ে? অবশ্য এ যুক্তি সবাই মানতে রাজী হন নি।

শেখ সাদী ছিলেন সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আবদুল কাদের গিলানীর শিষ্য। শেষ জীবনে ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেড়ে যায় এবং এই সময়ে তাঁর রচনায় একটা শান্ত, সমাহিত ভাব লক্ষ করা যায়। সত্যের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ ঐ সব কবিতায় ফুটে উঠেছে।

ওমর খৈয়াম

"রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম"—এই কথাটির সঙ্গে কবিতাপ্রিয় শিক্ষিত বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই পরিচিত। রুবাইয়াৎ বলতে বোঝায় চার লাইনের ছোট ছোট কবিতা। তা হ'লে রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম হ'ল ওমর খৈয়ামের লেখা চার লাইনের ছোট ছোট কবিতা।

এই ওমর খৈয়াম ছিলেন পারস্য দেশের আর এক মস্ত কবি—কারও কারও মতে মহা-কবি। ইংরেজ সাহিত্যিক ফিট্‌জিরাল্ড তাঁর এই সব রুবাইয়াৎ থেকে প্রায় ৫০০টি কবিতা ইংরেজি ভাষায় তরজমা করলে তাঁর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ইংরেজি থেকে অন্য নানা ভাষায় আবার তারও অনুবাদ হয়। ফলে সারা পৃথিবীর লোক ওমর খৈয়ামের কবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। আমাদের বাংলা ভাষায়ও কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ সর্বপ্রথম "সবুজপত্র" পত্রিকায় ও-থেকে অনুবাদ করে ওমর খৈয়ামকে বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। সেই যে-বইএর আরম্ভেই আছে—

"রাত পোহাল, শুনছ সখী,
দীপ্ত উষার মাঙ্গলিক?
লাজুক তারা তাই শুনে কি
পালিয়ে গেছে দিগ্বিদিক্‌?
পূব-গগনে দেব শিকারীর
স্বর্ণ-উজল কিরণ তীর
পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের
মিনার যেথা উচ্চশির।"

এ লাইনগুলি অনেকেরই হয়তো মুখস্থ হয়ে গেছে। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষের পরে আরও কোন কোন কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন।

চার লাইনের কবিতা, কিন্তু তারই মধ্যে এমন সব তত্ত্ব, এমন সব তথ্যের সন্নিবেশ করে গেছেন ওমর খৈয়াম, যা দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে খুব উচ্চাঙ্গের মনে হবে। অথচ তার মধ্যে কাব্যরসের অভাব নেই একটুও। এইসব

কবিতার কতকগুলোকে সমালোচকরা বলেন "মিস্টিক্" বা অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ যার মধ্যে গভীর অর্থ লুকানো আছে কিন্তু সহজে তার ভিতর ঢোকা যায় না। আবার কোন কোন কবিতায় কবির স্বাধীন চিন্তা ও দুঃসাহসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার দিনের প্রচলিত সামাজিক মতবাদ, উলেমাদের গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন চিত্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেও তাঁর বাধে নি। স্থানবিশেষে সুফীদের নানা মতকেও তিনি পাগলামি বলে বিদ্রূপ করেছেন। এইখানেও তাঁর বিশেষত্ব।

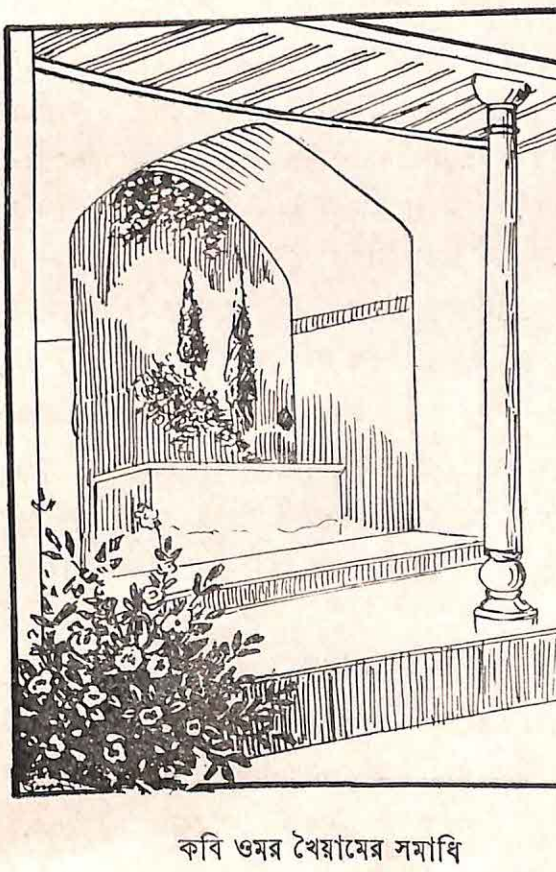
কিন্তু ওমর খৈয়ামের নাম শুধু কবি হিসেবেই নয়। তিনি ছিলেন অঙ্কশাস্ত্রেও মস্ত বড় ধুরন্ধর। জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ জ্ঞান। শুধু জ্ঞান বললে ভুল বলা হবে, অঙ্কশাস্ত্রের কোন কোন বিভাগে তাঁর আবিষ্কার ও গবেষণা আজও পণ্ডিতেরা ভুলতে পারেন নি। কবি নিজেই লিখে গেছেন ঃ

"অস্তি নাস্তি শেষ করেছি,—
দার্শনিকের গভীর জ্ঞান,
বীজগণিতের তত্ত্বকথা
যৌবনে মোর ছিলই ধ্যান।"

ছোটদের বিশ্বকোষে এই খণ্ডেই 'অঙ্কশাস্ত্রের কথা' বিভাগে বিশ্লেষাত্মক জ্যামিতির (অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি) কথা বলা হয়েছে (পৃঃ ১৩৪৪)। ওমর খৈয়ামকে তার পথিকৃৎ বলা চলে। তিনিই আবার জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান মালিককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, এবং প্রচলিত পঞ্জিকা-সংস্কারের কাজেও তাঁর সাহায্য আদায় করে নিয়েছিলেন। 'জিজ্' নাম দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার একখানি সংশোধিত সারণি-গ্রন্থ এবং তারিখ-ই-জালালি নামে নতুন অব্দের প্রচলনও (১০৭৯ খৃঃ) তাঁর দু'টি উল্লেখযোগ্য অবদান।

ওমর খৈয়াম ১২শ শতাব্দীর লোক। কিন্তু এত দিন পরেও পারস্যে তাঁর মত একাধারে পণ্ডিত, গণিতজ্ঞ এবং কবি দেখা যায় নি।

পারস্য ভাষায় যাঁরা তাঁবু তৈরির কাজ করতেন তাঁদেরকে বলা হ'ত খৈয়াম। ওমরের বাবারও তাঁবুর ব্যবসা ছিল, তাই থেকেই বোধ হয় তাঁরও নামের পাশে খৈয়াম কথাটি এসে বসেছে,—যদিও তিনি নিজে ও-ব্যবসা কখনও করতেন বলে শোনা যায় নি। তাঁর জন্ম হয়



কবি ওমর খৈয়ামের সমাধি

পারস্যের নিশাপুরের কাছে, মৃত্যুও হয় সেখানেই। আজও সেখানে গেলে তাঁর সমাধি দেখতে পাওয়া যাবে।

রুমি

শেখ সাদীর মত রুমিরও আসল নাম রুমি নয়,—আসল নাম মহম্মদ বিন হুশেন আলবালখি। তাঁর জন্ম হয় খোরাশানে, কিন্তু তাঁর বাবাকে রুমে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। সেজন্য পরবর্তী জীবনে কবিও লেখক হিসেবে তাঁর নাম বদল করে 'জালালউদ্দীন রুমি' করে নেন। ক্রমে সেটাই সংক্ষেপে হয়ে দাঁড়ায় শুধু 'রুমি'। রুম জায়গাটার নাম থেকেই রুমি।

রুমি জন্মেছিলেন ১২০৭ খৃষ্টাব্দে, আর ১২৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কারো কারো মতে পারস্যের সুফী কবিদের মধ্যে রুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কি শেখ সাদীর চাইতেও জনপ্রিয়। বিশেষ করে রুমির ভগবৎ-সংগীতগুলির মধ্যে যে মাধুর্য এবং সৌন্দর্য আছে তা অন্য কবিদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মৌলাই দরবেশদের প্রশস্তি ও গুণগান নিয়েই রুমির অধিকাংশ কবিতা।

যে বইখানার জন্য রুমি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন তার নাম মাৎনাবি-ই-মানাউই। ৬ খণ্ডে ৩০ হাজার থেকে ৪০ হাজারটি ছোট ছোট কবিতা —প্রত্যেকটি ছন্দমধুর এবং দু'টি করে মিল দিয়ে লেখা।

হাফিজ

পারস্যের গীতিকবিতাকারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা সম্ভবত কবি হাফিজ। অনেকে এঁকে হাফেজও বলেন, কিন্তু শেখ সাদী ও রুমির মত এ নামটিও কবির আসল নাম নয়। সিরাজ নগরের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে অনুমান ১৩০০ খৃষ্টাব্দে কবি জন্মগ্রহণ করলে বাবা-মা আদর করে নাম রেখেছিলেন খ্বাজা শামসুদ্দীন মোহম্মদ। বাবা-মা শুধু গালভরা নামই দেন নি, সেইসঙ্গে ছেলের উপযুক্ত লেখাপড়া শেখারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কবিও এ সুযোগের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তবে কাব্য, দর্শন এবং বিশেষ করে পরলোকতত্ত্বের দিকেই যেন ছিল তাঁর বেশি ঝোঁক।

এর পর কবি একটি নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনে কোরাণের অধ্যাপক হলেন। কোরাণ যাঁরা ভালো করে মনে রাখতে পারতেন তাঁদেরকে বলা হ'ত হাফিজ। তাই কবিও শামসুদ্দীন হাফিজ নামে পরিচিত হলেন। ক্রমে তাঁর আসল নাম লোকে ভুলে গেল। আজও ঐ নামেই তিনি সর্বত্র পরিচিত।

প্রচুর কবিতা লিখেছেন হাফিজ। তার মধ্যে দীওয়ানগুলিই সবচেয়ে জনপ্রিয়। ছোট ছোট গীতিকবিতা—কোনটা সনেট জাতীয়, কোনটা বা গজল। পাঁচ থেকে ষোলটি পূর্ণ পংক্তি দিয়ে প্রত্যেকটি কবিতা লেখা। প্রত্যেক পংক্তির শেষাংশ একই রকম ছন্দ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এদেশে বৈষ্ণব কবিরা এবং কবি কৃত্তিবাস, কবি কাশীরাম দাস প্রভৃতি যেমন তাঁদের রচনার শেষে নিজের নাম (ভণিতা) উল্লেখ করে গেছেন, যেমন—"ভণয়ে বিদ্যাপতি", "চণ্ডীদাস ভণে", "কহে কৃত্তিবাস" বা "কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্" ইত্যাদি, হাফিজও তেমনি

প্রত্যেক কবিতার শেষাংশে নিজের নাম 'হাফিজ' শব্দটি বসিয়ে গেছেন।

হাফিজের কবিতার ছত্রে ছত্রে রস যেন উপছে পড়ছে। সে লেখার রচনাশৈলীও এক কথায় অনুপম।

হাফিজ নামটি তিনি লাভ করেছিলেন কোরাণের একজন স্মৃতিধর বলে। কাজেই



কবি হাফিজের সমাধি, হাফিজিয়া

তাঁর কবিতার মধ্যে ধর্মের ছায়া বেশি করে আসবে এইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু হাফিজের কবিতা শুধু সেইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। গভীর দার্শনিক তত্ত্ব তার মধ্যে যেমন আছে, তেমনি আছে প্রকৃতির মধ্যে তিনি যে আশ্চর্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করে গেছেন তার কথা। জীবনের গানও বাদ যায় নি তা থেকে। এ সব জিনিস ধর্মের বাঁধাধরা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে না—চলতে পারে না। প্রচলিত ধর্মের নানা খুঁটিনাটির ওপর আঘাত দিয়েও কবিতা লিখেছেন তিনি। তাঁর সহধর্মীরা তাই তাঁকে বিধর্মী বলতেও ছাড়েন নি। তা ছাড়া হাফিজের ব্যক্তিগত জীবনও সন্ন্যাসীদের মত সর্বত্যাগী জীবন ছিল না। উৎকৃষ্ট মদ পেলে তিনি খুশি হতেন, স্বভাব ছিল চটুল। আদর্শবাদী বলতে আমরা যা বুঝি হাফিজ তার ধার-কাছ দিয়েও যেতেন না। এ জন্যও সমসাময়িক লোকেরা প্রচণ্ড সমালোচনা করত তাঁর। তিনিও সুযোগ পেলেই পাল্টা নিতেন—কবিতার মধ্যে দিয়েই।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও, সমস্ত সমালোচনা—সমস্ত প্রতিকূল মতবাদ তুচ্ছ করে হাফিজ তাঁর কালজয়ী কাব্য-সম্পদ্ নিয়ে আজও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে পরিণত বয়সে হাফিজ দেহত্যাগ করেন। সিরাজ নগরের মাইল দুই উত্তর-পূর্বে একটি গাছের নীচে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এখন ঐ জায়গাটির নামই হয়ে গেছে হাফিজিয়া। পরে সেখানে একটি সমাধিস্তম্ভ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার গায়ে হাফিজেরই লেখা কিছু দীওয়ানের অংশ খোদাই করে দেওয়া হয়েছে। সিরাজে বেড়াতে গেলে সকলেই এই মহাকবির সমাধিটিও দেখে আসেন।

সংগ্রহশালার কথা

সংগ্রহশালার কথা

ছোটদের বিশ্বকোষের বিভিন্ন খণ্ড পড়তে গিয়ে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ প্রতিটি খণ্ডের গোড়ায় ইতিহাস, চিত্রশিল্প, দেশবিদেশের কথা, নানারকমের বিজ্ঞান ইত্যাদি কত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু শুধু বই পড়েই কি সব কিছু জানা যায়? ধর, যদি ঐ সব বিষয় সম্পর্কে কোথাও আসল জিনিসপত্র বা প্রতিরূপ দেখে আসা সম্ভব হ'ত তা হলে কি সুন্দর ভাবেই না ঐ সব বুঝবার সুবিধা হ'ত! সত্যিই এই রকম এক ধরনের প্রতিষ্ঠান আছে। তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'মিউজিয়ম্', বাংলায় তারই নাম দেওয়া হয়েছে সংগ্রহশালা। কেউ কেউ একে 'যাদুঘর'ও বলেন। কিন্তু ঐ কথাটায় সঠিক অর্থ ধরা পড়ে না, যেমন চিড়িয়াখানা বলতেও অর্থের দিক্ দিয়ে ঠিক পশুশালা বোঝায় না। কিন্তু সাধারণের মধ্যে ও দু'টি শব্দই চালু হয়ে গেছে।

মানুষ অনেক কাল আগে থেকেই সুন্দর শিল্পকর্মের নিদর্শন, দুষ্প্রাপ্য জিনিস প্রভৃতি সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখতে শিখেছে—সে সমস্ত দেখে দেখে আনন্দ পাওয়ার ও শিক্ষা-লাভের জন্যে। অতীতের ভারতবর্ষেও 'চিত্র-শালা', 'বিশ্বকর্মাগৃহ' প্রভৃতি আদ্যিকালের সংগ্রহশালার কথা জানা যায়। মিউজিয়ম্ বা সংগ্রহশালা শুধুমাত্র প্রাণহীন দ্রব্যের সংগ্রহ নয়। জীবন্ত প্রাণীর সংগ্রহকেও এক ধরনের মিউজিয়ম্ বলা চলে। এদিক্ থেকেও সেকালের লোকেরা পিছিয়ে থাকে নি। সেকালে বন্য-প্রাণীদের রক্ষার জন্য 'অভয়ারণ্যের' কথাও ইতিহাস থেকে জানতে পারা গেছে। ঐ রকম গাছপালার সংগ্রহশালার কথাও জানা গেছে— যা থেকে কি ভাবে সেকালে উদ্ভিদ্দের শ্রেণীবিভাগ করা হ'ত তা আমরা জানতে পেরেছি।

ভারতে অতীতকালে 'সরস্বতী ভাণ্ডার' নামেও এক ধরনের পুঁথিপত্র, চিত্রকলা প্রভৃতির সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। এমন কি এখনকার কয়েকটি মিউজিয়ম্ও এই ধরনের সরস্বতী ভাণ্ডারের সংগ্রহের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে।

মিউজিয়ম্ নাম কি করে হ'ল

'মিউজিয়ম্' কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'মিউজ' থেকে। মিউজ-রা ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যার দেবী। পরে মিউজিয়ম বলতে জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রকেই বোঝাত। প্রায় দু'হাজার দু'শ' বছর আগে টলেমী বংশের গ্রীক রাজারা মিশরের সুবিখ্যাত বন্দর-নগরী আলেক-জান্দ্রিয়াতে এ রকম একটি 'মিউজিয়ম্' স্থাপন করেছিলেন।

মধ্যযুগের পৃথিবীতে রাজা-রাজড়ার প্রাসাদে, ধর্মস্থানে বা মন্দিরের মধ্যে নানারকম সংগ্রহ-শালা গড়ে ওঠে। এশিয়া ও ইয়োরোপের অনেক রাজার এ রকম সংগ্রহ ছিল। গত দু'শ-আড়াইশ' বছর আগে ইয়োরোপের কোন কোন জায়গায় জীববিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, ভূতত্ত্ব ও উদ্ভিদ্বিদ্যার নানা সংগ্রহ ঐ সব বিষয়ের পণ্ডিতদের দ্বারা গড়ে উঠেছিল।

তবে উপরে বর্ণিত এইসব অপূর্ব সংগ্রহ

সাধারণ লোকে দেখতে পেত না। কিন্তু এ রকম একটা অবস্থা তো আর চলতে পারে না চিরকাল। ফরাসী দেশের রাজাদের ল্যুভ্‌র্ প্রাসাদের অমূল্য সংগ্রহ ফরাসীবিপ্লবের পর সমগ্র জাতির সম্পত্তিরূপে সকলের জন্য খুলে দেওয়া হ'ল।

ইংল্যাণ্ডে স্যর্ হান্‌স্ স্লোন্ নামে এক বিখ্যাত সংগ্রহকারীর সংগ্রহগুলো দিয়েই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের একটি আইনের বলে 'ব্রিটিশ মিউজিয়ম্' তৈরি



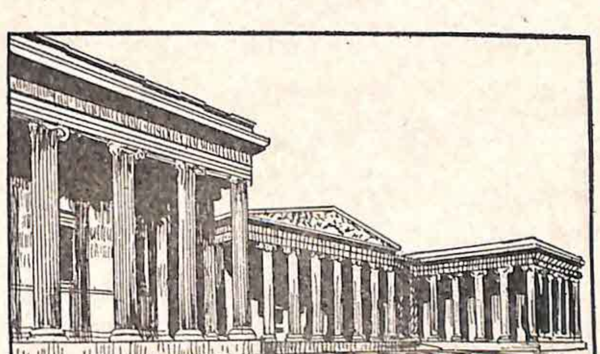
স্যর হান্‌স্ স্লোন্

হয়েছিল ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে। এটি এখন পৃথিবীর বৃহত্তম সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে একটি।

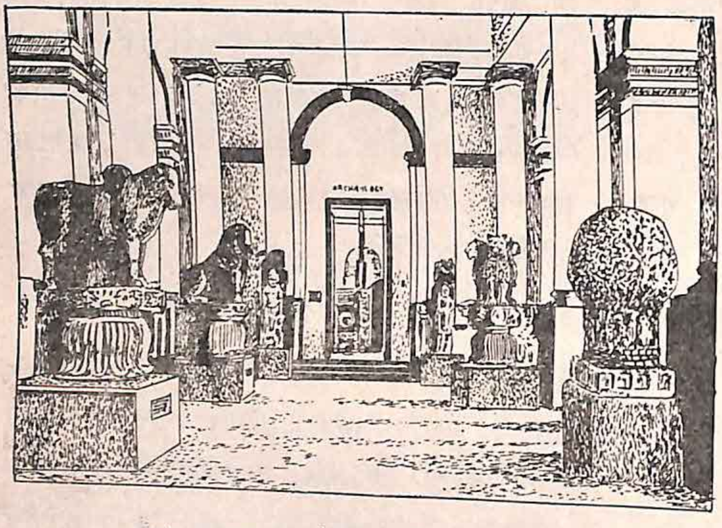
এখনকার পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেরই রাজধানীতে সংগ্রহশালা, পশুশালা, উদ্ভিদ্-উদ্যান, অ্যাকোয়েরিয়ম্ ইত্যাদি দেখা যায়। ব্রিটিশ মিউজিয়ম্ বা 'ল্যুভ্‌র' ছাড়াও ওয়াশিংটনের 'ন্যাশনাল গ্যালারী', নিউ ইয়র্কের 'আমেরিকান মিউজিয়ম্ অব্ ন্যাচারাল হিষ্ট্রী', মস্কোর 'হার্মিটেজ মিউজিয়ম্' এবং মিউনিকের 'ডয়শে মিউজিয়ম্' নামক বিজ্ঞানের সংগ্রহশালা বিখ্যাত। এশিয়ায় টোকিওর জাতীয় সংগ্রহশালা, চীনের 'পিকিং মিউজিয়ম্', কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্', মিশরের কায়রো মিউজিয়ম্, হায়দ্রাবাদের 'সালার জঙ্গ মিউজিয়ম্' সুপরিচিত।

আমাদের দেশে

ভারতের আধুনিক সংগ্রহশালার গোড়াপত্তন হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলকাতার 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র উদ্যোগে। এই সোসাইটির মিউজিয়মের প্রথম সংরক্ষক ছিলেন নাথানিয়েল ওয়ালিশ নামক এক দিনেমার ডাক্তার ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী। কলকাতার সামনেই গঙ্গার অপর পাড়ে ক্যাপ্টেন রবার্ট কীডের প্রচেষ্টায় ১৭৮৭-তে এখানকার উদ্ভিদ্-সংগ্রহশালা 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেনর'ও সূচনা হয়। ১৮১৪ সাল থেকেই শুরু হয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের গোড়ার কাজ। ভারতের আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মিউজিয়মের সূচনাও হয়েছিল



ব্রিটিশ মিউজিয়মের সম্মুখ ভাগ



প্রধান প্রবেশ-চত্বর, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্, কলকাতা

কলকাতায় ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে। আলিপুরে পশুশালা গড়ে ওঠে ১৮৭৫ সালে।

বাংলার পণ্ডিত ও চিন্তাশীলদের মধ্যে গোড়ার দিকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনীষী অক্ষয়কুমার দত্তও ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রত্নবিদ্যা চর্চার জন্য সংগ্রহশালা তৈরিতে উৎসাহী ছিলেন এবং তিনিও নিজস্ব সংগ্রহ গড়ে তুলেছিলেন। সাহিত্যিক ও শিল্পবেত্তা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র কারুকলা সংগ্রহের মাধ্যমে তাঁর গভীর কর্মক্ষমতার পরিচয় দেন। সুপণ্ডিত কর্মী রামব্রহ্ম সান্যাল আবদ্ধাবস্থায় পশুসংরক্ষণের একটি বিখ্যাত বই লিখেছিলেন।

বর্তমানে ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যের রাজধানীতে ইতিহাস বা শিল্পকলার মিউজিয়ম আছে। এই ধরনের মিউজিয়মের মধ্যে পাটনা, গৌহাটি, ভুবনেশ্বর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নতুন দিল্লী, হায়দরাবাদ, বোম্বাই, বরোদা, বাঙ্গালোর, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম্, জয়পুর, শ্রীনগর, চণ্ডীগড় প্রভৃতি স্থানের প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম্ বা শিল্পসংগ্রহশালাটিও বাঙ্গালী মাত্রেরই একবার দেখে আসা উচিত।

ভারতের পশুপাখির সংগ্রহশালা দেখতে হলে কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পাখি, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ প্রভৃতির ঘরগুলি ঘুরে দেখবার মত। এ ছাড়া বোম্বাই শহরের 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ মিউজিয়মের' জীবজন্তুর প্রদর্শনীটি ও মাদ্রাজের সরকারী সংগ্রহশালাও দেখা উচিত। পাখি, প্রজাপতি নানারকমের পাখির ডিম—এ সবের সংগ্রহ দার্জিলিংয়ের ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়মেও আছে। আর, কারো যদি জীবন্ত সামুদ্রিক জলপ্রাণী দেখবার ইচ্ছে হয়, তবে বোম্বাইয়ের 'অ্যাকোয়েরিয়ম্' দেখে আসতে পার। অ্যাকোয়েরিয়ম্ অবশ্য মাদ্রাজ ও ত্রিবান্দ্রামেও আছে। কলকাতার পশুশালায়ও একটি তৈরি হচ্ছে। (তবে সামুদ্রিক প্রাণীদের নয়)

পশুশালা ও অভয় অরণ্য

পশুশালার মধ্যে কলকাতা এবং নতুন দিল্লীর স্থান সর্বোচ্চে। অবশ্য বোম্বাই, মাদ্রাজ, জয়পুর—এ সব জায়গায়ও পশুশালা আছে। দার্জিলিংয়ে আছে পাহাড়ী অঞ্চলের বা শীতের দেশের পশুপাখির সংগ্রহশালা 'হিমালয়ান

জুয়োলজিকাল পার্ক'। আহ্‌মেদাবাদ, বিকানীর, বরোদা, বোম্বাই, গৌহাটি, হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌ, ত্রিবান্দ্রাম্ প্রভৃতি শহরেও ছোটখাট পশুশালা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের এক-শিংওয়ালা গণ্ডারের জন্য জলদাপাড়া, আসামের কাজিরাঙ্গা, সিংহের জন্য গুজরাতের সংরক্ষিত গির জঙ্গল, কেরলের পেরিয়ার, সুন্দরবনের পাখি-বাঘ-কুমীরের জন্য সজনেখালি, হ্যালিডে দ্বীপ প্রভৃতি, মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী, রাজস্থানের কেওলাদেও-ঘানা ও ভরতপুর, উত্তর প্রদেশের 'করবেট্ জাতীয় অরণ্য' এ সব জায়গাকে চিড়িয়াখানা না বলে সংরক্ষিত বন বলাই উচিত। পশ্চিমবঙ্গে দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্সটিট্যুটের পর্বতারোহণের মিউজিয়ম্, কলকাতায় কেন্দ্রীয় পাট গবেষণাগারের মিউজিয়ম্—এ দু'টিও দেখবার যোগ্য। বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম্ তো বটেই।

আরও নানান্ ধরনের সংগ্রহশালা

তোমাদের মধ্যে কারো কারো যদি উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের ওপর বিশেষ ঝোঁক থাকে তা হ'লে শিবপুরের 'ইণ্ডিয়ান বোটানিক গার্ডেন' এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়ম্' এই দু'টিই উপযুক্ত স্থান। আবার দেশের শস্যসম্ভার, ওষধি, তন্তুজ উদ্ভিদ্—যেমন তুলো, পাট, কাঠ, গঁদ, রজন, এ সবের জন্য কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সেক্শন' সর্বোত্তম। তবে বন-বিজ্ঞান ও বনজ সম্পদের সবচাইতে বড় মিউজিয়ম্ আছে দেরাদুনের 'ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট কলেজে'। এ ছাড়া মাদ্রাজের সরকারী মিউজিয়ম্‌টিতেও যেতে পার। লক্ষ্ণৌ শহরের 'বীরবল সাহানি ইন্সটিট্যুট অব প্যালিও-বোটানি'র সংগ্রহালয়ে গেলে সুদূর অতীত কালের পাথর-হয়ে-যাওয়া 'ফসিল' গাছগাছড়ার নমুনা দেখে আসা যায়। দার্জিলিংএ যেমন 'লয়েড বোটানিক গার্ডেন' তেমনি এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, মাদ্রাজ, কোদাইকানাল, কুন্নুর, উটকামণ্ড, দেরাদুন, শিলং প্রভৃতি স্থানে নানা ধরনের উদ্ভিদ্-উদ্যান আছে। কলকাতায় আলিপুরের 'এগ্রি-হর্টিকালচারাল সমিতি'র উদ্যানটিও বেশ আকর্ষণীয় ও শিক্ষাপ্রদ।

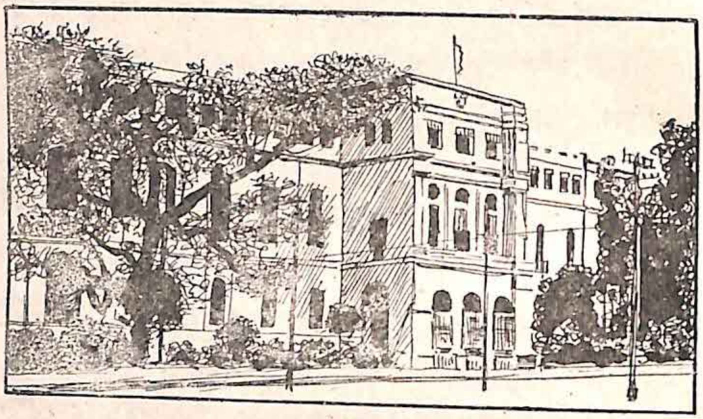
যদি মনে হয় আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চাটাই সবচাইতে ভালো তা হলেও সেই কলকাতা থেকেই শুরু করা ছাড়া উপায় নেই। এখানে ভারত সরকারের পরিচালিত 'বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম্' অথবা বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার কথা একটু আগেই বলেছি। এখানে খনিবিদ্যা, যোগাযোগ ও যানবাহন, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যান্ত্রিক শক্তি, ধাতুবিজ্ঞান এবং সাধারণ বিজ্ঞানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর রয়েছে। কলকাতা ছাড়াও বাঙ্গালোর শহরের 'বিশ্বেশ্বরাইয়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম্' এবং রাজস্থানের পালানী বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল মিউজিয়ম্‌ও দেখবার যোগ্য। প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক কিছু দিল্লীর বিমানবাহিনীর মিউজিয়ম্, পুনার নিকটস্থ খড়ক-ভাস্‌লার অথবা দেরাদুনের সামরিক সংগ্রহালয় প্রভৃতিতেও দেখতে পাবে।

ঠিক সংগ্রহশালা না হলেও মহাকাশ-চর্চা বা গ্রহ-তারকার বিচিত্র জগৎ চোখের সামনে তুলে ধরার মত ব্যবস্থা সারা ভারতে একটি প্রতিষ্ঠানেই আছে। সেটি কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ দিকে 'বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম্'

বা 'বিড়লা তারামণ্ডল'। তোমাদের মধ্যে অনেকে ডাক-টিকেট জমিয়ে পৃথিবীর নানাদেশের সভ্যতা, সম্পদ্, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির অনেক খবর পেয়ে যাও। নতুন দিল্লী তে 'ডাক-তারভবনে'র একটি কক্ষে 'জাতীয় ডাক-টিকেট সংক্রান্ত সংগ্রহালয়' অর্থাৎ ন্যাশনাল 'ফাইলাটেলিক মিউজিয়ম্' বসানো হয়েছে। এখানে সুন্দরভাবে ভারতীয় ডাকটিকেটের ক্রমবিবর্তনকে দেখানো হয়েছে। কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে'ও কিছু দামী ডাকটিকেট আছে ব্রিটিশ যুগের। যদি ভারতের নানারকম গানবাজনার যন্ত্র দেখতে চাও তবে কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র 'মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট্স্ গ্যালারী' তোমাদের কৌতূহলকে মেটাতে পারবে অনেকটাই। এই প্রসঙ্গে মহীশূরের জগমোহন প্যালেসের নামও করা যায়। এটি প্রধানত চিত্রশালা, কিন্তু এখানেও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের সংগ্রহ দেখবার মত।

ছোটদের মিউজিয়ম্

ছোটদের সংগ্রহশালা যদি দেখতে চাও তা হলে গুজরাতের আমরেলি নামক একটি ছোট জেলা শহরের মিউজিয়ম্ দেখে আসতে পার। উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরের 'মতিলাল নেহ্রু শিশু-সংগ্রহশালা', নতুন দিল্লীর 'ইণ্টারন্যাশনাল ডল্স্ মিউজিয়ম্' বা নিদেন পক্ষে কলকাতার 'নেহ্রু চিলড্রেন্স মিউজিয়ম্'টাও ঘুরে দেখা যেতে পারে।



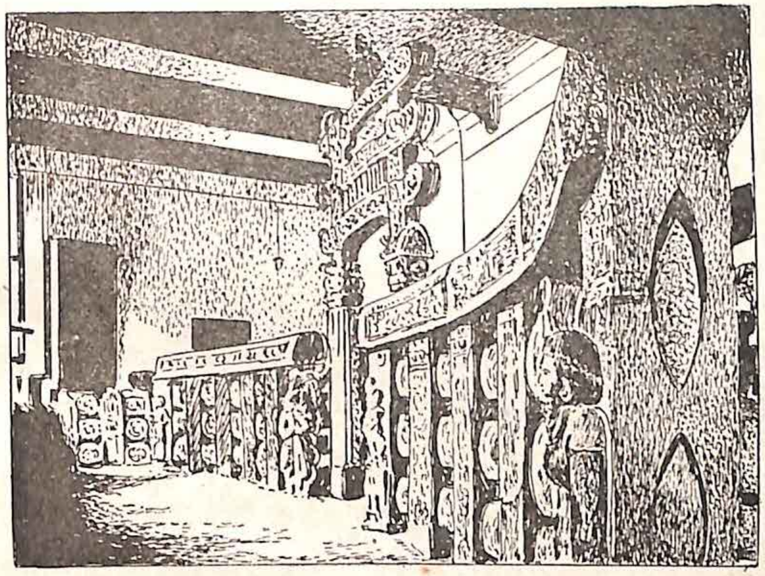
কলকাতা ময়দানের পূবদিকে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্

সাইট মিউজিয়ম্

ভারতবর্ষের চারদিকেই প্রাচীনকালের স্তূপ, বিহার, প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ ছড়িয়ে আছে। এই সব প্রাচীন স্থানের কাছাকাছি ছোট ছোট মিউজিয়মে রাখা আছে স্থানীয় সংগ্রহ। এইরকম স্থানীয় সংগ্রহগুলির মধ্যে কোণারক মিউজিয়ম্, বোধগয়া মিউজিয়ম্, নালন্দা মিউজিয়ম্, দিল্লীর লালকেল্লা মিউজিয়ম্, মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ মিউজিয়ম্, অন্ধ্রের নাগার্জুনকোণ্ডা মিউজিয়ম্ এবং কাশীর সারনাথ মিউজিয়ম্ প্রভৃতি বিখ্যাত। এগুলিকে প্রত্নস্থলের জায়গাতেই বসানো সংগ্রহশালা বা 'সাইট্ মিউজিয়ম্' বলা হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা কলকাতার একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ থেকে এ সব পরিচালনা করেন। মহীশূরের হালেবিড-এ, টিপু সুলতানের শ্রীরঙ্গপত্তনে এবং গোয়া শহরেও এ রকম সংগ্রহ-শালা আছে।

মিউজিয়মের অন্যান্য দিক্

বর্তমানে সংগ্রহশালা বা মিউজিয়মে দর্শকদের জন্য অনেক রকম বক্তৃতামালা, চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং প্রদর্শকের



ভারহুত কক্ষ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্, কলকাতা

সাহায্যে মিউজিয়ম্ ঘুরিয়ে দেখবার ব্যবস্থা করা হয়। মিউজিয়মে দেখবার মত জিনিসের ছবি, প্রদর্শিকা, ছাঁচে ঢালাই প্রতিরূপ—এ সব বিক্রিও করা হয়। কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা গাড়িতে করে বিশেষ ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী সুদূর গ্রামের দিকেও পাঠিয়ে দেন। ঐ রকম একটা ব্যবস্থা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম্ও করেছেন। বিড়লা মিউজিয়ম্ স্কুলে স্কুলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বা বিজ্ঞান সম্পর্কে মডেল বা প্রতিরূপ পাঠিয়ে থাকেন। মালদহ ও পুরুলিয়াতে এঁরা ছ'টি আঞ্চলিক মিউজিয়ম্ও পরিচালনা করেন।

উল্কাপিণ্ড, নানান্ রকমের খনিজ, পাথর, ধাতু-আকর প্রভৃতির সবচাইতে বড় সংগ্রহ যদি তোমরা কেউ দেখতে চাও তা হ'লেও তোমাদেরকে আবার ঘুরেফিরে সেই কলকাতাতেই আসতে হবে—কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ভূ-তাত্ত্বিক গ্যালারীতে। এখানে নানা রকম ভূ-তাত্ত্বিক নিদর্শন এবং ফসিল-হয়ে-যাওয়া বিভিন্ন অতিপ্রাচীন লুপ্ত প্রাণী-দের দেহাবশেষ সংগৃহীত আছে। ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে দেখতে হ'লে একদিনে হবে না। এখানে মানুষের কাজে লাগে এ রকম সর্বপ্রকার খনিজ বা ধাতব আকর ছাড়াও নানারকমের ঘরবাড়ি তৈরির জন্য উপযুক্ত পাথরের নিদর্শনও রাখা আছে।

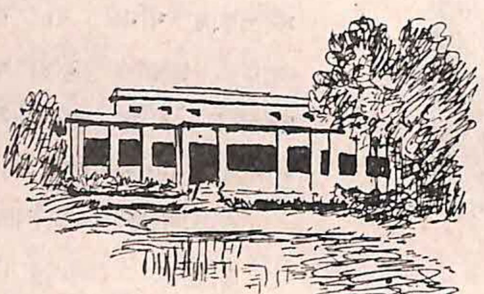
লোকশিল্পের মিউজিয়ম্

ভারতের আদিবাসীরাও এক সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় জীবনধারার ও শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতের সংস্কৃতিতে ও শিল্পে এঁদের প্রভাব গভীর ভাবে পড়েছে। আদিবাসীদের হাতে গড়া ছাড়াও গ্রামদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্পও দেখবার মত। এ সব দেখতে গেলে কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের নৃতত্ত্ব বিভাগের বিস্তৃত প্রদর্শনী দিয়ে শুরু করতে হবে। তবে নতুন দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালা বা 'ন্যাশনাল মিউজিয়মে'র নৃতত্ত্ব বিভাগ, শিলংএ অবস্থিত 'নেফা ষ্টেট মিউজিয়ম্', কোহিমার 'নাগাল্যাণ্ড মিউজিয়ম্', রাঁচির আদিবাসী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মিউজিয়ম্, মাদ্রাজ মিউজিয়মের নৃতত্ত্ব বিভাগ এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি মিউজিয়ম্ প্রভৃতিও ঘুরে আসতে পার।

লোকশিল্প বা গ্রামীণ শিল্পকলা বা কারুশিল্প দেখার জন্য ঠাকুরপুকুরের 'গুরুসদয় মিউজিয়ম্' দেখা উচিত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়ম্'ও এটিরই

মত বাংলার লোকশিল্পের জন্য বিখ্যাত। নতুন দিল্লীর জনপথ নামক রাস্তার 'ক্র্যাফ্‌ট্‌স্ মিউজিয়ম্' (অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্ বোর্ড পরিচালিত) দেখলে ভারতের সব রাজ্যের লোককলা দেখতে পাওয়া যাবে।

কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ সহ দেশের নানা অংশে চিকিৎসা-বিজ্ঞান কেন্দ্রে অথবা চিকিৎসা-



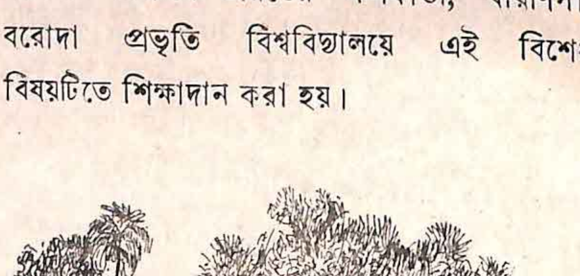
গুরুসদয় মিউজিয়ম্, ঠাকুরপুকুর

বিজ্ঞানের গবেষণা-প্রতিষ্ঠানে একাধিক সংগ্রহশালা আছে, কিন্তু এগুলি কেবলমাত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যই নির্দিষ্ট।

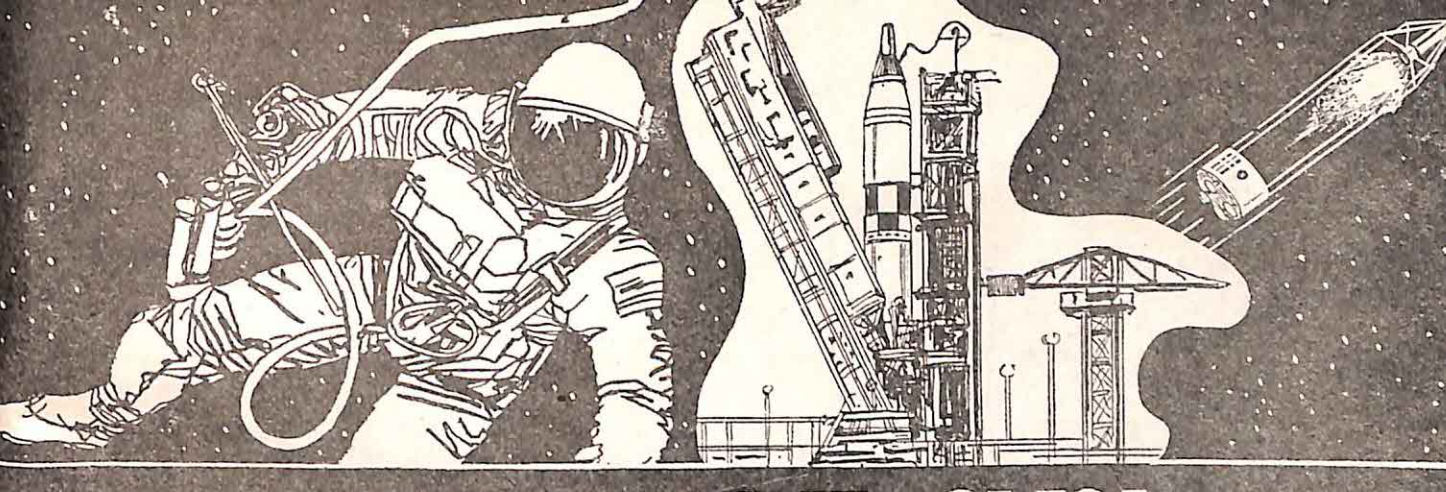
তোমরা সকলে নিশ্চয়ই বাংলার ও ভারতের ইতিহাস ভালোভাবেই জানতে চাও। এই জন্যে প্রথমেই তোমরা কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ভবনে আশুতোষ মিউ-জিয়মে যেতে পার। এর পরে দেখতে পার রাজ্য প্রত্নশালা অথবা 'ষ্টেট আর্কিওলজিক্যাল গ্যালারী'। এই দু'টি মিউজিয়মেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শুরু করে বাংলার সভ্যতার সুন্দর সব নিদর্শন রাখা আছে। প্রস্তর-যুগ ও সিন্ধুসভ্যতার যুগ থেকে ভারতের বিভিন্ন সময়ের বৃহত্তম সংগ্রহ আছে কলকাতার 'ইণ্ডি-য়ান মিউজিয়মে'। আদিযুগের ভাস্কর্য, আদিযুগ ও মধ্যযুগের শিলালেখ, মধ্যযুগের চিত্রকলা, প্রাচীনকালের সীলমোহর প্রভৃতিও এখানে দেখবার মত। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালা, বাঁকুড়ার 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি-ভবন', বাগনানের 'আনন্দনিকেতন কীর্তিশালা', মালদহ মিউজিয়ম্, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদ প্রভৃতিতেও আছে দেখবার মত সংগ্রহ। বাংলার নবাবী আমলের ও ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহ আছে কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে'।

ইতিহাসের গতিতে ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের নানা স্থানে অবস্থিত গান্ধীস্মারক সংগ্রহালয় এবং পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটির পাশে কাঁঠালপাড়ায় 'ঋষি বঙ্কিম সংগ্রহশালা', কলকাতার 'নেতাজী মিউজিয়ম্' ও 'রবীন্দ্র-ভারতী মিউজিয়ম্' এবং শান্তিনিকেতনের 'রবীন্দ্রসদন সংগ্রহশালায়' আমাদের আধুনিক যুগের অনেক নিদর্শন রাখা আছে।

মিউজিয়ম্ পরিচালন এখন একটা বিশেষ বিদ্যা। এই ধরনের জ্ঞানচর্চার জন্য মূল নিদর্শন আহরণ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের কলাকৌশল সম্পর্কে ভবিষ্যৎ সংগ্রহশালাবিদ্‌দের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিজ্ঞানের নাম মিউজিয়-লজি। বর্তমানে ভারতের কলকাতা, বারাণসী, বরোদা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিশেষ বিষয়টিতে শিক্ষাদান করা হয়।



গান্ধীস্মারক সংগ্রহালয়, ব্যারাকপুর



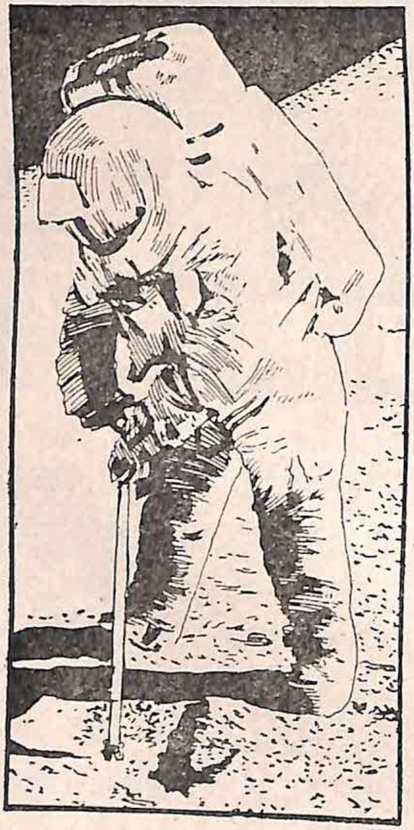
মহাশূন্যের পথে

চন্দ্র অভিযানে আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতা

এ পর্যন্ত মানুষ সশরীরে চাঁদে যে ক'টি অভিযান চালিয়েছে তার একটা মোটামুটি বিবরণ আমরা ছোটদের বিশ্বকোষের পাঠক-পাঠিকাদের জানিয়েছি, বিশেষ করে শেষের কয়েকটি অভিযান সম্বন্ধে। (ছোটদের বিশ্ব-কোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৬১-৬৭)। প্রতিবারই চন্দ্র-অভিযাত্রীরা,—বলা বাহুল্য তাঁদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীরাও ছিলেন,—নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। শুধু চাঁদের নয়, —পৃথিবী, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহতারার কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক রহস্যও এ থেকে ধরা পড়বে বলে তাঁদের ধারণা।

পৃথিবীতে যেমন ভূমিকম্প হয়, এবং সিস্‌মোমিটার যন্ত্রে যেমন তা ধরা পড়ে, চাঁদের বেলাও তেমনি মৃদু চন্দ্রকম্প টের পাওয়া গেছে অনেক বার। বিশেষ করে চাঁদ যখন পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পড়ে তখন এই চন্দ্রকম্পের সংখ্যা খুবই বেড়ে যায়। এতে মনে হয় পৃথিবীর আকর্ষণের ফলেই হয়তো ঐ কাঁপুনিগুলি হচ্ছে। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠের ভিতর দিয়ে অনেক গভীরে যন্ত্র নামিয়ে যে ধরনের সব চন্দ্রকম্প ধরা পড়েছে তাতে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন চাঁদকে যতটা মৃত মনে করা হচ্ছে আসলে সে হয়তো ততটা মৃত নয়। ওপরের দিকে না হ'লেও ভিতর দিকে তার সজীবতার লক্ষণ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চাঁদের অতি গভীরে কিছু জল আটকে থাকাও অসম্ভব নয়। ১৯৭১ সালেই এই রকম একটি চন্দ্র-অভিযানে 'আয়ন ডিটেক্‌টর' যন্ত্রে চাঁদের ভিতর থেকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে একটা গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল—যার আণবিক ওজন ছিল ঠিক জলেরই সমান। অবশ্য সে গ্যাস চাঁদের ওপরের দিকে এসে আর ধরা দেয় নি, সঙ্গে সঙ্গে মহাশূন্যে উড়ে চলে গেছে।

চাঁদে আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রচুর এবং সেগুলি সবই মৃত, অর্থাৎ তা থেকে আর বিস্ফোরণ হয় না, বেরোয় না কোন লাভা—যা নাকি একদা কোন্ সুদূর অতীতে নিয়তই বেরিয়ে আসত। চন্দ্রকম্পের ধরন দেখে বিজ্ঞানীরা এখন ভাবছেন যে চন্দ্রদেহের গভীর অভ্যন্তরে এই সব আগ্নেয়গিরির একেবারে নীচের দিকে হয়তো সজীবতার লক্ষণ এখনও আছে,—আছে হয়তো গাইজারও। গাইজার কাকে বলে জান তো? পৃথিবীর মাটির তলায় আবদ্ধ জল মাঝে



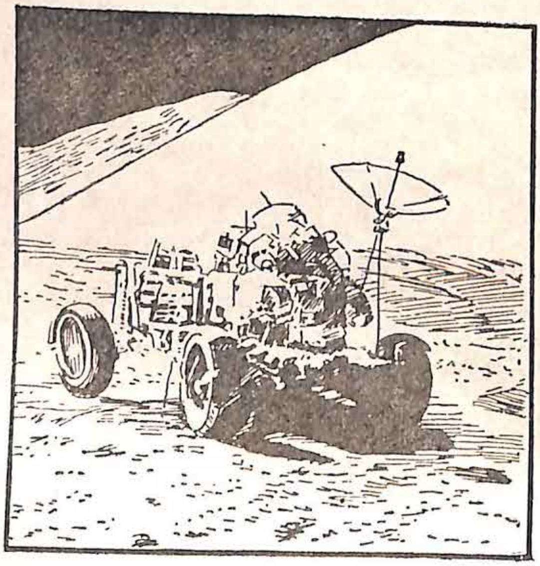
চাঁদের বুকে মহাকাশযাত্রী জেম্‌স্ আরউইন চাঁদের মাটিতে যন্ত্র বসিয়ে গর্ত খুঁড়ে চলেছেন। তাঁর পিঠের বোঝাটা বোঝা বলেই মনে হচ্ছে না, কারণ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর ছ'ভাগের একভাগ মাত্র।

মাঝে ফোয়ারার মত অবিরল ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসে নীচে থেকে ঠেলা খেয়ে। কি কারণে এটা ঘটে তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। (ছোটদের বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৯৫-৯৬)। চাঁদের ভিতরে যে গ্যাসের কথা বললাম সেগুলো এই রকম চাঁদের গভীরে আটকে-থাকা গাইজারের জন্যও হ'তে পারে।

আর একবার একটি চান্দ্র অভিযানে একটা মজার ব্যাপার দেখা গিয়েছিল। একবার চন্দ্র-অভিযাত্রীরা তাঁদের ব্যবহার-করা একটা যন্ত্র আর কোন কাজে লাগবে না বুঝে সেটাকে চাঁদের বুকে সজোরে আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের বুকে শুরু হ'ল কাঁপুনি আর বেশ খানিকটা সময় ধরে। যেন থামতেই চায় না। পেটা ঘণ্টা বাজালে সেটা যেমন একবার ঢং করে বেজে তার পর কিছুক্ষণ ধরে তার অনুরণন চলে,—এটাও ঠিক সেই রকম। চাঁদে এমনিতে কোন শব্দ শোনা না গেলেও, এটা যে আসলে শব্দই তা যন্ত্র দিয়েই ধরা গিয়েছিল। কেন এমনটা হ'ল তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক জল্পনাকল্পনা করেছেন। তবে এ থেকেও চাঁদের মাটির নীচেকার অংশ সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়েছে তাঁদের।

মহাশূন্যে স্টেশন ঃ স্কাইল্যাব

মহাকাশ অভিযানে মানুষের সাফল্যের



চাঁদের বুকে মহাকাশযাত্রীদের ব্যাটারী-চালিত গাড়ি। এই গাড়িতে বসে দু'জন মহাকাশযাত্রী চাঁদের ওপর ২৭·৯ কিলোমিটার ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই মহাশূন্যে একটা স্টেশন বসিয়ে দীর্ঘ দিন সেখানে বসে নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা ভাবছিলেন। আমেরিকার মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি এ রকম একটি স্টেশন মহাশূন্যে ভাসিয়ে দিলেন, আর সেটা ক্রমাগত পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল। এক একটা ঘুর-পাক শেষ হ'তে সময় লাগল ৯৩ মিনিট করে।

বিজ্ঞানীরা এই স্টেশনটিকে অবশ্য স্টেশন নাম দেন নি। এটা ছিল তাঁদের মহাকাশের ল্যাবোরেটরী। তাই সংক্ষেপ করে ওর নাম দেওয়া হ'ল "স্কাইল্যাব"।

লম্বায় পঁচিশ মিটার, চওড়ায় গড়পড়তা প্রায় সাড়ে ছ'মিটার। ধরতে গেলে একটা তিন কামরা-ওয়ালা ফ্ল্যাট বাড়ীর মত। এই বিরাট মহাকাশ-ল্যাবোরেটরী পৃথিবী থেকে ৪৩৫ কিলোমিটার ওপরে উঠে ঘুরতে শুরু করে দিল।

এই স্কাইল্যাবে তিনজন মহাকাশ-যাত্রীর থাকবার মত তিনটি পৃথক্ শোবার ঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর, স্নানের ঘর—সব কিছুরই ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল অগুণ্‌তি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, যা দিয়ে দিনের পর দিন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং মহাকাশের বিভিন্ন বাসিন্দাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা যায়। হ্যাঁ, আরও কয়েকটা জিনিস ছিল এই স্কাইল্যাবে। একটা ছোটখাট লাইব্রেরী, কিছু খেলাধূলার সরঞ্জাম আর অবসর বিনোদনেরও কিছু কিছু জিনিস—টেপ্ রেকর্ডার, গানের রেকর্ড ইত্যাদি। অর্থাৎ স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যা যা সাধারণত দরকার তার সবেরই ব্যবস্থা ছিল। তবে কাজের সময়টাও খুব কম ছিল না—দিনে কম করে দশ ঘণ্টা।

প্রথম দিকের বাধা

কিন্তু গোড়াতেই যে রকম বাধাবিপত্তি দেখা দিল তাতে মনে হ'ল শেষ পর্যন্ত হয়তো সমস্ত পয়সাটাই জলে গেল। খরচ তো কম হয় নি—প্রায় ২৫০ কোটি আমেরিকান ডলার। আমাদের টাকার হিসেবে বোধ হয় হাজার দুই কোটি টাকা। চাঁদে মানুষ পাঠাতেও বোধ হয় এত টাকা বরাদ্দ করা হয় নি।

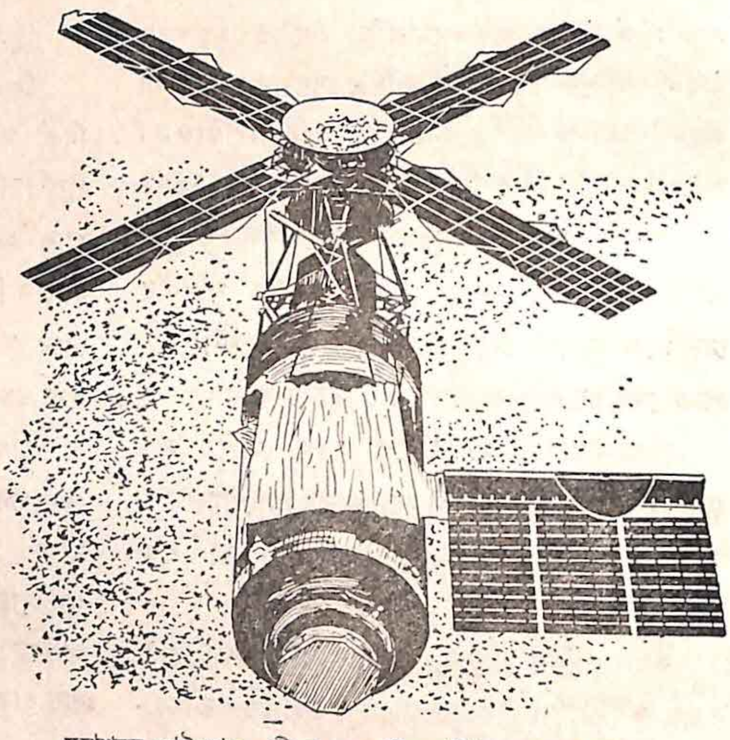
বাধার কথা বলছিলাম। মহাকাশে উঠতেই দেখা গেল স্কাইল্যাব এত গরম হয়ে যাচ্ছে যে তার মধ্যে মানুষের বাস করা অসাধ্য। কারণ, স্কাইল্যাবকে মহাকাশের তেজস্ক্রিয় আক্রমণ এবং অনবরত-ছুটে-আসা ছোটবড় উল্কার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যে তাপরোধক ঢাকনা দেওয়া ছিল প্রথম চোটেই সেটা খুলে আল্‌গা হয়ে গেল। তা ছাড়া সূর্য থেকে তাপ নিয়ে তাই দিয়েই তো প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎশক্তি তৈরি করে নিতে হবে স্কাইল্যাবকে। সেই তাপ সংগ্রহ করার জন্য দু'পাশে যে দু'টি ধাতুর ডানা বা পাখা বসানো হয়েছিল, তারও একটি গেল ভেঙ্গে।

কিন্তু উদ্ধার করলেন মহাকাশ-অভিযাত্রীরাই। অন্য মহাকাশ-জাহাজ ছুটিয়ে তাঁরা স্কাইল্যাবে গিয়ে ভেড়ালেন—ঠিক যেমন করে সমুদ্রে বড় জাহাজের গায়ে গিয়ে স্টিমার ভেড়ে। তারপর অসম্ভব ক্ষিপ্রতা আর কৌশলের সাহায্যে ত্রুটীগুলি সাধ্যমত মেরামত করে ফিরে এলেন। এ রকম একবার নয়, একাধিক বার করতে হ'ল। শেষে ৫২ দিন পরে সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে তিনজন করে অভিযাত্রী রওনা হ'লেন ওখানে বাস করার জন্য।

স্কাইল্যাবে ওঠার পর

এক একবার তিনজন করে অভিযাত্রী গিয়ে বাসা

বাঁধলেন স্কাইল্যাবে। এর আগে ওঁদের মত অত দীর্ঘদিন কেউ মহাকাশে কাটায় নি। একদল কাটালেন ২৮ দিন, আর একদল ৫৯ দিন এবং শেষ দলটি কাটালেন একটানা ৮৪ দিন। তা গোড়ায় একটু অসুবিধা হয়েছিল বৈকি! প্রথম সমুদ্রে জাহাজে চড়লে জাহাজের দোলানিতে যে সামুদ্রিক পীড়া বা সী-সিক্‌নেস্ হয় তাঁদেরও অনেকটা সেই রকম হয়েছিল - যাকে বলা যায় 'গতির পীড়া' বা 'মোশান সিক্‌নেস্'। ২য় ও ৩য় দলটিই এই অসুস্থতা বেশ কয়েকদিন ধরে অনুভব করেছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠেন।



মহাশূন্যে স্কাইল্যাব—নীচে, ৪৩৫ কিলোমিটার দূরে পৃথিবীকে রেখে অবিরত তাকে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

মহাশূন্যে উঠলে শরীরে আরও কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। আমরা যতক্ষণ পৃথিবীতে থাকি সে সময়টা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আমাদের টেনে রাখে। মহাশূন্যে সে আকর্ষণ না থাকায় মানুষ তার ভার হারিয়ে ফেলে। ফলে আমাদের পেশীকেও তখন অনেক কম কাজ করতে হয়, যার জন্য সেগুলি বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া হৃৎপিণ্ডকেও, মাধ্যাকর্ষণমুক্ত হওয়ায়, রক্ত পাম্প করতে অনেক কম শক্তি ব্যয় করতে হয়। ফলে সেটাও শিথিল হয়ে আসে আর তার প্রভাব দেখা যায় রক্ত সঞ্চালনের ওপর। মোট কথা, মহাশূন্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে আসার পর আবার পৃথিবীতে নেমে এলে দেহকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়। অবশ্য স্কাইল্যাবের অভিযাত্রীদের মধ্যে একজন ডাক্তারও ছিলেন। তিনি নানা পরীক্ষার পর অভিমত দিয়েছেন, মহাকাশে বেশিদিন কাটালে দেহে পরিবর্তন ঘটে ঠিকই, তবে তা এমন কিছু মারাত্মক নয়।

আর, এবারকার স্কাইল্যাবে জীবন্ত প্রাণী হিসেবে তিনজন করে মানুষ গেলেও অন্য জীবন্ত প্রাণীও কিছু কিছু সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিল কিছু মাকড়সা, খুব খুদে খুদে কিছু মাছ, মথ অর্থাৎ রাতের প্রজাপতির কিছু ডিম। এ ছাড়া কিছু শস্যের বীজও ছিল। এদের নিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে মাকড়সারা কয়েকবারে না পারলেও শেষ পর্যন্ত স্কাইল্যাবের মধ্যেই যথারীতি তাদের অভ্যাস-মত জাল বুনে গেছে, খুদে মাছগুলো থেকেও মহাশূন্যেই নতুন মাছের বাচ্চা পাওয়া গেছে এবং ঐ অবস্থায় জন্মেও সেই বাচ্চাগুলোর শূন্যে সাঁতার কাটতে কোন অসুবিধা হয় নি। অবশ্য ওপর-সোজা জ্ঞান আর ওখানে কি করে হবে? অনুরূপ ভাবে

মথের ডিম থেকেও বাচ্চা বেরিয়েছে, বীজ থেকেও শীষ গজাতে বাধা পড়ে নি কোনও।

স্কাইল্যাবে বসে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বিজ্ঞানীরা স্কাইল্যাবে বসে কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে চালিয়েছেন তার আর লেখাজোখা নেই। সূর্যের ফটোই তো তুলেছেন প্রায় তিন লক্ষ। ধূমকেতুর, বিশেষ করে কোহেতুক ধূমকেতুর, যেটা সে সময় সূর্যের খুব কাছে এসে পড়েছিল,—তারও ছবি তুলেছেন অজস্র। অনেক সময় স্কাইল্যাব থেকে মহাশূন্যে বেরিয়ে এসেও এ সব ছবি তুলেছেন। তেমনিধারা মহাকাশের অন্যান্য বাসিন্দাদেরও ছবি নিয়েছেন, আর স্কাইল্যাব থেকে পৃথিবীকে কখন কেমন দেখায় তার ছবি নিতেও ছাড়েন নি। এ রকম ছবির সংখ্যা হবে প্রায় চল্লিশ হাজার। কোন কোন ছবিতে একটা নেগেটিভেই পৃথিবীর ১৬৩ বর্গ কিলোমিটার জায়গার ছবি উঠে গেছে। ছবি ছাড়া চৌম্বক ফিতেয়ও নানারকম তথ্য গেঁথে নিয়েছেন। সে ফিতে লম্বায় হবে প্রায় ৬৯ হাজার মিটার।

আরও কত রকম পরীক্ষা! বিভিন্ন সময়ে মহাশূন্যে বসেই নিজেদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে তাকে জমিয়ে রেখেছেন ওঁরা, পৃথিবীতে এসে পরীক্ষা শেষ করবেন বলে। বায়ুমণ্ডলের বাধা না থাকায় তাঁরা এমন সব অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন যা পৃথিবীতে বসে দেখা অসম্ভব। যেমন সূর্যদেহের একটি বিস্ফোরণ। হিসেব করে দেখা গেছে এই একটা বিস্ফোরণে যে শক্তি বেরিয়ে আসে তা পৃথিবীতে পাওয়া গেলে আগামী পাঁচশ' বছর আর পৃথিবীর কোন দেশে ইলেক্‌ট্রিসিটি তৈরির দরকার হ'ত না।

শুধু তাই নয়, মানুষ যে পৃথিবীর বাইরে দীর্ঘদিন সুস্থ দেহে, পৃথিবীর মতই আরামে বাস করতে পারে এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এ থেকে মনে হয় ভিন্ন গ্রহে যদি কখনও মানুষের যাওয়া সম্ভব হয় তা হ'লে সেখানেও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সঙ্গে থাকলে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়তো মানুষের তত কষ্ট হবে না।

স্কাইল্যাবে অঘটন

শেষ দল ফিরে এলে স্কাইল্যাবটাকে আর একটু ওপরে ঠেলে দেওয়া হ'ল। বিজ্ঞানীরা নানা হিসেব করে বললেন, ওটা ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত আপন মনে মহাকাশে ঘুরতে থাকবে। তা ঘুরুক, পরে সুবিধে-মত এক সময়ে পৃথিবীতে নামিয়ে আনলেই হবে।

কিন্তু মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এখনও যে বেশ সীমিত তা অল্পদিন পরেই টের পাওয়া গেল। হঠাৎ কোথা থেকে স্কাইল্যাবের গায়ে এসে লাগল একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। আর সেই ধাক্কায় সেটা তার কক্ষ থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবীর দিকে নামতে লাগল—প্রত্যহ প্রায় দুই কিলোমিটার করে।

কারণটাও জানা গেল। সূর্যই এর জন্য দায়ী। সূর্যদেহে মাঝে মাঝে যখন কলঙ্ক বা সূর্যক্ষত দেখা দেয় তখন সেখানে হয় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—যার ফলে অতিকায় সব বুদ্‌বুদ্‌ ছিটকে বেরিয়ে আসে। বুদ্‌বুদ্‌ বললাম বটে, কিন্তু তার এক একটা আকারে আমাদের পৃথিবীর চাইতেও বড় হ'তে পারে। বুদ্‌বুদ্‌ ছুটে বেরুবার সময় সেই সঙ্গে নানা রকম বিদ্যুৎ-কণাও বেরিয়ে আসে এবং দুস্তর মহাকাশ-সমুদ্র পার হয়ে তার কিছু কিছু আমাদের পৃথিবীর আকাশেও এসে পড়ে। অবশ্য পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক, তাই সেই বিদ্যুৎ-কণাগুলোকে সে তার দুই মেরুতে টেনে নেয়—যার ফলে সেখানে দেখা দেয় রঙিন আলোর খেলা। কিন্তু সূর্যক্ষত দেখা দিলে সূর্যের বুক থেকে শুধু তো বিদ্যুৎ-কণাই বেরোয় না, দেখা দেয় প্রচণ্ড ঝড়—যাকে বলা যায় সৌর ঝড়। এই ঝড় খানিকটা মহাকাশেও ছড়িয়ে পড়ে, এমন

কি তার ফলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরটাও কিছুটা গরম হয়ে পড়ে। আর গরম হ'লে যা নিয়ম, ঐ স্তরটি তখন হাল্কা হয়ে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

এ সব খবরই বিজ্ঞানীরা জানতেন এবং এও জানতেন যে আপাতত বেশ কয়েক বছর সূর্যদেহে ও-রকম কোন উপদ্রব হবার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ সূর্যদেহে অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু হয়ে গেল ঐ ঝড়ের মাতন, শুরু হ'ল মহাকাশে ঝড়ের সেই ধাক্কা—যার খানিকটা স্কাইল্যাবের ওপরেও আচমকা এসে পড়ল। বিজ্ঞানীরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ; যখন বুঝতে পারলেন তখন খুবই দেরী হয়ে গেছে। স্কাইল্যাবকে আর বাঁচানো গেল না। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই সে নেমে এল পৃথিবীর আকাশে, আর বাতাসের ঘন স্তরে এসেই জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের মত হাজার টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ল।

কোন লোকালয়ের ওপর পড়লে হয়তো বিপর্যয় ঘটাতে পারত স্কাইল্যাব। কিন্তু সুখের বিষয়, সেটার বেশির ভাগই গিয়ে পড়ল অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি সমুদ্রে, আর অল্প কিছু আশপাশের বনজঙ্গলে। স্কাই-ল্যাবের মৃত্যু ঘটলেও সে আর কারও মৃত্যু ঘটাল না।

চাঁদের পরে মঙ্গল

মানুষের চন্দ্রবিজয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন, চাঁদ আসলে পৃথিবীরই একটি উপগ্রহ এবং দূরত্বের দিক্ দিয়ে মহাশূন্যে সে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। কাজেই চন্দ্রবিজয়ের অসাধারণ সাফল্যের পর স্বভাবতই বিজ্ঞানীদের পরবর্তী চেষ্টা হবে উপগ্রহ নয়,—কোন গ্রহ জয় করা।

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্র। কিন্তু শুক্রের শরীরটা এমন ঘন গ্যাসের আবরণে ঢাকা যে সেখানে নামাও যেমন বিপজ্জনক তেমনি তার সঠিক চেহারা সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। তাই শুক্রকে আপাতত পাশ কাটিয়ে তার পরবর্তী গ্রহ মঙ্গলের কথাই আগে মনে আসবে।

মঙ্গল কিন্তু পৃথিবীর চাইতে বেশ খানিকটা ছোট,—আয়তনে পৃথিবীর সাত ভাগের এক ভাগ। চার চারটে মঙ্গল গ্রহ একত্র যুড়লে তবেই তার বেড় হবে পৃথিবীর বেড়ের সমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমস্ত গ্রহের মধ্যে পৃথিবীর সঙ্গে মঙ্গলেরই মিল নাকি সবচাইতে বেশি। বিজ্ঞানীরা ইতিপূর্বে মঙ্গল সম্বন্ধে যে সব তথ্য বার করেছিলেন তা থেকে, চাঁদের মত স্পষ্ট না হ'লেও, মঙ্গলের একটা মোটামুটি ছবি আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। যেমন,—ঠিক পৃথিবীর মত না হ'লেও মঙ্গলের আকাশে যে খানিকটা বাতাস আছে এবং সে বাতাসে যে সামান্য পরিমাণ অক্সিজেনও আছে এ সব তথ্য। অবশ্য ঐ বাতাসে পৃথিবীর ওপরকার বাতাসের তুলনায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুব বেশি। তা ছাড়া পৃথিবীর মতই মঙ্গলেও আছে মাটিপাথর। এমন কি, জল থাকারও সমূহ সম্ভাবনা। শীতকালে মঙ্গলের দুই মেরুতে সাদা জমাট ছোপ দেখা যায়। সেটাও হয়তো মঙ্গলের জল জমে গিয়ে বরফ হওয়ার দরুণই হয়ে থাকে এই রকম একটা ধারণা ছিল বিজ্ঞানীদের। অবশ্য ইদানীং কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন ওগুলো জল না হয়ে জমাট কার্বন ডাইঅক্সাইডও হ'তে পারে। চাঁদে যাবার আগে যেমন চাঁদের একটা চমৎকার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছিল, তেমনি মঙ্গলেরও একটা ম্যাপ তৈরি করে ফেলেছিলেন বিজ্ঞানীরা। আর তাতে কোথায় রয়েছে কোন্ মরুভূমি, কোথায় রয়েছে কোন্ আগ্নেয়গিরি, কোথায় রয়েছে কোন্ শুকনো সমুদ্রের খাত—সবই দেখানো হয়েছিল। অবশ্য মঙ্গলের গায়ের সোজা সোজা আঁচড়—যাকে

কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোনও বুদ্ধিমান্ জীবের তৈরি কাটা খাল বলে অনুমান করেছিলেন,—সেটাকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় নি এবং সেই কারণেই মঙ্গল গ্রহের বুদ্ধিমান্ প্রাণীদের অস্তিত্বকেও আমল দেন নি এ যুগের বিজ্ঞানীরা—যদিও তথাকথিত অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পে এই সব কল্পিত প্রাণী নিয়ে কোন কোন সাহিত্যিক নানা মজাদার গল্প লিখতে কসুর করেন নি, আর শিল্পীরাও তার কল্পিত ছবি আঁকতে ছাড়েন নি।

কিন্তু এ সবই জল্পনাকল্পনা। চন্দ্রবিজয়ের পর মঙ্গল সম্বন্ধে এ সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে সাক্ষাৎ সত্য উদ্ঘাটন করবার কাজে অগ্রসর হ'লেন বিজ্ঞানীরা। ইতিপূর্বেই তাঁরা দূর পাল্লার একাধিক রকেট পাঠিয়েছিলেন মঙ্গলের দিকে। ঠিক মঙ্গলে না নামলেও মঙ্গলের মাটি থেকে কিছুটা দূর দিয়ে সেগুলো ছুটে গিয়েছিল আর স্বয়ংক্রিয় টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে তার ছবি তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল পৃথিবীতে। এইসব ছবিতে অনেক খুঁটিনাটি খবর জানা গিয়েছে মঙ্গল সম্বন্ধে। এদের মধ্যে মেরিনার-৯ নামে একটি রকেট কয়েক মাস ধরে মঙ্গলের চারধারে ঘুরপাক খেয়ে এমন ভাবে মঙ্গলের ছবি নিয়েছে যে তাই থেকে এখন মঙ্গলের প্রায় নিখুঁত একটি ম্যাপ বিজ্ঞানীরা তৈরি করে ফেলেছেন।

মঙ্গল গ্রহে অভিযান

কিন্তু এর পর আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছেন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরা এবং সেটা ঘটেছে ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে। যে ভাবে তাঁরা চাঁদে মহাকাশ-জাহাজ পাঠিয়ে তা থেকে লুনার মডিউল (যার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছিল চাঁদের ভেলা) চাঁদের বুকে নামিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি ভাবে মঙ্গলের আকাশেও মহাকাশ-জাহাজ পাঠিয়ে তা থেকে তাঁরা ঐ রকম ভেলা নামিয়ে দিয়েছেন মঙ্গলের বুকে। পর পর দু'টি মহাকাশ-জাহাজ,—ভাইকিং-১ ও ভাইকিং-২,—কয়েক দিনের ব্যবধানে। ভাইকিং বলতে বোঝায় দুঃসাহসী অভিযাত্রী। সেকালে নরওয়ে আর সুইডেনে এই সব অভিযাত্রীরা জাহাজ নিয়ে উত্তর সাগরে বেরিয়ে পড়ত অজানার উদ্দেশে। অদম্য ছিল তাদের সাহস আর অপরিসীম ছিল তাদের মনের জোর। অবশ্য এই সব ভাইকিংরা সমুদ্রে লুঠপাট করতেও কম দক্ষ ছিল না।

যাই হোক, দুঃসাহসের অভিযান বলেই হয়তো মঙ্গল-অভিযানের মহাকাশ-জাহাজেরও ঐ নামকরণ। তবে এই অভিযানে কোন মানুষ পাঠানো হয় নি—যন্ত্রকে দিয়েই যা কিছু কাজ করানো হয়েছে। ঠিক চন্দ্র-অভিযানের মতই ভাইকিং মহাকাশ-জাহাজেও ছিল দু'টি করে অংশ। তার একটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'অরবিটার', অপরটির নাম 'ল্যাণ্ডার'। নাম শুনেই বোঝা যায় মূল জাহাজটিই হচ্ছে অরবিটার—যার কাজ মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করা, আর ল্যাণ্ডার হচ্ছে লুনার মডিউলের মতই একটা ভেলা। ভাইকিং-এর অরবিটার থেকে এই ল্যাণ্ডারকে ধীরে ধীরে মঙ্গলের মাটিতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ল্যাণ্ডারে, আগেই বলেছি, চাঁদের ভেলার মত কোন মানুষ ছিল না,—ছিল কতকগুলি আপনি-চলা যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক কৌশলের দিক্ দিয়ে যা অতুলনীয়।

মহাকাশ-জাহাজখানা কিন্তু পৃথিবী থেকে রওনা হয়েছিল আরও এক বছর আগে। অর্থাৎ পৃথিবীর আকাশ থেকে মঙ্গলের আকাশে পৌঁছতে তার লেগেছিল প্রায় পুরো একটি বছর। এক বছর আগে রওনা হ'লেও তার প্রস্তুতি চলছিল বহু আগে থেকেই। এই পরিকল্পনার প্রধান বিজ্ঞানী ছিলেন ডক্টর জেরাল্ড সফেন। পনেরো বছর ধরে ইনি

পৃথিবীর বাইরেকার জগতে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করে আসছিলেন, তবে শেষ আট বছর তিনি এই ভাইকিং নিয়েই মেতে ছিলেন। কারণ, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ভাইকিং-এর সাহায্যে হয়তো এমন সব তথ্য বেরিয়ে পড়বে যা পৃথিবীর ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও অনেক নতুন খবর যোগাতে পারবে। তাঁর সহযোগী হিসেবে কাজ করছিলেন আরও ৭৫ জন বিজ্ঞানী, যাঁরা নাকি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত। কেউ জীববিজ্ঞানে, কেউ ভূবিজ্ঞানে, কেউ পদার্থবিজ্ঞানে, কেউ রসায়ন-বিজ্ঞানে, কেউ আবহাওয়া-বিজ্ঞানে—এই রকম আর কি! তবে মঙ্গলে যে মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান্ কোন জীবের সন্ধান পাওয়া যাবে এ কথা আর এখন কেউ বিশ্বাস করেন না। এমন কি কোন বড় বা উঁচু জাতের প্রাণী থাকার সম্ভাবনাও তাঁরা উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ধারণা, যদি মঙ্গলে জীবনের কোন লক্ষণ পাওয়া যায়ও, তবে তা হবে বড় জোর ব্যাক্টিরিয়া বা তার চেয়েও ছোট ভাইরাস জাতের কিছু।

ভাইকিং থেকে ল্যাণ্ডার মঙ্গলের মাটিতে নামল

যাই হোক, ভাইকিং-১ থেকে ল্যাণ্ডার অক্ষত শরীরেই মঙ্গলের বুকে নামল। নামবার সময় খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। মঙ্গলের পিঠ থেকে মহাকাশ-জাহাজটি যখন ৯৫০ মাইল ওপরে তখনই ল্যাণ্ডারটি তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল; সঙ্গে সঙ্গে উল্টোমুখো রকেট চালিয়ে তার গতি আরও মন্থর করে দেওয়া হ'ল। মঙ্গলের বাতাসের সঙ্গে ঘষা লেগে সেই উত্তাপে ল্যাণ্ডারের যাতে কোন ক্ষতি না হয় এজন্য তার গায়ে একটা বর্ম পরানো ছিল। মঙ্গলের পিঠ থেকে ২৫০০ ফুট দূরে নেমে এসে সেই বর্মটি আপনি খুলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ৫০ ফুট ব্যাসের একটা প্যারাসুট খুলে গিয়ে ওর গতিবেগ দিল আরও কমিয়ে। ইতিমধ্যে এর আগেই ওর ভিতরকার আপনি-চলা যন্ত্রগুলো একে একে বেরিয়ে আসছিল। যেমন,—খাড়া হয়ে থাকার জন্য তিনটে পা (তেপায়া টেবিল কখনও কাৎ হতে পারে না, এখানেও তাই তেপায়ার ব্যবস্থা), টেলিভিশন ক্যামেরা ইত্যাদি হরেক রকম যন্ত্র। মঙ্গলের বুকে জমা ধুলো বেশি থাকলে চোরাবালির মত ল্যাণ্ডার যাতে তার মধ্যে ঢুকে না যায় তারও ব্যবস্থা ছিল ঐ সব যন্ত্রের সঙ্গে। ল্যাণ্ডার যখন মঙ্গলের পিঠ থেকে মাত্র দশ ফুট ওপরে তখন ওর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র তিন মাইল।

কোথায় নামবে ভাইকিং-১এর ল্যাণ্ডার তা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল, অবশ্য কয়েকবার স্থান পরিবর্তনও করা হয়েছিল। নেমেই ল্যাণ্ডারের আপনি-চলা যন্ত্রগুলো সচল হয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে তার রঙিন ছবি পাঠাতে শুরু করল পৃথিবীতে-বসে-থাকা বিজ্ঞানীদের উদ্দেশে। প্রথমেই দেখা গেল, যেখানে ওটি নেমেছে সে জায়গাটি বেশ সমতল, তবে এদিকে ওদিকে অনেক ছোটবড় পাথর ছড়িয়ে আছে। মাটি ঈষৎ স্যাঁৎসেঁতে,—তলায় বরফ জমে থাকলে যে রকমটা হতে পারে। মাটির রঙ মরচে-ধরা লোহার মত লালচে, আর আকাশের রঙ ফিকে গোলাপী। মনে হ'ল মঙ্গলের পাৎলা বাতাসে প্রচুর ধুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। আর তারই ওপর সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে ঐ রকম গোলাপী দেখাচ্ছে। মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে বেতার-সঙ্কেত আসতে সময় লাগল ১৯ মিনিট।

খানিকক্ষণ বেশ ছবি আসছিল, কিন্তু তার পরেই, ব্যস্, একদম চুপচাপ। হবেই তো, মঙ্গলে যে তখন রাত্রি নেমে এসেছে! সার্চ লাইটের ব্যবস্থা থাকলে তবু কিছু হ'ত, কিন্তু ল্যাণ্ডারে তা ছিল না।

কাজেই আবার ১৯ ঘণ্টা পরে মঙ্গলের ভোর হ'লে তবেই আবার শুরু হ'ল টেলিভিশনে ছবি আসা।

ল্যাণ্ডারের পাঠানো খবর

ক্রমে আরও নতুন নতুন খবর জানতে পারা গেল। দেখা গেল ভোরের দিকে, সূর্যোদয়ের সময় ঐ জায়গাটির উষ্ণতা শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে ৮৬ ডিগ্রী নীচে। এমন কি দুপুরেও শূন্য ডিগ্রী থেকে ৩০ ডিগ্রী কম। বাতাস আমাদের পৃথিবীর তুলনায় অসম্ভব হাল্কা। সে বাতাসের চাপ পৃথিবীর ওপরকার চাপের ২০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র; পৃথিবীর উপর ২৩ মাইল উঠে গেলে বাতাসের চাপ যেমন হাল্কা হয়ে যাবে—ঠিক সেই রকম হাল্কা।

মঙ্গলের পাহাড়গুলি কিন্তু খুব উঁচু! ভাইকিং-১ যেখানে নেমেছিল তার কিছুটা পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছে একটা মৃত আগুনে পাহাড়—অলিম্পাস্ মন্‌স্। এর চূড়া আমাদের এভারেস্টের তিন গুণেরও বেশি উঁচু। এভারেস্টের ওপর পর পর আরও দু'টো এভারেস্ট চাপিয়ে দিলেও তার নাগাল পাবে না। এভারেস্ট প্রায় ৫ মাইল উঁচু, অলিম্পাস মন্‌স্ সাড়ে পনেরো মাইল। বেড়ও অলিম্পাস্ মন্‌সের সাংঘাতিক। আমাদের প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই অঞ্চলে প্রচুর আগুনে পাহাড় ছড়ানো আছে। তাদের সবগুলির বেড় যোগ দিয়ে একত্র করলেও অলিম্পাস্ মন্‌সের সমান হবে না। এ ছাড়া মঙ্গলে আছে বিরাট বিরাট গভীর খাদ। কিন্তু তাতে একটুও জল নেই। হয়তো এক সময়ে ছিল, এখন নেই। মঙ্গল এখন যে রকম ঠাণ্ডা আর তার বাতাস এখন যে রকম হাল্কা তাতে ওখানে জল তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। এক বালতি জল মঙ্গলের গায়ে ঢেলে দিলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে, নয়তো ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যাবে।

এ ছাড়াও আছে বড় বড় ফাটল। অত্যন্ত গভীর সেই ফাটল। কোন কোনটা ৬ থেকে ১২ মাইল গভীর। কি করে এত বড় আর গভীর ফাটল হ'ল? একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে মঙ্গলের বুকে আগুনে পাহাড়ের প্রচণ্ড লাভাস্রোত। দু'টি প্রবল লাভাস্রোত যদি পাশাপাশি, খানিকটা ফাঁক রেখে, গড়িয়ে চলে, তা হলে লাভাস্রোত জমে যাবার পর তাদের মাঝখানের ফাঁকটা ঐ রকম গভীর ফাটল বলেই মনে হতে পারে।

কম্পিউটার অসাধ্য সাধন করল

ভাইকিং-১এর ল্যাণ্ডারের সঙ্গে লাগানো ছিল দু'টি যান্ত্রিক হাত। কথা ছিল মঙ্গলে নামবার পরই ঐ হাত দু'টি ল্যাণ্ডারের ভিতর থেকে দু'দিকে বেরিয়ে আসবে আর হাত দিয়ে যেমন করে আমরা মাটি খুবলে নিই ঠিক তেমনি করে মঙ্গলের খানিকটা করে মাটি খুবলে নিয়ে ল্যাণ্ডারের ভিতকার ছোট্ট ল্যাবোরেটরীর মধ্যে তা ঢুকিয়ে দেবে বিশ্লেষণের জন্য। কিন্তু কোথায় কি যান্ত্রিক গোলমালের জন্য হাত আর বেরোল না। কিন্তু মহাকাশ-বিজ্ঞানীরাও ছাড়বার পাত্র ন'ন, কম্পিউটারের সাহায্যে পৃথিবীতে বসেই তাঁরা গোলযোগের কারণটা আবিষ্কার করে ফেললেন এবং তারই সাহায্যে আশ্চর্য কৌশলে এখানে বসেই যন্ত্র দু'টোকে চালু করে দিলেন। যন্ত্র চালু হওয়া মাত্র দু'দিক্ থেকে দশ ফুট করে লম্বা এক-একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এসে বেশ খানিকটা করে মঙ্গলের মাটিপাথর খুবলে নিয়ে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দিল। তার পর দু'ভাগে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা হ'ল। একটাতে জল দিয়ে, অপরটাতে পুষ্টিকর খাদ্য দিয়ে। উদ্দেশ্য, যে ভাবে "ঘুমন্ত" বীজ থেকে অঙ্কুর বার করা হয় সেইভাবে মঙ্গলের কোন সজীব পদার্থ "ঘুমন্ত" অবস্থায় থাকলে

তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করা যায় কিনা তাই দেখা।

মঙ্গলে কি পাওয়া গেছে

মঙ্গলের মাটিতে বালি, লোহার মরচে অর্থাৎ লোহার জলীয় অক্সাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম্‌, 'অ্যালুমিনিয়াম্‌' ইত্যাদির যৌগ এবং নানা রকমের সিলিকেট্‌ লবণ পাওয়া গেছে। বাতাসে পাওয়া গেছে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং বেশ কিছু আর্গন। পৃথিবীর বাতাসে কিন্তু এ দু'টির পরিমাণই অতি সামান্য। কিন্তু মঙ্গলের বাতাসে আবার অক্সিজেন আছে অতি সামান্য, শতকরা এক ভাগও নয়—এক ভাগের দশ ভাগ, যে ক্ষেত্রে পৃথিবীর বাতাসে আছে শতকরা ২১ ভাগ। তেমনি নাইট্রোজেনও আছে মাত্র শতকরা তিনভাগ (পৃথিবীর বাতাসে শতকরা ৭৮ ভাগ)। এ ছাড়া কিছু জলীয় বাষ্প, হাইড্রোজেন, ওজোন ইত্যাদি গ্যাসও পাওয়া গেছে মঙ্গলের বাতাসে। এখানে লক্ষ করবার বিষয় এই যে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন আর জল—প্রাণসৃষ্টির জন্য যা যা দরকার সবই আছে মঙ্গলে, তা পরিমাণে যা-ই হোক না কেন। কাজেই মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। এখন যদি নাও বা থাকে, সুদূর অতীতে হয়তো একদিন ছিল। কিন্তু ছিল বললেই তো হয় না, চাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ভাইকিং-১ এবং ভাইকিং-২-এর ল্যাণ্ডার সেই অনুসন্ধানই চালিয়ে গেছে। তবে এখন পর্যন্ত সে রকম কোন প্রত্যক্ষ এবং সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ভাইকিং-২এর উল্লেখ করলাম। ভাইকিং-১ মঙ্গল গ্রহে পৌঁছবার অল্প কয়েকদিন পরেই এই ২ নম্বর ভাইকিংও মঙ্গলে পৌঁছে তার অরবিটার থেকে ল্যাণ্ডার নামিয়ে দিয়েছিল, আর নামিয়েছিল ভাইকিং-১এর ল্যাণ্ডার মঙ্গলের যে দিক্‌টায় নেমেছে ঠিক তার উল্টো দিকে। এ জায়গাটিতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আগেরটির পাঁচগুণ, সুতরাং প্রাণের চিহ্ন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি।



মঙ্গলের দু'টি চাঁদ। তার একটি হচ্ছে ফোবো। খুব কাছে-থেকে-তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে ফোবোর চেহারা এই রকম এবড়োখেবড়ো। লম্বায় ফোবো মাত্র ২৫ কিলোমিটার।

পৃথিবীর একটি চাঁদ, মঙ্গলের দু'টি—ডাইমো আর ফোবো। অবশ্য পৃথিবীর চাঁদের তুলনায় এরা অনে-ক ছোট। তবু ভাইকিংএর এই অভিযানে তাদেরও খুব-কাছ-থেকে-তোলা ছবি আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে।

মহাকাশযাত্রার পরের ধাপে আমরা হয়তো চাঁদের মত মঙ্গলের বুকেও মানুষের সশরীরে পদার্পণ দেখতে পাব। সে দিনটিও যে খুব দূরে নয় তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।